ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন

757.7
·012/38A

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম.এ., পি-এইচ্.ডি.
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ,
যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় দর্শন ও
সংস্কৃতির ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৬৩
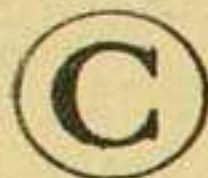
স্বর্গতা সহধর্মিণী প্রীতিলতা দেবীর
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে
গ্রন্থখানি
উৎসর্গ করিলাম

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

দশম অধ্যায়

দ্বিতীয় ভাগ

একাদশ অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

CENTRAL LIBRARY

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিষয় | পৃষ্ঠা

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

CENTRAL LIBRARY

ভূমিকা

বর্তমান কালে বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় লিখিত কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে পুস্তকের পঠন-পাঠন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীতে এবং মহাবিদ্যালয়গুলিতে বাংলা ভাষার মাধ্যমে অধ্যাপনা ও পরীক্ষার প্রচলন হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও অনেক বিষয়ে পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর বাংলা ভাষায় লিখিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এতদিন ইংরেজি ভাষাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ও পরীক্ষার একমাত্র মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বিদেশীয় ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করিয়া পাঠ ও পরীক্ষার কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ করা বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে বর্তমানে দুষ্কর হইয়াছে। কলা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা ভাষায় লিখিত উত্তম পুস্তক রচিত হইলে তাহাদের পক্ষে বিষয়গুলি পরিষ্কার ভাবে বুঝা ও পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর করা সুকর হয়। কিন্তু বর্তমানে এরূপ উত্তম পুস্তকের অভাব আছে।

এই অভাব দূর করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কয়েকটি কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে যোগ্যমানের পুস্তক প্রকাশ করিবার উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। তাঁহারা দর্শনের পাস ডিগ্রি কোর্সের জন্য ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন সম্বন্ধে একটি পুস্তক লিখিবার ভার আমার উপর অর্পণ করেন। এই পুস্তকটি ঐ বিষয়ের পাঠ্যসূচী (Syllabus) অনুসারে লিখিত হইয়াছে। দর্শনের অনার্স ডিগ্রি কোর্সেরও অনেক বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

পুস্তকটি দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম ভাগে ভারতীয় দর্শনের মূল ভাবধারা, চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনের আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের যে সকল বিষয় পাঠ্যবস্তুর অন্তর্গত তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। অনেক স্থলে ভারতীয় দর্শনের সহিত পাশ্চাত্ত্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনাও আছে। প্রায় সর্বত্রই পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মতের সমালোচনাও করা হইয়াছে। দর্শনের পরীক্ষার্থীদের পাঠের জন্য যে সকল পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত হইয়াছে, এই পুস্তক প্রণয়নে সেগুলিরও যথাবশ্যক সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। পুস্তকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের এবং দর্শনের সাধারণ পাঠকবর্গের উপযোগী হইবে এরূপ আশা করা যায়।

পরিশেষে পুস্তকটি লিখিবার প্রেরণা দান ও প্রকাশের ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। পুস্তকটির মুদ্রণকার্য যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণালয়ের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীশিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল ও তাঁহার সুযোগ্য সহকারিগণকে, বিশেষতঃ মুদ্রণ-সংশোধক পণ্ডিত শ্রীরামধন শাস্ত্রী মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫৯বি, হিন্দুস্থান পার্ক,
কলিকাতা-২৯,
৭ই জ্যৈষ্ঠ, সন ১৩৭০

প্রথম ভাগ

ভারতীয় দর্শন

CENTRAL LIBRARY

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় দর্শনের মূল ভাবধারা

(The Basic Features of Indian Philosophy)

১। দর্শনের লক্ষণ

(The Nature of Philosophy)

দর্শনের প্রয়োজনীয়তা।

অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মনুষ্যও জীবনযুদ্ধে লিপ্ত এবং জীবনধারণের জন্য নানা কর্মে ব্যস্ত। কিন্তু ইতর প্রাণীরা জীবন-সংগ্রামে তাহাদের সহজাত প্রবৃত্তিবশেই অন্ধভাবে কাজ করে। ইহারা কোন পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য অনুসারে ও সচেতনভাবে কাজ করে না। পক্ষান্তরে, মানুষ বিচারবুদ্ধিদ্বারা জীবনসংগ্রাম পরিচালিত করে। এই সংগ্রামে সাফল্য লাভ করিবার জন্য মানুষ জীবনসংগ্রামের তাৎপর্য কি, ইহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উপায় কি, জীবনে চরমোন্নতি লাভের পথ কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করে। জীবজগৎ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান অর্জন করিয়া মানুষ তাহার আলোকে জীবন যাপন করিবার প্রয়াস করে। জ্ঞানলাভের এই আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, প্রকৃতিগত ও বিচারবুদ্ধি হইতে উদ্ভূত। দর্শন মানুষের জ্ঞান-পিপাসা মিটাইবার একটি চিরন্তনী প্রচেষ্টা। ইহা মানুষের অনাবশ্যক কল্পনাবিলাসমাত্র নহে, পরন্তু তাহার একান্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য বস্তু। অলডুস হাকস্‌লি নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ মনীষী এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 'মানুষ জীবনে একটি দার্শনিক মত অনুসারে চলে, জীবজগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা লইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। একথা শুধু চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পক্ষেই প্রযোজ্য নহে, পরন্তু একান্ত চিন্তাবিমুখ ব্যক্তির পক্ষেও প্রযোজ্য। ভাল হউক্ বা মন্দ হউক্, একটা দার্শনিক মতবাদ অনুসরণ করিয়া মানুষকে জীবনে চলিতে হয়। কোন দার্শনিক মত না মানিয়া জীবনে চলা যায় না।'[১]

১। Aldous Huxley, *Ends and Means*, p. 252.

CENTRAL LIBRARY

দর্শন কাহাকে বলে?

সমগ্র জীবজগৎ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানকে দর্শন বলে। মানুষের স্বরূপ কি, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য কি? মানুষ কি কেবল দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির সমষ্টিমাত্র, অথবা দেহবিশিষ্ট অথচ দেহাতিরিক্ত চেতন আত্মা? মৃত্যুর পর মানুষের সবই কি বিনষ্ট হয়, অথবা তাহার আত্মা পরলোকে গমন করিয়া পরে আবার ইহজগতে জন্ম গ্রহণ করে? মানুষের জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি? ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চার প্রকার পুরুষার্থের মধ্যে কোন্‌টি মানুষের পরমার্থ বা পরম পুরুষার্থ? জীবজগৎ কি জড় প্রকৃতির পরিণামমাত্র, অথবা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ ভগবানের ইচ্ছাশক্তিপ্রসূত বিচিত্র সৃষ্টি? পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার কিরূপ সম্বন্ধ? পরম তত্ত্ব এক, অথবা বহু? এক হইলে কিরূপে বহু জীব ও জড় পদার্থের উৎপত্তি হইল? পরম তত্ত্ব জানিবার ও পরম পুরুষার্থ লাভের উপায় কি? মানব-সভ্যতার আদিমকাল হইতেই এই প্রকার প্রশ্ন সকল চিন্তাশীল মানুষের মনে স্বতঃই উঠিতেছে। দর্শনশাস্ত্রে এরূপ প্রশ্নগুলির বিচারপূর্বক মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা হয়। ভারতীয় দার্শনিকগণ এসব প্রশ্নের বিচার ও যুক্তিসংগত সমাধান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই।

দর্শন—তত্ত্বদর্শন।

তাঁহারা দর্শনের বিচার্য তত্ত্বের ও সত্যের সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষানুভূতি লাভের উপদেশ ও পথনির্দেশ করিয়াছেন। এজন্য ভারতীয় সাহিত্যে দার্শনিক তত্ত্বের বিচারশাস্ত্রকে "দর্শন" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনের সব শাখাতেই এক না একভাবে তত্ত্বদর্শনের সম্ভাব্যতা ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচীন সংহিতাকার মনু বলিয়াছেন, সম্যক্ দর্শন বা জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির কর্ম-বন্ধন হয় না, সম্যক্-দর্শনবিহীন ব্যক্তি সংসারে আবদ্ধ হন।১

পাশ্চাত্য দর্শনের বিবিধ শাখা।

বর্তমান কালে পাশ্চাত্য দর্শন বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছে—যথা (ক) তত্ত্ববিদ্যা (metaphysics) অর্থাৎ জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান, (খ) প্রমাবিজ্ঞান (epistemology) অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞানসাধন, জ্ঞানের প্রামাণ্য প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান, (গ) তর্কশাস্ত্র (logic) অর্থাৎ অনুমানের প্রামাণ্য ও সে সম্পর্কে অন্যান্য বিষয়ের বিচার, (ঘ) নীতিশাস্ত্র (ethics) অর্থাৎ মানুষের নীতি, নৈতিক বিচারের মান, পুরুষার্থ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান, (ঙ) সৌন্দর্যবিজ্ঞান (aesthetics) অর্থাৎ সুন্দর ও অসুন্দরের তথ্য বিচার এবং তাহাদের মান প্রভৃতি বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান। আধুনিক যুগে

১। মনুসংহিতা, ৬।৭৪ দ্রষ্টব্য।

CENTRAL LIBRARY

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের আর একটি শাখার অভ্যুদয় হইয়াছে, এটি হইল পুরুষার্থ-বিজ্ঞান (axiology), ইহাতে মানুষ যে সকল বস্তুকে ইষ্ট বা বাঞ্ছিত দ্রব্য হিসাবে মূল্যবান (values) বলিয়া গণ্য করে (যথা সত্য, শিব, সুন্দর, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ইত্যাদি) তাহার বিচার করা হয়। সেইরূপ সমাজবিজ্ঞানকে (sociology) কখন কখন দর্শনের একটি শাখারূপে গণ্য করা হয় এবং নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে তাহার আলোচনা করা হয়। মনোবিজ্ঞানকে (psychology) বহুকাল হইতে দর্শনের একটি বিশিষ্ট শাখারূপে গণ্য করা হইত। কিন্তু বর্তমানে ইহাকে দর্শন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পদার্থবিদ্যা (physics) ও রসায়নশাস্ত্রের (chemistry) মত একটি দর্শন-নিরপেক্ষ প্রাকৃত বিজ্ঞান (natural science) হিসাবেই আলোচনা করিবার চেষ্টা হইতেছে।

ভারতীয় দর্শনের সমন্বয়ী ও বিচারপদ্ধতি।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মূল সমস্যাগুলি একরূপ এবং অনেক স্থলে তাহাদের সমাধানও অনুরূপ। তথাপি দার্শনিক বিচারপদ্ধতি ও চিন্তাধারার পরিণতির দিক্ দিয়া উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। ভারতীয় দর্শনে তত্ত্ববিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান ও প্রমাবিজ্ঞানের বিষয়গুলির আলোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু সাধারণতঃ তাহা পৃথগ্‌ভাবে করা হয় নাই, একত্রে করা হইয়াছে। ভারতীয় দার্শনিকগণ যে-কোন দার্শনিক সমস্যা তত্ত্ববিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির সকল সম্ভাব্য দিক্ হইতে বিচার করিয়াছেন। এজন্য ভারতীয় দর্শনের প্রত্যেক শাখাতেই প্রমাবিজ্ঞান, তত্ত্ববিদ্যা, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির একত্র সমাবেশ দেখা যায়। ইহাকেই কোন কোন দার্শনিক ভারতীয় দর্শনের সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী (synthetic outlook) বলিয়াছেন।

২। ভারতীয় দর্শনের ব্যাপক অর্থ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী
(The Meaning and Broad Outlook of Indian Philosophy)

ভারতীয় দর্শন, মাত্র হিন্দু-দর্শন নহে।

ভারতীয় দর্শন বলিতে সকল ভারতীয় চিন্তানায়কের দার্শনিক চিন্তাধারার সমষ্টি বুঝায়। প্রাচীন ও নবীন, হিন্দু ও অহিন্দু, আস্তিক ও নাস্তিক সব ভারতীয় দার্শনিকের চিন্তাধারা ও মতবাদ ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত। কেহ কেহ মনে করেন যে, ভারতীয় দর্শন বলিতে মাত্র হিন্দুদর্শন বুঝায়। কিন্তু 'হিন্দু' শব্দের অর্থ যদি 'হিন্দুধর্মাবলম্বী'

CENTRAL LIBRARY

হয়, তবে এ ধারণা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর বলিতে হইবে। অবশ্য 'হিন্দু' শব্দটি ভৌগোলিক অর্থে 'ভারতীয়' বুঝাইলে ভারতীয় দর্শনকে হিন্দুদর্শন বলা যায়। শ্রীমন্ মাধবাচার্য তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "সর্বদর্শনসংগ্রহে" বৈদিক বা আস্তিক দর্শনগুলির সঙ্গে নাস্তিক চার্বাকদর্শন এবং অবৈদিক বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনকে যথাযোগ্য স্থান দিয়াছেন এবং সমভাবে তাহাদের আলোচনা করিয়াছেন।

ভারতীয় দর্শনের উদার দৃষ্টিভঙ্গী।

ইহা হইতে ভারতীয় দর্শনের উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও নিরবচ্ছিন্ন সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় দর্শন বহু শাখা ও প্রশাখায় বিভক্ত এবং কোন কোন স্থলে তাহাদের মতও অত্যন্ত ভিন্ন ও বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন। কিন্তু কোন এক শাখাতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে অন্য শাখাগুলির মতবাদের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাহাদের আপত্তি খণ্ডন করা হইয়াছে। এই প্রকারে দার্শনিক আলোচনার একটি বিশিষ্ট পদ্ধতির প্রচলন হইয়াছে। কোন দার্শনিককে নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্বে বিপক্ষের মতবাদের অবতারণা করিতে হইত। বিপক্ষের মতকে 'পূর্বপক্ষ' বলা হয়। তারপর তাঁহাকে বিপক্ষের মত নিরসন করিতে হইত, ইহাকে 'খণ্ডন' বলে। সর্বশেষে ঐ দার্শনিক নিজ মতের ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠা করিতেন, এজন্য ইহাকে 'উত্তরপক্ষ' বা সিদ্ধান্ত বলা হয়।

তজ্জন্য দর্শনশাখাগুলির পূর্ণতা।

ভারতীয় দর্শনশাখাগুলি এরূপ উদার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রচিত হওয়ায় এক শাখায় অন্য শাখাগুলির মত যত্নসহকারে আলোচিত হইয়াছে। ফলে প্রত্যেক শাখাই পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে এবং উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। বেদান্তের কোন উত্তম বৃহৎ গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাতে চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ ও মীমাংসা দর্শনের মতগুলির সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করা হইয়াছে। সেইরূপ বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনের কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থে অন্যান্য দর্শনের মতগুলির আলোচনা করা হইয়াছে। এইভাবে এক একটি দর্শনশাখা এক একটি দর্শনকোষে পরিণত হইয়াছে। এমন কি সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য দর্শনের অনেক সমস্যার আলোচনা প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে পাওয়া যায়। বোধ হয় এইজন্যই কেবল ভারতীয় দর্শনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এদেশীয় পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্ত্য দর্শনের অতি কঠিন ও দুর্বোধ্য সমস্যাগুলির এমন সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করিতে পারেন যে তাহাতে আমরা বিস্মিত হই।

অতীতকালে ভারতীয় দর্শনের উদার ও সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী ইহার সমৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছে। বর্তমান কালে ভারতীয় দর্শনকে পুনরুজ্জীবিত এবং সমৃদ্ধ করিতে হইলে সুদূর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশ হইতে যেসব নূতন চিন্তাধারা এদেশে প্রবেশ করিতেছে, সেগুলির সম্যক্ আলোচনা করা এবং তাহাদের সহিত ভারতীয় চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন করা ভারতীয় দার্শনিকগণের একান্ত কর্তব্য।

ভারতীয় দর্শনের পুনরুত্থানের পথ।

৩। ভারতীয় দর্শনের শাখাসমূহ
(The Schools of Indian Philosophy)

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় দর্শনগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা আস্তিক এবং নাস্তিক। খুব সম্ভব হিন্দু দার্শনিকগণ এই বিভাগ করিয়াছিলেন। হিন্দু ষড়্‌দর্শন, যথা—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত, প্রথম ভাগের অন্তর্গত। ষড়্‌দর্শনের সবগুলিতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, যেমন সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শনে জগৎস্রষ্টারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। তথাপি এসব দর্শন বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে বলিয়া তাহাদিগকে আস্তিক দর্শন বলা হয়। ষড়্‌দর্শন ব্যতীত আরও অন্যান্য আস্তিক দর্শন আছে, যথা—শাব্দিক দর্শন, আয়ুর্বেদ দর্শন ইত্যাদি। শ্রীমন্ মাধবাচার্যের "সর্বদর্শনসংগ্রহে" এসব দর্শনের বিবরণ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনকে তিনটি প্রধান নাস্তিক দর্শন বলিয়া গণ্য করা হয়, কারণ এগুলিতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই।

ভারতীয় দর্শনের দুই ভাগ—আস্তিক ও নাস্তিক।

ভারতীয় দর্শনগুলির এই বিভাগ ভালরূপে বুঝিতে হইলে ভারতীয় চিন্তাধারায় বেদের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক। বেদ ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ। উত্তরকালে ভারতীয় চিন্তাধারা, বিশেষতঃ দার্শনিক চিন্তাধারা এক না আর এক ভাবে বৈদিক চিন্তাধারাদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। কোন কোন দর্শনশাখায় বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, আবার কোন কোনটিতে উহা অস্বীকৃত বা বাধিত হইয়াছে। মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনকে বৈদিক সংস্কৃতির প্রসার বা বিস্তার বলা যায়।

ভারতীয় দর্শনে বেদের প্রভাব।

CENTRAL LIBRARY

বেদে প্রথমে কর্ম এবং শেষে জ্ঞান নামে দুইটি কাণ্ড বা ভাগ আছে। মীমাংসা-দর্শন বেদের কর্মকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই বিচার বা মীমাংসা। এজন্য ইহাকে পূর্ব-মীমাংসা বা কর্ম-মীমাংসা বলে। বেদান্ত বেদের জ্ঞান-কাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই বিচার বা মীমাংসা। এজন্য ইহাকে উত্তর-মীমাংসা বা জ্ঞান-মীমাংসা বলে। কিন্তু সচরাচর এদুটিকে যথাক্রমে মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন বলা হয়। আমরাও এরূপ লোকব্যবহার অনুসরণ করিব। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও যোগদর্শন প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও এগুলিতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে এবং উহাদের সিদ্ধান্তগুলি বেদানুগ বলিয়া প্রদর্শন করিবার চেষ্টাও করা হইয়াছে। চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন বেদের বিরুদ্ধভাবাপন্ন, এগুলিতে বেদের প্রামাণ্য অস্বীকৃত ও অবজ্ঞাত হইয়াছে। এজন্য ইহাদিগকে নাস্তিক দর্শন বলা হয়।

৪। ভারতীয় দর্শনে শব্দ বা আপ্তবাক্য ও তর্কের স্থান

(The Places of Authority and Reasoning in Indian Philosophy)

দর্শনের ভিত্তি।

পূর্বে আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনের যে প্রকারভেদ করা হইয়াছে তাহার মূলে দার্শনিক জ্ঞানলাভের উপায় সম্বন্ধে মতভেদ নিহিত আছে বলা যায়। আত্মা, ঈশ্বর ও জগতের আদি কারণ প্রভৃতি অলৌকিক বিষয়ে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষদ্বারা আমরা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারি না। এজন্য দার্শনিককে অনুভূতি ও বিচারবুদ্ধি বা তর্কযুক্তির আশ্রয় লইতে হয়। তিনি প্রত্যক্ষানুভূতির (experience) মূলে এবং বিচারবুদ্ধির (reasoning) সাহায্যে এসব তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন। অতএব দার্শনিক জ্ঞানের ভিত্তি হইতেছে অনুভূতি (experience) এবং প্রধান সাধন (instrument) হইতেছে বিচারবুদ্ধি বা তর্কযুক্তি (reason)। এখন প্রশ্ন হইতেছে, কিরূপ অনুভূতি বা কাহার অনুভূতি দর্শনের ভিত্তি হইবে? দর্শন কি সব বিষয়েই সাধারণ লৌকিক প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, অথবা কোন কোন স্থলে শব্দ বা আপ্তপুরুষের অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠা করা উচিত? ভারতীয় দার্শনিকগণ এ বিষয়ে একমত নহেন। কোন কোন দার্শনিকের মতে সাধারণ লৌকিক প্রত্যক্ষের উপর দর্শন প্রতিষ্ঠা

লৌকিক প্রত্যক্ষ বা আপ্ত-পুরুষের অনুভূতি?

করা উচিত, অর্থাৎ সাধারণ লোকের স্বাভাবিক প্রত্যক্ষ এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-লব্ধ সত্যের উপর দর্শনের প্রতিষ্ঠা হইবে। অধিকাংশ আধুনিক য়ুরোপীয় দার্শনিক এই মত পোষণ করেন। ভারতীয় ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও চার্বাক দর্শনে এই মত গৃহীত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেও এই মত প্রধানতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। পক্ষান্তরে কোন কোন দার্শনিক মনে করেন যে, ঈশ্বর, পরলোক, মোক্ষ প্রভৃতি অপ্রাকৃত বিষয়ে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষদ্বারা আমরা তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারি না। এসব স্থলে আমাদিগকে মুনি ঋষি প্রভৃতি আপ্তপুরুষের তত্ত্বসাক্ষাৎকার বা তত্ত্বানুভূতির উপর নির্ভর করিতে হইবে। অতএব আপ্তবাক্য এবং শাস্ত্রবাক্যের উপরই দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন এই মত ও পথ গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের অনেক সিদ্ধান্ত বেদ ও উপনিষদের অর্থাৎ শব্দ বা শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন কি, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনকেও কোন কোন স্থলে পূর্ণজ্ঞানী বুদ্ধ ও তীর্থঙ্করদিগের উপদেশের উপর নির্ভরশীল দেখা যায়। মধ্যযুগের য়ুরোপীয় দর্শনও এইভাবে খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত বলা যায়।

এ বিষয়ে দুই মত।

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পূর্বোক্ত উভয় শ্রেণীর দার্শনিকদের মতে বিচারবুদ্ধি ও তর্কযুক্তিই দার্শনিক জ্ঞানের প্রধান সাধন। তাঁহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত দার্শনিকগণ বিচারবুদ্ধিকে সর্বত্র লৌকিক প্রত্যক্ষানুগামী বলিয়াছেন এবং শেষোক্ত দার্শনিকগণ কোন কোন বিষয়ে বিচারবুদ্ধিকে আপ্তবাক্যানুসারীও করিয়াছেন।

দর্শনে বিচারবুদ্ধিই প্রধান জ্ঞানসাধন।

ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ প্রায় শুনা যায়। অনেকে মনে করেন, ইহার সিদ্ধান্তগুলি আপ্ত বা শাস্ত্রবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, স্বাধীন চিন্তা বা যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, অতএব ইহা অবিচারিত ও যুক্তিহীন মতবাদ মাত্র। অধিকাংশ ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে এ অভিযোগ স্পষ্টতঃ মিথ্যা, কারণ যে-কোন পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ন্যায় ইহারা স্বাধীন যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবল মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে এরূপ অভিযোগ করা যাইতে পারে, কারণ এই দুইটি দর্শনে শাস্ত্রবাক্যকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ইহাদের সিদ্ধান্তগুলি কেবল শাস্ত্রবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, পরন্তু স্বাধীন যুক্তিতর্ক ও বিচারের উপরও প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্রবাক্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইহাদের প্রামাণ্যের কোন হানি বা লাঘব হয়

ভারতীয় দর্শন যুক্তিহীন মতবাদ নয়।

CENTRAL LIBRARY

না, বরং যে-কোন যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তের ন্যায় এগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবশ্য-স্বীকার্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে। মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব। কোন মত বা সিদ্ধান্ত যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে সে সন্তুষ্টচিত্তে তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। এখন যদি কোন মত বা সিদ্ধান্ত একদিকে যুক্তিযুক্ত হয় এবং অপর দিকে সূক্ষ্মদর্শী ও শুদ্ধচিত্ত আপ্ত পুরুষের অনুমোদিত হয়, তবে তাহা অধিকতর মূল্যবান ও আকর্ষণীয় হইবে।

৫। ভারতীয় দর্শনসমূহের ক্রমপরিণতি

(The Development of the Indian Systems)

ভারতীয় দর্শনগুলির জীবনাদর্শরূপে যুগপৎ অবস্থিতি।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ বিভিন্ন দর্শন একটির পর আর একটি আবির্ভূত হইয়াছে। কোন দর্শন এককালে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং পরে অন্য কোন দর্শন তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতীয় দর্শনগুলি এককালে আবির্ভূত না হইলেও একসঙ্গে বহুকাল যাবৎ বিদ্যমান আছে এবং বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, ভারতে দর্শন জীবনের অঙ্গীভূত ছিল। প্রত্যেক দর্শনই আবির্ভূত হইবার পর এক শ্রেণীর লোক তাহাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তদনুসারে জীবন যাপন করিয়াছেন। এইভাবে দর্শনগুলিকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। এক একটি সম্প্রদায় যুগের পর যুগ গুরু-শিষ্য পরম্পরায় তাহার দার্শনিক চিন্তাধারাকে রক্ষা ও পরিপুষ্ট করিয়াছে। এইভাবে বিভিন্ন দর্শনের জীবনধারা অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত হইতেছে এবং উহাদিগকে যুগপৎ বিদ্যমান ও বর্ধিষ্ণু দেখা যায়। বর্তমান কালেও ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের আশ্রম ও মঠ দেখা যায়, যদিচ এখন নানা কারণে ভারতীয় দর্শনের অগ্রগতি কতকটা ব্যাহত হইয়াছে।

ভারতীয় দর্শনগুলি পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়াছে।

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতীয় দর্শনগুলি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, পরন্তু উহারা পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়াছে। এক দর্শন-সম্প্রদায় অন্য সকল সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এবং সম্ভাব্য সকল আপত্তির বিচার ও খণ্ডন করিতেন। এরূপ পারস্পরিক সমালোচনা হইতেই ভারতীয় দর্শনের বিশাল সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এজন্যই দার্শনিক রচনার সৌষ্ঠব ও সুস্পষ্টতার বৃদ্ধি হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনের সমালোচনা ভারতীয় দর্শনেই পাওয়া যাইবে।

এখন কিভাবে দর্শনগুলির উৎপত্তি হয় এবং প্রসার ঘটে তাহা আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিব। আমরা পূর্বে বলিয়াছি বেদই অধিকাংশ দর্শনের মূল এবং বেদ হইতে উহারা সাক্ষাৎভাবে বা পরম্পরাক্রমে আবির্ভূত হইয়াছে। বেদ ও উপনিষদের পরে সূত্রগ্রন্থের উৎপত্তি হয়। সূত্র শব্দের অর্থ সূতা, যাহাদ্বারা অনেক বস্তু একত্র গ্রথিত হয়। দর্শনশাস্ত্রে সংক্ষিপ্ত, সারগর্ভ স্মারক বাক্যকে সূত্র বলে। প্রাচীন কালে গুরু শিষ্যকে মুখে মুখে দর্শনশাস্ত্র শিখাইতেন এবং দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনাও মৌখিকভাবে চলিত। কাজেই অতি সংক্ষিপ্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যদ্বারা দার্শনিক সমস্যার আলোচনা, সমাধান, আপত্তি ও খণ্ডন করা আবশ্যক হইত। কোন দার্শনিক সূত্রগ্রন্থে এরূপ বহুসংখ্যক সূত্র আছে এবং তাহাদিগকে বিভিন্ন অধ্যায়ে ও প্রকরণে বিভক্ত করা হইয়াছে। বিভিন্ন দর্শনের আদি গ্রন্থ হইল এরূপ সূত্রগ্রন্থ, যেমন বেদান্তের আদি গ্রন্থ বাদরায়ণের **ব্রহ্ম-সূত্র**, মীমাংসার **জৈমিনি-সূত্র**, ন্যায়দর্শনের গোতমের **ন্যায়-সূত্র**, বৈশেষিকের কণাদের **বৈশেষিক-সূত্র**, যোগদর্শনের পতঞ্জলির **যোগ-সূত্র**, এবং জনশ্রুতি অনুসারে সাংখ্যদর্শনের আদি গ্রন্থ কপিলের **সাংখ্য-সূত্র**।

দার্শনিক সাহিত্যরচনার ক্রম নির্ণয়।

আস্তিক দর্শনের সূত্র-গ্রন্থ।

সূত্র-গ্রন্থের পর ভাষ্য-গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়াছে। সূত্রগুলি অতি সংক্ষিপ্ত বলিয়া তাহাদের তাৎপর্য অনুধাবন করা কঠিন হইত। এজন্য সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিয়া ভাষ্য-গ্রন্থের রচনা হয়। পূর্বোক্ত সকল সূত্র-গ্রন্থেরই ভাষ্য আছে। কোন কোন সূত্র-গ্রন্থের একাধিক ভাষ্য আছে, যেমন ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, নিম্বার্ক, বলদেব প্রভৃতি আচার্যের ভাষ্য। ইহাদের মূলে বেদান্ত দর্শনের বিভিন্ন শাখার আবির্ভাব হইয়াছে।

ভাষ্য-গ্রন্থ।

ভাষ্য-গ্রন্থের পর অন্যান্য ব্যাখ্যা-গ্রন্থ ও টীকা প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। ভাষ্যের ভাষ্য, অনুভাষ্য, টীকা, বিবরণ, পরিভাষা, সংগ্রহ-গ্রন্থ এবং অনেক স্বতন্ত্র রচনা ভারতীয় দর্শনের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। নাস্তিক দর্শন-গুলির ক্রমপরিণতির ইতিহাস অল্পবিস্তরভাবে আস্তিক দর্শনের ইতিহাসেরই মত। কিন্তু ইহাদের আবির্ভাব কোন সূত্র-গ্রন্থের আকারে হয় নাই।

ভাষ্যের ভাষ্য ও অন্যান্য ব্যাখ্যা-গ্রন্থ।

ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে অনেক বিষয়ে মতভেদ ও মতবিরোধ থাকিলেও ভারতীয় দার্শনিকগণ তাহাদের একটা সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, সকল ব্যক্তিই সব কাজের যোগ্য নয়। মানুষের যোগ্যতা অনুসারে ধর্ম, দর্শন, নীতি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত। যোগ্যতা অনুসারে অর্থাৎ অধিকারভেদে বিভিন্ন প্রকার দর্শন বিভিন্ন ব্যক্তির উপযোগী।

ভারতীয় দর্শনগুলির সমন্বয়। অধিকারভেদে ইহাদের ক্রমসন্নিবেশ।

বিশেষতঃ ভারতীয় দর্শনগুলি মানুষের চরিত্র ও জীবন গঠনের বিভিন্ন প্রণালী বলিয়া বিবেচিত হইত। সেস্থলে দর্শনে মানুষের যোগ্যতা বিচার করা বিশেষ প্রয়োজন। এই যোগ্যতা বিচার করিয়া বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের জন্য বিভিন্ন দর্শন-পথ নির্দিষ্ট হইয়াছে। চার্বাকদর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্বৈত বেদান্ত পর্যন্ত বিভিন্ন দর্শন বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির গ্রহণীয়। বিভিন্ন দর্শনগুলি যেন একই জ্ঞানসৌধের বিভিন্ন সোপান। অধিকারভেদের ভিত্তিতে ভারতীয় দর্শনের সমন্বয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহাদের মধ্যে কতকগুলি মুখ্য বিষয়ে মতৈক্য দেখা যায়। এগুলিকে তাহাদের সমান তন্ত্র বলা যায়। এখন এগুলির আলোচনা করা যাইবে।

৬। ভারতীয় দর্শনসমূহের সমান তন্ত্র
(The Common Characters of the Indian Systems)

ভারতীয় দর্শনগুলির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ইহার বিভিন্ন দিক্।

আপাতদৃষ্টিতে ভারতীয় দর্শনগুলিকে পরস্পর-বিরোধী মনে হয়। কিন্তু তাহাদের একটি মূলগত ঐক্য আছে। এটি হইল তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী। ইহার পরিচয় কয়েকটি মুখ্য বিষয়ে পাওয়া যায়। এসব বিষয়ে ভারতীয় দর্শনসকল একমত। এগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

ভারতীয় দর্শনগুলি জীবনের প্রয়োজন-সাধক।

(১) প্রথমে দেখা যায় যে, ভারতীয় দর্শনগুলি মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন সাধনে তৎপর। জীবনের সঙ্গে দর্শনের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা সকল ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে। দর্শন শুধু মানুষের বিচার-বুদ্ধি বা তর্কযুক্তির ব্যাপার নহে। ইহা আমাদের বিচারবুদ্ধিপ্রসূত কতকগুলি মত বা সিদ্ধান্তেই পর্যবসিত নয়। মানুষ জীবনে কোন্ পথে চলিলে পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারিবে তাহা প্রদর্শন করাই দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এজন্য কোন গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থটি কোন্ প্রয়োজন বা পুরুষার্থ সাধন করিবে তাহা উল্লেখ করার একটি প্রথা প্রাচীন ভারতে দেখা যায়। ভারতীয় দর্শন পুরুষার্থসাধক, তত্ত্বার্থের শুষ্ক বিচারমাত্র নয়।

এজন্য সেগুলিতে তত্ত্বার্থ-বিচার ব্যাহত হয় না।

এখানে বলা আবশ্যক যে, ভারতীয় দর্শন পুরুষার্থসাধক হইলেও তাহাতে তত্ত্বার্থ বিচারের কোন লাঘব হয় নাই। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মনে করেন, ভারতীয় দর্শন নীতি ও ধর্ম বিষয়ে নিবদ্ধ। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। শুদ্ধ জ্ঞানানুসন্ধিৎসা-প্রসূত যে-কোন দর্শনের ন্যায় ভারতীয় দর্শনের বিচার্য বিষয় বহুমুখ ও বহু-বিস্তৃত। ইহাতে তত্ত্ববিদ্যা, প্রমাবিজ্ঞান,

তর্কশাস্ত্র প্রভৃতির সমস্যাবলীর এমন বিস্তৃত বিচার আছে যে তাহা পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

দুঃখানুভূতি হইতে দর্শনের উৎপত্তি।

(২) এক প্রকার আধ্যাত্মিক অতৃপ্তি হইতে ভারতীয় দর্শনগুলি উদ্ভূত হইয়াছে বলা যায়। সংসারের অনিত্যতা এবং জীবনে নানা প্রকার দুঃখভোগ দৃষ্টে ভারতীয় দার্শনিকগণ সংসারের মূল কারণ এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহারা জীবজগতের প্রকৃতি, জীবনের উদ্দেশ্য, জ্ঞান-সাধন প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করেন। এইভাবে ভারতীয় দর্শনের রচনা হয়। এ কথা বৈদিক ও অবৈদিক উভয় প্রকার দর্শন সম্বন্ধে প্রয়োজ্য।

ভারতীয় দর্শনের আদিতে দুঃখবাদ থাকিলেও অন্তে নাই।

ভারতীয় দর্শন দুঃখানুভূতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া অনেকে ইহাকে দুঃখবাদ-(pessimism) দোষদুষ্ট এবং ব্যবহারিক জীবনে অনিষ্টকর বলেন। এরূপ ধারণা ভ্রান্ত এবং ইহা নিরসন করিতে হইলে সমগ্র ভারতীয় দর্শন পাঠ করা কর্তব্য। তবে এখানে সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বলা যায়। দুঃখবাদ বলিতে যদি জগতে দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকারমাত্র বুঝায় তবে ভারতীয় দর্শনকে দুঃখবাদী বলা যায়। কিন্তু প্রকৃত দুঃখবাদ বলিতে দুঃখই জীবনের আদি এবং অন্ত এরূপ মত বুঝায়। এ হিসাবে ভারতীয় দর্শনকে দুঃখবাদী বলা যায় না। কারণ যদিও ভারতীয় দর্শন দুঃখের অনুভূতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায়ও উদ্ভাবন করিয়াছে। ভারতীয় দার্শনিকগণের মতে সাধারণ মানুষের জীবন অসংযত এবং কাম-ক্রোধাদির বশবর্তী। এরূপ জীবনে সুখ অপেক্ষা অধিক দুঃখই ভোগ হয়। কিন্তু মানুষকে চিরকালই দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। দুঃখের কারণ দূরীভূত হইলে দুঃখেরও নিবৃত্তি হইবে এবং সুখ ও শান্তি লাভ করা সম্ভবপর হইবে। এ বিষয়ে বুদ্ধের বাণীকে ভারতীয় দার্শনিকদের সর্বসম্মত বাণী বলা যায়। বুদ্ধ চারিটি আর্য সত্যের কথা বলিয়াছেন, যথা—দুঃখ আছে, দুঃখের হেতুও আছে, দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব, দুঃখ নিবৃত্তির পথ আছে। অতএব বলিতে হইবে, ভারতীয় দর্শনের আদিতে দুঃখবাদ থাকিলেও অন্তে নাই। আর এক কথা, এরূপ দুঃখবাদ, অবিচারিত সুখবাদ অপেক্ষা মানুষের কল্যাণকর। জনৈক আমেরিকাবাসী অধ্যাপক মন্তব্য করিয়াছেন, 'নৈতিক বিচারে দুঃখবাদ অপেক্ষা সুখবাদ নিকৃষ্ট, কারণ দুঃখবাদ মানুষকে আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সজাগ করে, আর সুখবাদ তাহাকে মিথ্যা নিরাপত্তার মোহে বিভ্রান্ত করে।'১

১। George Herbert Palmer, *Contemporary American Philosophy*, Vol. I, p 51.

(৩) যে দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় দার্শনিকদের জীবনে এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও হতাশা না আনিয়া আশার বাণী প্রচার করিতে সমর্থ করিয়াছিল, তাহাকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী বলা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে জীবজগৎ নিত্য নৈতিক নিয়মের অধীন বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। উইলিয়াম্ জেম্সের মতে 'আধ্যাত্মিকতা বলিতে বিশ্বের নিত্য নৈতিক নিয়মে বিশ্বাস এবং তজ্জন্য জীবনে আশার সঞ্চার বুঝায়। আমাদের অন্তরের অন্তরে আমরা এই নিত্য নৈতিক নিয়মের প্রয়োজন বোধ করি। মহাকবিদের কাব্যে ও কবিতায় এই বিশ্বাস নিহিত থাকায় তাহা আমাদের এত আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে।'[১] চার্বাকদর্শন ব্যতীত ভারতীয় দর্শনের সর্বত্র এই নিত্য নৈতিক নিয়মে দৃঢ় বিশ্বাস দেখা যায়। বৈদিক ও অবৈদিক, আস্তিক ও নাস্তিক সকল দর্শনেই ইহা বিদ্যমান। ঋগ্বেদে ইহাকে ঋত বলা হইয়াছে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অর্থাৎ গ্রহ, নক্ষত্র, দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি সকল বস্তুকে ইহার অধীন বলা হইয়াছে। ইহাদ্বারা বিশ্বের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও নীতি-ধর্ম রক্ষিত হয় এরূপ বিশ্বাস করা হইত। কালক্রমে এই ঋত-প্রত্যয় বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। মীমাংসাদর্শনে যাহাকে অপূর্ব (অর্থাৎ এখন যজ্ঞ করিলে ভবিষ্যতে তাহার ফল প্রসবের শক্তি) বলে, ন্যায়দর্শনে যাহাকে অদৃষ্ট (অর্থাৎ সৃষ্টিতে পরমাণু-সংযোগের অদৃশ্য কারণ) বলে, এবং যাহাকে সাধারণ কর্ম ও কর্মফলের নিয়ম বলে, তাহাকে ঐ ঋত-প্রত্যয়ের রূপান্তর বলা যায়। কর্ম-নিয়ম অনুসারে কোন কর্মের ফল নষ্ট (কৃতপ্রণাশ) হয় না এবং বিনা কর্মে কোন ফলভোগ (অকৃতাভ্যুপগম) হয় না। আস্তিক ষড়্দর্শন এবং বৌদ্ধ ও জৈন সকল দর্শনেই কর্ম-নিয়ম স্বীকৃত হইয়াছে।

বিশ্বের নিত্য নৈতিক নিয়মের অনুশাসনে বিশ্বাস।

সহজ কথায় কর্ম-নিয়ম বলিতে বুঝায় যে, ভাল মন্দ সব কর্মের ফল কর্মকর্তাকে ভোগ করিতে হয়, অবশ্য যদি তিনি ফলাকাঙ্ক্ষা লইয়া সে কর্ম করেন। কর্ম ও কর্মফল নিয়মে বিশ্বাস না করিলে আমাদের জীবনে সচরাচর সুখ-দুঃখ-ভোগের যে বৈষম্য দেখা যায় তাহার ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা প্রায় দেখিতে পাই যে, একরূপ অবস্থায় জাত ও লালিত-পালিত ব্যক্তিদের জীবনে সুখ-দুঃখ-ভোগ বা প্রতিষ্ঠা লাভ অত্যন্ত ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। কেহ জীবনে সুখী হয়, কেহ দুঃখী হয়, কেহ পণ্ডিত হয়, কেহ মূর্খ হয়, কেহ ধার্মিক, কেহ অধার্মিক হয়। আবার কখন-কখন দেখা যায় যে, ধার্মিক ব্যক্তি দুঃখ ভোগ করে, পাপী ব্যক্তি সুখৈশ্বর্য ভোগ করে। এসব বৈষম্যের কারণ কি? কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে, বর্তমান জীবনের কর্ম হইতেই বিভিন্ন ব্যক্তির

কর্ম-নিয়ম।

১। Vide *Pragmatism*, pp. 106-07.

বিভিন্ন প্রকার সুখ-দুঃখ ভোগ হয়। কিন্তু অনেক স্থলে বর্তমান জীবনের কর্মদ্বারা মানুষের সুখ-দুঃখের ব্যাখ্যা করা যায় না। এখন যদি দেখা যায় যে, বর্তমান জীবনে আমাদের কোন কোন সুখ-দুঃখ-ভোগ আমাদের কর্মজন্য, তবে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, মানুষের সব সুখ-দুঃখ তাহার ইহ-জন্ম বা পূর্ব-জন্মের কর্মজন্য এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকল কর্মই যথাযোগ্য ফল প্রসব করে। ইহাই হইল কর্ম-কর্মফলনিয়ম এবং জীবজগৎ ও জড়জগৎ দুইই ইহার অধীন।

কর্মের প্রকারভেদ।

কর্ম বলিতে কর্ম-কর্মফলনিয়মও বুঝায় এবং কর্মফল-প্রসবিনী শক্তিও বুঝায়। দ্বিতীয় অর্থে কর্মের নানারূপ প্রকার-ভেদ করা হইয়াছে। এক প্রকারভেদ অনুসারে কর্ম দুই প্রকার, যথা (ক) অনারব্ধ কর্ম ও (খ) আরব্ধ বা প্রারব্ধ কর্ম। যে কর্ম কোন প্রকার ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করে নাই তাহাকে অনারব্ধ কর্ম বলে। ইহার আবার দুই প্রকারভেদ আছে, যথা প্রাক্তন বা সঞ্চিত কর্ম, যাহা পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মার্জিত, এবং ক্রিয়মাণ বা সঞ্চীয়মান কর্ম, যাহা এই জন্মের কর্ম হইতে উৎপদ্যমান। পক্ষান্তরে, যে কর্ম ফলপ্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাকে আরব্ধ বা প্রারব্ধ কর্ম বলে, এই প্রকার কর্ম হইতেই আমাদের বর্তমান দেহ হইয়াছে এবং সুখ-দুঃখভোগ হয়।

কর্ম-নিয়মের সম্প্রতিষ্ঠা।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে কর্ম-নিয়মকে ঈশ্বরের অধীন বলা হইয়াছে। জীবের শুভাশুভ কর্মজন্য ফলসমষ্টিকে অদৃষ্ট বলে। অদৃষ্টবশেই জীবজগতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু অদৃষ্ট জড় ও অচেতন সত্তা। যেমন কোন জড় বস্তু চেতন পুরুষ কর্তৃক পরিচালিত না হইলে কোন কর্ম সম্পাদন করিতে পারে না, তেমনি জড় অদৃষ্ট কোন চেতন পুরুষ কর্তৃক পরিচালিত না হইলে সৃষ্টি করিতে পারে না। জীবাত্মা অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তিবিশিষ্ট। জগৎ-সৃষ্টিরূপ অলৌকিক কার্যে অদৃষ্টকে পরিচালিত করা তাহার সাধ্যাতীত। কেবল সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই জগৎরচনায় অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। অতএব অদৃষ্ট ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং ঈশ্বর জীবের সুখদুঃখরূপ কর্মফলদাতা। পক্ষান্তরে, বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শনে কর্ম-নিয়মকে ঈশ্বরেচ্ছাধীন না বলিয়া স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বলা হইয়াছে। কর্ম-নিয়ম স্বাধীন ও স্বয়ং-ক্রিয়াশীল শক্তিরূপে জগৎ ব্যাপার নির্বাহ করে। এজন্য ঈশ্বরের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। কর্ম-নিয়ম স্বাধীনই হউক আর ঈশ্বরাধীনই হউক, ইহার অধিকার যে সকাম কর্মে সীমাবদ্ধ এ বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকগণ একমত। রাগ-দ্বেষ-ও অশুভ কামনা-বাসনা-জাত সাংসারিক জীবের কর্ম কুফল প্রসব করে। সকাম সাধু ও পুণ্য কর্মও সুফল প্রসব করে। কিন্তু

কর্ম-নিয়মের অধিকার সীমাবদ্ধ।

ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কোন কর্ম ভাল বা মন্দ কোন ফল প্রসব করে না। শুধু তাহাই নহে, নিষ্কাম কর্মদ্বারা সঞ্চিত কর্মের ক্ষয় হয় এবং মোক্ষলাভ হয়। মুক্তপুরুষ জীবহিতার্থে কর্ম করেন, কিন্তু তাঁহার কর্মবন্ধন হয় না, কারণ তাঁহার কর্ম কামনা-বাসনা-রহিত ও স্বার্থলেশশূন্য।

হারাল্ড হেফ্‌ডিং নামক ডেনমার্কের এক প্রসিদ্ধ দার্শনিক মন্তব্য করিয়াছেন, 'কল্যাণ-কর্মের শুভফল বিনষ্ট হয় না' এই বিশ্বাস ধর্মের মূল কথা।১ বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই। তথাপি যে বৌদ্ধ ও জৈন মত ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহার প্রধান কারণ এই যে ইহাদের মধ্যে এরূপ কর্ম-নিয়মের অনুশাসন স্বীকৃত হইয়াছে।

নৈতিক নিয়মে বিশ্বাস মনে আশার সঞ্চার করে।

এই বিশ্বাস হইতেই মানুষের মনে আশা-ভরসার সঞ্চার হয় এবং সে নিজেকে তার ভাগ্য-নিয়ন্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে। মানুষের বর্তমান দুঃখ তাহার পূর্ব-কর্মের ফল। অতএব বর্তমানে শুভ কর্ম করিয়া আমরা ভবিষ্যতে শুভ ফলের আশা করিতে পারি। যদি তাহাই হয় তবে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি (free will) এবং পুরুষকার স্বীকার করিতে হয়। অতএব অদৃষ্টবাদ এবং দৈববিশ্বাস কর্ম-কর্মফল নিয়মের অপব্যাখ্যা ব্যতীত আর কিছু নয়। অদৃষ্ট বা দৈব বলিতে পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফলমাত্র বুঝায়। এ জন্মের প্রবল প্রচেষ্টাদ্বারা আমরা তাহার প্রতিরোধ করিতে পারি, যেমন এ জীবনে বহু দিনের পুরাণ কদভ্যাসগুলি দৃঢ় সংকল্প, প্রবল প্রচেষ্টা ও সদভ্যাসের অনুশীলনদ্বারা পরিত্যাগ করা যায়।২

বিশ্বসংসার বিশাল নৈতিক রঙ্গমঞ্চ।

(৪) কর্ম-কর্মফলে বিশ্বাস করার জন্য ভারতীয় দার্শনিকগণ এই বিশ্ব-সংসারকে এক বিশাল নৈতিক রঙ্গমঞ্চরূপে কল্পনা করিয়াছেন। জীবগণ তাহাদের পূর্ব জন্মের কর্মানুসারে এই সংসারে যোগ্য বংশে যোগ্য দেহেন্দ্রিয়াদি লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং যথাযোগ্য কর্তব্য পালন করে। যে

১। *Vide* Harald Höffding, *The Philosophy of Religion*, pp. 1-13. *Cf.* Perry's *Philosophy of the Recent Past*, p. 205, f.n.

২। এ বিষয়ে অন্যান্য কথা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (২.৪-৯), মহাভারত (শান্তিপর্ব), ভগবদ্গীতা (১৮-১৪), যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি (১-৩৫১) প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

জীব এ জীবনের কর্তব্য যথাযথ পালন করে পরজন্মে তাহার ঊর্ধ্বগতি হয়, আর যে নিজ কর্ম না করিয়া অকর্ম বা কুকর্ম করে তাহার অধোগতি হয়।

অজ্ঞান বন্ধনের এবং জ্ঞান মুক্তির হেতু।

(৫) সকল ভারতীয় দার্শনিকের মতে অজ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্ব সম্বন্ধে মিথ্যা জ্ঞান জীবের বন্ধন ও দুঃখের কারণ এবং তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত দুঃখ ও বন্ধন হইতে মুক্তি নাই। সাধারণতঃ বন্ধন বলিতে জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যু এবং তজ্জন্য নানাপ্রকার দুঃখভোগ বুঝায়। জন্ম-মৃত্যুর নিবৃত্তিকেই মুক্তি বা মোক্ষ বলে। মুক্তি জীবের পূর্ণ উৎকর্ষ বা চরম উন্নতির অবস্থা, ইহাই তাহার পরম কল্যাণ ও পরমশ্রেয়ঃ। জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য ও অদ্বৈত বেদান্ত-দর্শন-মতে এ অবস্থা এই জীবনেই লাভ করা যায়। অতএব কয়েকটি প্রধান দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতে ইহ জগতে এবং ইহ জীবনে জীবের চরমোন্নতি লাভ করা সম্ভবপর। এসব ভারতীয় দর্শনের অনুগামী ব্যক্তিকে একেবারে ইহলোক-বিরাগী বা পরলোকসর্ব্বস্ব সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে হয় না। যে অদূরদর্শিতার ফলে জীব ইহলোকসর্বস্ব ও স্বার্থান্ধ হইয়া পড়ে এসব ভারতীয় দর্শন তাহারই প্রতিরোধ করে মাত্র।

কিন্তু সে জ্ঞান শুধু শব্দার্থ জ্ঞান নয়।

কিন্তু যে জ্ঞানে বন্ধন-মুক্তি হয় তাহা কেবল তত্ত্বার্থের শাব্দিক জ্ঞান নয়, পরন্তু উহা তত্ত্বের সাক্ষাৎ অনুভূতি বা তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার। শুধু শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করিলে বা শাস্ত্রের বাক্যার্থজ্ঞান হইলেই জীবের মুক্তি হয় না। এজন্য সাধনা অর্থাৎ নিরন্তর ধ্যান-ধারণা ও ইন্দ্রিয়-সংযম আবশ্যক।

মিথ্যা জ্ঞান নিরসনের জন্য তত্ত্বার্থের অনুধ্যান আবশ্যক।

(৬) ধ্যান-ধারণা ও যোগের আবশ্যকতা চার্বাকদর্শন ব্যতীত সকল ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে। যোগদর্শনে যোগের এবং যোগাঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা আছে। কিন্তু যোগদর্শন ব্যতীত বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, বেদান্ত এবং ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনেও যোগ সাধনের উপদেশ করা হইয়াছে। এসব দর্শনের মতে তত্ত্বার্থের বিচারলব্ধ জ্ঞানদ্বারা আমাদের বহুকালসঞ্চিত ও মজ্জাগত ভ্রান্ত ধারণাগুলি দূর হইবার নয়। এসব ভ্রান্ত ধারণা আমাদের চিন্তা বাক্ ও কর্মধারা দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তাহারাও ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে পুষ্ট ও দৃঢ়তর করিতেছে। যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলেই বা ইচ্ছামাত্রেই আমরা এসব ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে পারি না। এজন্য তত্ত্বার্থ বিচারের পরে সে বিষয়ে অনুধ্যান বা নিদিধ্যাসন করিতে হয়। দীর্ঘকাল নিরন্তর অনুধ্যানের ফলে মিথ্যা ধারণাগুলি অপনীত হয় এবং তত্ত্বার্থগুলি আমাদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

CENTRAL LIBRARY

ধ্যান-ধারণা ও সৎকর্মের বিরোধী প্রবৃত্তি দমনের জন্য সংযম আবশ্যক।

(৭) তত্ত্বার্থবিষয়ে মনোনিবেশের জন্য এবং তত্ত্বজ্ঞান জীবনে কার্যকর করার জন্য সংযমও আবশ্যক। সোক্রেটেস বলিতেন, জ্ঞান হইতেই ধর্মে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু তাঁহার অনুগামী দার্শনিকেরা মন্তব্য করিয়াছেন, কেবল সাধু কর্মের বোধ হইতেই সব স্থলে সাধু কর্মে প্রবৃত্তি হয় না, কারণ আমাদের কর্মসকল কেবল বিচারবুদ্ধিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, ইহারা আমাদের পশুপ্রবৃত্তিদ্বারা সমভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এ পশু-প্রবৃত্তিগুলি সংযত না করিলে আমাদের জ্ঞান অনুসারে কর্ম হয় না। চার্বাক ব্যতীত সকল ভারতীয় দার্শনিক এ কথার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। একটি সুবিদিত সংস্কৃত শ্লোকে এ কথা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য এইরূপ, 'সাধু কর্ম বুঝিতে পারি কিন্তু করিতে পারি না, অসাধু কর্মও বুঝি কিন্তু না করিয়া থাকিতে পারি না।'১

অজ্ঞানজন্য রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি প্রবৃত্তির বশে মানুষ সব সময় বিবেকবুদ্ধি বা বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করিতে পারে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য মানুষের স্বয়ংক্রিয় কর্ম-প্রেরণা-শক্তি। মানুষ যখন বিচার না করিয়া অভ্যাসবশে কাজ করে তখন তাহার কর্ম ইহাদের বশেই হয়। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্ ও মন এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) ইহাদের অধীন হইয়া কতগুলি দৃঢ়মূল অভ্যাসের বশবর্তী হয়। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সর্ব বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া ইন্দ্রিয়-বিষয়ে রাগ-দ্বেষ পরিহার করিতে হয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে পূর্বকার কদাচার হইতে মুক্ত করিয়া বিবেকবুদ্ধির অনুগামী করিবার চেষ্টা করিতে হয়। এ কার্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন। এজন্য দীর্ঘকাল সাধনা এবং সদাচারের অনুশীলন আবশ্যক। সকল ভারতীয় দার্শনিক এরূপ সদাচারের অনুশীলন অর্থাৎ অভ্যাসের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

সংযমের অর্থ মন ও ইন্দ্রিয়-সংযম।

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সংযম বলিতে মন, ইন্দ্রিয় ও রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তির সংযম বুঝায়। ইহাদ্বারা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ বুঝায় না, কেবল ইন্দ্রিয়ের কুপ্রবৃত্তির দমন করিয়া ইহাকে বিবেকবুদ্ধি বা বিচারবুদ্ধির অনুগামী এবং সন্মার্গানুগামী করাই বুঝায়।

১। পঞ্চদশী, ১৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সংযম ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ নয়, তাহাকে বিবেকবুদ্ধির অনুগামীকরণ।

কেহ কেহ মনে করেন যে, ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে এমন কঠোর সংযমের উপদেশ করা হইয়াছে যে তাহা পালন করিলে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি বিনষ্ট হয়। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। উপনিষদের যুগ হইতেই ভারতীয় দার্শনিকগণ মানুষের আত্মাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিলেও মনুষ্য হিসাবে তাহার অস্তিত্ব যে অনাত্ম-বস্তুর উপরও নির্ভর করে এবং তাহার বুদ্ধিবৃত্তিও যে অন্নের উপর নির্ভর করে তাহা স্বীকার করিতেন। তাঁহারা কোন যুগেই ইহা অস্বীকার করেন না। তাঁহারা নিম্নগামী মন ও ইন্দ্রিয়কে ঊর্ধ্বগামী করিবারই উপদেশ করিয়াছেন, উহাদিগকে বিনষ্ট করিতে বলেন নাই। দৃষ্টান্তরূপে যোগদর্শনের কথা বলা যায়। ইহাতে সর্বাপেক্ষা কঠোর সাধনার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও যোগাঙ্গের বর্ণনায় যেমন একদিকে অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহরূপ যম সাধনের কথা বলা হইয়াছে, তেমনি অন্য দিকে শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধানরূপ নিয়ম পালনের কথাও বলা হইয়াছে। অতএব ইহাতে অশুভ কর্মের নিষেধের সঙ্গে শুভ কর্ম করিবার বিধিও আছে। অন্যান্য দর্শনেও এরূপ বিধি ও নিষেধ-মূলক উপদেশ দেখা যায়। যেমন জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনে মৈত্রী, করুণা ও অহিংসার উপদেশ আছে। ইন্দ্রিয়গুলিকে নিগ্রহ না করিয়া তাহাদিগকে আত্মবশ্য করাই যে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের অভিপ্রেত তাহা ভগবদ্‌গীতার একটি শ্লোকে (২.৬৪) স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, 'সংযতাত্মা ব্যক্তি রাগ-দ্বেষবিযুক্ত ও আত্মবশ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।'

নীতি—বিধি ও নিষেধমূলক।

সকল ভারতীয় দর্শনের মতে মোক্ষ পরম পুরুষার্থ।

(৮) চার্বাক ব্যতীত সকল ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ মানুষের পরম পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অবশ্য মোক্ষের স্বরূপ সম্বন্ধে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মত-ভেদ আছে। তাঁহাদের সকলের মতেই মোক্ষে জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়। কোন কোন দার্শনিকের মতে মোক্ষে কেবল দুঃখনিবৃত্তিই হয় না, পরন্তু নিত্য সুখাভিব্যক্তিও হয়। ইহা শুধু দুঃখাভাবের অবস্থা নয়, পরন্তু আনন্দানুভূতির অবস্থা। জৈন ও বেদান্ত দর্শনে এবং কোন কোন বৌদ্ধ দার্শনিক ও পরকালীন নৈয়ায়িককর্তৃক এরূপ মত গৃহীত হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

৭। ভারতীয় দর্শনে দেশ-কালের ধারণা
(The Space-Time Background)

ভারতীয় দর্শনগুলির সমান নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যতীত আর একটি বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। এটি ইহাদের দেশ-কালের বিরাটত্বের ধারণা। ইহাকে ভারতীয় চিন্তাধারার সমান পটভূমি বলা যায় এবং ইহা তাহার নৈতিক ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করিয়াছে।

দেশ ও কালের বিরাটত্বের ধারণা, ভারতীয় দর্শনের সমান পটভূমি।

আধুনিক বিজ্ঞানে দেশ ও কালের বিরাটত্বের যে ধারণা দেখা যায় তাহা আমাদের কল্পনাতীত। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের কাল আর সহস্র বর্ষ হিসাবে নির্ণীত হয় না, ইহাকে কোটি কোটি বৎসর হিসাবে ধরিতে হয়। বিশ্বের দৈশিক বিরাটত্বের কল্পনা করিতে দৈশিক পরিমাপ ছাড়িয়া কালিক পরিমাপের আশ্রয় লইতে হয় এবং তাহা কত যোজন হইবে তাহার ইয়ত্তা করিতে না পারায় বলিতে হয় যে বিশ্বের ব্যাস কোটি কোটি আলোক-বৎসর, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,৩২৫ মাইল বেগে ছুটিয়া আলোক কোটি কোটি বৎসরে যত দূর যাইতে পারে ততটা। এই হিসাবে সূর্য সমগ্র বিশ্বের একটি বিন্দুমাত্র এবং পৃথিবী এই বিন্দুর দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র।

আধুনিক বিজ্ঞানে দেশ-কালের ধারণা।

বিজ্ঞানকর্তৃক নির্ণীত বিশ্বের দেশ-কালের বিরাটত্বের কল্পনাও আমরা করিতে পারি না। এ বিষয়ে পৌরাণিক বিবরণও আমাদের কল্পনাকে স্তম্ভিত ও ব্যাহত করে। বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে যে এই ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দশ ভুবন বা লোক আছে, তাহাদের মধ্যে পৃথিবী একটিমাত্র এবং উহাদের মধ্যে ব্যবধান কোটি কোটি যোজন হইবে। অনন্ত বিশ্বে এরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে।

ভারতীয় সাহিত্যে অনুরূপ ধারণা।

কাল সম্বন্ধেও ভারতীয় দার্শনিকগণ আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মত সাধারণ পরিমাপ-মান ত্যাগ করিয়া কল্পনান্তরের আশ্রয় লইয়াছেন। জাগতিক কালের পরিমাপ করিতে ব্রহ্মার এক দিনকে মান ধরা হইয়াছে এবং ব্রহ্মার এক দিন হইল সহস্র যুগ, অর্থাৎ মানুষের ৪,৩২০ লক্ষ বৎসর। ইহাই হইল সৃষ্ট জগতের স্থিতিকাল। ব্রহ্মার রাত্রি হইল প্রলয়কাল, যখন সৃষ্ট জগতের লয় বা বিনাশ হয়। অনাদি কাল হইতে ব্রহ্মার দিন রাত্রির আবর্তন অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় চলিতেছে। বিশ্বের প্রথম সৃষ্টি বা আদি নির্ধারণ করা যায় না এবং তাহা করিবার কোন উপায়ও নাই। এজন্য ভারতীয়

দার্শনিকগণ ইহাকে অনাদি ও অনন্তকাল প্রবহমাণ বলিয়াছেন। এক সৃষ্টির পূর্বে প্রলয় এবং প্রলয়ের পূর্বে সৃষ্টি এরূপ কল্পপরম্পরা অনাদি কাল চলিতেছে এবং অনন্তকাল চলিবে।

বিরাট দেশ-কালের পটভূমিকায় বিশ্বকে দর্শন করিয়া ভারতীয় দার্শনিকগণ পৃথিবীর ক্ষুদ্রতা, পার্থিব বস্তুর অনিত্যতা এবং পার্থিব সম্পদের অসারতা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং বার বার তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। পৃথিবী বিরাট দেশে একটি বিন্দুমাত্র, জীবন কাল-সমুদ্রে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ মাত্র। অসংখ্য পৃথিবী এবং অসংখ্য জীব জন্মে ও মরে, তাহাতে বিরাট বিশ্বের বিশেষ কিছু আসে যায় না। কত সভ্যতার উত্থান-পতন হইল, কত যুগ আসিল ও চলিয়া গেল। অনাদি-অনন্তকালের আবর্তনে কত সমৃদ্ধি ও অসমৃদ্ধির যুগের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইল, কত সভ্যতা ও বর্বরতার উত্থান-পতন ঘটিল ও ঘটিবে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে ভারতীয় দার্শনিকগণ বর্তমান সৃষ্টির আংশিক ব্যাখ্যা করিবার জন্য পূর্ব পূর্ব সৃষ্টির কল্পনা করিয়াছেন এবং তত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্রে এক শাশ্বত বা নিত্য বস্তুর অন্বেষণ করিয়াছেন। নীতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁহারা এক উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও অনাসক্ত ভাব লইয়া জীবজগতের আলোচনা করিয়াছেন এবং ক্ষুদ্র ও অনিত্য বস্তুতে আকৃষ্ট না হইয়া নিত্য ও শাশ্বত সত্য, শিব ও সুন্দরের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মানুষের দেহ কালগ্রাসে নষ্ট হইবে, কিন্তু তাহার আত্মা অজর ও অমর। মনুষ্য-জন্ম অতি দুর্লভ, কারণ এই জন্মে আমরা অমরত্ব লাভ করিতে পারি, দেশ ও কালজয়ী হইতে পারি।[১]

১। ভাগবত ১১.২.২৯ ; ধম্মপদ, ১৪.৪ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চার্বাকদর্শন

১। ইহার উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য

চার্বাকদর্শন জড়বাদের নামান্তর। জড়বাদের প্রতিষ্ঠা করা ইহার উদ্দেশ্য। যে মত অনুসারে অচেতন জড়পদার্থ একমাত্র তত্ত্ব, তাহার নাম জড়বাদ। জড়বাদ অনুসারে জড় হইতে প্রাণ মন চৈতন্য প্রভৃতি সকল জাগতিক পদার্থের উৎপত্তি হয়। ইহাতে আত্মা ঈশ্বর প্রভৃতি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব স্বীকার করা হয় না।

চার্বাকদর্শন—জড়বাদ।

চার্বাকমত অতি প্রাচীন। বেদ, প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য ও রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্যের স্থানে স্থানে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু চার্বাকদর্শন সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য শাখায় চার্বাকমত খণ্ডন করিবার জন্য ইহার যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেই আমরা চার্বাকদর্শন সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারি।

চার্বাক মত অতি প্রাচীন।

'চার্বাক' শব্দটির উৎপত্তি রহস্যাবৃত। কেহ কেহ মনে করেন যে, প্রাচীনকালে চার্বাক নামে জনৈক ঋষি ছিলেন, তিনিই জড়বাদের প্রতিষ্ঠা করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, চর্বণ অর্থে চর্ব্ ধাতু হইতে চার্বাক শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে এবং জড়বাদীরা খাদ্য ও পেয় বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত বলিয়া তাহাদিগকে চার্বাক বলা হয়, অথবা তাহাদের কথাগুলি বড় সুন্দর ও মনোহর (চারু+বাক্) বলিয়া তাহাদের চার্বাক নাম দেওয়া হইয়াছে। আবার কোন কোন লেখকের মতে লোক-পুত্র বৃহস্পতি জড়বাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি অসুরদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে জড়বাদের প্রচলন করেন। সে যাহা হউক, এখন চার্বাক বলিতে জড়বাদী নাস্তিক বুঝায়। সাধারণ লোকের মধ্যে চার্বাকমতের বহুল প্রচার দেখা যায়। এজন্য চার্বাকের অপর নাম লোকায়তিক এবং চার্বাকমতের অপর নাম লোকায়তমত হইয়াছে।

চার্বাক নামের ব্যাখ্যা।

157-7
012/38A

CENTRAL LIBRARY
DATA ENTERED

২। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, অনুমানাদির প্রামাণ্য নাই

চার্বাকমতে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ এবং সকল যথার্থ জ্ঞানের করণ। যে বস্তু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষযোগ্য কেবল তাহাই সদ্বস্তু, যাহা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষযোগ্য নহে তাহার প্রকৃত সত্তা বা অস্তিত্ব নাই।

প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ।

অনুমানকে প্রমাণ বলা যায় না, কারণ ইহাদ্বারা কোন বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ ও যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায় না। কোন যথার্থ অনুমান করিতে হইলে, হেতু ও সাধ্যের সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্যক। অনুমানের দৃষ্টান্ত এইরূপ: 'দূরস্থ পর্বতে বহ্নি আছে, যেহেতু পর্বতে ধূম দেখা যাইতেছে।' এখানে পর্বত হইল অনুমানের পক্ষ, কারণ পর্বতবিষয়ে বহ্নির অনুমান করা হইয়াছে। ধূম হইল অনুমানের হেতু, কারণ পর্বতে ধূম দেখা যাইতেছে বলিয়াই, সেখানে অপ্রত্যক্ষ বহ্নির অনুমান করা হইয়াছে। বহ্নি হইল অনুমানের সাধ্য, যেহেতু এই অনুমানদ্বারা পর্বতে বহ্নির অস্তিত্ব সাধিত অর্থাৎ প্রতিপাদিত হইয়াছে বলা হয়। কিন্তু যদি ধূম ও বহ্নির এরূপ সম্বন্ধ থাকে যে, 'যেখানে যেখানে ধূম আছে সেখানে সেখানেই বহ্নি আছে', তবেই আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে পর্বতে বহ্নি আছে, যদিচ তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর নয়। ধূম ও বহ্নির এইরূপ সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তিসম্বন্ধ বলে। কিন্তু এই ব্যাপ্তিসম্বন্ধ জানিবার কোন উপায় নাই। প্রত্যক্ষদ্বারা ইহা জানা যায় না। কারণ বর্তমান কালে ও সন্নিহিত দেশে ধূমের সহিত বহ্নির সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হইলেও, অতীত ও অনাগত কালে এবং অতি দূর দেশে বা অন্য গ্রহে তাহাদের সম্বন্ধ কাহারও প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারে না। অতএব তাহাদের ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ (অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধূম আছে, সেখানে সেখানে বহ্নি আছে এরূপ সম্বন্ধ) প্রত্যক্ষদ্বারা নির্ণীত হইতে পারে না। অনুমানদ্বারাও ইহা জানা যায় না। কারণ উল্লিখিত অনুমানের অপেক্ষিত ব্যাপ্তি অন্য কোন অনুমানদ্বারা জানিতে হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় অনুমানের অপেক্ষিত ব্যাপ্তি কিরূপে জানা যাইবে? এজন্য তৃতীয় অনুমান আবশ্যক হইবে। এইভাবে অনুমানের পর অনুমান করিতে হইবে এবং কোন সুস্থিত অবস্থায় উপনীত হওয়া যাইবে না। ইহাকেই অনবস্থা দোষ বলে এবং ইহা বর্জনীয়। কোন আপ্তপুরুষের বাক্যদ্বারাও ব্যাপ্তিসম্বন্ধের জ্ঞান হইতে পারে না। অবশ্য এ কথা বলা যায় যে, কোন বিশ্বস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি আমাদিগকে ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তিসম্বন্ধ বলিয়া দিলেন, এবং তাহা হইতেই আমাদের ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তিসম্বন্ধের জ্ঞান হইল। কিন্তু এ কথা স্বীকার্য নহে। কারণ বক্তা যে বিশ্বাসযোগ্য আপ্তপুরুষ তাহাইত আমাদিগকে অনুমানদ্বারা জানিতে হইবে। আরও এক

অনুমানের প্রামাণ্য নাই।

239193

CENTRAL LIBRARY

কথা, যদি আপ্তবাক্যই ব্যাপ্তিজ্ঞানের একমাত্র কারণ হয়, তবে কোন লোকই নিজে কোন অনুমান করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমরা অনেক বিষয়ে অনুমান করি। আমাদের কোন কোন অনুমান যথার্থ হয়, আবার কোন কোনটি ভ্রান্ত হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে অনুমান প্রমাণ নহে, কারণ প্রমাণ সব স্থলেই অভ্রান্ত জ্ঞান প্রদান করে।

আপ্তবাক্য বা শব্দেরও প্রামাণ্য নাই।

অনেক ভারতীয় দার্শনিকের মতে আপ্তবাক্য বা শব্দ এক প্রকার প্রমাণ। কিন্তু চার্বাকমতে ইহার কোন প্রামাণ্য নাই। বাক্য পদ বা শব্দসমূহের সমষ্টি। শব্দ শ্রবণ করিলে যে জ্ঞান হয়, তাহা প্রত্যক্ষ এবং যথার্থ। কিন্তু শব্দদ্বারা অপ্রত্যক্ষ দ্রব্য আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতির যে জ্ঞান হয়, তাহা অযথার্থ ও ভ্রান্ত। এরূপ জ্ঞান কখন সত্য আবার কখন মিথ্যা হয়। বেদে যে সব যাগ-যজ্ঞের উপদেশ করা হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান করিলে, অভীষ্ট ফললাভ হয় না। বাস্তবিক পক্ষে বেদ ধূর্ত পুরোহিতগণের আবিষ্কৃত তন্ত্র মাত্র। তাঁহারা ইহাতে স্বর্গসুখ প্রভৃতি রমণীয় বস্তুর কথা বলিয়া অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোককে যজ্ঞাদি করিবার প্ররোচনা দিয়াছেন। ফলে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া জনসাধারণের কোন লাভ হয় না, কিন্তু পুরোহিতগণের জীবিকানির্বাহ হয়। শেষ কথা, আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য অনুমানদ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হয়। কোন ব্যক্তি বিশ্বাসযোগ্য কি না, তাহা আমরা তাঁহার চরিত্রদ্বারা অনুমান করি। কিন্তু অনুমানই যখন প্রমাণ নয়, তখন তাহার আশ্রিত আপ্ত-বাক্য কিরূপে প্রমাণ হইবে? অতএব ইহা স্বীকার্য যে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, অনুমান প্রভৃতির কোন প্রামাণ্য নাই।

৩। জড়পদার্থই পরম তত্ত্ব

জড়পদার্থই পরম তত্ত্ব। জগৎ চারি ভূতের কার্য।

যেহেতু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থকে তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আত্মা, ঈশ্বর, স্বর্গ, পরজন্ম প্রভৃতি সত্য বা তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করা যায় না, যেহেতু এসব বিষয়ের কোন ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হয় না। চার্বাকমতে তত্ত্ব চারিপ্রকার—পৃথিবী, জল, তেজ বা অগ্নি এবং বায়ু। এই চারপ্রকার মহাভূতের সংযোগদ্বারা জগতের সমুদায় পদার্থের উৎপত্তি হয় এবং তাহাদের বিয়োগ হইলে উহারা বিনষ্ট হয়। জড়পদার্থ—সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, বৃক্ষ, লতা, জীবশরীর ও মানবদেহ—এ সবই চারি মহাভূত হইতে উৎপন্ন হয় এবং কালে ধ্বংস হইয়া তাহাতে বিলীন হয়।

৪। আত্মার অস্তিত্ব নাই

দেহই আত্মা। দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই।

অনেক লোক মনে করেন যে, মানবদেহে আত্মা নামে এক অজড় নিত্য দ্রব্য আছে, চৈতন্য ইহার স্বাভাবিক গুণ এবং ইহা মৃত্যুর পর দেহান্তরে গমন করে। চার্বাকমতে এরূপ আত্মার কোন অস্তিত্ব নাই। দেহমধ্যে যে চৈতন্য অনুভূত হয় তাহা দেহেরই গুণ। দেহ জড় ভূতের পরিণামমাত্র। পৃথিব্যাদি চারি ভূত দেহাকারে পরিণত হইলে তাহাতে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়, যেমন কিণ্বাদি (অর্থাৎ মদ্যমাদকতাহেতু গুড়-চাউল ইত্যাদি দ্রব্য) হইতে মাদকতা গুণের আবির্ভাব হয়। চৈতন্যবিশিষ্ট দেহকেই আত্মা বলা হয়, দেহাতিরিক্ত কোন অজড় আত্মা নাই। বাস্তবিক পক্ষে দেহই যে আত্মা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা সচরাচর বলি, 'আমি স্থূল', 'আমি খঞ্জ', 'আমি অন্ধ', ইত্যাদি। যদি দেহই আত্মা হয়, তবে এসব কথা সার্থক হয়, কারণ দেহরূপ আমিই স্থূল, খঞ্জ বা অন্ধ হইতে পারে। আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন হইলে এসব কথা নিরর্থক হয়। অতএব দেহকেই আত্মা বলিতে হইবে এবং দেহের বিনাশ হইলে আত্মারও বিনাশ হয় ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এমত অবস্থায় আত্মার কর্ম-কর্মফল, পুনর্জন্ম, স্বর্গ, নরক, মোক্ষ, অমরত্ব প্রভৃতি বিষয়ে দার্শনিক আলোচনার কোন অর্থ বা সার্থকতা থাকে না, ইহা নিরর্থক চিন্তা বা কল্পনায় পর্যবসিত হয়।

৫। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই

জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর নাই।

ঈশ্বর আমাদের প্রত্যক্ষগোচর বস্তু নয়। অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্য নহে। অনুমানদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। অবশ্য জগতের স্রষ্টারূপে ঈশ্বরের অনুমান করা হয়। যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘটাদি, তন্তু হইতে বস্ত্রাদি উৎপত্তির জন্য মৃত্তিকা ও তন্তুরূপে উপাদান ব্যতীত কুম্ভকার ও তন্তুবায়রূপে চেতনকর্তার প্রয়োজন, সেইরূপ জড় মহাভূত হইতে বৈচিত্র্যময় ও সুশৃঙ্খল জগৎ রচনার জন্য কোন অসীম জ্ঞান ও শক্তিমান্ কর্তার প্রয়োজন, আর সেই কর্তাই হইলেন ঈশ্বর। চার্বাকমতে জগৎ-সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। জড় মহাভূতসকল নিজ নিজ স্বভাববশে ক্রিয়া করে এবং তাহা হইতেই সমগ্র জগৎ ও জাগতিক বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে। জগতের প্রকৃতি ও গতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে,

ইহা কোন বুদ্ধিমৎ কর্তার কার্য নহে। অপর পক্ষে, জগৎ জড় প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের যদৃচ্ছ-ক্রিয়ার ফল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতএব চার্বাকমতে নিরীশ্বরবাদই যুক্তিযুক্ত। এ মতকে স্বভাববাদ বলা হয়, যেহেতু এ মতে জগৎ জড় প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণতি। ইহাকে যদৃচ্ছাবাদও বলা হয়, যে-হেতু এ মতে জগৎ প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের যদৃচ্ছ-ক্রিয়ার পরিণামমাত্র। ইহাকে দৃষ্টবাদও (positivism) বলা হয়, যেহেতু ইহাতে কেবল দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষীভূত বা প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে।

৬। সুখই একমাত্র পুরুষার্থ

স্বর্গ পুরুষার্থ নহে।

যেহেতু মৃত্যুর পর পুনর্জন্মের কোন সম্ভাবনা নাই, স্বর্গ মানুষের পরম ইষ্ট বা পুরুষার্থ হইতে পারে না। মীমাংসক প্রভৃতি কোন কোন ভারতীয় দার্শনিকদের মতে স্বর্গবাস বা অমিশ্র স্বর্গসুখভোগই মানুষের পরম পুরুষার্থ। চার্বাকমতে মৃত্যুর পর যখন কোন আত্মাই থাকে না, তখন কে স্বর্গসুখ ভোগ করিবে? অতএব স্বর্গ মানুষের পুরুষার্থ হইতে পারে না।

মোক্ষ পুরুষার্থ নহে।

অন্যান্য অনেক ভারতীয় দার্শনিকের মতে মোক্ষ মানুষের পরম পুরুষার্থ। কিন্তু চার্বাকদের নিকট এ মতও গ্রাহ্য নয়। মোক্ষ বলিতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বুঝায়। কেহ কেহ মনে করেন যে, কেবল মৃত্যুর পর আত্মা দেহমুক্ত হইলে মোক্ষলাভ হইতে পারে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এই জীবনেই ইহা লাভ করা সম্ভব। কিন্তু চার্বাকমতে মৃত্যুর পূর্বেই হউক আর পরেই হউক, মোক্ষলাভ করা সম্ভব নয়। মৃত্যুতে দেহের বিনাশ হইলে আত্মারও বিনাশ হয়, আর আত্মাই যখন থাকে না, তখন কে মোক্ষলাভ করিবে? পক্ষান্তরে, এই জীবনে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপে মোক্ষলাভ করা অসম্ভব। যতদিন দেহ থাকিবে ততদিন মানুষের সুখ ও দুঃখভোগ অনিবার্য। আমরা কেবল যথাসম্ভব দুঃখ পরিহার করিয়া সুখের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে পারি। সুখভোগের সঙ্গে দুঃখ জড়িত থাকে বলিয়া সুখলাভের চেষ্টা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। মাছে কাঁটা আছে বলিয়া কেহ মাছ খাওয়া বন্ধ করে না, ভিক্ষুকের ভয়ে কেহ রন্ধন কার্য বন্ধ করে না। এই জীবনে এবং এই দেহে আমরা যে সুখভোগ করিতে পারি, তাহাই আমাদের বাঞ্ছনীয়। পরজীবনে এবং পরলোকে কল্পিত সুখের আশায়

ইহজীবনের সুখ ত্যাগ করা মূর্খের কার্য। অতএব যথাসম্ভব দুঃখ পরিহার করিয়া ইহজীবনে সুখভোগ করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। যে জীবনে সর্বাধিক সুখভোগ হয়, তাহাই সাধু জীবন; যে কার্যদ্বারা দুঃখ অপেক্ষা অধিক সুখ পাওয়া যায়, তাহাই সাধু কার্য; এবং যে কাজ করিলে সুখ অপেক্ষা অধিক•দুঃখভোগ হয়, তাহাই অসাধু কর্ম। চার্বাকের নৈতিক মতকে সুখবাদ (hedonism) বলা যায়, যেহেতু এই মত অনুসারে সুখই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য এবং মানুষের পরম পুরুষার্থ।

সুখই জীবনের উদ্দেশ্য ও পরম পুরুষার্থ.

কোন কোন ভারতীয় দার্শনিক অর্থ, কাম বা সুখভোগ, ধর্ম ও মোক্ষ—এই চারিটি পুরুষার্থের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু চার্বাকমতে ধর্ম ও মোক্ষ পুরুষার্থ হইতে পারে না। মোক্ষ দশায় সর্ব দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় এরূপ বলা হয়। কেবল মৃত্যু হইলেই এরূপ অবস্থা হইতে পারে। কিন্তু কোন লোকই মৃত্যুকে তাহার কাম্য বলিয়া বরণ করিবার চেষ্টা করে না। তারপর ধর্মাধর্ম ও পাপপুণ্য বলিয়া বাস্তবিক কোন বস্তু নাই। এই সব বস্তু ধর্মশাস্ত্রে উদ্ভাবিত হইয়াছে বটে। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের কোন প্রামাণ্য নাই। সুখলাভের উপায় হিসাবে অর্থ বা ধনসম্পদকে পুরুষার্থ বলা যায়। কিন্তু ইহা গৌণ পুরুষার্থ, একমাত্র সুখই পরম পুরুষার্থ।

ধর্মও মোক্ষ নহে। সুখের উপায় হিসাবে অর্থও পুরুষার্থ।

চার্বাকেরা কেবল ধর্মশাস্ত্রে অবিশ্বাস করেন না, তাঁহারা শাস্ত্রানুমোদিত যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপকে বিদ্রূপও করিয়াছেন। ধর্মশাস্ত্রে পরলোকগত আত্মার তৃপ্তিসাধনের জন্য শ্রাদ্ধে অন্নজল দানের নির্দেশ আছে। যদি ইহলোকে অন্নজল উৎসর্গ করিলে স্বর্গত আত্মার ক্ষুধা-পিপাসার নিবৃত্তি হয়, তবে দূরদেশগত লোকের গৃহে অন্নজল উৎসর্গ করিলে তাহার ক্ষুৎপিপাসার শান্তি হইত। তারপর পুরোহিতগণ যদি সত্যসত্যই বিশ্বাস করিতেন যে, কোন যজ্ঞে কোন পশু বলি দিলে উহা স্বর্গে গমন করে, তবে তাঁহারা নিজেদের পিতামাতাকে বলি দিয়া তাঁহাদের স্বর্গে পাঠাইতেন।

৭। উপসংহার

আপাতদৃষ্টিতে চার্বাকমত যত নিন্দনীয় মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে ইহা তত নিন্দনীয় নয়। ভারতীয় বৈদিক বা আস্তিক দার্শনিকগণ ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কতকাংশে অতিরঞ্জিত মনে হয়। অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে, চার্বাকেরা চরম প্রত্যক্ষবাদী ও সংশয়বাদী দার্শনিক ছিলেন এবং তাঁহারা বেদ ও বৈদিক ধর্মের তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাচীন

CENTRAL LIBRARY

দর্শনগুলির বহু তত্ত্বের সমালোচনা ও খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জয়শ্রী নামে কোন প্রাচীন চার্বাক তাঁহার "তত্ত্বোপপ্লবসিংহ" নামক গ্রন্থে আস্তিক দর্শনের তত্ত্বগুলি খণ্ডন করিতে চরম সংশয়বাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে বলা উচিত যে, দর্শনের ক্ষেত্রে সংশয়বাদের বিশেষ উপযোগিতা আছে। দর্শনে অবিচারিত তত্ত্ব ও মতের স্থান নাই। দার্শনিক মতগুলিকে যুক্তিতর্কদ্বারা প্রতিষ্ঠা করা উচিত। চার্বাকগণের সংশয়বাদ অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকদের সতর্ক করিয়াছিল এবং তাঁহাদের দার্শনিক মতের বিরুদ্ধে যেসব সম্ভাব্য আপত্তি হইতে পারে, তাহা খণ্ডন করিয়া বহু যুক্তিতর্কদ্বারা নিজ নিজ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত করিতে বাধ্য করিয়াছিল। এইভাবে ভারতীয় দর্শনের পরিপুষ্টি ঘটে এবং ইহার যৌক্তিকতাও বর্ধিত হয়। অন্যান্য প্রায় সকল দর্শনেই চার্বাকমতের সমালোচনাপূর্বক নিজ মত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা দেখা যায়। এইভাবে অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকদের সংশয়বাদী চার্বাকের নিকট ঋণী বলিতে পারা যায়। পরিশেষে একথাও বলা উচিত যে, প্রমা ও প্রামাণ্যবিষয়ে চার্বাকদের মতামতের যথেষ্ট মূল্য আছে। অনুমান সম্বন্ধে চার্বাকদের যে আপত্তি, ব্যাপ্তিপ্রয়োগ অনুমানের (deductive logic) বিরুদ্ধে আধুনিক কালে সে আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। চার্বাকদের ন্যায় পাশ্চাত্ত্য জগতের কার্যকারিতাবাদী (pragmatists) ও দৃষ্টবাদী (positivists) দার্শনিকগণ স্বীকার করেন যে, অনুমানদ্বারা নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান লাভ করা যায় না।

CENTRAL LIBRARY

তৃতীয় অধ্যায়

জৈনদর্শন

১। ভূমিকা

প্রাগৈতিহাসিক যুগে জৈনধর্ম ও দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছিল। জৈনধর্মের প্রচারক হিসাবে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের অর্থাৎ শাস্ত্রকারের নাম শুনা যায়। তাঁহাদের প্রথম হইলেন ঋষভদেব এবং শেষ হইলেন বর্ধমান। বর্ধমানের অপর নাম মহাবীর। তিনি খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ করেন এবং গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক দার্শনিক ছিলেন। শুনা যায়, জৈন ধর্ম ও দর্শনের প্রধান গ্রন্থগুলিতে তাঁহারই বাণী ও উপদেশ নিবদ্ধ হইয়াছে। জৈন তীর্থঙ্করদের 'জিন' বলা হয়, কারণ তাঁহারা রাগদ্বেষাদি রিপুজয়ী ছিলেন।

জৈনধর্মের তীর্থঙ্করগণ।

জৈনেরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা তীর্থঙ্করদের পূজা করেন। তীর্থঙ্করেরা সিদ্ধ মহাপুরুষ। তাঁহারা এক কালে বদ্ধ জীব ছিলেন, কিন্তু স্বীয় সাধনাদ্বারা বন্ধনমুক্ত হইয়া অনন্ত জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের অধিকারী হন। জৈনেরা বিশ্বাস করেন যে সকল বদ্ধ জীব জিনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সাধনবলে মুক্ত হইতে পারেন এবং তাঁহাদের মতে পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের অধিকারী হইতে পারেন। জৈনধর্ম স্বাবলম্বনের ধর্ম। সাধনবলে যে বদ্ধ জীব মুক্ত হইতে পারে, তাহা প্রত্যেক মুক্ত মহাপুরুষের জীবনে দেখা যায়।

জৈনধর্মে তাঁহাদের স্থান।

জৈনধর্মাবলম্বিগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। তাঁহাদের মধ্যে মূল দার্শনিক মত সম্বন্ধে পার্থক্য নাই, কিন্তু বিশেষ ধর্মমত ও আচার বিষয়ে কিছু পার্থক্য আছে। উভয় সম্প্রদায়ই জিনদের উপদেশ মানা করেন। কিন্তু দিগম্বরগণ অধিক কঠোরতা ও পবিত্রতার পক্ষপাতী, আর শ্বেতাম্বরগণ অধিক উদার ও সাধারণ লোকের দোষত্রুটির

জৈনধর্মের দুই সম্প্রদায়—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর।

CENTRAL LIBRARY

প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। যেমন দিগম্বরদের মতে সন্ন্যাসীর কোন সম্বল থাকা উচিত নয়। তিনি বস্ত্রাদিও ত্যাগ করিয়া নগ্নদেহে অর্থাৎ দিগম্বর হইয়া থাকিবেন। শ্বেতাম্বরদের মতে তাঁহাদের শ্বেতাম্বর অর্থাৎ শ্বেত বস্ত্র ধারণ করা উচিত।

জৈনদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী।

লৌকিক বস্তুতন্ত্রবাদের ন্যায় জৈনদর্শনে বহু বস্তুর জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা স্বীকার করা হয়। আমরা যে সব দ্রব্য প্রত্যক্ষ করি তাহাদের বাস্তবিক সত্তা আছে। তত্ত্ব দুই প্রকার—জীব ও অজীব। প্রত্যেক প্রাণীতেই আত্মা (জীব) আছে, যদিচ তাহার দেহ অতি নিম্নস্তরের হইতে পারে। এজন্য প্রাণীর অহিংসা জৈন নীতিশাস্ত্রের প্রধান অঙ্গরূপে পরিগণিত। পরমতসহিষ্ণুতাও জৈন ধর্ম ও দর্শনের আর একটি বৈশিষ্ট্য। ইহার যৌক্তিকতা জৈনদর্শনের অনেকান্তবাদ ও স্যাদ্বাদে পাওয়া যায়। এ সব বিষয়ে ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইবে।

২। জৈনদর্শনে প্রমা ও প্রামাণ্য বিচার

(১) জ্ঞানের লক্ষণ ও প্রকারভেদ

জ্ঞান বা চৈতন্যের লক্ষণ।

জ্ঞান বা চৈতন্য জীব বা আত্মার স্বরূপগত ও অবিচ্ছেদ্য ধর্ম। ইহা আত্মার কাদাচিৎক অর্থাৎ কদাচিৎ উৎপন্ন গুণ নহে। জ্ঞান সূর্যালোকের মত নিজকে এবং অপর সকল দ্রব্যকে প্রকাশ করে, অবশ্য যদি ইহা বাধা-প্রাপ্ত না হয়। বাধামুক্ত হইলে জীব বা আত্মা সর্বজ্ঞ হইত। কিন্তু সাধারণ জীবের জ্ঞান কর্মদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহারা অজ্ঞানী ও অল্পজ্ঞ হয়। সর্বজ্ঞত্ব জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। কর্মজন্য দেহ ইন্দ্রিয় ও মনদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া জীবের সর্বজ্ঞত্ব বিলুপ্ত হয়।

প্রমাজ্ঞান পাঁচপ্রকার—মতি ও শ্রুত—দুইটি পরোক্ষ

জৈনমতে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান পাঁচপ্রকার—মতি, শ্রুত, অবধি, মনঃপর্যায় ও কেবল। ইহার মধ্যে প্রথম দুইটি অর্থাৎ মতি ও শ্রুত পরোক্ষ জ্ঞান এবং অবধি, মনঃপর্যায় ও কেবল প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান। যে জ্ঞান আত্মা, ইন্দ্রিয় বা মনের বৃত্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়, তাহাকে পরোক্ষ বলে। মতি ইন্দ্রিয় বা মনের ক্রিয়াজন্য। অতএব ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা ও অনুমান মতির অন্তর্গত। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বাহ্য ইন্দ্রিয়জন্য বা আন্তর ইন্দ্রিয়-জন্য অর্থাৎ মনোজন্য হইতে পারে। উভয়প্রকার প্রত্যক্ষই পরোক্ষ-জ্ঞান, যেহেতু

ইহারা বাহ্য বা আন্তর ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষকে অপরোক্ষ জ্ঞান বলা হয়। কিন্তু প্রাচীন জৈন গ্রন্থকারদের মতে ইহা পরোক্ষ জ্ঞান। অবশ্য পরকালীন কোন কোন জৈন গ্রন্থকার অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকদের ন্যায় ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষকে অপরোক্ষ জ্ঞান বলিয়াছেন। কোন বস্তুকে পূর্বদৃষ্ট বলিয়া স্মরণ করার নাম প্রত্যভিজ্ঞা, যেমন কেহ কোন বালককে দেখিয়া বলিলেন 'এই সেই বালক যাহাকে কাল দেখিয়াছিলাম'। শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম শ্রুত। ইহাও পরোক্ষ জ্ঞান।

অবধি, মনঃপর্যায় ও কেবল—তিনটি অপরোক্ষ।

যে জ্ঞানে ইন্দ্রিয় ও মনের ক্রিয়া ব্যতীত বিষয়ের সাক্ষাৎ প্রতীতি হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান। অপরোক্ষ জ্ঞান তিনপ্রকার—অবধি, মনঃপর্যায় ও কেবল। যেসব কর্মদ্বারা জীবের জ্ঞান বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহা আংশিকভাবে অপগত হইলে জীব অতি সূক্ষ্ম দূরস্থ ও অস্পষ্ট দ্রব্যসকল সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারে, যদিচ সে সব দ্রব্য ইন্দ্রিয় বা মনোগ্রাহ্য নহে। এ সকল দ্রব্য মূর্ত ও সসীম বলিয়া এরূপ সাক্ষাৎ প্রতীতিকে অবধিজ্ঞান বলে। তারপর মনঃপর্যায় জ্ঞান। কোন জীব রাগ-দ্বেষ প্রভৃতিদ্বারা অভিভূত হইলে অন্য জীবের মনের কথা জানিতে পারে না। যখন সে রাগাদি দোষমুক্ত হয়, তখন অন্য জীবের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে এবং তাহার মনের কথা জানিতে পারে। এরূপ ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ মনোবিষয়ক জ্ঞানকে মনঃপর্যায় বলে। কিন্তু যখন কোন জীব জ্ঞানাবরক সর্ব কর্ম বিনির্মুক্ত হয়, তখন সে সর্বজ্ঞ হয় এবং নিখিল বিশ্বের সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ করে। এরূপ জ্ঞানের নাম কেবলজ্ঞান এবং কেবল মুক্ত পুরুষই এরূপ জ্ঞান লাভ করেন। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, তিনপ্রকার অপরোক্ষ জ্ঞানই ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ ও অলৌকিক জ্ঞান।

জৈনমতে মতি, শ্রুত ও অবধিজ্ঞানে ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মনঃ-পর্যায় ও কেবলজ্ঞানে ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই, ইহারা সর্বদাই অভ্রান্ত। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, জৈনমতে প্রমাণ পাঁচপ্রকার হইলেও, কার্যতঃ জৈনগণ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ অর্থাৎ শাস্ত্র এই তিনটি প্রমাণ স্বীকার করেন।

(২) অনুমানাদি সম্বন্ধে চার্বাকমত খণ্ডন

অনুমান অপ্রমাণ নহে। চার্বাকমতেও তাহার প্রামাণ্য স্বীকার্য।

চার্বাকমতে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু জৈনমতে অনুমান এবং শব্দও প্রত্যক্ষের সমতুল্য প্রমাণ। এজন্য জৈন দার্শনিকগণ চার্বাকমত খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, অনুমান যে প্রমাণ নহে এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে চার্বাকেরা যদি কোন যুক্তি প্রদর্শন না করেন, তবে তাঁহাদের মত

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

CENTRAL LIBRARY

অযৌক্তিক বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে। পক্ষান্তরে, যদি তাঁহারা যুক্তিদ্বারা এই মত সমর্থন করেন, তবে বলিতে হইবে যে, তাঁহারা অনুমানেরই সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন এবং অনুমানের প্রামাণ্য তাঁহাদের অবশ্য স্বীকার্য। তারপর, যে কারণে চার্বাকগণ প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, ঠিক সেই কারণেই অনুমান ও শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়। যদি প্রত্যক্ষজ্ঞান বাধিত হয় না এবং প্রত্যক্ষমূলে যে কার্য করা যায় তাহা নিষ্ফল হয় না, এই কারণে চার্বাকেরা প্রত্যক্ষকে প্রমাণরূপে গণ্য করেন, তবে অনুমান এবং শব্দজ্ঞানও বাধিত ও নিষ্ফল হয় না বলিয়া প্রমাণরূপে গণ্য হইবে। অবশ্য অনুমান ও শব্দজ্ঞান কখন কখন বাধিত ও নিষ্ফল হয় সত্য। কিন্তু সেইরূপে প্রত্যক্ষজ্ঞানও কখন কখন বাধিত ও নিষ্ফল হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম, জ্যোৎস্নালোকে স্থাণুতে পুরুষভ্রম ইত্যাদি ভ্রান্ত ও নিষ্ফল প্রত্যক্ষের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষই হউক আর অনুমান বা শব্দই হউক, যে জ্ঞানদ্বারা কর্ম সফল হয় তাহাই প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান এবং যে জ্ঞানদ্বারা কর্ম বিফল হয় তাহা অপ্রমা অর্থাৎ অযথার্থ জ্ঞান। এজন্য বলিতে হইবে যে, প্রামাণ্য সংবাদ এবং অপ্রামাণ্য বিসংবাদদ্বারা গৃহীত অর্থাৎ নিশ্চিত হয়।

অধিকন্তু চার্বাকেরা তাঁহাদের মত স্থাপন করিতে একাধিক অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। স্বর্গ, পরজন্ম, আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতির প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি হয় না বলিয়া তাঁহারা ইহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। এখানে কার্যতঃ অনুপলব্ধিলিঙ্গক অনুমান স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ অনুপলব্ধিদ্বারাই এসব বস্তুর অনস্তিত্ব বা অভাব অনুমিত হইয়াছে। তারপর, চার্বাকেরা বাদানুবাদকালে তাঁহাদের বিপক্ষের অর্থাৎ বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের বাক্য হইতে তাহাদের মতামত জানিতে পারেন। এস্থলে বাক্য বা শব্দ হইতে মানসিক চিন্তা ও ভাবনার অনুমান করা হয়। ইহা কার্যলিঙ্গক অনুমান, যেহেতু বাক্য হইল কার্য এবং চিন্তা হইল তাহার কারণ। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, 'প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ' এই কথার তাৎপর্য হইতেছে যে, সকল প্রত্যক্ষজ্ঞানই যথার্থ। কিন্তু কোন চার্বাকই ভূত, ভবিষ্যৎ ও দূরদেশস্থ সকল প্রত্যক্ষজ্ঞান পরীক্ষা করিয়া এ কথা বলিতে পারেন না। তিনি কেবল কতকগুলি প্রত্যক্ষজ্ঞান যথার্থ দেখিয়া এবং অন্য সব প্রত্যক্ষ তাহাদের সদৃশ বা সমভাবাপন্ন বলিয়া, তাহারাও যথার্থ হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত করেন। অতএব চার্বাকেরা এখানে স্বভাবলিঙ্গক অনুমান স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, চার্বাকদের এই মত গ্রাহ্য নয়।

CENTRAL LIBRARY

(৩) স্যাদ্বাদ ও সপ্তভঙ্গী নয়

এক একটি অবধারণ বস্তুর এক একটি দিক্ প্রকাশ করে। অতএব ইহা সাপেক্ষিক।

মানুষ সসীম জীব। তাহার জ্ঞান ও শক্তি সীমাবদ্ধ। কোন মানুষ একদা কোন বস্তুর সব গুণধর্ম জানিতে পারে না। যিনি সর্বজ্ঞ কেবল তিনিই কেবল-জ্ঞানদ্বারা কোন বস্তু বা সব বস্তু সম্বন্ধে সব তথ্য জানিতে পারেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। সীমাবদ্ধ সাধারণ মানুষ কোন সময়ে কোন একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে কোন বস্তু জানিতে পারে। ফলে সে বস্তুটির কোন বিশেষ গুণ বা ধর্মই জানিতে পারে, তাহার সম্বন্ধে সব কথা জানিতে পারে না। যেমন কোন সময়ে কোন লোক কোন বিশেষ স্থান হইতে একটি প্রাসাদ দেখিতে পারে। একদা সব স্থান হইতে প্রাসাদটি দেখা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। তাহাকে প্রাসাদের সম্মুখভাগে বা পশ্চাদ্ভাগে বা পার্শ্বভাগে দাঁড়াইয়া প্রাসাদ দেখিতে হইবে। সম্মুখভাগ হইতে সে প্রাসাদের এক দিক্ অর্থাৎ সম্মুখ দিক্ দেখে, পশ্চাদ্ভাগ হইতে আর এক দিক্ এবং পার্শ্বভাগ হইতে আর একটি ভিন্ন দিক্ দেখিতে পায়। অতএব এক সময়ে আমরা কোন একটি দৃষ্টিকোণ হইতে কোন বস্তুর একটি দিক্ বা অংশ দেখিতে ও জানিতে পারি। জৈনমতে কোন বস্তুর অসংখ্য গুণধর্মের মধ্যে কোন একটি গুণ বা ধর্ম সম্বন্ধে উহার যে আংশিক জ্ঞান, তাহার নাম **নয়**। এইরূপ আংশিক জ্ঞানের মূলে যে **অবধারণ** (judgment) হয়, তাহাকেও নয় বলে। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের বস্তুবিষয়ক অবধারণ কোন বিশেষ দৃষ্টি-কোণ হইতে এবং বস্তুর কোন বিশেষ গুণ বা ধর্মবিষয়ে সত্য হইবে; উহা সর্বভাবে অর্থাৎ সর্বসর্তনিরপেক্ষভাবে (unconditionally) সত্য হইবে না। যখন আমরা একথা ভুলিয়া যাই এবং নিজ নিজ অবধারণকে সর্ব-নিরপেক্ষভাবে সত্য বলিয়া মনে করি, তখনই আমরা জীবনে এবং দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ববিবাদে লিপ্ত হই। হস্তী ও চারি অন্ধ ব্যক্তির গল্পে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। চার অন্ধ এক হস্তীর বিভিন্ন অংগ স্পর্শ করিয়া ঐ জন্তু সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণায় উপনীত হইল। প্রত্যেকেই নিজ ধারণা সত্য এবং অপর সকলের ধারণা মিথ্যা এরূপ মন্তব্য করিয়া কলহ করিতে লাগিল। তাহাদের প্রত্যেকের ধারণা হস্তীর এক এক অঙ্গ সম্বন্ধে সত্য, কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য নয়, ইহা বুঝাইয়া দিলে তাহাদের কলহের অবসান হয়।

বিভিন্ন দর্শন তত্ত্বের বিভিন্ন দিক্ প্রকাশ করে।

দর্শনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। বিভিন্ন দর্শনে তত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখা যায়। এসব বিভিন্ন মত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বহুমুখ তত্ত্বের বিভিন্ন দিক্ স্পর্শ করে। এজন্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এক একটি

দার্শনিক মত একই তত্ত্বের মাত্র এক দিকের পরিচয় দেয়, ইহাতে তত্ত্বের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। অতএব বিভিন্ন দার্শনিক মত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে তত্ত্বের বিভিন্ন দিক্ বা ধর্ম সম্বন্ধে সত্য, কিন্তু কোনটিই সর্বভাবে বা সর্বনিরপেক্ষভাবে সত্য নয়, যেমন হস্তী সম্বন্ধে বিভিন্ন বর্ণনা হস্তীর বিভিন্ন অঙ্গ সম্বন্ধে সত্য, কিন্তু কোনটিই হস্তী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য নয়। দার্শনিকগণ একথা বিস্মৃত হইয়া পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্বকলহে লিপ্ত হন।

প্রত্যেক অবধারণে 'একভাবে' (স্যাৎ) এই শব্দ যোগকরা উচিত।

এসব কথা বিবেচনা করিয়া জৈন দার্শনিকগণ বলেন যে, কোন বস্তু সম্বন্ধে কোন অবধারণ ভাষায় প্রকাশ করিবার সময় সর্তহীন উক্তি না করিয়া 'স্যাৎ' অর্থাৎ 'একভাবে' বস্তুটি এইরূপ ইহাই বলা উচিত। যেমন 'হস্তী স্তম্ভের মত' ইহা না বলিয়া 'একভাবে (অর্থাৎ পায়ের দিক্ দিয়া) হস্তী স্তম্ভের মত" ইহা বলা উচিত, সেইরূপ 'ঘট বিদ্যমান' এরূপ নিঃসর্ত উক্তি না করিয়া, 'একভাবে ঘট বিদ্যমান' এরূপ বলা উচিত। কারণ কোন ঘট কোন দেশে ও কালে এবং কোন বিশেষ গুণযুক্ত হইয়াই থাকিতে পারে, ইহা সর্ব দেশে ও কালে এবং সর্ব গুণবিশিষ্ট হইয়া বিদ্যমান হয় না।

জৈনদের এইরূপ মতকে **স্যাদ্বাদ** বলা হয়। এই মত অনুসারে আমাদের সাধারণ অবধারণ, কোন বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে বস্তুর কোন বিশেষ গুণধর্ম সম্বন্ধে সত্য হইবে। ইহার সত্যতা সর্তাধীন (conditional), নিঃসর্ত (unconditional) নহে।

অবধারণের সাতপ্রকার ভেদ।

জৈনেরা স্যাদ্বাদ হইতে **সপ্তভঙ্গী নয়ের** অবতারণা করিয়াছেন। তর্কশাস্ত্রে সাধারণতঃ দুইপ্রকার অবধারণ স্বীকার করা হয় —বিধিমূলক (affirmative), যেমন ফলটি মিষ্ট, ও নিষেধমূলক (negative), যেমন ফলটি মিষ্ট নহে। জৈনেরা সাতপ্রকার অবধারণ স্বীকার করেন। বিধিমূলক ও নিষেধমূলক অবধারণ ইহাদের অন্তর্গত। এই সাতপ্রকার অবধারণ নিম্নে বর্ণিত হইল।

(ক) বিধিমূলক অবধারণে কোন বস্তুর কোন গুণ আছে এই কথা বলা হয়। কিন্তু জৈনেরা বিধিমূলক অবধারণ সর্তাধীন ইহা প্রকাশ করিবার জন্য ইহার সঙ্গে 'স্যাৎ' অর্থাৎ 'একভাবে' এই শব্দটি সংযুক্ত করেন। যেমন 'ঘট বিদ্যমান' ইহা প্রকাশ করিতে তাঁহারা বলিবেন 'একভাবে ঘট বিদ্যমান' (স্যাৎ অস্তি), অর্থাৎ কোন বিশেষ দেশে কালে ও অবস্থায় ঘট বিদ্যমান।

(খ) সেইরূপ নিষেধমূলক অবধারণ প্রকাশ করিতে তাঁহারা বলিবেন, 'এক ভাবে ঘট নাই' (স্যাৎ নাস্তি), অর্থাৎ ভিন্ন দেশে কালে ও অবস্থায় ঘট নাই।

(গ) যখন এক দেশে কালে ও অবস্থায় ঘট বিদ্যমান এবং ভিন্ন দেশে কালে ও অবস্থায় ঘট অবিদ্যমান, এই দুইটি তথ্যের অর্থাৎ বিষয়ের পারম্পর্য প্রকাশ করিতে হয়, তখন আমাদের বলিতে হইবে যে, 'একভাবে ঘট বিদ্যমান এবং একভাবে ঘট বিদ্যমান নহে' (স্যাৎ অস্তি চ, নাস্তি চ)। একটি আম প্রথমে সবুজ থাকে এবং পাকিলে হলুদে হয়। আমের এই অবস্থান্তর প্রকাশ করিতে আমাদিগকে বলিতে হয় 'একভাবে আমটির বর্ণ সবুজ এবং একভাবে হলুদে'।

(ঘ) একটি কাঁচা মাটির ঘটের রং কাল এবং পোড়াইলে উহা লাল হয়। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, সর্বাবস্থায় ঘটের প্রকৃত রং কিরূপ অর্থাৎ দেশ কাল ও অবস্থা নিরপেক্ষ ঘটের রং কিরূপ, তবে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এরূপ ঘটের রং কি তাহা বলা যায় না, 'ইহা অবক্তব্য' (স্যাৎ অবক্তব্যম্)। জৈনমতে ইহাই হইল অবধারণের চতুর্থ প্রকারভেদ। দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়, যাহার সোজাসুজি কোন উত্তর দেওয়া যায় না এবং আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে, এ সব প্রশ্নের সমাধান করা যায় না। বুদ্ধ এসব প্রশ্নকে 'অব্যাকতানি' বলিয়াছেন। এসব প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা কিভাবে বিসংবাদের সৃষ্টি করে এবং কার্যতঃ ব্যর্থ হয় তাহা জার্মান দার্শনিক কাণ্ট প্রদর্শন করিয়াছেন।

(ঙ) অবশিষ্ট তিনপ্রকার অবধারণ চতুর্থপ্রকার অবধারণের সহিত প্রথম তিনপ্রকার অবধারণকে ক্রমান্বয়ে যুক্ত করিলে পাওয়া যাইবে। প্রথমটির সহিত চতুর্থটিকে যুক্ত করিলে পঞ্চমপ্রকার অবধারণের উদ্ভব হয়। যেমন ঘটটি এক দেশে কালে ও অবস্থায় বিদ্যমান এবং দেশ-কাল-অবস্থা-নিরপেক্ষভাবে অবর্ণনীয়, ইহা প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে, 'একভাবে ঘট আছে এবং একভাবে ইহা অবক্তব্য' (স্যাৎ অস্তি চ, অবক্তব্যং চ)।

(চ) সেইরূপ দ্বিতীয়টির সহিত চতুর্থটি যুক্ত করিলে ষষ্ঠপ্রকার অবধারণ পাওয়া যায়। যেমন ঘটটি এক দেশে কালে ও অবস্থায় অবিদ্যমান এবং দেশ-কাল-অবস্থা-নিরপেক্ষভাবে অবর্ণনীয়, ইহা প্রকাশ করিতে বলিতে হয় যে, 'একভাবে ঘট নাই এবং একভাবে ইহা অবক্তব্য' (স্যাৎ নাস্তি চ, অবক্তব্যং চ)।

(ছ) সেইরূপ তৃতীয়টির সহিত চতুর্থটি যুক্ত করিলে সপ্তমপ্রকার অবধারণ পাওয়া যাইবে। যেমন ঘটটি এক দেশ-কাল-অবস্থায় বিদ্যমান এবং ভিন্ন দেশ-কাল-অবস্থায় অবিদ্যমান এবং দেশ-কাল-অবস্থা-নিরপেক্ষভাবে অবর্ণনীয়, ইহা প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে, 'একভাবে ঘট আছে, এবং

CENTRAL LIBRARY

একভাবে নাই, এবং একভাবে অবক্তব্য' (স্যাৎ অস্তি চ, নাস্তি চ, অবক্তব্যং চ)। অন্য প্রকার যেসব অবধারণ হইতে পারে, তাহা এই সাতপ্রকার অবধারণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এজন্য অবধারণের প্রকারভেদের সংখ্যা সাতই হইবে, কমও নয়, বেশীও নয়।

৩। অনেকান্তবাদ

জৈনমতে আমাদের জ্ঞাত বিষয়মাত্রেরই অনন্ত ধর্ম আছে। আমরা যে-সব বস্তু জানি তাহাদের দুইপ্রকার ধর্ম আছে—ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক (positive and negative characters)। উভয়প্রকার ধর্মই অসংখ্যেয়। যেসব ধর্ম কোন বস্তুতে থাকে এবং যাহাদ্বারা ইহা গঠিত হয়, তাহাদের ভাবাত্মক ধর্ম বলে। কোন মানুষের ভাবাত্মক ধর্ম হইল তাহার আকার-প্রকার, স্বভাব-প্রকৃতি, জাতি-ধর্ম, বংশ, বর্ণ, শিক্ষা-দীক্ষা, কাজ-কর্ম, জন্মস্থান, জন্মসময় ইত্যাদি ইত্যাদি। যেসব ধর্ম ঐ মানুষে নাই এবং যাহাদ্বারা সে জাগতিক অন্য সব বস্তু হইতে ভিন্ন বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহাদিগকে তাহার অভাবাত্মক ধর্ম বলে। যেমন মনুষ্যটি য়ুরোপবাসী নয়, চীনবাসী নয়, তিব্বতবাসী নয়, গৌরবর্ণ নয়, দীর্ঘকায় নয়, শিক্ষিত নয়, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নয়, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী নয়, অসাধু নয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্যটির ভাবাত্মক ধর্ম অপেক্ষা অভাবাত্মক ধর্ম অধিক, কারণ ইহাদ্বারা সে জাগতিক অন্য সব বস্তু হইতে ভিন্ন বিবেচিত হয় এবং জাগতিক বস্তুর সংখ্যার কোন ইয়ত্তা করা যায় না। তারপর, কালের পরিবর্তনে কোন বস্তুর যেসব নূতন ধর্মের উৎপত্তি হয়, তাহারও সংখ্যা নির্ধারণ করা যায় না। এসব কথা ভাবিলে বেশ বুঝা যায় যে, জগতের কোন বস্তুই অল্পসংখ্যক গুণধর্মবিশিষ্ট পদার্থ নয়। বাস্তবিকপক্ষে উহার গুণধর্মের ইয়ত্তা করা যায় না, উহা অনন্তধর্মবিশিষ্ট।

প্রত্যেক বস্তুই অনন্তধর্মক।

কোন বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে জানিতে হইলে তাহার সব ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক ধর্ম জানিতে হয়। এজন্য জৈনেরা বলেন যে, যিনি একটি বস্তু সম্পূর্ণরূপে জানেন, তিনি জগতের সব বস্তুই জানেন। কিন্তু শুধু কেবলজ্ঞানেই ইহা সম্ভব হয়। ব্যবহারিক জীবনে আমরা বস্তুর আংশিক জ্ঞান লইয়াই কাজ চালাইতে পারি। কিন্তু সেজন্য যেন কেহ মনে না করেন যে, কোন সসীম বস্তু নির্দিষ্টসংখ্যক গুণধর্মবিশিষ্ট এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান ও পারমার্থিক জ্ঞান।

CENTRAL LIBRARY

৪। জৈনমতে দ্রব্যের লক্ষণ

দ্রব্য, গুণ ও পর্যায়বিশিষ্ট। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেক বস্তুর অনন্ত ধর্ম আছে। যাহার ধর্ম আছে অর্থাৎ ধর্ম যাহাতে থাকে, তাহার নাম ধর্মী এবং ধর্মীকেই **দ্রব্য** বলে। দ্রব্যে দুইপ্রকার ধর্ম থাকে—যথা স্বাভাবিক বা স্বরূপগত ধর্ম এবং আগন্তুক বা কাদাচিৎক ধর্ম। দ্রব্যের স্বাভাবিক বা স্বরূপগত ধর্ম সব সময়েই দ্রব্যে থাকে অর্থাৎ যতকাল দ্রব্য থাকে ততকাল তাহার স্বাভাবিক ধর্মও থাকে। কোন দ্রব্যের স্বাভাবিক ধর্ম অপগত হইলে, তাহা আর সে দ্রব্যই থাকে না। যেমন চেতনা বা চৈতন্য (consciousness) আত্মার স্বরূপগত ধর্ম। চৈতন্যহীন আত্মা আত্মাই নহে। আগন্তুক বা কাদাচিৎক ধর্ম কখন দ্রব্যে থাকে কখন থাকে না, উহারা একদা উৎপন্ন হয় এবং পরে অপগত হয়। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আত্মার আগন্তুক ধর্ম। এরূপ আগন্তুক ধর্মের মাধ্যমে দ্রব্যে পরিবর্তন হয়। জৈনমতে স্থিতিশীল স্বাভাবিক ধর্ম হইল **গুণ**, আর পরিবর্তনশীল আগন্তুক ধর্ম হইল **পর্যায়** বা **পর্যয়**। অতএব জৈনেরা দ্রব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে বলিয়াছেন যে, দ্রব্য গুণ ও পর্যায়বিশিষ্ট। দ্রব্য পরিণামীও বটে, অপরিণামীও বটে। গুণের দিক্ দিয়া ইহা অপরিণামী এবং পর্যায়ের দিক্ দিয়া ইহা পরিণামী। গুণ ও পর্যায়ের আধাররূপেও ইহা অপরিণামী।

জগৎ বিভিন্ন দ্রব্যের সমষ্টি। ইহা একভাবে নিত্য বা অপরিণামী এবং একভাবে অনিত্য বা পরিণামী। ইহার মূল উপাদান দ্রব্যগুলির স্বরূপগত গুণ অপরিণামী বলিয়া ইহা অপরিণামী এবং ইহার উৎপাদক দ্রব্যগুলির আগন্তুক ধর্ম বা পর্যায়ের পরিবর্তন হয় বলিয়া ইহা পরিবর্তনশীল। বৌদ্ধ-মতে জগৎ অবিরাম পরিবর্তনশীল বা ক্ষণিক, ইহাতে কোন নিত্য বা অপরিণামী বস্তু নাই। অদ্বৈত-বেদান্তমতে তত্ত্ব নিত্য ও অপরিণামী, পরিণামী বস্তুর কোন তাত্ত্বিক সত্তাই নাই। জৈনেরা বলেন, উভয় মতই একদেশ-দোষদুষ্ট। একটিতে তত্ত্বের এক দিক্ অর্থাৎ পরিবর্তনের দিক্ স্বীকৃত হইয়াছে এবং অন্যটিতে তত্ত্বের আর দিক্ অর্থাৎ অপরিণামিত্বের দিক্ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তত্ত্ব পরিণামীও বটে এবং অপরিণামীও বটে।

তত্ত্বের (reality) লক্ষণ নির্দেশ করিতে জৈনগণ বলেন যে, সৎ বা তত্ত্ব উৎপত্তি, ক্ষয় ও স্থিতিবিশিষ্ট অর্থাৎ সতের বা তত্ত্বের জন্ম হয়, পরিবর্তন ও ক্ষয় হয় এবং ইহার ধ্রুব বা নিশ্চল স্থিতিও আছে। উৎপাদ, ব্যয় ও ধ্রৌব্য এই তিনটি সতের লক্ষণ। দ্রব্যেও এই তিনটি লক্ষণ আছে। দ্রব্য স্বরূপতঃ অপরিণামী বা নিত্য, কিন্তু ইহার পর্যায়ের উৎপত্তি ও ক্ষয় হয়।

দ্রব্য, গুণ ও পর্যায়বিশিষ্ট।

CENTRAL LIBRARY

বৌদ্ধমতে অর্থক্রিয়াকারিত্ব অর্থাৎ কোন কার্য উৎপাদনের শক্তি সতের লক্ষণ। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। রজ্জুতে যে সর্প দৃষ্ট হয় তদ্দ্বারা ভয় পলায়ন প্রভৃতি কার্য উৎপন্ন হইলেও ইহাকে সৎ বলা যায় না, ইহা মিথ্যা সর্প। বৌদ্ধেরা সতের এরূপ ভ্রান্ত ধারণামূলে ক্ষণিকবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষণিকবাদ গ্রাহ্য নয়। যদি সব বস্তুই ক্ষণিক হয়, তবে আত্মাও ক্ষণিক হইবে। সেস্থলে স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, কোন লোকের বিভিন্ন অবস্থায় একপুরুষত্ব প্রতীতি (sense of personal identity) প্রভৃতির কোন ব্যাখ্যা করা যাইবে না। তারপর, ক্ষণিকবাদ স্বীকার করিলে মুক্তি অর্থহীন হইয়া পড়ে, কারণ কোন স্থায়ী আত্মা না থাকিলে কাহার মুক্তি হইবে? তারপর, স্থায়ী আত্মা স্বীকার না করিলে বলিতে হয় যে, একজন কাজ করিলেন এবং অপর আর একজন তাহার ফলভোগী হইলেন। ইহাতে কর্ম ও কর্মফল-নিয়ম ব্যাহত হয়। তৎপরে বক্তব্য এই যে, যদি স্থায়ী আত্মা না থাকে, তবে ক্ষণিক বিজ্ঞানগুলি কিরূপে একসূত্রে গ্রথিত হইয়া একই ব্যক্তির ধারাবাহিক জীবন গঠন করিবে? শেষ কথা, প্রত্যক্ষ বা অনুমানদ্বারা আমরা কোন বস্তুকেই একেবারে ক্ষণিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি না। এই সব কারণে ক্ষণিকবাদ গ্রাহ্য নয়।

৫। দ্রব্যের প্রকারভেদ

দ্রব্য—অস্তিকায় ও অনস্তিকায়।

জৈনমতে সকল দ্রব্যকে প্রথমে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়—যথা অস্তিকায় ও অনস্তিকায়। যেসব দ্রব্য প্রদেশবৎ অর্থাৎ দেশ ব্যাপিয়া থাকে তাহাদিগকে অস্তিকায় বলে। যে দ্রব্য কোন দেশ ব্যাপিয়া থাকে না, তাহাকে অনস্তিকায় বলে। একমাত্র কাল অনস্তিকায় দ্রব্য, কারণ ইহা প্রদেশবৎ নহে অর্থাৎ ইহা কোন দেশ ব্যাপিয়া থাকে না এবং ইহার কোন দৈশিক বিস্তার নাই। আর সব দ্রব্য অস্তিকায় অর্থাৎ দেশ ব্যাপিয়া থাকে। অস্তিকায় দ্রব্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—যথা জীব ও অজীব। জীব বলিতে আত্মাকে বুঝায়। জীবকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—যথা মুক্ত ও বদ্ধ। বদ্ধ জীব আবার দুইপ্রকার—যথা ত্রস অর্থাৎ গতিশীল এবং স্থাবর অর্থাৎ গতিহীন। গতিহীন জীব পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু বা বৃক্ষদেহে বাস করে। ইহাদের কেবল ত্বক্ ইন্দ্রিয় এবং স্পার্শন চেতনা আছে। গতিশীল জীবদের বিভিন্ন স্তরের দেহ আছে এবং তাহাদের দুইটি হইতে পাঁচটি পর্যন্ত ইন্দ্রিয় আছে। ক্রিমির দুইটি ইন্দ্রিয়—ত্বক্ ও রসন।

জীব ও অজীব ইত্যাদি।

পিপীলিকার তিনটি ইন্দ্রিয়—ত্বক্, রসন ও ঘ্রাণ। ভ্রমরের চারিটি ইন্দ্রিয়—ত্বক্, রসন, ঘ্রাণ ও চক্ষু। উচ্চস্তরের জীবদের অর্থাৎ পশু, পক্ষী ও মনুষ্যের পাঁচটি ইন্দ্রিয়—ত্বক্, রসন, ঘ্রাণ, চক্ষু ও শ্রোত্র।

প্রদেশবৎ অজীব দ্রব্য চারিপ্রকার—ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও পুদ্গল। কাল অজীব দ্রব্যের অন্তর্গত, কিন্তু ইহা প্রদেশবৎ বা অস্তিকায় নয়।

(১) জীব বা আত্মা

আত্মাই জীব এবং চৈতন্ত ইহার স্বরূপগত ধর্ম।

জীব বা আত্মা চেতন দ্রব্য। চেতনা ইহার স্বরূপগত ধর্ম এবং সর্বদা ইহাতে থাকে, যদিচ ইহার হ্রাস ও বৃদ্ধি হইতে পারে। পূর্ণতাপ্রাপ্ত বা মুক্ত আত্মার চেতনা সর্বব্যাপী এবং পৃথিবী, জল বা বৃক্ষদেহস্থ আত্মার চেতনা সর্বাপেক্ষা কম। কিন্তু ইহারা অচেতন নহে, ইহাদের চেতনা কর্মদ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া সুপ্ত থাকে। অন্যান্য জীবের চেতনা মধ্যমপরিমাণ।

ইহা নিত্য।

আত্মা জ্ঞাতা, কর্তা ও সুখ-দুঃখ-ভোক্তা এবং ইহা নিজকে ও বিষয়কে প্রকাশ করে। ইহা নিত্য, যদিচ ইহার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ইহা দেহ হইতে ভিন্ন এবং ইহার অস্তিত্ব নিজ চেতনাদ্বারা প্রকাশিত।

ইহা দেহকে পরিব্যাপ্ত করে।

আত্মা নিজ পূর্বকর্মের ফলে একটির পর আর একটি দেহে বাস করে এবং যখন যে দেহে বাস করে তখন আলোকের মত নিজ চৈতন্যদ্বারা সেই দেহকে পরিব্যাপ্ত করে। যদিও ইহা অমূর্ত অর্থাৎ ইহার কোন আকার নাই, তথাপি আলোকের মত যে দেহে বাস করে সেই দেহের আকার ধারণ করে। এই হিসাবে আত্মা অমূর্ত হইলেও তাহাকে অস্তিকায় অর্থাৎ প্রদেশবৎ বলা হয়। অতএব আত্মা অনন্ত বা অসীম নয়, ইহার বিস্তৃতি অধিকৃত দেহের বিস্তৃতির সমপরিমাণ, কারণ ইহা কেবল দেহমধ্যস্থ বিষয়ই সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারে। ইহার চেতনা সর্বব্যাপী নয়, ইহা কেবল দেহব্যাপী।

আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ ও চার্বাকমত খণ্ডন।

আত্মার অস্তিত্ব সাক্ষাৎ-প্রতীতিগম্য। আত্মার সুখ-দুঃখ প্রভৃতি ধর্মের প্রত্যক্ষকালে আত্মারও প্রত্যক্ষ হয়। আমরা যখন বলি 'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী' ইত্যাদি তখন আমাদের সুখ ও দুঃখের প্রত্যক্ষ হয়। সুখ ও দুঃখ আত্মার ধর্ম। ইহাদের প্রত্যক্ষ হইলে ধর্মী আত্মারও প্রত্যক্ষ হয়, যেমন কোন ফুলের বর্ণের প্রত্যক্ষ হইলে ফুল দ্রব্যটিরও প্রত্যক্ষ হয়। অনুমানদ্বারাও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। কোন শকটের

ন্যায় মানব দেহকে ইচ্ছামত চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করা যায়। অতএব দেহের চালক ও নিয়ামকরূপে আত্মা স্বীকার্য। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের করণমাত্র। এসব ইন্দ্রিয়কে পরিচলনা করিবার জন্য কোন কর্তা আবশ্যক। আত্মাই সে কর্তা। কোন জড়দ্রব্য নির্মাণ করিতে হইলে উপাদান কারণ ব্যতীত কোন নিমিত্ত কারণ আবশ্যক হয়। যেমন ঘট নির্মাণ করিতে হইলে মৃত্তিকা ব্যতীত কুম্ভকারের প্রয়োজন হয়, কারণ কুম্ভকারদ্বারাই মৃত্তিকা ঘটরূপে পরিণত হয়। সেইরূপ দেহ নির্মাণ করিবার জন্য নিমিত্তকারণরূপে আত্মা স্বীকার্য। চার্বাকমতে জড়ভূত হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি কোথায়ও প্রত্যক্ষ হয় না। চার্বাকমতে প্রত্যক্ষই যখন একমাত্র প্রমাণ, তখন বলিতে হইবে যে, জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হয় না। চার্বাক অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও তদ্দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইবে না। জড়দেহ হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হইলে এবং চৈতন্য দেহের গুণ বা ধর্ম হইলে, মৃতদেহেও চৈতন্য বিদ্যমান থাকিত, কারণ দেহত তখনও বিদ্যমান থাকে। চার্বাক বলেন যে, পৃথিব্যাদি জড়ভূত দেহাকারে পরিণত হইলে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। কিন্তু জড়ভূতকে দেহাকারে পরিণত করিতে হইলেও কোন কর্তা আবশ্যক হয়, আর আত্মাই সে কর্তা। আমরা অবশ্য বলি, 'আমি স্থূল', 'আমি কৃশ' ইত্যাদি। কিন্তু এরূপ কথা আক্ষরিক অর্থে না বুঝিয়া ঔপচারিক অর্থে বুঝিতে হইবে। আত্মা যখন ভ্রমবশতঃ নিজকে দেহ হইতে অভিন্ন মনে করে, তখনই এই সব বাক্য ব্যবহৃত হয়। তারপর, যদি আত্মা বলিয়া কোন পদার্থই না থাকে, তবে 'দেহে আত্মা নাই' একথা নিরর্থক হয়। কোন দ্রব্য কোন স্থানে নাই একথা বলিলে, ইহা কোনভাবে অন্যত্র আছে স্বীকার করিতে হয়। শেষ কথা, 'আমার আত্মা নাই' অর্থাৎ 'আমি নাই' এই কথা, 'আমার মাতা বন্ধ্যা' বা 'সর্বপ্রকাশক সবিতা নাই' এসব কথার মত প্রলাপবাক্যমাত্র।

(২) অজীব দ্রব্যসমূহ

যে ভৌতিক জগতে জীবসকল অবস্থান করে, তাহা জীবদিগের জড়দেহসমুদায় এবং অন্যান্য জড়দ্রব্যদ্বারা গঠিত। কিন্তু এসব জড়দ্রব্য ব্যতীত জগতে আকাশ, কাল এবং গতি ও স্থিতির কারণরূপে ধর্ম ও অধর্মরূপ অজীব দ্রব্যসমূহ স্বীকার করিতে হয়। নতুবা বিশ্বব্যাপারের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। এখন এই দ্রব্যগুলির পরিচয় দেওয়া যাইবে।

অজীব দ্রব্য পাঁচপ্রকার—পুদ্গল, আকাশ, কাল, ধর্ম ও অধর্ম।

CENTRAL LIBRARY

(ক) জড় বা পুদ্গল (Matter)

জৈনদর্শনে জড়কে পুদ্গল বলে। ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে পদার্থ সংযোগ ও বিভাগযোগ্য (পূরয়ন্তি গলন্তি চ) তাহার নাম পুদ্গল। ক্ষুদ্র জড়দ্রব্যসকলের সংযোগে বৃহৎ দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং কোন জড়দ্রব্যকে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়বে বিভাগ করা যায়। জড়দ্রব্যকে বিভাগ করিতে করিতে যে সব ক্ষুদ্রতম ও অবিভাজ্য কণা পাওয়া যায়, তাহার নাম অণু (atom)। অণু-সংযোগদ্বারা যে জড়দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, তাহাকে সংঘাত বা স্কন্ধ বলে। আমাদের দেহ এবং প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ অণুসকলের সংঘাত। মন, বাক্, প্রাণ ও শ্বাস-প্রশ্বাস জড়ের কার্য। জড়দ্রব্যের গুণ চারিপ্রকার—স্পর্শ, রস, গন্ধ ও বর্ণ। জড় পরমাণুরও এই চারিপ্রকার গুণ আছে। জৈনমতে শব্দ জড়ের মৌলিক গুণ নহে। ইহা আলোক, তাপ, ছায়া, সংযোগ, বিয়োগ ইত্যাদির ন্যায় জড়ের পরভাবী কার্য।

পুদ্গল সংযোগ ও বিভাগ-যোগ্য দ্রব্য।

(খ) আকাশ (Space)

আকাশ সকল প্রদেশবৎ দ্রব্যের (extended substances) অবস্থিতির উপকারক। জীব, পুদ্গল, ধর্ম ও অধর্ম সবই আকাশে অবস্থিত। আকাশ প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্য নয়। ইহা অনুমানগম্য। অনুমানের প্রণালী এইরূপ : প্রদেশবৎ দ্রব্য কোন দেশে থাকিবে, দেশ (Space) ব্যতীত দৈশিক বিস্তার (extension) সম্ভব নয়। অতএব দেশ বা আকাশ স্বীকার্য। আকাশ বা দেশ যদিও প্রদেশবৎ দ্রব্যের বিস্তৃতি (extension) উৎপন্ন করে না, তথাপি দেশ বা আকাশ ব্যতীত প্রদেশবৎ দ্রব্য থাকিতে পারে না। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আকাশ (space) দৈশিক বিস্তারমাত্র (extension) নয়, পরন্তু ইহা দৈশিক বিস্তারের উপকারক, ইহা ব্যতীত দৈশিক বিস্তার সম্ভব নয়। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক ডেকার্টের মতে আকাশ দৈশিক বিস্তারমাত্র। জন্ লকের মতে আকাশ দৈশিক বিস্তারের অধিকরণ বা অধিষ্ঠান, ইহা দৈশিক বিস্তারমাত্র নয়। আকাশ সম্বন্ধে জৈনমত লকের মতের অনুরূপ।

আকাশ দৈশিক বিস্তারের অধিষ্ঠান।

জৈনমতে আকাশ দুইপ্রকার—লোকাকাশ ও অলোকাকাশ। যে আকাশে আমরা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত তাহার নাম লোকাকাশ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া যে মহাশূন্য অবস্থিত, তাহার নাম অলোকাকাশ।

CENTRAL LIBRARY

(গ) কাল (Time)

কাল বর্তনা-পরিণামাদির অপেক্ষিত কারণ।

যে দ্রব্যদ্বারা অন্য বস্তুসকলের বর্তনা অর্থাৎ অনুবৃত্তিত্ব (continuity), পরিণাম (modification), ক্রিয়া (movement), পরত্ব (newness) ও অপরত্ব (oldness) সম্ভব হয়, তাহার নাম কাল। আকাশের ন্যায় কালেরও প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা অনুমানগম্য। উল্লিখিত ধর্মগুলি হইতে কালের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। যদিও কাল এসব ধর্ম উৎপন্ন করে না, তথাপি কাল না থাকিলে ইহাদের উৎপত্তি হইতে পারে না। কোন দ্রব্য অল্প বা দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। একই দ্রব্য যে অল্প বা দীর্ঘ কাল থাকে (continue to exist), তাহা কালেই সম্ভব হয়। কোন দ্রব্যের কিছুকাল থাকার অর্থ হইতেছে কালের বিভিন্ন ক্ষণে বর্তমান থাকা। অতএব দ্রব্যের বর্তনা বা অনুবৃত্তিত্ব কালসাপেক্ষ। সেইরূপ দ্রব্যের পরিণাম বা অবস্থান্তর কালেই সম্ভব হয়। একটি কাঁচা আম যে পাকে, তাহা বিভিন্নকালেই সম্ভব হয়। দ্রব্যের ক্রিয়া এবং পরত্ব ও অপরত্ব সম্বন্ধও কালে সম্ভব হয়। অতএব এইসব হেতুদ্বারা কালের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়।

জৈনমতে কাল অস্তিকায় নহে। তাহার কারণ এই যে, কাল এক ও অবিভাজ্য দ্রব্য। জগতে সর্বত্র এক কাল বিদ্যমান এবং কাল কোন দেশ ব্যাপিয়া থাকে না। কিন্তু জৈনগ্রন্থকারগণ পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ভেদে দুইপ্রকার কালের কথা বলিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে, পরমার্থতঃ অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে কাল একই, তবে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আমরা অনেক প্রকার কালের কথা বলি। বর্তনা (continuity or duration) পারমার্থিক কালের লক্ষণ, পরিণামাদি ব্যবহারিক কালের লক্ষণ। ব্যবহারিক কালকে সময় বলে এবং ইহাই ক্ষণ, দণ্ড, দিন প্রভৃতিতে বিভক্ত হয়। পারমার্থিক কাল নিত্য ও নিরাকার। পারমার্থিক কালে ব্যবহারিক ভেদ-বিভেদ আরোপ করিলে ব্যবহারিক কালের উৎপত্তি হয়।

কোন কোন জৈন আচার্য কালকে পৃথক্ দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা ইহাকে অন্য দ্রব্যগুলির পর্যায়রূপে গণ্য করেন।

(ঘ) ধর্ম ও অধর্ম

ধর্ম ও অধর্ম গতি ও স্থিতির উপকারক।

জৈনদর্শনে ধর্ম ও অধর্ম শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ধর্ম ও অধর্ম বলিতে সাধারণতঃ পুণ্য ও পাপকর্ম-জনিত শুভ ও অশুভ সংস্কার বুঝায়। কিন্তু জৈনদর্শনে ধর্ম ও অধর্ম যথাক্রমে গতি (motion) ও স্থিতির (rest) উপকারক অর্থাৎ অনুকূল দ্রব্য (condition) বুঝায়।

CENTRAL LIBRARY

ধর্ম ও অধর্ম প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্য নয়, ইহারা অনুমানগম্য। যেমন নদীতে কোন মৎস্যের গতি জলদ্বারা উৎপন্ন না হইলেও জলের মধ্যেই সম্ভব হয়, সেইরূপ জীব ও জড়দ্রব্যের গতিক্রিয়া (movement) তাহাদের কৃতকর্ম হইলেও সহকারী কারণরূপে ধর্মনামক দ্রব্যের অপেক্ষা করে। এরূপ সহকারী কারণের আনুকূল্য ব্যতীত তাহাদের গতি সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে, অধর্ম সকল দ্রব্যের স্থিতির সহকারী কারণ। যেমন বৃক্ষচ্ছায়ায় পথিক বিশ্রাম করিতে পারে অথবা পৃথিবীবক্ষে সকল বস্তু সুস্থিত হইতে পারে, সেইরূপ অধর্ম সহায়ে সকল বস্তু স্থিতিলাভ করিতে পারে। ধর্ম ও অধর্ম গতি ও স্থিতির উদাসীনকারণ বা অপেক্ষাকারণ (passive condition), অর্থাৎ ইহারা গতি ও স্থিতি উৎপন্ন করে না, কিন্তু গতি ও স্থিতির আনুকূল্য করে এবং ইহাদিগকে সম্ভবপর করে। ইহারা নিত্য, নিরাকার ও অচল দ্রব্য এবং লোকাকাশে পরিব্যাপ্ত।

৬। জৈন নীতিশাস্ত্র

জৈনদর্শনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ অঙ্গ হইল ইহার উপদিষ্ট নীতিশাস্ত্র। বস্তুতঃ জৈনদর্শনে সম্যক্-চারিত্র লাভের সহায়করূপেই তত্ত্ববিদ্যা ও প্রমা-বিজ্ঞানের আলোচনা করা হইয়াছে। সম্যক্-চারিত্রের লক্ষ্য হইল মোক্ষলাভ। মোক্ষ বলিতে একদিকে বন্ধন-মুক্তি এবং অপরদিকে চরম উৎকর্ষ বুঝায়।

(১) আত্মার বন্ধন বা বন্ধ

সাধারণভাবে বন্ধন বলিতে জীবের পুনর্জন্ম ও তজ্জন্য দুঃখভোগ বুঝায়। জৈনমতে জীব চেতনালক্ষণ দ্রব্য—অর্থাৎ আত্মা। ইহা স্বভাবতঃ পূর্ণৈশ্বর্যবান্ এবং অনন্ত জ্ঞান, দর্শন, শক্তি ও আনন্দের আধার। বাধাপ্রাপ্ত হইয়া এগুলি অপ্রকাশিত আছে। সূর্য যেমন মেঘমুক্ত হইলে স্বীয় আলোকে নিখিল বিশ্ব আলোকিত করে, সেইরূপ আত্মা বাধামুক্ত হইলে স্বভাবগত সর্বজ্ঞতাদি ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারে। এখন প্রশ্ন হইতেছে—কি এমন বাধা যাহা আত্মার স্বাভাবিক ঐশ্বর্য হরণ করে? জৈনমতে জীব তাহার পূর্বজন্মার্জিত কর্মের ফলে ইহজন্মে কর্মোপযোগী দেহ ধারন করে। পূর্বজন্মের কর্মের ফলে তাহার মধ্যে রাগ-দ্বেষাদি-ভাব (passions) জন্মে এবং তাহাদের তৃপ্তির জন্য জীবাত্মা উপযোগী পুদ্গল-পরমাণু সংগ্রহ করিয়া দেহ গঠন করে। এসব পুদ্গল-পরমাণু মূলে কর্মজন্য বলিয়া

আত্মা স্বভাবতঃ পূর্ণৈশ্বর্যবান্।

কর্মবশে ইহা পুদ্গলাবৃত ও বদ্ধ হয়।

CENTRAL LIBRARY

ইহাদিগকে কর্ম-পুদ্গল বা শুধু কর্মও বলে। জীবাত্মা দেহে পরিব্যাপ্ত থাকায় তাহার উপর পুদ্গল-পরমাণুর লেপ পড়ে। যেসব রাগদ্বেষাদি-ভাব জীবাত্মায় পুদ্গল-পরমাণু লিপ্ত করে তাহাদিগকে কষায় বলে। কষায় চারি-প্রকার—ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ। কষায়যুক্ত জীব যখন পুদ্গল-পরমাণু-দ্বারা আবৃত হয়, তখন তাহার বন্ধন ঘটে এবং তাহার অনন্ত জ্ঞান, দর্শন, শক্তি ও আনন্দ বাধাপ্রাপ্ত হয়। আত্মার রাগ-দ্বেষাদি ভাবই তাহার বন্ধনের আভ্যন্তর ও প্রাথমিক কারণ, তাহার ফলে আত্মায় পুদ্গলের অনুপ্রবেশ হয়।

ভাববন্ধ ও দ্রব্যবন্ধ।

আত্মায় পুদ্গল বা কর্ম-পুদ্গলের অনুপ্রবেশকে আস্রব বলে। এজন্য জৈন গ্রন্থকারেরা দুইপ্রকার বন্ধনের কথা বলিয়াছেন। তাঁহারা রাগ-দ্বেষাদিদ্বারা আত্মার বন্ধনকে ভাববন্ধ এবং পুদ্গলদ্বারা আত্মার বন্ধনকে দ্রব্যবন্ধ বলেন।

(২) মুক্তি বা মোক্ষ

আত্মা হইতে পুদ্গলের অপগমে মোক্ষ হয়।

যেহেতু পুদ্গলাবরণ আত্মার বন্ধনের কারণ, আত্মা সম্পূর্ণরূপে পুদ্গল-মুক্ত হইলে তাহার মোক্ষ হয়। এজন্য একদিকে নূতন পুদ্গলের অনুপ্রবেশ বন্ধ করিতে হইবে এবং অন্যদিকে পূর্বসঞ্চিত পুদ্গলের অপগম করিতে হইবে। প্রথম ক্রিয়াকে সংবর বলে এবং দ্বিতীয়টিকে নির্জরা বলে।

পূর্বে বলিয়াছি যে, রাগ-দ্বেষ-বাসনা হইতেই আত্মা পুদ্গলসংযুক্ত হয়। রাগ-দ্বেষ ও বাসনার মূল কারণ হইল মিথ্যাদর্শন বা মিথ্যাজ্ঞান। আত্মা ও অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ আমাদের ক্রোধ, মান, মোহ ও লোভ হয়। একমাত্র যথার্থ জ্ঞানেই অজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। এজন্য জৈনেরা সম্যগ্-জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে জৈন তীর্থঙ্করদের উপদেশ যত্নসহকারে শিক্ষা করিতে হইবে। তীর্থঙ্করেরা মুক্ত ও সর্বজ্ঞ পুরুষ। কেবল তাঁহারাই বদ্ধ জীবকে মুক্তির পথ দেখাইতে পারেন। কিন্তু জৈন তীর্থঙ্করদের প্রতি

সম্যগ্-জ্ঞান-দর্শন-চারিত্র মোক্ষমার্গ।

শ্রদ্ধাবান্ না হইলে, কেহ তাঁহাদের উপদেশ শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন না। অতএব সম্যগ্-জ্ঞানের মূল হইল সম্যগ্-দর্শন অর্থাৎ সম্যক্ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। এজন্য মুক্তির জন্য সম্যগ্-জ্ঞানের ন্যায় সম্যগ্-দর্শনের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু কেবল জ্ঞান বা শ্রদ্ধাদ্বারা মুক্তি হয় না। যে জ্ঞান বা শ্রদ্ধা আমাদের জীবন ও চরিত্রকে প্রভাবিত ও পবিত্র করে না, তাহা নিষ্ফল

ও নিরর্থক। এজন্য জৈনেরা সম্যক্-চারিত্রকে মোক্ষলাভের অত্যাবশ্যক তৃতীয় সহায়রূপে স্বীকার করিয়াছেন। সম্যক্-চারিত্রের অঙ্গ হইল ইন্দ্রিয়-সংযম, রাগ-দ্বেষ-সংযম, বাক্-সংযম, প্রবৃত্তি-সংযম ও চিন্তা-সংযম। ইহাদ্বারাই পূর্ব-কর্মের অর্থাৎ কর্ম-পুদ্গলের ক্ষয় হয় এবং নূতন কর্ম-পুদ্গলের উৎপত্তি নিরুদ্ধ হয়। সম্যক্-চারিত্রের অঙ্গরূপে কোন কোন জৈন গ্রন্থকার পঞ্চ মহাব্রতের নির্দেশ করিয়াছেন। এই পঞ্চ মহাব্রত হইল—(ক) অহিংসা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে কোন জীব হিংসা না করা। (খ) সত্য বা সূনৃত অর্থাৎ যাহা সত্য ও হিত কেবল তাহাই বলা, অহিতকর সত্য এবং অনাবশ্যক সত্য কথা না বলা। (গ) অস্তেয় অর্থাৎ চৌর্যবৃত্তির নিবৃত্তি। (ঘ) ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে ইন্দ্রিয়সুখলিপ্সা ত্যাগ করা। (ঙ) অপরিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ।

জৈন নীতিশাস্ত্রে সম্যগ্-দর্শন, সম্যগ্-জ্ঞান ও সম্যক্-চারিত্র ত্রিরত্ন বলিয়া পরিচিত, এই তিনটি গুণ তিনটি রত্নের মত জীবের সাধু জীবনের শোভা বর্দ্ধন করে। তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র নামক জৈনদর্শনের একটি মূল গ্রন্থের প্রথম সূত্রেই বলা হইয়াছে যে সম্যগ্-দর্শন, সম্যগ্-জ্ঞান ও সম্যক্-চারিত্র মোক্ষমার্গ। এই পথেই বদ্ধ জীবের বন্ধনমুক্তি হয় এবং তাহার স্বভাবগত অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত আনন্দ (অনন্ত চতুষ্টয়) অবাধে প্রকাশিত হয়। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, মোক্ষ সম্যগ্-দর্শন, জ্ঞান ও চারিত্রের মিলিত ফল। ইহাদের সমন্বয়েই মোক্ষলাভ হয়, কোন একটিদ্বারা হয় না।

৭। জৈনধর্মে নিরীশ্বরবাদ

বৌদ্ধধর্মের ন্যায় জৈনধর্মও নিরীশ্বরবাদী। ইহাতে যেসব যুক্তিদ্বারা নিরীশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে তাহার প্রধানগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই।

(১) ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, ইহা অনুমানগম্য বলা হয়। কিন্তু কোন অনুমানদ্বারা ঈশ্বর প্রমাণিত হন না। নৈয়ায়িকগণ যে অনুমানদ্বারা ঈশ্বরের প্রমাণ করেন তাহা এইরূপ: পৃথিবী কার্য, যেহেতু ইহা সাবয়ব অর্থাৎ অবয়ব-সংযোগে গঠিত, যেমন ঘটাদি। ঘটাদি কার্যের যেমন কর্তা আছে, সেইরূপ পৃথিবীর কর্তা আছেন এবং তিনিই ঈশ্বর। কিন্তু এ অনুমান যথার্থ বা যুক্তিসিদ্ধ নয়, কারণ পৃথিবী যে কার্য তাহার প্রমান নাই। অবয়ব থাকিলেই যে কার্য হইবে এমন নিয়ম নাই। আকাশের অবয়ব আছে, কিন্তু ন্যায়মতে আকাশ কার্য নহে, ইহা নিত্য দ্রব্য।

CENTRAL LIBRARY

(২) যেখানে কোন কার্য উৎপন্ন হয়, সেখানেই দেখা যায় যে, কোন কর্তা তাঁহার দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনাদ্বারা কার্য উৎপন্ন করেন। কিন্তু ঈশ্বরের যখন শরীর নাই তখন তিনি কিরূপে কার্য করিবেন?

(৩) ঈশ্বরে যেসব গুণ আরোপ করা হয় সেগুলি প্রমাণিত হয় না। যেমন ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান্ বলা হয়। যদি তাহাই হয় তবে বলিতে হয় যে, তিনিই সকল কার্যের কারণ। কিন্তু একথা ঠিক নয়, যেহেতু আমরা নিত্য দেখি যে ঘটপটাদি নির্মাণরূপ অনেক কার্য তিনি করেন না। তারপর, বলা হয় যে ঈশ্বর এক, অনেক নহেন, কারণ বহু ঈশ্বর হইলে তাঁহাদের মতভেদ হইবেই এবং তজ্জন্য জগতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। কিন্তু একথা ঠিক নয়, যেহেতু গৃহাদি নির্মাণে বহু কর্তা মিলিতভাবে কার্য করে। অতএব ঈশ্বর যে এক তাহা জগতের শৃঙ্খলাদ্বারা প্রমাণিত হয় না। তারপর, ঈশ্বরকে নিত্যমুক্ত বলা হয়। কিন্তু নিত্যমুক্ত শব্দ নিরর্থক। মুক্তির অর্থ হইতেছে বন্ধন হইতে মুক্তি। অতএব মুক্তির পূর্বে বন্ধন-অবস্থা স্বীকার করিতে হয় এবং ঈশ্বর যে নিত্যমুক্ত পুরুষ তাহা স্বীকার করা যায় না।

মুক্ত সিদ্ধ-পুরুষদের ধ্যানোপাসনা কর্তব্য।

জৈনেরা জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর অস্বীকার করিলেও, মুক্ত সিদ্ধ-পুরুষের ধ্যান ও পূজার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। মুক্ত সিদ্ধ-পুরুষেরা ঈশ্বরস্থানীয় এবং তাঁহাদের পূজারাধনাদ্বারা তাঁহারা জীবনে পবিত্রতা ও অনুপ্রাণনা লাভ করেন। পঞ্চ-পরমেষ্ঠির (অর্হৎ, সিদ্ধ, আচার্য, উপাধ্যায় ও সাধু এই পঞ্চ পবিত্র পুরুষ) উপাসনা ধর্মনিষ্ঠ জৈনের নিত্যকর্মরূপে পরিগণিত। মুক্ত এবং ধর্মপথে অগ্রগামী পুরুষদের পবিত্র চরিত্র ধ্যান করিয়া জৈনেরা মুক্তির কঠিন ও দুর্গমপথে অগ্রসর হন এবং মুক্তিলাভ করা যে সম্ভব সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু জৈনেরা কোন অনুগ্রহ বা কৃপাপ্রার্থী হইয়া সিদ্ধ-পুরুষদের পূজা করেন না। তাঁহাদের

জীব তাঁহাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা না করিয়া নিজ কর্মদ্বারা মুক্তি অর্জন করিবে।

দৃঢ় বিশ্বাস যে, কর্মানুসারেই সকল জীবের শুভাশুভ ফলভোগ হয় এবং কেহ এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারেন না। পূর্ব কুকর্মের অশুভ ফল কেবল শুভকর্মের দ্বারাই প্রতিরোধ করা যায়। প্রত্যেক জীবকেই তাহার নিজ কর্মদ্বারা মুক্তি সাধন করিতে হইবে। সিদ্ধ-পুরুষেরা জীবকে মুক্তিপথে কেবল আলোক প্রদর্শন করেন। জৈনধর্ম বীরের ধর্ম, স্বাবলম্বী সাধকের ধর্ম। এজন্যই জৈনেরা মুক্তপুরুষকে জিন অর্থাৎ জয়ী এবং বীর বলেন। এবিষয়ে জৈনধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের এবং সাংখ্য ও অদ্বৈত-বেদান্তের মিল দেখা যায়।

CENTRAL LIBRARY

চতুর্থ অধ্যায়

বৌদ্ধদর্শন

১। ভূমিকা

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের বাল্য নাম সিদ্ধার্থ। খ্রীষ্টপূর্ব ছয় শতকে বিহারের উত্তর প্রদেশস্থ কপিলাবস্তু নগরে তিনি এক রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। রাজপ্রাসাদে রাজৈশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হইলেও তাঁহার মন বাল্যকাল হইতেই চিন্তাশীল ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন ছিল। ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু দর্শনে তিনি এ সংসার দুঃখময় বলিয়া উপলব্ধি করেন। অপরন্তু সন্ন্যাসীর শান্তিপূর্ণ জীবনদৃষ্টে তিনি বুঝিলেন যে, দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় আছে। অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাসী হইলেন এবং দুঃখের মূলকারণ ও আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কঠোর তপস্যা করিয়া এবং বহু বিদ্বান্ সাধুজনের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি বহুকাল অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। অবশেষে সংসারের সকল ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া এবং দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া তিনি শান্ত মনে ধ্যান-নিরত হইলেন। দীর্ঘকাল গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া তিনি সত্যের সন্ধান পাইলেন, তাঁহার চিত্ত সত্যের আলোকে সমুদ্ভাসিত হইল এবং তাঁহার নিকট সাংসারিক দুঃখের রহস্য উদ্ঘাটিত হইল। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, তিনি বোধি লাভ করিয়া বুদ্ধ নামে সুপরিচিত হইলেন। তাঁহার বোধির বাণী হইতে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছে। কালে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সুদূর দেশদেশান্তরে প্রচার হইয়াছে, দক্ষিণে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, সায়াম, উত্তরে তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রচারলাভ করিয়াছে।

গৌতম বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

প্রাচীন ধর্মাচার্যগণের ন্যায় বুদ্ধও কথোপকথনছলে উপদেশ দিতেন এবং বহুকাল যাবৎ তাঁহার শিষ্যেরা এইভাবেই সেগুলি লোককে শিক্ষা দিতেন। পরে তাঁহার তিনজন প্রধান প্রিয় শিষ্যের বিবৃতি হইতে পালি ভাষায় এগুলিকে তিনটি পিটকে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রথম পিটকের নাম 'বিনয়পিটক', ইহাতে প্রধানতঃ বৌদ্ধ সংঘের নিয়মাবলী পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টি 'সুত্তপিটক', ইহাতে বুদ্ধের উপদেশ ও কথোপকথন

বুদ্ধের উপদেশের সংগ্রহ-গ্রন্থ ত্রিপিটক।

আছে। তৃতীয়টির নাম 'অভিধম্মপিটক', ইহাতে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা আছে। বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ এবং প্রাচীন বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় ত্রিপিটকে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধধর্মের দুই শাখা—হীনযান ও মহাযান।

কালক্রমে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহারা নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়েন। ধর্মের দিক্ দিয়া বৌদ্ধধর্ম দুইটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়, একটির নাম হীনযান বা থেরবাদ, অপরটির নাম মহাযান। প্রথমটি দক্ষিণ দিকে প্রসারলাভ করে এবং বর্তমানে ইহা সিংহল, সায়াম ও ব্রহ্মদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। হীনযানের বিরাট সাহিত্য পালি ভাষায় রচিত। কেহ কেহ বলেন হীনযানেই বুদ্ধের উপদেশ অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। মহাযান প্রধানতঃ উত্তরে প্রসারলাভ করে। এখন তিব্বত, চীন ও জাপানে বহু মহাযানপন্থী আছে। মহাযানীরা সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম ও দর্শন গ্রন্থ রচনা করেন এবং ইহা হইতে সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধদর্শনের বিপুল সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধধর্ম দেশ বিদেশে প্রসারলাভ করায় এবং বহু শাখা ও প্রশাখায় বিভক্ত হওয়ায় যে বিপুল ধর্ম ও দর্শনবিষয়ক সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তাহা আয়ত্ত করা কোন বহুভাষাবিৎ ও তীক্ষ্মধী ব্যক্তিরও এক জীবনে সম্ভবপর নয়। অতএব এখানে বৌদ্ধদর্শনের যে বিবরণ দেওয়া হইবে তাহা অতি সংক্ষিপ্তই হইবে। এ বিবরণে বুদ্ধের কথানুযায়ী প্রধান উপদেশগুলির, ভারতীয় বৌদ্ধদর্শন-শাখাগুলির প্রধান সিদ্ধান্তের এবং হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের মূল ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ইহার বিরাট সাহিত্য।

২। বুদ্ধের উপদেশাবলী ঃ

চারি আর্য সত্য

(১) বুদ্ধের তত্ত্ববিচারবিরোধী মনোভাব

বুদ্ধ তত্ত্ববিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না।

বুদ্ধ তত্ত্ববিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না, বরং তিনি ইহার বিরোধীই ছিলেন। জগৎ সান্ত বা অনন্ত, নিত্য বা অনিত্য, আত্মা দেহাতিরিক্ত দ্রব্য কি না, মৃত্যুর পরে ইহার অস্তিত্ব থাকে কি না, ইত্যাদি তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন করিলে বুদ্ধ তাহার কোন আলোচনা করিতেন না। এসব বিষয়ে মানুষ তর্কযুক্তি করিয়া কোন সর্বসম্মত স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন না। উপরন্তু মানুষের বাস্তব জীবনে তত্ত্বালোচনার কোন উপযোগিতা নাই। ইহাদ্বারা মানুষের দুঃখ হইতে বিমুক্তি

CENTRAL LIBRARY

লাভ হয় না এবং সে অর্হতের অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। মানুষের দুঃখান্তই সর্বাপেক্ষা এবং সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এ প্রয়োজন সাধন না করিয়া তত্ত্ববিচারে সময় ক্ষেপণ করা, শরবিদ্ধ ব্যক্তির দেহকে শরমুক্ত না করিয়া শরতত্ত্ব বিচার করার মত অত্যন্ত মূর্খতার কার্য।

দুঃখ নিবৃত্তি সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

এজন্য বুদ্ধ বৃথা তত্ত্ববিচার না করিয়া লোককে দুঃখ, দুঃখের হেতু, দুঃখের নিবৃত্তি ও তাহার উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। এই চারি বিষয়ে তাঁহার উপদেশ চারি আর্যসত্য নামে সুপরিচিত। বৌদ্ধদর্শনে এগুলিকে যথাক্রমে দুঃখ, দুঃখ-সমুদায়, দুঃখ-নিরোধ এবং দুঃখ-নিরোধ-মার্গ বলা হয়।

চারি আর্য-সত্য।

(২) প্রথম আর্য-সত্য—দুঃখ

ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু দর্শনে বুদ্ধ প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে জীবন দুঃখময়। তিনি শুধু এইগুলিতেই দুঃখের উপলব্ধি করেন নাই, পরন্তু তীক্ষ্ম দৃষ্টিদ্বারা জীবনের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণসামগ্রীই যে দুঃখজনক তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি সবই দুঃখজনক, শোক তাপ হতাশা নিরাশা সবই দুঃখহেতু, যাহা কিছু কামনা-বাসনা-জাত তাহাই দুঃখপ্রদ। বুদ্ধের ন্যায় অন্যান্য প্রধান ভারতীয় দার্শনিকও জীবন দুঃখময় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য জড়বাদী চার্বাকেরা এ কথায় আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, সংসারে সুখের সামগ্রীও আছে এবং মানুষের জীবনে দুঃখের সঙ্গে সুখভোগও হয়। কিন্তু বুদ্ধ ও অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক বলিবেন, অদূরদর্শী ব্যক্তির নিকটই দুঃখ সুখ বলিয়া প্রতিভাত হয়; সুখ ক্ষণস্থায়ী, তাহার বিরহ দুঃখকর এবং বিরহাশঙ্কা উদ্বেগজনক ইহা বুঝিলে আপাতসুখ দুঃখ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে।

জীবন দুঃখময়।

আপাতসুখ দুঃখের আকর।

(৩) দ্বিতীয় আর্য-সত্য—সমুদায়ঃ দ্বাদশ নিদান

সংসারের সকল বস্তুই কার্যকারণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। বিনা কারণে কোন কার্য হয় না, সকল বস্তুরই কারণ আছে, কারণনিরপেক্ষ কোন বস্তু নাই। বুদ্ধ এরূপ স্বাভাবিক কার্যকারণ-নিয়ম স্বীকার করিতেন এবং ইহাকে তিনি 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' বলিতেন। এই নিয়ম অনুসারেই তিনি দুঃখের উৎপত্তির কারণ নির্ধারণ করিয়াছেন। মানুষের দুঃখভোগের কারণ আছে।

সব বস্তুর ন্যায় দুঃখেরও কারণ আছে।

CENTRAL LIBRARY

জীবনে দুঃখ হইতেছে **জরা-মরণ**। তাহার কারণ হইতেছে **জাতি** বা **জন্ম**। মানুষ যদি এ সংসারে জন্মগ্রহণ না করিত, তবে তাহার কোন দুঃখভোগ হইত না। কিন্তু জন্ম হয় কেন? জন্মেরও কারণ আছে। জন্মের কারণ **ভব** অর্থাৎ জন্মগ্রহণের ইচ্ছা বা জন্মাভিমুখী ভাবনা। এই ভাবনার কারণ হইল **উপাদান** অর্থাৎ সাংসারিক বস্তুর প্রতি আসক্তি। সাংসারিক আসক্তির কারণ হইতেছে তৃষ্ণা অর্থাৎ বিষয়-বাসনা বা ইন্দ্রিয়-বিষয় ভোগের ইচ্ছা। কিন্তু বিষয়-বাসনার কারণ কি? ইহার কারণ বেদনা অর্থাৎ বিষয়সকলের সুখানুভূতিসহ পূর্ব ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ। পূর্বে বিষয়গুলিকে সুখপ্রদ বলিয়া প্রত্যক্ষ না করিলে এখন সেগুলি লাভ করিবার কোন ইচ্ছা আমাদের হইত না। কিন্তু বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের **স্পর্শ** না হইলে কোন প্রত্যক্ষ হইত না, অর্থাৎ বিষয়েন্দ্রিয়-স্পর্শ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের কারণ। কিন্তু ইন্দ্রিয় না থাকিলে স্পর্শ হইত না। অতএব স্পর্শের কারণ **ষড়ায়তন** অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি জীবশরীরেই থাকিতে পারে। অতএব ষড়ায়তনের কারণ **নাম-রূপ** অর্থাৎ দেহ-মন বা জীব-শরীর। কিন্তু প্রাণ ও চেতনাহীন হইলে মাতৃগর্ভে জীব-শরীর গঠিত হইত না। অতএব জীব-শরীরের উৎপত্তির কারণ **বিজ্ঞান** অর্থাৎ যে চেতনা-দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া জীব-শরীর গঠিত হয়। কিন্তু মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণে যে চেতনার আবির্ভাব হয় তাহা পূর্ব জন্মের **সংস্কার**-প্রসূত। এক জন্মের শেষ অবস্থা হইতে পর জন্মের সূত্রপাত হয় এবং এই শেষ অবস্থায় আমাদের সকল পূর্বকর্মের সংস্কার পুঞ্জীভূত থাকে। আর সেসব সংস্কার হইতে পুনর্জন্ম হয় তাহারা **অবিদ্যা**-প্রসূত অর্থাৎ তত্ত্ববিষয়ে অজ্ঞান হইতে জন্মে। তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হইলে মানুষ সংসার অনিত্য ও দুঃখময় বলিয়া উপলব্ধি করে এবং রাগ-দ্বেষের বশীভূত হইয়া পুনর্জন্মের হেতুভূত কোন কর্ম করে না। অতএব অবিদ্যাই পুনর্জন্মের হেতুভূত সংস্কারের মূল কারণ।

জীবনে দুঃখের হেতুভূত কার্যকারণ-শৃঙ্খল।

দুঃখের কার্যকারণ-শৃঙ্খলের দ্বাদশ নিদানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এইরূপ:—(১) জীবনে দুঃখের কারণ (২) জাতি, তাহার কারণ (৩) ভব, তাহার কারণ (৪) উপাদান, তাহার কারণ (৫) তৃষ্ণা, তাহার কারণ (৬) বেদনা, তাহার কারণ (৭) স্পর্শ, তাহার কারণ (৮) ষড়ায়তন, তাহার কারণ (৯) নামরূপ, তাহার কারণ (১০) বিজ্ঞান, তাহার কারণ (১১) সংস্কার, তাহার কারণ (১২) অবিদ্যা। ইহাকে বৌদ্ধধর্মে ভবচক্রও বলে। আজও বৌদ্ধগণ ইহার প্রতীক হিসাবে এবং তাঁহাদের উপাসনার অঙ্গরূপে নিত্য চক্র ঘুরাইয়া থাকেন।

দুঃখের দ্বাদশ নিদান।

CENTRAL LIBRARY

কখন কখন এই দ্বাদশ নিদানকে কার্যকারণ সম্বন্ধানুসারে সন্নিবেশিত করা হয়। ইহাদ্বারা ইহজীবনকে পূর্ব-জীবনের কার্যরূপে এবং ভবিষ্য-জীবনের কারণরূপে দেখান হয়। এইভাবে তিন জীবনের সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য দ্বাদশ নিদানের এরূপ সন্নিবেশ করা হয়।

ইহজীবন পূর্ব-জীবনের কার্য এবং পর-জীবনের কারণ।

(১) অবিদ্যা
(২) সংস্কার } পূর্ব জীবন
(৩) বিজ্ঞান
(৪) নামরূপ
(৫) ষড়ায়তন
(৬) স্পর্শ
(৭) বেদনা } বর্তমান জীবন
(৮) তৃষ্ণা
(৯) উপাদান
(১০) ভব
(১১) জাতি
(১২) জরা-মরণ } ভবিষ্যৎ জীবন

(৪) তৃতীয় আর্য-সত্য—দুঃখ-নিরোধ

দ্বিতীয় আর্য-সত্য ব্যাখ্যা কালে বলা হইয়াছে যে দুঃখের কারণ আছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে দুঃখের নিরোধ হইতে পারে। যে কারণসামগ্রী হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয় তাহার বিনাশ হইলেই দুঃখের নিবৃত্তি হইবে। এখন দুঃখনিবৃত্তির অবস্থা কিরূপ তাহা বলা প্রয়োজন।

দুঃখের কারণ দূর হইলে দুঃখ দূর হয়।

যে অবস্থায় দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় তাহাকে নির্বাণ বলে। এ অবস্থা ইহলোকে এবং ইহজীবনেই লাভ করা যায়। কোন ব্যক্তি পূর্ণ সংযম সহকারে সত্যের অনুক্ষণ ধ্যান করিলে রাগ-দ্বেষ-মোহ-মুক্ত হইয়া প্রজ্ঞালাভ করেন। তাঁহার সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয় এবং তিনি মুক্ত পুরুষ ও অর্হৎপদবাচ্য হন। ইহাই নির্বাণ বা জীবন্মুক্তির অবস্থা।

দুঃখ নিবৃত্তিরূপ নির্বাণ ইহ-জীবনে লভ্য।

CENTRAL LIBRARY

নির্বাণ নৈষ্কর্ম্যের অবস্থা নয়। সাধারণ লোকে মনে করে যে নির্বাণ নৈষ্কর্ম্যের অবস্থা। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। অবশ্য একথা সত্য যে, আর্য-সত্য-চতুষ্টয় সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মনকে বহির্বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া অন্তর্মুখী করিতে হয় এবং শান্ত মনে সত্যের বিচার ও ধ্যান করিতে হয়। কিন্তু এইভাবে একবার প্রজ্ঞালাভ করিতে পারিলে, পরে সর্বদা ধ্যানমগ্ন থাকিতেও হয় না, আর সর্বকর্ম ত্যাগ করিতেও হয় না। বুদ্ধ নিজেই বোধিলাভ করিয়া দীর্ঘকাল কত কর্ম করিয়াছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ, ধর্মপ্রচার ও সঙ্ঘস্থাপন প্রভৃতি কর্মে নিরত ছিলেন। অধিকন্তু তিনি দুইপ্রকার কর্মের কথা বলিয়াছেন, যথা রাগ-দ্বেষ-মোহ-জাত কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম। প্রথমটি বন্ধনের ও পুনর্জন্মের হেতু; দ্বিতীয়টি বন্ধনের বা পুনর্জন্মের কারণ হয় না, যেমন দগ্ধ বীজ বপন করিলে অঙ্কুরোদ্গম হয় না। বুদ্ধের জীবনী ও বাণী হইতে বেশ বুঝা যায় যে, নির্বাণপ্রাপ্ত অর্হৎ সর্বকর্মত্যাগ করিয়া সংসারের সব বিষয়ে উদাসীন থাকেন না। বরং অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও দুঃখতাপতপ্ত জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে অপরিসীম করুণার উদ্রেক হয় এবং তিনি জীবের উদ্ধারের জন্য নিষ্কামভাবে সর্ব কর্ম করেন।

নির্বাণে দুঃখনিবৃত্তি ও জন্ম-নিরোধ হয়, মৃত্যু নয়। যদি ইহাই বুদ্ধের জীবনী ও বাণীর প্রকৃত মর্ম হয় তবে নির্বাণের অবস্থাকে জীবনের নিঃশেষে উচ্ছেদ বা নিধন অবস্থা বলা ঠিক নয়। অনেকে দীপ নির্বাপণের সহিত নির্বাণের তুলনা করিয়া মন্তব্য করেন যে, নির্বাণ বলিতে জীবনের নিঃশেষে বিনাশই বুঝায়। কিন্তু তাহা হইলে বুদ্ধ যে জীবিত অবস্থায় নির্বাণলাভ করিয়াছিলেন সে কথা মিথ্যা হইয়া যায়। তারপর বুদ্ধের উপদেশ অনুসারে নির্বাণে দুঃখনিবৃত্তি ও পুনর্জন্মের নিরোধই হয়, নির্বাণপ্রাপ্ত সিদ্ধপুরুষ যে মৃত্যুর পর একেবারে বিনষ্ট হন তাহা বুঝায় না। মৃত্যুর পর নির্বাণপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষের অবস্থা সম্বন্ধে বুদ্ধ কোন কথা বলিতেন না। তাহার কারণ এই নয় যে, মৃত্যুর পর তাঁহার কোন অস্তিত্ব থাকে না। পরন্তু এ অবস্থার অবর্ণনীয়তাই ইহার কারণ বলা যায়।

নির্বাণের অবস্থা বর্ণনাতীত। প্রকৃতপক্ষে নির্বাণের অবস্থা বর্ণনাতীত। তথাপি আমাদের কতকগুলি উপলব্ধির সহিত তুলনা করিয়া আমরা উহার সম্বন্ধে কিছু আভাস পাইতে পারি। রোগমুক্তি, ঋণমুক্তি, কারাগার-বন্ধন-মুক্তি প্রভৃতি সর্বপ্রকার সাময়িক দুঃখনিবৃত্তির অনুভূতি হইতে নির্বাণের স্বরূপ সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যায়। কিন্তু ইহা যে ঠিক্ কি অবস্থা তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, কেবল অনুভূতিতেই পাওয়া যায়।

(৫) চতুর্থ আর্য-সত্য—দুঃখ-নিরোধ-মার্গ

অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

দুঃখ-নিরোধের জন্য আটটি সাধন আবশ্যক। এজন্য দুঃখ-নিরোধের পথকে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হইয়াছে। ইহাতেই বৌদ্ধ ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের সার কথা পাওয়া যায়। এই সাধনগুলি এইরূপ :—

আর্য-সত্যের সম্যগ্‌জ্ঞান।

(১) সম্যগ্‌দৃষ্টি বা সম্মাদিট্‌ঠি।—অবিদ্যা ও তজ্জন্য মিথ্যাদৃষ্টি অর্থাৎ জীবজগৎ সম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞান সকল দুঃখের মূল কারণ। অতএব দুঃখনিবৃত্তির জন্য সর্বপ্রথমে তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। তত্ত্বজ্ঞান বলিতে চারি আর্য-সত্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান বুঝায়। ইহা আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে বুদ্ধিগত জ্ঞানমাত্র নহে। আর্য-সত্যের সম্যক্‌ অনুভূতিরূপ জ্ঞানই মুক্তিসাধক ও নির্বাণপ্রাপক। এরূপ সম্যগ্‌-জ্ঞানকে সম্যগ্‌দৃষ্টি বলে।

জ্ঞানের আলোকে চরিত্র গঠনের সঙ্কল্প।

(২) সম্যক্‌ সঙ্কল্প বা সম্মাসঙ্কপ্প।—সত্যের জ্ঞান অনুসারে জীবনে চলা এবং চরিত্র গঠন করা উচিত। নতুবা জ্ঞানের কোন উপযোগিতা বা সার্থকতা থাকে না। এজন্য সাধককে সম্যগ্‌দৃষ্টির সঙ্গে সম্যক্‌ সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হয়। তিনি বিষয়াসক্তি পরিহার করিবেন, হিংসা ও দ্বেষ ত্যাগ করিবেন। এজন্য সঙ্কল্পই সম্যক্‌ সঙ্কল্প।

বাক্‌সংযম।

(৩) সম্যক্‌বাক বা সম্মাবাচা।—সাধু সঙ্কল্পই শেষ কথা নয়। সঙ্কল্প অনুসারে কাজ করিতে হইবে। এজন্য প্রথমে বাক্‌সংযম আবশ্যক। মিথ্যা কথা, পরনিন্দা, অপ্রিয় ভাষণ ও অনর্থক বাক্যালাপ পরিত্যাগ বাক্‌সংযমের লক্ষণ।

সাধু চরিত্র।

(৪) সম্যক্‌কর্মান্ত বা সম্মাকম্মান্ত।—কেবল বাক্‌সংযম করিলেই সব সঙ্কল্প সিদ্ধি হয় না। এজন্য সাধু কর্ম ও সাধু চরিত্র গঠন করিতে হইবে। অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, সত্য ও মাদকবর্জন এই পঞ্চশীল সম্যক্‌কর্মান্তের অন্তর্গত।

সদুপায়ে জীবন যাত্রা।

(৫) সম্যগাজীব বা সম্মা-আজীব।—অসাধু বাক্য ও অসাধু কর্ম ত্যাগ করিয়া সদুপায়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা উচিত। এমন কি, প্রাণ রক্ষার জন্যও অসদুপায় অবলম্বন করা উচিত নয়। এই জন্যই সম্যগাজীবের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

(৬) সম্যগ্‌ব্যায়াম বা সম্মাবায়াম।—পূর্বোক্ত সাধনসমূহ অনুষ্ঠান করিয়া ধর্মপথে কতকটা অগ্রসর হওয়া যায়। কিন্তু তখনও পতনের আশংকা থাকে। এজন্য সাধককে সব সময় সতর্ক থাকিতে হয়। দৃঢ়মূল পুরান কুচিন্তাগুলি দূর করিতে হইবে, অন্য নূতন কুচিন্তা মনে স্থান না পায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে মনে সচ্চিন্তার উদয় ও স্থিতি হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এসব প্রচেষ্টাকে সম্যগ্‌ব্যায়াম বলে। এ বিষয়ে অমনোযোগী হইলে উচ্চ সাধকেরও পতন হইতে পারে।

অসচ্চিন্তা ত্যাগ করিয়া সচ্চিন্তাদ্বারা সাধন পথে অগ্রগমন।

(৭) সম্যক্‌স্মৃতি বা সম্মাসতি।—অসচ্চিন্তা পরিহার ও সচ্চিন্তা পোষণের সংগে সংগে সাধক নিজ এবং অপর বস্তু সম্বন্ধে তত্ত্বকথাগুলি সর্বদা স্মরণ করিবেন। তিনি নিজেকে দেহ মন ইন্দ্রিয় বলিয়া ভাবিবেন না, দেহকে দেহ বলিয়াই, মনকে মন বলিয়াই জানিবেন, 'আমি দেহ বা আমি মন' এরূপ ভাবনা করিবেন না। অনেকে মনে করিবেন, বুদ্ধের এরূপ উপদেশের কোন সার্থকতা নাই, ইহাত অতি সাধারণ কথা, সকলেই জানে। কিন্তু এগুলি সাধারণ কথা হইলেও সব সময় আমাদের মনে থাকে না এবং কার্যক্ষেত্রে আমরা সে সব ভুলিয়া যাই। দীর্ঘকালের সংস্কারবশতঃ আমরা দেহ মন প্রভৃতিকে নিত্য ও অত্যধিক মূল্যবান্‌ বলিয়া ভাবি এবং জাগতিক বস্তুকে স্থায়ী সম্পদ্‌রূপে গণ্য করি। ফলে এসব বিষয়ে আমাদের অত্যধিক আসক্তি হয় এবং আমরা তাহাদের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরিণামে দুঃখভোগ করি। এজনাই এসব বিষয়ে তত্ত্বকথার সর্বদা স্মরণ-মনন আবশ্যক।

সতত তত্ত্বকথা স্মরণ

(৮) সম্যক্‌সমাধি বা সম্মাসমাধি।—পূর্বোক্ত সাতটি সাধন অনুষ্ঠান-দ্বারা রাগ-দ্বেষ ও অশুভ ভাবনা মুক্ত হইয়া সাধক ধ্যান অভ্যাস করিবেন। ধ্যানের চারিটি স্তর আছে। একটির পর আর একটি করিয়া ধ্যানের গভীরতর স্তর হইতে গভীরতম স্তরে প্রবেশ করিলে সাধক তাঁহার অভীষ্ট নির্বাণ-মুক্তি লাভ করিয়া সুখদুঃখের অতীত হইবেন। প্রথমে তিনি স্থির ও শান্ত মনে তত্ত্বার্থবিষয়ে বিতর্ক ও বিচার করিবেন। ইহা ধ্যানের প্রথম স্তর। ইহাতে সাধক অনাসক্তি ও শুদ্ধ ভাবনাজন্য আনন্দ অনুভব করেন।

ধ্যান ও সমাধি।

ইহার প্রথম স্তর।

প্রাথমিক ধ্যানসিদ্ধ সাধক ধ্যানের দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করিবেন। প্রথম স্তরের ধ্যানের ফলে আর্য-সত্য-চতুষ্টয় সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় হওয়ায় আর বিতর্ক ও বিচারের আবশ্যকতা থাকে না। এ অবস্থায় সাধক নিশ্চিন্ত চিত্তে গভীর ধ্যাননিরত

দ্বিতীয় স্তর।

হইতে পারেন। ইহা ধ্যানের দ্বিতীয় স্তর। এখানেও অবাধিত ও প্রগাঢ় ধ্যানজন্য একরূপে প্রশান্তি ও আনন্দানুভূতি থাকে।

ধ্যানের পরবর্তী স্তরে সাধক উপেক্ষাভাবাপন্ন হইবার চেষ্টা করেন এবং পূর্বানুভূত ধ্যানানন্দও অতিক্রম করেন। ফলে তিনি ধ্যানের গভীরতর স্তরে প্রবেশ করিয়া পূর্ণ প্রশান্তি অনুভব করেন, যদিচ তখনও তাঁহার একটা দৈহিক আনন্দানুভূতি থাকে।

তৃতীয় স্তর।

ধ্যানের চতুর্থ ও শেষ স্তরে দৈহিক আনন্দানুভূতিরও নিরোধ হয় এবং পূর্বানুভূত সর্বপ্রকার সুখানুভূতির বিলোপ হয়। এই অবস্থা পূর্ণ শান্তি ও সমতার অবস্থা, সুখদুঃখের অতীত অবস্থা। ইহাই নির্বাণের অবস্থা, অর্হতের অবস্থা, পূর্ণ প্রজ্ঞা ও শীলসম্পন্নের অবস্থা।

চতুর্থ স্তর—নির্বাণমুক্তি।

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রধান তিনটি অঙ্গ হইল—শীল বা সাধু চরিত্র, ধ্যান বা সমাধি এবং প্রজ্ঞা বা তত্ত্বজ্ঞান। এই তিনটির মিলন বা সমন্বয়ই দুঃখ-নিরোধ-মার্গের সারকথা। জ্ঞানের সঙ্গে চরিত্রের মিলন আবশ্যক, ইহারা পরস্পরসাপেক্ষ। জ্ঞানের আলোকে চরিত্র গঠিত হয়, চরিত্রের নির্মলতায় জ্ঞানালোক সমুদ্ভাসিত হয়। জ্ঞান ও চরিত্রের মিলনেই মানুষের অসাধু মনোবৃত্তি দূর হয়, কাম ক্রোধাদি ষড়্‌রিপু বশীভূত হয় এবং রাগ-দ্বেষ-মোহ-বন্ধন ছিন্ন হয়। এরূপ বিবেক-বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিই শান্ত ও সংযত চিত্তে সত্যের ধ্যান করিতে পারেন। দীর্ঘকাল গভীর ধ্যানের ফলে তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয় এবং তাঁহার নিকট বিশ্বরহস্য চিরকালের জন্য উদ্ঘাটিত হয়। অবিদ্যা ও বিষয়-বাসনার মূলোচ্ছেদ হওয়ায় তাঁহার দুঃখের চির অবসান হয়। তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞা, পূর্ণ শীল এবং পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করেন। ইহাই তাঁহার নির্বাণলাভ, ইহাই তাঁহার আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি।

৩। বুদ্ধের নৈতিক উপদেশের অন্তর্নিহিত দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহ

বুদ্ধ ধর্ম ও নীতিবিষয়ে যে সব উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাতে জীবজগৎ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রত্যয় ও সিদ্ধান্ত নিহিত আছে। ইহাদের কোন কোনটি বুদ্ধ নিজেই বিবৃত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে চারিটি বিষয়ের আলোচনা করিব, যথা—(১) প্রতীত্যসমুৎপাদ, (২) কর্ম-নিয়ম, (৩) পরিবর্তন-নিয়ম এবং (৪) নৈরাত্ম্যবাদ :

(১) প্রতীত্যসমুৎপাদ নিয়ম

জাগতিক সব বস্তু কার্যকারণ নিয়মের অধীন। কারণ বিনা কোন কার্য হয় না। সংসারের সব বস্তুরই কারণ আছে। এ নিয়ম অনুসারে একটি বস্তুর (কারণ-বস্তুর) আবির্ভাব হইলেই আর একটি বস্তুর (কার্য-বস্তুর) আবির্ভাব হয়। সকল বস্তুর অস্তিত্ব কারণ-সামগ্রী-সাপেক্ষ, জগতে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র কোন বস্তু নাই, যাহা কিছু আছে বা ঘটে, সে সকলেরই কারণ আছে। জগতে অকস্মাৎ কিছু ঘটে না, বিনা কারণে কোন বস্তুর উৎপত্তি হয় না। ইহাকেই প্রতীত্য-সমুৎপাদ বা পটিচ্চসমুপ্পাদ নিয়ম বলে। প্রতীত্যসমুৎপাদ শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতেছে, ইহাকে পাইয়া (প্রতীত্য) অর্থাৎ ইহার জন্য ইহার উৎপত্তি (সমুৎপাদ) হয়, অর্থাৎ দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি হয়। বুদ্ধ এই মতকে শাশ্বতবাদ ও উচ্ছেদবাদ দুই অন্ত্য মতের মধ্যবর্তী বলিয়াছেন। শাশ্বতবাদমতে নিত্য, সর্বকারণনিরপেক্ষ কোন তত্ত্ব আছে, উচ্ছেদবাদমতে যে-কোন বিদ্যমান বস্তু নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। বুদ্ধের মতে কারণ-নিরপেক্ষ কোন শাশ্বত বস্তু নাই, সব বস্তুই কারণজন্য; এবং কোন বস্তুর নিঃশেষে বিনাশ হয় না, তজ্জন্য কার্যরূপে উহা বিদ্যমান থাকে। এজন্য বুদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদকে মধ্যমপথ বলিয়াছেন।

প্রতীত্যসমুৎপাদ অনুসারে সব বস্তুরই কারণ আছে।

বিনা কারণে কিছু হয় না এবং কোন বস্তুই একেবারে ধ্বংস হয় না।

বুদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদ সিদ্ধান্তের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি ইহাকে 'ধম্ম' নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং তাঁহার উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করিতেন। 'ধম্ম' সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ এইরূপ : 'ইহা হইলে উহা হয়, ইহার আবির্ভাব হইতে উহার উৎপত্তি হয়, ইহা না থাকিলে উহা হয় না, ইহার তিরোভাব হইলে উহার তিরোভাব ঘটে।' 'যিনি পটিচ্চসমুপ্পাদ জানেন তিনি ধম্ম জানেন, যিনি ধম্ম জানেন তিনি পটিচ্চসমুপ্পাদ জানেন।' প্রতীত্যসমুৎপাদ বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সারা সংসার দর্শন করিতে পারেন। এ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবেই আমরা সকল দুঃখ ভোগ করি। বুদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদ নিয়মকে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য করিতেন। এই নিয়ম অনুসারেই তিনি দুঃখের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি উভয় সমস্যারই সমাধান করিয়াছেন। ইহা হইতে তিনি আর কোন্ কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

প্রতীত্যসমুৎপাদ অতি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত।

CENTRAL LIBRARY

(২) কর্ম-কর্মফল নিয়ম

প্রতীত্যসমুৎপাদ সাধারণ কার্য-কারণ-সম্বন্ধ-নিয়ম। কর্ম-কর্মফল নিয়ম ইহারই একটি বিশেষ রূপ। যেমন কার্যকারণ নিয়মানুসারে তেমনি কর্ম-নিয়ম অনুসারেও জীবের বর্তমান দশা তাহার পূর্ব অবস্থার পরিণতি এবং তাহার ভবিষ্যৎ দশা বর্তমান অবস্থার পরিণতি হইবে। প্রতীত্যসমুৎপাদ নিয়মানুসারে দুঃখের উৎপত্তি ব্যাখ্যাকালে ইহা স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। অতএব কর্ম-নিয়ম কার্যকারণ নিয়মেরই একটি বিশেষ দিক্ বা রূপ।

কর্ম-নিয়ম ইহারই একটি বিশেষ রূপ।

(৩) সর্বপরিণামিত্ব ও অনিত্যতাবাদ

প্রতীত্যসমুৎপাদ নিয়ম অনুসারে সকল বস্তুকেই পরিবর্তনশীল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সকল বস্তুই কারণ-সামগ্রীজন্য। অতএব কারণসামগ্রীর পরিবর্তন বা বিলোপ হইলে বস্তুরও পরিবর্তন বা বিনাশ হইবে। বুদ্ধ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, 'সব বস্তুই পরিবর্তনশীল ও ধ্বংসশীল। যাহার আদি আছে তাহার অন্তও আছে, যাহার জন্ম আছে তাহার মৃত্যুও আছে, যেখানে মিলন আছে সেখানেই বিরহ আছে, আপাতদৃষ্টিতে যাহা চিরস্থায়ী মনে হয় সে বস্তুরও বিনাশ হইবে।'

সব বস্তুই কারণজন্য ও অনিত্য।

বুদ্ধের পরবর্তী দার্শনিকগণ অনিত্যতাবাদকে ক্ষণিকবাদে পর্যবসিত করিয়াছেন। ক্ষণিকবাদ অনুসারে সকল বস্তুই কেবল অনিত্য বা অল্পকালস্থায়ীই নয়, পরন্তু ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ একক্ষণমাত্র স্থায়ী। যে কোন বস্তু এক্ষণে জন্মলাভ করিয়া পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়। ক্ষণিকবাদ স্থাপন করিবার জন্য বহু যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হইয়াছে। তাহার একটি এইরূপ : অর্থক্রিয়াকারিত্ব বস্তুর সত্তার লক্ষণ, অর্থাৎ কোন বস্তুর অস্তিত্বের অর্থ হইতেছে তাহার কোন কার্য করিবার শক্তি। আকাশ-কুসুম অসৎ বস্তু, কারণ ইহার কোন কার্য করিবার শক্তি নাই। সত্তার এরূপ লক্ষণ হইলে অস্তিত্ববান্ বস্তুমাত্রই ক্ষণস্থায়ী হইবে। যদি একটি বীজের মত কোন বস্তু এক্ষণের অধিক কাল স্থায়ী হয়, তবে ইহা পূর্বক্ষণের ন্যায় পরবর্তী ক্ষণগুলিতেও কোন কার্য করিবে এবং বস্তুটি একরূপ থাকিলে ইহার কার্যও একরূপ হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না। বীজটিকে গৃহ মধ্যে রাখিয়া দিলে তাহাতে অঙ্কুরোদ্গম হয় না, ভূমিতে বপন করিলেই তবে হয়। কিন্তু গৃহমধ্যস্থ বীজ আর ভূমিমধ্যস্থ

অনিত্যতাবাদের ক্ষণিকবাদে পর্যবসান।

CENTRAL LIBRARY

বীজ এক ও অপরিবর্তিত নহে, পূর্বক্ষণের বীজ পরিবর্তিত হইয়া পরক্ষণে অন্যরূপ হইয়া যায়। অতএব ইহাকে ক্ষণস্থায়ীই বলিতে হয়। এখানে অবশ্য বলা যায় যে, যদিও বীজটি সর্বক্ষণে একরূপ কার্য করে না তথাপি ইহাতে অব্যক্তভাবে সে শক্তি সব সময় থাকে এবং মাটি জল প্রভৃতি সহকারী কারণ সহযোগে তাহা ব্যক্ত হয়। কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে, সহকারীকারণ-যুক্ত বীজ আর পূর্বাবস্থায় থাকে না, উহার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং উহা পরিবর্তিত হয়। এভাবে দেখা যায় যে, সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, একক্ষণের অধিক দুই ক্ষণও স্থায়ী নহে। অতএব সব বস্তুই ক্ষণস্থায়ী ইহা স্বীকার করিতে হয়।

(৪) নৈরাত্ম্যবাদ

সব বস্তুই পরিণামশীল, অতএব আত্মা বলিয়া কোন নিত্য দ্রব্য নাই।

সকল বস্তুই পরিবর্তনশীল, মনুষ্য বা মনুষ্যেতর জীব, স্থাবর বা জঙ্গম যাহা কিছু আছে সবই পরিণামশীল। অতএব বুদ্ধ মানুষের মধ্যে নিত্য ও অপরিণামী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। অনেকের মতে আত্মা নিত্য দ্রব্য, দেহের পরিবর্তন হইলেও আত্মার পরিবর্তন হয় না, এক দেহ ধ্বংস হইলে আত্মা দেহান্তরে গমন করে। বুদ্ধের মতে আত্মা বলিয়া এরূপ কোন নিত্য বস্তু নাই। কিন্তু তাহা হইলে কোন ব্যক্তির এক জন্মের সঙ্গে অপর জন্মের যোগসূত্র কিরূপে রক্ষা হয়? অথবা বাল্য, যৌবন ও জরা প্রভৃতি ভিন্ন অবস্থার মধ্যে তাহার বর্তনা অর্থাৎ অনুবৃত্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হয়? বুদ্ধ মানুষের মধ্যে এক অপরিণামী আত্মা স্বীকার না করিলেও মানুষের জীবনের সকল অবস্থার মধ্যে যে একটি যোগসূত্র আছে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। মানুষের জীবন বিভিন্ন অবস্থার নিরবচ্ছিন্ন ধারা এবং অবস্থাগুলি কার্য-কারণসম্বন্ধে আবদ্ধ। ইহাদ্বারাই মানুষের জীবনের বর্তনা বা একত্ব (continuity or unity) রক্ষিত হয় এবং সে সারা জীবন নিজকে এক ব্যক্তি বলিয়াই উপলব্ধি করে। বুদ্ধ প্রদীপের দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা বুঝাইতেন।

জীবন বিভিন্ন অবস্থার নিরবচ্ছিন্ন ধারামাত্র।

আমরা বলি, একটি প্রদীপ সারারাত জ্বলিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কার্যকারণ-সম্বন্ধে আবদ্ধ নানা অগ্নিশিখার ধারাবাহিক গতি হইতেছে। অগ্নিশিখাগুলি ভিন্ন হইলেও পরস্পর কার্যকারণরূপে সম্বদ্ধ হইয়া এক অবিচ্ছিন্ন ধারার সৃষ্টি করে। তারপর, যেমন এক দীপশিখা হইতে অন্য দীপশিখা প্রজ্বলিত করা যায়, তেমনি এই জীবনের শেষ অবস্থা হইতে পরজীবনের আরম্ভ হইতে পারে। অতএব পুনর্জন্ম বলিতে একই আত্মার এক দেহ হইতে দেহান্তরে

CENTRAL LIBRARY

গমন বুঝায় না, ইহার প্রকৃত অর্থ হইতেছে, ইহজীবন হইতে পরজীবনের উৎপত্তি। বুদ্ধ নিত্য আত্মা বর্জন করিয়া এক নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞানধারাকেই আত্মা বলিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক উইলিয়াম জেম্‌স্ এরূপ মত পোষণ করিতেন। আত্মা সম্বন্ধে বুদ্ধের মতকে অনত্তাবাদ বলা হয়, কারণ তিনি নিত্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না এবং আত্মা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহার শিষ্যদের পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেন, আত্মা সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য না জানায় লোকে 'আত্মা আত্মা' করে এবং আত্মাকে সুখী করিবার জন্য আত্মার মুক্তি কামনা করে। এ যেন, যে সুন্দরী রমণীকে কখন দেখি নাই ও জানি নাই তাহাকে ভালবাসা।

মানুষ দেহ, মন ও বিজ্ঞানের অস্থায়ী সমষ্টি মাত্র ।

মানুষের আত্মা বলিয়া কিছু নাই। মানুষ কায়, মন বা চিত্ত এবং বিজ্ঞান এই তিন উপাদানের সমষ্টিমাত্র, যেমন কোন রথ, চক্র অর প্রভৃতির সমষ্টিমাত্র। মানুষের অস্তিত্ব এসব উপাদানের সংঘাতের উপর নির্ভরশীল এবং এ সংঘাত বিনষ্ট হইলে মানুষও বিনষ্ট হয়।

অথবা পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি মাত্র।

মানুষের অন্তর ও বাহির দেখিলে তাহাকে পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি বলা যায়। এ পাঁচটি স্কন্ধ হইল : (১) রূপ অর্থাৎ রূপবিশিষ্ট দেহের উপাদানসমষ্টি; (২) বেদনা অর্থাৎ সুখ-দুঃখ ইত্যাদির অনুভূতি; (৩) সংজ্ঞা অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ; (৪) সংস্কার অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব অনুভূতিজন্য ভাবনারাজি; (৫) বিজ্ঞান অর্থাৎ অন্যান্য স্কন্ধের মূলগত বিজ্ঞানধারা, ইহাকেই আত্মা বলা যায়।

বুদ্ধের উপদেশাবলীর যে আলোচনা করা হইল তাহার সারমর্ম হইল দুঃখ ও দুঃখনিবৃত্তি। এই দুইটিকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার অন্যান্য উপদেশ ও সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাই বুদ্ধের নিজের কথা এবং ইহাই আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার ফল।

৪। বৌদ্ধদর্শনের শাখাসমূহ

তত্ত্ববিদ্যা বর্জন করিতে গিয়া বুদ্ধ একপ্রকার তত্ত্ববিদ্যাই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

মানুষের চিন্তার প্রগতির ইতিহাসে দেখা যায় যে, যখনই কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বিচারপূর্বক দার্শনিক তত্ত্বালোচনা পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই তিনি এক নূতন দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ববিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি নির্বিচারে কোন মত বা পথ গ্রহণ করিতেন না এবং তাঁহার শিষ্যদেরও তাহা করিতে দিতেন না। তিনি

CENTRAL LIBRARY

বিচারপূর্বক সব কথা বলিতেন এবং তাঁহার নৈতিক উপদেশসমূহ যুক্তিতর্ক ও বিচারদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতেন। এইভাবে তিনিও প্রসঙ্গক্রমে একপ্রকার দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অবশ্য এ মত অংশতঃ ব্যক্ত এবং অংশতঃ অব্যক্ত। ইহাকে দৃষ্টবাদ (positivism) বলা যায়, যেহেতু ইহা দৃষ্টজগতে নিবদ্ধ এবং ইহজীবনের কল্যাণসাধনে নিয়োজিত। ইহাকে প্রতিভাসবাদ (phenomenalism) বলা যায়, যেহেতু বুদ্ধ বলিয়াছেন, কেবল পরিদৃশ্যমান ও প্রকাশিত জগৎ সম্বন্ধেই আমরা নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞানলাভ করিতে পারি। অতএব ইহাকে একপ্রকার প্রত্যক্ষবাদও (empiricism) বলা যায়, যেহেতু বুদ্ধের মতে প্রত্যক্ষই জ্ঞানলাভের উপায়।

তাঁহার উপদেশের অন্তর্নিহিত দৃষ্টবাদ, প্রতিভাসবাদ ও প্রত্যক্ষবাদ।

বুদ্ধের অনুগামী শিষ্যগণ তাঁহার দার্শনিকমতের বিভিন্ন দিক্ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। বুদ্ধ তত্ত্বার্থ বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং এবিষয়ে প্রশ্ন করিলে কোন উত্তর দিতেন না। তাঁহার শিষ্যেরা এই নীরবতার দুইপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, বুদ্ধ প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন এবং প্রত্যক্ষাতীত কোন তত্ত্বে বিশ্বাস করিতেন না। এপক্ষে বুদ্ধ সংশয়বাদী ছিলেন বলিতে হয়; অপরপক্ষে কেহ কেহ, বিশেষতঃ মহাযানপন্থীরা বলেন, বুদ্ধ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের অতীত তত্ত্বে বিশ্বাসও করিতেন এবং তাহা জানিবার যে উপায় আছে তাহাও স্বীকার করিতেন, কেবল তাঁহার মতে তত্ত্বার্থ এবং তত্ত্বজ্ঞান অনির্বচনীয়, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষলব্ধ কোন প্রত্যয়দ্বারা তাহা বর্ণনা করা যায় না, এজন্য বুদ্ধ এসব বিষয়ে মৌন থাকিতেন। বুদ্ধের জীবনী ও বাণী হইতে শেষোক্ত ব্যাখ্যার কিছু সমর্থন পাওয়া যায়। সাধারণতঃ প্রত্যক্ষবাদীরা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ব্যতীত কোন অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সম্ভাব্যতা স্বীকার করেন না। কিন্তু বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, নির্বাণ দশায় একপ্রকার অনুভূতি লাভ করা যায় এবং উহা ইন্দ্রিয়জন্য নহে। এ অনুভূতির উপর তিনি যেরূপ গুরুত্ব দিয়াছেন তাহাতে উহাকে পরমতত্ত্ব বলিলেও ভুল হয় না। বুদ্ধ প্রায় বলিতেন যে, 'তাঁহার অতি গভীর অনুভূতিতে তিনি যে সুদূরের (অর্থাৎ দেশ-কালের অতীত সত্তার) সন্ধান পান তাহা তর্কদ্বারা বুঝা যায় না, কেবল বোধিতেই বোধগম্য হয়।'. ইহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহার অতীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, অথবা তর্কদ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এসব দৃষ্টে তাঁহার কোন কোন অনুগামী বুদ্ধের নীরবতার মূলে যে দর্শন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাকে

বুদ্ধের শিষ্যেরা তাঁহার উপদেশের মর্ম বিভিন্নভাবে বুঝিয়াছেন।

প্রত্যক্ষবাদ ও সংশয়বাদ।

অতীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষবাদ ও অতীন্দ্রিয়-তত্ত্ববাদ।

অতীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষবাদ (mysticism) ও অতীন্দ্রিয়-তত্ত্ববাদ (transcendentalism) বলা যায়।

এইভাবে বুদ্ধের উপদেশের মূলে বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন বহু শাখায় বিভক্ত হয়। ছোটগুলি ছাড়িয়া দিলেও তাহাদের সংখ্যা ত্রিশ হইবে। উহাদের মধ্যে ভারতীয় দর্শন-সাহিত্যে সাধারণতঃ চারিটির বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে এই চারিটির আলোচনা করা হইবে, যথা—(১) মাধ্যমিক দর্শন বা শূন্যবাদ, (২) যোগাচার দর্শন বা বিজ্ঞানবাদ, (৩) সৌত্রান্তিক দর্শন বা বাহ্যানুমেয়বাদ, এবং (৪) বৈভাষিক দর্শন বা বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদ। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি মহাযান শাখার এবং শেষ দুইটি হীনযান শাখার অন্তর্গত। অবশ্য উভয় যানের মধ্যেই আরও বহু শাখা আছে।

বৌদ্ধদর্শনের ত্রিশটি শাখা।

ভারতীয় দর্শনে বিবৃত বৌদ্ধ-দর্শনের চারিটি শাখা।

দুইটি বিষয়ে মতভেদের জন্য বৌদ্ধদর্শনের এই চারিটি শাখার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথম বিষয়ে প্রশ্ন হইল: আন্তর বা বাহ্য, চিত্তাত্মক বা ভৌতিক (mental or non-mental) কোন সদ্বস্তু (reality) আছে কি না? মাধ্যমিকদের মতে কোন সদ্বস্তু নাই, সবই শূন্য। এজন্য তাঁহাদের শূন্যবাদী বলে। যোগাচারমতে বাহ্য বস্তু অসৎ, আন্তর বস্তু বা চিত্ত (mind) সৎ। এজন্য ইঁহাদের বিজ্ঞানবাদী বলে। অপর দুই শ্রেণীর মতে বাহ্য ও আন্তর দুইপ্রকার বস্তুই সৎ। ইঁহাদিগকে সর্বাস্তিবাদী বলে। দ্বিতীয় বিষয়ে প্রশ্ন হইল: বাহ্য বস্তু আমরা কি প্রকারে জানি? সৌত্রান্তিকদের মতে বাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না, অনুমানদ্বারা আমরা বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব জানিতে পারি। ইঁহাদিগকে বাহ্যানুমেয়বাদী বলা হয়। বৈভাষিকদের মতে বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষদ্বারাই জানা যায়। এজন্য তাঁহাদের বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদী বলে। এখন এই চারিটি দর্শন-শাখার আলোচনা করা যাইবে।

দুইটি বিষয়ে মতভেদ হইতে ইহাদের উৎপত্তি।

(১) মাধ্যমিক দর্শন—শূন্যবাদ

সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে তিনি দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। **বুদ্ধচরিত** প্রণেতা অশ্বঘোষও এই দর্শনের একজন নায়ক ছিলেন। নাগার্জুন তাঁহার **মাধ্যমিকশাস্ত্র** গ্রন্থে অতি পাণ্ডিত্য ও নিপুণতার সহিত মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন।

নাগার্জুন শূন্যবাদ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা।

CENTRAL LIBRARY

হিন্দু দার্শনিকগণ সাধারণতঃ শূন্যবাদ বলিতে উচ্ছেদবাদ বা সর্বশূন্যবাদ বুঝিয়াছেন। অর্থাৎ জগতে কোন সদ্বস্তু নাই, সবই শূন্য ও নিরুপাখ্য বা অসৎপদার্থ। মাধবাচার্য তাঁহার **সর্বদর্শনসংগ্রহ** গ্রন্থে শূন্যবাদের সপক্ষে একটি প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা এইরূপ : জ্ঞাতা বা আত্মা, জ্ঞেয় বা অর্থ এবং জ্ঞান পরস্পরসাপেক্ষ। ইহাদের একটির অস্তিত্ব অপর দুইটির অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে এবং একটি মিথ্যা বা অসৎ হইলে অপর দুইটিও মিথ্যা বা অসৎ হইবে, যেমন কোন ব্যক্তির সন্তানের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হইলে তাঁহার পিতৃত্বেরও মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হইবে। এখন ভ্রম-প্রত্যক্ষ-স্থলে দেখা যায় যে, বিষয় বা জ্ঞেয় অর্থ মিথ্যা বা অসৎ বস্তু, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম-স্থলে জানা যায়, সর্প মিথ্যা বা অসৎপদার্থ। কিন্তু বিষয়টি মিথ্যা হইলে তাহার জ্ঞানও মিথ্যা হইবে এবং জ্ঞাতাও মিথ্যা হইবে, কারণ বিষয় না থাকিলে তাহার জ্ঞান কিরূপে হইবে, আর তাহার জ্ঞাতাই বা কিরূপে হইবে? অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, কোন জ্ঞেয় পদার্থ নাই, জ্ঞানও নাই আর জ্ঞাতাও নাই। জগতে কোথায়ও কোন সদ্বস্তু নাই, সবই অসৎ, মিথ্যা ও শূন্য।

> শূন্যবাদ বলিতে হিন্দু দার্শনিকগণ উচ্ছেদবাদ বুঝিয়াছেন।

> সর্ব বস্তুর মিথ্যাত্বের প্রমাণ।

মাধবাচার্য কর্তৃক উল্লিখিত প্রমাণ দৃষ্টে মনে হয়, মাধ্যমিক মতে সবই অসৎ ও শূন্য। এজন্য এ মতকে ভারতে এবং পাশ্চাত্ত্য দেশে উচ্ছেদবাদ বা সর্ববৈনাশিকবাদ বলা হয়। মাধ্যমিকদের ব্যবহৃত "শূন্য" শব্দটি এরূপ ধারণা উৎপত্তির প্রধান হেতু, কারণ "শূন্য" বলিলেই আমাদের মনে হয়, এটা কিছু না, অভাব বা অবকাশমাত্র। কিন্তু মাধ্যমিক দর্শন গভীরভাবে পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে এ ধারণা ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে মাধ্যমিকেরা উচ্ছেদবাদী নয়, তাঁহারা সবই অসৎ বা মিথ্যা এমন কথা বলেন না, কেবল পরিদৃশ্যমান জগতের সত্তাই অস্বীকার করেন। তাঁহারা দৃশ্যমান প্রাতিভাসিক জগতের অন্তরালে এক সত্তা বা সৎ বস্তু স্বীকার করেন, কিন্তু ইহাকে কোন রূপ বা গুণদ্বারা বর্ণনা করা যায় না বলিয়া শূন্য আখ্যা দিয়াছেন। জাগতিক বস্তুর প্রকৃত সত্তা কি তাহা আমরা নির্ণয় করিতে পারি না। ইহাকে সৎ বলা যায় না, কারণ যাহা সৎ তাহা অন্য কারণ-নিরপেক্ষ হইবে, কিন্তু জাগতিক সব বস্তুই কারণ-সাপেক্ষ। ইহাকে অসৎও বলা যায় না, কারণ আকাশ-কুসুমের ন্যায় অসৎ বস্তুর উৎপত্তি ও প্রতীতি হয় না। ইহাকে সৎ ও অসৎ উভয়ই বলা যায় না, কারণ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম একত্র থাকে না। অথবা ইহা সৎও নয়

> শূন্যবাদে কেবল প্রাতিভাসিক জগতের সত্তা অস্বীকৃত হইয়াছে, সবসত্তা নয়।

এবং অসৎও নয় এরূপও বলা যায় না, কারণ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মের অভাব একত্র দেখা যায় না। অতএব বস্তুর প্রকৃত সত্তা যে কি তাহা আমরা নির্ণয় করিতে পারি না। বস্তুর প্রকৃত সত্তার অনির্বচনীয়তাকেই শূন্যতা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বস্তুসমূহ অস্তিত্ববান্ বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু এই অস্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। ইহাকে সৎ বা অসৎ বলা যায় না, সদসৎ উভয়াত্মক বলা যায় না, আবার সৎও নয় অসৎও নয় এরূপও বলা যায় না।

শূন্য বলিতে বস্তুর প্রকৃত সত্তার অনির্বচনীয়তা বুঝায়।

এখানে দেখা যাইবে যে, কোন বস্তুকে অনির্বচনীয় বলিবার কারণ হইল এই যে বস্তুটির অস্তিত্ব অন্য কারণ-সাপেক্ষ। এজন্য নাগার্জুন বলেন যে বস্তুর কারণ-সাপেক্ষ অস্তিত্বই শূন্যতাপদবাচ্য। এ মতে কোন বস্তু সর্বকারণ-নিরপেক্ষ সৎ বস্তু নয়, আবার একেবারে অসৎ বস্তুও নয়, ইহা কারণ-সাপেক্ষ অস্তিত্ববান্ বস্তু। এজন্য এ মতকে মধ্যম পথ বলে। নাগার্জুনও বলেন শূন্যবাদ মধ্যম পথ, কারণ ইহাতে বস্তুর কারণজন্য অস্তিত্ব বুঝায়। এ হিসাবে শূন্যবাদকে আপেক্ষিকবাদ (relativity) বলা যায়। ইহাদ্বারা কোন বস্তুর অস্তিত্ব, গুণ ও ধর্ম অন্যকারণজন্য ইহাই বুঝায়। অতএব কোন বিষয়ে আমাদের মত বা সিদ্ধান্ত সর্বাবস্থা ও সর্বসর্ত নিরপেক্ষ হইবে না।

বস্তুর কারণসাপেক্ষ অস্তিত্বই শূন্যতা।

শূন্যবাদ এক হিসাবে আপেক্ষিকবাদ।

মাধ্যমিক দর্শনে জগৎ সম্বন্ধে প্রতিভাসবাদের (philosophy of phenomena) সংগে তত্ত্ববাদও (philosophy of noumenon) পাওয়া যায়। বুদ্ধ বলিয়াছেন সবই অনিত্য, সবই দুঃখ ইত্যাদি। কিন্তু এসব কথা তিনি এসংসার সম্বন্ধেই বলিয়াছেন। সংসারের অতীত এবং ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের অযোগ্য যে নির্বাণাবস্থা বা নির্বাণানুভূতি, তাহার স্বরূপ এসংসারের কোন বস্তুদ্বারা বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের কোন প্রত্যয়দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। ইহার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, বিকার নাই, ক্ষয় নাই। অতএব নাগার্জুন বলিয়াছেন, বুদ্ধের উপদেশ হৃদয়ংগম করিতে হইলে দুইপ্রকার সত্যের ভেদ বুঝিতে হইবে, যথা সংবৃতি-সত্য ও পরমার্থ-সত্য। প্রথমটি সাধারণ লোকের ও ব্যাবহারিক জীবনের উপযোগী, দ্বিতীয়টি পূর্ণ ও পরম সত্য। প্রথমটি নিম্নস্তরের সত্য এবং উচ্চস্তরের দ্বিতীয় সত্য লাভ করিবার সোপান। নির্বাণে এই উচ্চস্তরের সত্যের উপলব্ধি হয়। কিন্তু এ

মাধ্যমিক দর্শনে প্রতিভাসবাদ ও তত্ত্ববাদ।

সংবৃতি-সত্য ও পরমার্থ-সত্য।

নির্বাণে পরমার্থ-সত্যের উপলব্ধি।

উপলব্ধি ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের অতীত এবং বাক্ ও মনের অগম্য। ইহা কিরূপ তাহা বলা যায় না, তবে কিরূপ নহে তাহা বলিয়া কতকটা বুঝান যায়। যেমন নাগার্জুন বলিয়াছেন, 'যাহা সাধারণভাবে জানা যায় না, যাহা নূতনভাবে অর্জন করা যায় না, যাহার ভাবও নাই অভাবও নাই, যাহার উৎপত্তিও নাই তিরোধানও নাই—তাহাই নির্বাণ।' নির্বাণ যেমন অনির্বাচ্য, নির্বাণপ্রাপ্ত তথাগতও তেমনি অবর্ণনীয়, তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না। এজন্যই নির্বাণপ্রাপ্ত তথাগত সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলে বুদ্ধ তাহা আলোচনা করিতেন না।

ইহার নেতিবাচক বর্ণনা।

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, জগতের মিথ্যাত্ব, সত্যের দুইপ্রকার ভেদ, ইন্দ্রিয়াতীত তত্ত্বের নেতিবাচক বর্ণনা এবং নির্বাণে পরমাত্মৈকত্ব (অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একত্ব) লাভ প্রভৃতি বিষয়ে মাধ্যমিক দর্শন এবং কোন কোন উপনিষদে বর্ণিত ও গৌড়পাদ ও শঙ্কর কর্তৃক ব্যাখ্যাত অদ্বৈত বেদান্তদর্শনের মধ্যে বিশেষ মিল আছে।

মাধ্যমিক দর্শন ও অদ্বৈত বেদান্তের মিল।

(২) যোগাচার দর্শন—বিজ্ঞানবাদ

মাধ্যমিক ও যোগাচার উভয় শ্রেণীর দার্শনিকদের মতে বাহ্য বস্তু অসৎ, উহার প্রকৃত সত্তা নাই। কিন্তু চিত্ত বা মন সম্বন্ধে তাঁহারা একমত নহেন। মাধ্যমিক মতে চিত্তও অসদ্বস্তু, কিন্তু যোগাচার মতে চিত্ত বা মন সদ্বস্তু। মনের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে সব তর্কযুক্তি এবং চিন্তাবৃত্তি অস্বীকার করিতে হয়, কারণ মন না থাকিলে চিন্তাই হয় না। আর চিন্তা ও তর্কযুক্তি যদি মিথ্যা হয়, তবে মাধ্যমিকদের তর্কযুক্তিও মিথ্যা হইবে এবং মাধ্যমিক দর্শনই প্রতিষ্ঠিত হইবে না। বাহ্য বস্তু ও মন সবই অসৎ বা মিথ্যা বলিলে তাঁহাদের স্বপক্ষ হানি হইবে। অতএব মনের অস্তিত্ব বা সত্তা স্বীকার করিতেই হইবে, নতুবা নির্ভুল চিন্তাই অসম্ভব হইবে।

মন বা চিত্তের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য।

মন বা চিত্তই একমাত্র সদ্বস্তু। বাহ্য বস্তু বলিয়া কিছু নাই। মন বিভিন্নপ্রকার প্রত্যয়ের প্রবাহমাত্র। যাহা বাহ্য বস্তুরূপে প্রতীয়মান হয় (যেমন আমাদের দেহ এবং অন্যান্য বস্তু) তাহা আমাদের মনের প্রত্যয়মাত্র। যেমন স্বপ্নে, মায়া-মরীচিকায় ও বিকার অবস্থায় লোকে অবস্তুকে বাহ্য বস্তু বলিয়া ভ্রান্তি-দর্শন করে, তেমনি আমরা মনের বৃত্তি বা প্রত্যয়কেই বাহ্য বস্তু বলিয়া দর্শন করি। বাহ্য বস্তুর

মনই একমাত্র সদ্বস্তু। আর সব বস্তু মানসিক প্রত্যয়মাত্র। বাহ্য বস্তু নাই।

CENTRAL LIBRARY

অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, কারণ বস্তুসত্তা যে জ্ঞানসত্তা হইতে পৃথক্ তাহা দেখান যায় না। ধর্মকীর্তি বলিয়াছেন, নীল ও নীলজ্ঞান অভিন্ন, কারণ ইহারা পৃথক্‌ভাবে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু অভিন্ন হইলেও ভ্রমপ্রত্যক্ষবশতঃ ইহাদের পৃথক্ বলিয়া প্রতীতি হয়, যেমন চক্ষুপীড়াবশতঃ এক চন্দ্র দুই বলিয়া প্রতিভাত হয়। যেহেতু জ্ঞানব্যতিরিক্ত বস্তু দৃষ্ট হয় না, কোন বস্তুর জ্ঞাননিরপেক্ষ সত্তা প্রমাণ করা যায় না।

বাহ্য বস্তুর বিপক্ষে প্রমাণ-সমূহ।

যোগাচার দর্শনে বাহ্য বস্তুর স্বীকৃতির বিপক্ষে আরও কতকগুলি প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে দেখান হইয়াছে যে, বাহ্য বস্তু থাকিলেও তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কল্পিত বাহ্য বস্তু হয় সাবয়ব নয় নিরবয়ব হইবে। নিরবয়ব হইলে ইহা পরমাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম হওয়ায় প্রত্যক্ষ-গোচর হইবে না। সাবয়ব হইলেও ইহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ ইহার বিভিন্ন অবয়বের যুগপৎ প্রত্যক্ষ হয় না এবং তাহা না হইলে ইহারও প্রত্যক্ষ হইবে না। অবয়বগুলি ক্রমান্বয়ে প্রত্যক্ষ করিয়াও ইহার প্রত্যক্ষ হইবে না। কারণ অবয়ব অণুপরিমাণ হইলে তাহার প্রত্যক্ষ হইবে না, আর সাবয়ব হইলে পূর্ব আপত্তি আবার উঠিবে। অতএব বাহ্য বস্তু স্বীকার করিলে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার উপায় দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, ইহাকে জ্ঞান বা প্রত্যয়মাত্র বলিলে কোন আপত্তি হইতে পারে না, কারণ জ্ঞানবিষয়ে 'সাবয়ব কি নিরবয়ব' এ প্রশ্নই উঠে না। তারপর বাহ্য বস্তু থাকিলে তাহা ক্ষণিক বা ক্ষণমাত্রস্থায়ী হইবে এবং তাহা হইতে কোন প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হইবে না। বাহ্য বস্তু উহার প্রত্যক্ষের কারণ হওয়ায় প্রত্যক্ষজ্ঞানের পূর্বক্ষণবর্তী হইবে এবং পরক্ষণে বিনষ্ট হইবে। যদি তাহাই হয় তবে প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইবার পূর্বে উহা বিনষ্ট হওয়ায় তাহার কারণ হইতে পারে না। এমন কথা বলা যায় না যে, বাহ্য বস্তু বিনষ্ট হইবার পর তাহার প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। কারণ সে-স্থলে 'বর্তমান বস্তু প্রত্যক্ষ করিতেছি' এরূপ অনুভূতি হইবে না। অতএব বাহ্য বস্তু স্বীকার করিলে বর্তমান বস্তুর প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। বাহ্য বস্তুকে জ্ঞানমাত্র বলিলে এরূপ সঙ্কট হয় না।

যোগাচার মত—বিজ্ঞানবাদ।

যোগাচার মতকে বিজ্ঞানবাদ (idealism) বলে, যেহেতু এমতে বিজ্ঞানই একমাত্র সদ্বস্তু এবং বাহ্য বা জড় বস্তু-সকল বিজ্ঞানেরই অবস্থাবিশেষ বা প্রত্যয়মাত্র। ইহাকে বিজ্ঞানমাত্রবাদ বা জ্ঞাতৃগত বিজ্ঞানবাদও (subjective idealism) বলা যায়, যেহেতু এমতে বস্তু বা বিষয়ের অস্তিত্ব বিষয়ী বা জ্ঞাতা হইতে পৃথক্ নহে।

CENTRAL LIBRARY

বিজ্ঞানবাদে আপত্তি ও তাহার খণ্ডন।*

এখানে আপত্তি হইতে পারে, যদি বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয় তবে জ্ঞাতা তাহার ইচ্ছামত যে কোন সময়ে যে কোন বস্তু সৃষ্টি করিতে পাবে না কেন? কেনই বা জ্ঞাতার ইচ্ছামত বস্তুর আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় না? ইহার উত্তরে বিজ্ঞানবাদী বলেন,—মন ক্ষণিক-বিজ্ঞানধারা, ইহাতে পূর্ব পূর্ব প্রত্যক্ষের সংস্কারসমূহ নিহিত থাকে। এককালে কোন একটি সংস্কার অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে উদ্বুদ্ধ হয় এবং সেই উদ্বোধিত সংস্কার প্রত্যক্ষজ্ঞানের মত স্পষ্ট হয়। যে বস্তুর পূর্ব সংস্কার এইভাবে উদ্বুদ্ধ হয় তাহারই প্রত্যক্ষ হয়, অন্যগুলির হয় না। এজন্যই সব বস্তুর সব সময়ে প্রত্যক্ষ হয় না, কোন একটি বস্তুবিশেষেরই হইয়া থাকে, যেমন সব পূর্বপ্রত্যক্ষের সংস্কার মনোমধ্যে থাকিলেও যেগুলির সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয় তাহাদেরই স্মৃতি বা স্মরণ হয়।

সব সংস্কারের আধার মনকে আলয়-বিজ্ঞান বলে।

মন বা চিত্ত সর্ব সংস্কারের আধার বলিয়া যোগাচারগণ ইহাকে **আলয়-বিজ্ঞান** বলিয়াছেন। ইহাকে অব্যক্ত মনও বলা যায়। অন্যান্য দর্শনে যাহাকে আত্মা বলা হয় ইহা তাহারই সমতুল্য। কিন্তু ইহা আত্মার ন্যায় নিত্য বস্তু নয়, পরন্তু নিয়ত পরিবর্তনশীল বিজ্ঞানের প্রবাহমাত্র। সংযম ও সাধন সহায়ে অশুভ ভাবনা পরিত্যাগ করিলে আলয়-বিজ্ঞান নির্বাণানুভূতিতে পরিণত হইতে পারে। নতুবা ইহা অশুভ ভাবনা ও কামনা-বাসনার সৃষ্টি করিয়া জীবকে কাল্পনিক বাহ্য জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে। চিত্তই চিত্তের প্রতিষ্ঠাভূমি, ইহা স্বর্গগামীও হইতে পারে অথবা নরকগামীও হইতে পারে।

যোগাচার নামের অর্থ।

যোগাচার আখ্যা ব্যাখ্যা করিতে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, যোগাচার মতাবলম্বী দার্শনিকগণ বাহ্য জগতের অসত্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য যোগাভ্যাস করিতেন বলিয়া তাঁহাদের যোগাচার বলা হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা পর্যনুযোগ বা পরিপ্রশ্ন এবং সদাচার দুই মার্গই অবলম্বন করায় তাঁহাদিগকে যোগাচার আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অসংগ, বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণ এই দর্শনশাখার প্রধান নায়ক ছিলেন। **লঙ্কাবতারসূত্র** এই দর্শনের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

(৩) সৌত্রান্তিক দর্শন—বাহ্যানুমেয়বাদ

সৌত্রান্তিক মতে আন্তর ও বাহ্য উভয় বস্তুই সৎ। বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে উহার ভ্রমপ্রত্যক্ষও হইতে পারে না। যোগাচারগণ বলেন ভ্রমবশতঃ বিজ্ঞানই বাহ্য বস্তুর মত প্রতিভাত হয়। কিন্তু যদি কেহ কখন কোন বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষ না করে তবে 'বাহ্য বস্তুর মত' এরূপ তুলনা-মূলক বাক্যই প্রয়োগ করা যায় না। এরূপ বাক্য 'বন্ধ্যার পুত্রের মত' এই বাক্যের ন্যায় অর্থহীন। তারপর কোন বস্তু এবং তাহার জ্ঞান যুগপদ্ভাবী বলিয়া তাহাদের অভিন্ন বলা ঠিক নয়। বিভিন্ন ব্যক্তি একই বস্তুকে এক কালে দেখিতে পারেন। এস্থলে ঐ বস্তুবিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান সমকালীন হইলেও অভিন্ন বা এক নয়। পরন্তু, কোন বস্তু জানিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা উপলব্ধি করি যে বস্তুটি বাহ্য এবং উহার জ্ঞান আন্তর। অতএব প্রথম হইতেই আমরা বুঝি যে, বস্তু এবং উহার জ্ঞান ভিন্ন, এক নহে। যদি জ্ঞেয় বস্তু ও জ্ঞাতা অভিন্ন হয়, তবে নীলবর্ণ প্রত্যক্ষ করিবার সময় জ্ঞাতাও নীলবর্ণ হইবেন এবং 'নীলবর্ণ প্রত্যক্ষ করিতেছি' এরূপ না বলিয়া, 'আমি নীলবর্ণ' এরূপ বলিবেন। শেষ কথা, বাহ্য বস্তু স্বীকার না করিলে 'ঘট-জ্ঞান', 'পটজ্ঞান' প্রভৃতি জ্ঞানের ভেদ বুঝা যাইবে না, কারণ জ্ঞান হিসাবে ইহারা অভিন্ন, কেবল বিষয় হিসাবেই তাহাদের ভেদ হয়।

আন্তর ও বাহ্য উভয় বস্তুই সৎ।

বাহ্য বস্তুর প্রমাণ।

অতএব মনের সত্তাতিরিক্ত বাহ্য বস্তুর সত্তা স্বীকার্য। বাহ্য বস্তুগুলির আকার মনের বিভিন্ন জ্ঞানরূপ বৃত্তিতে আরোপিত হয়। আমরা জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়াকার হইতে তাহাদের কারণরূপে বিভিন্ন বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারি।

জ্ঞানের বিষয়াকার হইতে বাহ্য বস্তুর অনুমান হয়।

আমরা যে ইচ্ছামত যে কোন দেশে ও কালে যে কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারি না তাহার কারণ এইরূপ : কেবল মনই প্রত্যক্ষের কারণ নয়। প্রত্যক্ষের চারিটি কারণ আছে, যথা—আলম্বন, সমনন্তর, অধিপতি ও সহকারী। প্রত্যক্ষের প্রথম কারণ আলম্বন অর্থাৎ বিষয়, যাহাদ্বারা জ্ঞানে বিষয়াকার আরোপিত হয়। দ্বিতীয় কারণ হইতেছে, সমনন্তর অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-পূর্ব-কালীন জ্ঞান বা মানসিক অবস্থা, যাহাদ্বারা বিষয়াকারের উপলব্ধি হয়। তৃতীয় কারণ হইতেছে, অধিপতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, যাহাদ্বারা প্রত্যক্ষটি চাক্ষুষ বা রাসন ইত্যাদি প্রকারের জ্ঞান হয়। শেষ কারণ হইল সহকারী অর্থাৎ আলোক ইত্যাদি যাহারা প্রত্যক্ষোৎপত্তির সহায়তা করে। এই চারিপ্রকার কারণের সহযোগে প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয়। মনোগত বিষয়াকার

প্রত্যক্ষের চতুর্বিধ কারণ—বিষয়, মন, ইন্দ্রিয় ও সহকারী বস্তুনিচয়।

CENTRAL LIBRARY

বাহ্য বস্তু প্রভৃতি কারণের কার্য। বাহ্য বস্তুটি প্রত্যক্ষগোচর হয় না, কারণ মনে যাহা সাক্ষাৎভাবে প্রতীত হয় তাহা বস্তুর জ্ঞানগত আকার। কিন্তু এই জ্ঞানাকার হইতে বাহ্য বস্তু অনুমান করা যায়, কারণ বাহ্য বস্তু ব্যতীত এরূপ জ্ঞানাকারের উৎপত্তি হয় না। এ জন্য সৌত্রান্তিকদের বাহ্যানুমেয়বাদী বলা হয়। তাঁহাদের সৌত্রান্তিক আখ্যার হেতু এই যে তাঁহারা কেবল সূত্র-পিটকের প্রামাণ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সৌত্রান্তিক আখ্যার অর্থ।

(৪) বৈভাষিক দর্শন—বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদ

সৌত্রান্তিকদের ন্যায় বৈভাষিকগণও বাহ্য ও আন্তর উভয়প্রকার বস্তুর সত্তা স্বীকার করেন। কিন্তু বৈভাষিকগণ বাহ্য বস্তুকে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বলেন। তাহা না হইলে বাহ্য বস্তু, অনুমান বা অন্য কোন প্রকারে জানা সম্ভব হয় না। আমরা পূর্বে ধূম ও অগ্নির সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করি বলিয়াই ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমান করিতে পারি। যে ব্যক্তি কখনও অগ্নি দর্শন করেন নাই, তিনি ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমান করিতে পারেন না। বাহ্য বস্তু যদি কখনও প্রত্যক্ষীভূত না হয়, তবে মানসিক আকার হইতে আমরা তাহার অনুমান করিতে পারি না। যে ব্যক্তি বাহ্য বস্তু কিরূপ তাহা জানেন না, তাঁহার নিকট মানসিক আকার বা প্রত্যয় বাহ্য বস্তুর প্রতিরূপ (copy) বলিয়া প্রতিভাত না হইয়া বাহ্য বস্তু নিরপেক্ষ মৌলিক পদার্থ বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। অতএব আমাদিগকে হয় বিজ্ঞানবাদ স্বীকার করিতে হয়, নয় বাহ্য বস্তুকে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বলিতে হয়। এভাবে বৈভাষিকগণ বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদের প্রতিষ্ঠা করেন।

বাহ্য ও আন্তর উভয় বস্তুই সৎ। বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য, অনুমেয় নহে।

বৈভাষিক আখ্যা ব্যাখ্যা করিতে কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই শ্রেণীর দার্শনিকগণ বৌদ্ধদর্শনের অন্যান্য শাখাগুলিকে বিভাষা অর্থাৎ বিরুদ্ধ-ভাষা-দোষ-দুষ্ট মনে করিতেন বলিয়া তাঁহাদের বৈভাষিক আখ্যা হইয়াছে। অপরপক্ষে, কেহ কেহ বলেন বৈভাষিক দর্শন কেবলমাত্র **অভিধম্ম-মহাবিভাষার** উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহার এরূপ নাম হইয়াছে।

বৈভাষিক নামের অর্থ।

৫। বৌদ্ধধর্মের শাখাসমূহ ঃ

হীনযান ও মহাযান

পূর্বে বলিয়াছি যে, ধর্ম হিসাবে বৌদ্ধমত দুইটি মহতী শাখায় বিভক্ত হয় একটির নাম হীনযান ও অপরটির নাম মহাযান।

হীনযান, বুদ্ধের উপদেশে নিষ্ঠাবান্ স্বাবলম্বী সাধকের পথ।

হীনযান শাখার বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, ইহাতে বুদ্ধের উপদেশ অতি নিষ্ঠার সহিত ও অবিকৃতভাবে গৃহীত হইয়াছে এবং বুদ্ধের নির্দেশমত ধর্ম-বিষয়ে সকলকে স্বাবলম্বী হইতে বলা হইয়াছে। বুদ্ধ বলিতেন, 'আত্মদীপো ভব', অর্থাৎ নিজ চেষ্টায় নিজের মুক্তি সাধন কর; এজন্য ভগবান্, দেবদেবী বা অন্য কাহারও উপর নির্ভরশীল হইও না। বুদ্ধ দেহত্যাগের পূর্বে শেষ কথা বলিয়াছিলেন—"সাবয়ব দ্রব্যমাত্রই ধ্বংসশীল, অধ্যবসায় সহকারে নিজ মুক্তি সাধন কর"। হীনযান পন্থীরা এসব উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। তাঁহারা ঈশ্বর-বিশ্বাসী নহেন, পরন্তু কম ও কর্মফল-নিয়মে সম্পূর্ণ আস্থাবান্। এই নিয়ম অনুসারে বিশ্বসংসার চলিতেছে। কোন কর্মের ফল নষ্ট হয় না, যে যেমন কর্ম করে তাহার তেমনি ফলভোগ হয়। বুদ্ধের জীবনেই দেখা যায় যে, মানুষ নিজের চেষ্টায় মুক্তিলাভ করিতে পারে। সংঘবদ্ধ বুদ্ধশিষ্যগণ সাধকের জীবনে শক্তি সঞ্চার করে, আশা-ভরসা আনিয়া দেয়। 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি' সাধক এই ত্রিশরণ গ্রহণ করিবেন। কর্ম ও কর্মফলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া এবং বুদ্ধ-নির্দিষ্ট পরম পথ অনুসরণ করিয়া হীনযানপন্থী ইহ বা পর জীবনে মুক্তিলাভের আশা করেন। মুক্তি বা নির্বাণ অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য। হীনযান মত ও পথ শক্তিমান্ স্বাবলম্বী সাধকের পথ।

ইহা সকলের জন্য নয়।

কিন্তু এপথ সকলের উপযোগী নয়। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম দেশদেশান্তরে প্রসারলাভ করে এবং নানা দেশের ও নানা ধর্মের লোক নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। ফলে তাহাদের পূর্বকার রীতি-নীতি, অভ্যাস ও ঐতিহ্য আংশিকভাবে বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং ইহার বিশুদ্ধতা কতকাংশে নষ্ট করে। কিন্তু তাহা হইলেও এইভাবে বৌদ্ধধর্মের অধিক প্রসার হয় এবং বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। এইজন্য এরূপে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত বৌদ্ধধর্মশাখাকে মহাযান বলে। ইহাতে সকলপ্রকার ও সকল স্তরের লোকের স্থান আছে এবং এমত সকলেই অনুসরণ করিতে পারে। মহাযানপন্থীরা অপর শাখার বৈসাদৃশ্য প্রদর্শন করিবার জন্য ইহাকে হীনযান বলেন।

মহাযান সকলের উপযোগী ধর্ম।

হীনযানপন্থীদের জীবনের আদর্শ স্বকীয় মুক্তি। কিন্তু মহাযান-পন্থীরা নিজ মুক্তি অপেক্ষা অন্য জীবের মুক্তি কাম্য মনে করিতেন এবং সে জন্য সচেষ্ট হইতেন। তাঁহাদের মতে কেবল নিজের মুক্তির চেষ্টা করাও একপ্রকার প্রচ্ছন্ন স্বার্থপরতা। তাঁহারা বুদ্ধের সর্বজীবের প্রতি করুণা এবং

মহাযান মতে নিজ মুক্তি অপেক্ষা অন্য জীবের মুক্তি কাম্য।

CENTRAL LIBRARY

সকলের দুঃখান্ত ও মুক্তি কামনাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে জীবের দুঃখ-কষ্ট দূর করিবার জন্যই প্রজ্ঞার প্রয়োজন। ইহা স্বীকার করার জন্যই তাঁহাদের মত ও পথকে মহাযান বলে, এবং ইহা স্বীকার না করায় অন্য পথকে হীনযান বলিতে হয়। তাঁহাদের মতে সর্বমুক্তির আদর্শই বুদ্ধের উপদেশের উচ্চতর ভাব ও মর্ম।

বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখায় কিছু কিছু নূতন তথ্য ও ভাব দেখা যায়। তাহাদের প্রধান কয়েকটি নিম্নে বর্ণিত হইল।

বোধিসত্ত্বের আদর্শে প্রজ্ঞা ও করুণার মিলন।

(ক) বোধিসত্ত্বের আদর্শ।—বোধি শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা বা পরম জ্ঞান। যে পরম জ্ঞানদ্বারা সাধক নিজ মুক্তিলাভের চেষ্টা না করিয়া সর্ব জীবের দুঃখ দূর করিবার এবং মুক্তি সাধনের চেষ্টা করেন তাহাকেই বোধিসত্ত্ব বলে। ইহাই মহাযানপন্থীর জীবনের ব্রত ও আদর্শ। বোধিসত্ত্বের আদর্শে এক দিকে প্রজ্ঞা এবং অন্য দিকে সর্বজীবে প্রেম ও সর্বজীবের কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। যে পূর্ণ জ্ঞানী এরূপ প্রচেষ্টা করেন তাঁহাকেও বোধিসত্ত্ব বলে। তাঁহার জীবনে প্রজ্ঞা ও করুণার সমাবেশ দেখা যায়। এ সম্বন্ধে নাগার্জুন বলিয়াছেন যে, বোধিসত্ত্বের মহাকরুণাচিত্ত সর্বজীবের কল্যাণে সমাহিত। এজন্য তিনি জন্ম-মৃত্যুরূপ দুঃখভোগ করিতেও ইচ্ছা করেন। কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর মধ্যেও তাঁহার চিত্তের পবিত্রতা অটুট থাকে, তাঁহাকে পাপ ও কামনা স্পর্শ করিতে পারে না, যেমন পঙ্কে জন্মলাভ করিয়াও প্রফুল্ল কমলের পবিত্রতা নষ্ট হয় না। পাপী-তাপীর সঙ্গে নিজ কর্মফল বিনিময় বা পরিবর্ত করিয়া তিনি তাহাদের আর্তি নাশ করেন এবং তাহাদের প্রাপ্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন।

বুদ্ধ হইলেন পরমেশ্বর এবং গৌতম বুদ্ধ তাঁহার অবতার।

(খ) বুদ্ধের ঈশ্বরত্ব।—বোধিসত্ত্বের আদর্শ উচ্চ শ্রেণীর মহাযানপন্থীদের উপযোগী হইলেও নিম্ন শ্রেণীর মহাযানীদের সন্তুষ্ট করিতে পারে না। তাঁহারা জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ও বিপদ-আপদে এমন এক প্রেমময় পুরুষের আশ্রয় চান যিনি তাঁহাদের অভয় দিবেন, সহায় হইবেন এবং বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। এরূপ পুরুষবিশেষ হইল ঈশ্বর বা ভগবান্। তাঁহারা বুদ্ধকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নিকট বুদ্ধ হইল পরম তত্ত্ব বা পরমেশ্বর এবং গৌতম বুদ্ধ হইল তাঁহার অবতার। এরূপ অনেক অবতার পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের জন্মবৃত্তান্ত জাতকসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। পরতত্ত্বরূপে বুদ্ধ অনির্বচনীয়। কিন্তু তিনি ধর্মকায়রূপে জগতে প্রকাশিত এবং জগতের নিয়ন্তা। ধর্মকায়রূপে বুদ্ধ সর্বজীবের মুক্তি কামনা করেন এবং লোকশিক্ষার জন্য বিভিন্ন গুরুরূপে আবির্ভূত

CENTRAL LIBRARY

হন। অতএব ধর্মকায়রূপে বুদ্ধই হইতেছেন ভগবান্ এবং তাঁহার নিকট দুঃখী মানব দয়া, প্রেম ও মুক্তি ভিক্ষা করিতে পারে। ধর্মকায়রূপে বুদ্ধকে অমিতাভ বুদ্ধও বলে। এইভাবে মহাযান বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধই ঈশ্বরপদবাচ্য হইয়াছেন এবং সাধারণ লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছেন।

ক্ষুদ্র আত্মা অর্থাৎ অহম্ অসৎ, মহান্ আত্মা সৎ এবং সর্বভূতাত্মা।

(গ) আত্মার পুনঃসংস্থাপন।—বৌদ্ধদর্শনের প্রাথমিক যুগে নিত্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। এরূপ অনাত্মবাদ সাধারণ লোকের মনে ভীতির সঞ্চার করিত। কারণ আত্মাই যদি না থাকে তবে কাহার জন্য এত পরিশ্রম, এত কৃচ্ছ্রসাধন? মহাযান মতে মানুষের ক্ষুদ্র আত্মা, অর্থাৎ অহং অসত্য ও অপরমার্থ। কিন্তু এসব ক্ষুদ্র আত্মার অন্তরালে 'এক মহান্ আত্মা বিদ্যমান এবং ইহাই সর্বজীবের আত্মা'। ইহাতে যেন মহাযান ধর্মে আত্মা অধিকতর গৌরবের সহিত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

হীনযান ও মহাযান দুইটি ভিন্ন, কিন্তু সমভাবে উচ্চ আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত।

বর্তমানে হীনযান ও মহাযানপন্থীদের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব এবং পরস্পরকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাদের বিরোধ দুইটি উচ্চ আদর্শের সংঘর্ষমাত্র। হীনযান ধর্মের বিশুদ্ধতার পক্ষপাতী, মহাযান ইহার অধিকতর উপযোগিতার পক্ষপাতী। কিন্তু উভয় আদর্শই সমভাবে আদরণীয়। বিশুদ্ধতা ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি করে সন্দেহ নাই, কিন্তু উপযোগিতাহীন ধর্ম কতকটা নিষ্ফল ও নিরর্থক হইয়া পড়ে। আবার কেবল উপযোগিতা ও কার্যকারিতা ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা না করিলে ধর্মকেই বিনষ্ট করে। সুখের বিষয় বর্তমানে বৌদ্ধধর্মের সর্বসম্মত মূল নীতিগুলির ভিত্তিতে সর্বদেশের ও সর্বশাখার বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মিলন সাধনের চেষ্টা চলিতেছে।

CENTRAL LIBRARY

পঞ্চম অধ্যায়

ন্যায়দর্শন

১। ভূমিকা

ন্যায়দর্শন মহর্ষি গোতমপ্রণীত। তাঁহাকে গৌতম ও অক্ষপাদ নামেও অভিহিত করা হয়। এজন্য ন্যায়দর্শনকে অক্ষপাদদর্শনও বলে। ন্যায়দর্শনে তর্কপদার্থ বিশেষরূপে নিরূপিত হইয়াছে এবং এই দর্শনের সম্যক্ অনুশীলন করিলে তর্ক ও বিচারশক্তির সবিশেষ উন্মেষ হয় বলিয়া ইহাকে তর্কশাস্ত্র ও ন্যায়বিদ্যাও বলে। ন্যায়দর্শনের অপর নাম আন্বীক্ষিকী। শ্রবণের পর আত্মার মনন বা আলোচনাকে অন্বীক্ষা বলে। ন্যায়দর্শন অন্বীক্ষার নির্বাহ করে বলিয়া তাহার নাম আন্বীক্ষিকী।

ন্যায়দর্শন মহর্ষি গোতম-প্রণীত।

ন্যায়দর্শনে যুক্তি-তর্ক এবং প্রমা-প্রমাণ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা প্রাধান্য-লাভ করিলেও ইহা একপ্রকার মোক্ষশাস্ত্র এবং মোক্ষই ইহার চরম উদ্দেশ্য। মোক্ষলাভ করিতে হইলে তত্ত্বজ্ঞান প্রয়োজন এবং তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণ করিতে হইলে যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা এবং তাহার সাধন বা প্রমাণ প্রভৃতির বিচার করিতে হয়। এজন্যই ন্যায়দর্শনে প্রমা-প্রমাণ প্রভৃতির সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য দর্শন-শাখার ন্যায় ইহাও প্রকৃতপক্ষে মোক্ষকামীর একপ্রকার জীবন-দর্শন।

ইহাতে তর্ক-বিচার প্রাধান্য লাভ করিলেও মোক্ষই ইহার চরম উদ্দেশ্য।

গোতমের ন্যায়সূত্র ন্যায়দর্শনের মূল গ্রন্থ। বাৎস্যায়নের ন্যায়ভাষ্য, উদ্দ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিক, বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকা, উদয়নের কুসুমাঞ্জলি, জয়ন্ত ভট্টের ন্যায়মঞ্জরি প্রভৃতি পরবর্তীকালের গ্রন্থ ন্যায়সূত্র অবলম্বনে এবং তাহারই ব্যাখ্যামুখে লিখিত। এসব গ্রন্থে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ন্যায়দর্শনের সিদ্ধান্তসমূহ খণ্ডন করিতে যেসব যুক্তি-তর্ক করিয়াছেন তাহারই খণ্ডন করিয়া ন্যায়দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ইহাই প্রাচীন ন্যায়ের ইতিহাস। তারপর গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তত্ত্বচিন্তামণির আলোকে নব্য ন্যায়ের অভ্যুদয় হয়। এককালে মিথিলা নব্য ন্যায়ের পঠন-পাঠনের কেন্দ্র ছিল। পরবর্তী কালে বাংলা দেশের নবদ্বীপধামে রঘুনাথ শিরোমণিপ্রমুখ

ন্যায়দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

নৈয়ায়িকগণ ইহার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেন। তাহার পরে বৈশেষিক দর্শনের সহিত ন্যায়দর্শনের সংমিশ্রণ ঘটে এবং ইহা হইতে ন্যায়-দর্শনের যে রূপান্তর হয় তাহাকে বৈশেষিক-সম্মিলিত-ন্যায়দর্শন (Syncretist School of the Nyāya) বলে।

ন্যায়দর্শনের ষোড়শ পদার্থ।

আলোচনার সৌকর্যার্থে ন্যায়দর্শনকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—প্রামাণ্যবাদ, ভূতসর্গবাদ, জীবাত্মা ও মোক্ষবাদ এবং ঈশ্বরবাদ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ন্যায়দর্শনে ষোড়শ পদার্থের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এই ষোড়শ পদার্থ হইল—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। ইহাদের তত্ত্বজ্ঞান হইলে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিলাভ করা যায়।

প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের করণকে প্রমাণ বলে। প্রমাণ চারিপ্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। ইহাদের বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হইবে।

প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের বিষয়কে প্রমেয় বলে। প্রমেয় দ্বাদশ প্রকার—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ। (১) আত্মা দ্রষ্টা ও ভোক্তা। (২) আত্মার ভোগায়তন অর্থাৎ যাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া আত্মা ভোগ করেন, তাহাই শরীর। (৩) আত্মার ভোগসাধন ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় পাঁচপ্রকার—ঘ্রাণ, রসন বা রসনা, চক্ষু, ত্বক্ ও শ্রোত্র। (৪) ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের নাম অর্থ। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় গন্ধ, রসনেন্দ্রিয়ের বিষয় রস, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ, ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় স্পর্শ ও শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ। (৫) বুদ্ধি বলিতে উপলব্ধি বা জ্ঞান বুঝায়। (৬) মন অন্তরেন্দ্রিয়, অভৌতিক ও অণুপরিমাণ। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলেই জ্ঞান হয় না, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ হইলেই তবে জ্ঞান হয়। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ থাকিলেও এককালে অনেক জ্ঞান হয় না, কারণ মন অণুপরিমাণ বলিয়া এককালে একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে। মনদ্বারা সুখদুঃখ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয়। (৭) প্রবৃত্তি তিনপ্রকার—শারীরিক, বাচিক ও মানসিক, ইহারা সৎ বা অসৎ হইতে পারে। (৮) প্রবৃত্তির হেতু দোষ। দোষ তিনপ্রকার, যথা—রাগ, দ্বেষ ও মোহ। (৯) মৃত্যুর পর জন্ম প্রেত্যভাব। (১০) দোষ ও প্রবৃত্তিজনিত সুখদুঃখের অনুভূতি হইল ফল। (১১) দুঃখ বাধনা বা পীড়ালক্ষণ এবং সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। (১২) দুঃখের অত্যন্ত বিনাশ বা নিবৃত্তি অপবর্গ। উল্লিখিত দ্বাদশ প্রমেয় ব্যতীত অন্যান্য প্রমেয় আছে, তবে এগুলিই অপবর্গলাভে প্রয়োজনীয়।

CENTRAL LIBRARY

অনবধারণ বা অনিশ্চিত জ্ঞানের নাম সংশয়। সংশয়ে একই বিষয়ে নানা বিরুদ্ধ ধর্মের স্মরণ হয়, কিন্তু তাহাদের নিশ্চায়ক কোন বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি হয় না। এস্থলে বিরুদ্ধ ধর্মের মধ্যে কোন্‌টি বস্তুর প্রকৃত ধর্ম তাহার নিশ্চয় না হওয়ায় মন তন্মধ্যে দোলায়মান হয়। দূর হইতে কোন উচ্চ পদার্থ দেখিলে, 'ইহা স্থাণু কি মনুষ্য' এরূপ সন্দেহ হয়। এখানে স্থাণু ও মনুষ্যের সাধারণ ধর্ম উচ্চতা দৃষ্ট হয় এবং স্থাণুত্ব ও মনুষ্যত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্মের স্মরণ হয়। কিন্তু এই দুইটি ধর্মের নির্ণায়ক কোন বিশেষ ধর্ম দৃষ্ট হয় না। ফলে ঐ উচ্চ পদার্থবিষয়ে মনে, 'ইহা স্থাণু কি মনুষ্য' এরূপ সংশয়ের উদয় হয়।

যে বস্তুর উদ্দেশ্যে লোকের প্রবৃত্তি হয় তাহাকে প্রয়োজন বলে। লোকে যে সব কার্য করে তাহার চরম লক্ষ্য সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখপরিহার। অতএব সুখ ও দুঃখাভাব মুখ্য প্রয়োজন, তদ্ভিন্ন সব বস্তুই গৌণ প্রয়োজন।

যে বিষয়ে সাধারণ লোকের এবং শিক্ষিত ও বিচারশীল ব্যক্তির মতভেদ হয় না, অর্থাৎ উভয়েই সমভাবে বুঝেন ও স্বীকার করেন, তাহাকে দৃষ্টান্ত বলে। যেমন দূরস্থ পর্বতে ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমান স্থলে মহানস বা পাকস্থানকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যায়, কারণ মহানসে ধূম ও অগ্নির সহাবস্থান সকলেই স্বীকার করেন।

'ইহা এইপ্রকার' এভাবে স্বীকৃত বিষয়ের নাম সিদ্ধান্ত। যেমন 'আত্মা একটি দ্রব্য এবং জ্ঞান বা চৈতন্য ইহার আগন্তুক গুণ', ইহা ন্যায়দর্শনের একটি সিদ্ধান্ত।

অনুমানের অন্তর্গত তর্কবাক্যগুলিকে অবয়ব বলে। যেমন প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন অনুমানের অবয়ব।

কোন স্বীকৃত সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিবার জন্য যে অনুমান করা যায় তাহাকে তর্ক বলে। ইহাতে ঐ সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিলে কি অনিষ্টাপত্তি বা দোষ হয় তাহা দেখান হয়। যেমন ধূম দেখিয়া কেহ সিদ্ধান্ত করিলেন, 'পর্বতটি বহ্নিমান্'। এখন কেহ এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিলে এরূপ অনুমানদ্বারা তাহার দোষ দেখান যায়: 'যদি পর্বতটি বহ্নিমান্ না হয়, তবে বিনাকারণে কার্য হয় বলিতে হইবে, কারণ অগ্নিই ধূমের একমাত্র জ্ঞাত কারণ'। এরূপ অনুমানকে তর্ক বলে। তর্কদ্বারা বস্তুর জ্ঞানলাভ করা যায় না, জ্ঞাত বিষয়কে সমর্থন করা যায়। এজন্য তর্ক প্রমাণ নয়, প্রমাণের সহকারীমাত্র।

CENTRAL LIBRARY

কোন অর্থ বা বিষয়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কি যুক্তি-তর্ক হইতে পারে তাহা আলোচনা করিয়া ঐ অর্থের অবধারণ বা নিশ্চয়ের নাম নির্ণয়। নির্ণয় সংশয়পূর্বক বা সংশয় ব্যতিরেকেও হইতে পারে। ইহা প্রমাণ ও তর্কের ফল।

কেবলমাত্র তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য যে বিচার প্রবর্তিত হয় তাহাকে বাদ বলে। ইহাতে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই তত্ত্বনির্ণয়ের চেষ্টা করেন। বাদবিচার প্রমাণ ও তর্কের সাহায্যে করা হয়। ইহা পঞ্চাবয়বযুক্ত হয় এবং ইহাতে কোন স্বীকৃত সিদ্ধান্তের অপলাপ করা হয় না।

তত্ত্বনির্ণয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র নিজের জয় ও পরপক্ষের পরাজয়ের উদ্দেশ্যে যে বিচার প্রবর্তিত হয় তাহাকে জল্প বলে। ব্যবহার-জীবীরা কখন কখন বিচারালয়ে এরূপ জল্পের অবতারণা করেন।

স্বপক্ষ স্থাপনের চেষ্টা না করিয়া কেবল পরপক্ষ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে যে তর্কযুক্তি করা হয় তাহাকে বিতণ্ডা বলে। জল্পে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ প্রতিষেধ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিতণ্ডায় স্বপক্ষের কোনও নির্দেশ না করিয়া কেবল পরপক্ষ খণ্ডনের চেষ্টা করা হয়।

অনুমান সদ্ধেতুবলেই অনুমিত বা যথার্থ অনুমানজ্ঞান হয়। কিন্তু কোন কোন হেতু সদ্ধেতু বলিয়া প্রতিভাত হইলেও প্রকৃতপক্ষে দোষদুষ্ট বলিয়া অনুমেয়ের গমক হয় না। এরূপ দুষ্ট হেতুকে হেত্বাভাস বলে। পরে ইহার প্রকারভেদের আলোচনা করা হইবে।

বক্তা যে অর্থে বাক্যপ্রয়োগ করেন তাহার বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়া দোষ প্রদর্শন করাকে ছল বলে। যেমন কেহ 'এই লোকটি নূতন-কম্বলযুক্ত' এই অর্থে বলিলেন 'লোকটি নবকম্বল'। প্রতিপক্ষ বলিলেন 'ইহার একটি মাত্র কম্বল আছে, **নয়টি** নহে'। এখানে প্রতিপক্ষ বক্তার অভিপ্রেত অর্থের বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়া দোষোদ্ভাবন করিলেন, ইহারই নাম ছল।

জাতি শব্দটি এখানে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে প্রতিবাদী ব্যাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া কেবল সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যবলে বাদীর যুক্তির দোষোদ্ভাবন করেন। যেমন 'শব্দ ঘটপটাদির ন্যায় জন্য পদার্থ বলিয়া অনিত্য' এরূপ সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে কোন প্রতিপক্ষ বলিলেন 'শব্দ আকাশের ন্যায় অমূর্ত পদার্থ বলিয়া নিত্য'। এখানে অমূর্তত্ব ও নিত্যত্বের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ অমূর্ত পদার্থমাত্রই নিত্য নহে, যেমন সুখ, দুঃখ ইত্যাদি। অতএব প্রতিবাদী কেবল সাধর্ম্যবলে বাদীর যুক্তি বা সিদ্ধান্ত

খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিলেন। এরূপ কুযুক্তিবলে দোষোদ্ভাবন করার নাম জাতি।

বিচারে নিগ্রহের অর্থাৎ পরাজয়ের স্থান বা হেতুকে নিগ্রহস্থান বলে। সাধারণভাবে বলা যায়, যদ্দ্বারা বিচারকারীর বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিপরীত বা ভ্রমাত্মক জ্ঞান এবং অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ প্রকৃতবিষয়ে অজ্ঞান প্রকাশ পায় তাহার নাম নিগ্রহস্থান। প্রতিজ্ঞাহানি অর্থাৎ প্রথমে একপ্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে তাহার পরিহার, দুষ্ট হেতুপ্রয়োগ, পরপক্ষে দোষোদ্ভাবন না করা অথবা পরপক্ষ কর্তৃক উদ্ভাবিত দোষের উদ্ধার না করা প্রভৃতি নিগ্রহস্থান।

ন্যায়দর্শন যুক্তিসিদ্ধ বস্তুতন্ত্রবাদ (logical realism)। যে মতে জাগতিক পদার্থের জ্ঞাননিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করা হয় তাহাকে বস্তুতন্ত্রবাদ (realism) বলে। সুখদুঃখ প্রভৃতির সত্তা মনসাপেক্ষ, ইহারা মনোগত অনুভূতি, ইহাদের মনোনিরপেক্ষ সত্তা নাই। কিন্তু ঘট-পটাদির সত্তা মনের উপর নির্ভর করে না। ইহাদের মন ও জ্ঞান-নিরপেক্ষ সত্তা আছে। ইহারা জ্ঞাত হউক বা অজ্ঞাত থাকুক তাহাতে ইহাদের সত্তার কোন ইতরবিশেষ হয় না। গৃহমধ্যস্থ ঘটকে কেহ না জানিলেও উহা বিদ্যমান ছিল এবং বিদ্যমান থাকিবে। যে মতে বস্তুর এরূপ মন ও জ্ঞান-নিরপেক্ষ সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে তাহাকে বস্তুতন্ত্রবাদ বলে। পক্ষান্তরে, বিজ্ঞানবাদে (idealism) বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করা হয় না। বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, কোন বস্তুর অস্তিত্বের অর্থ হইতেছে যে, উহা আমার বা অন্য কাহারও, কোন জীবের বা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ বা জ্ঞানগোচর। জ্ঞাত বিষয়কেই আমরা অস্তিত্ববান্ বলিতে পারি, যাহা কেহ জানে না তাহাকে বিদ্যমান বলিয়া আমরা নিশ্চয় করিতে পারি না। যে মতে সকল বস্তুর সত্তা মন বা জ্ঞানসাপেক্ষ, অর্থাৎ মন বা জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তাহাকে বিজ্ঞানবাদ বা চেতনবাদ (idealism) বলে। ন্যায়মতে বস্তুর জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা আছে। অতএব ইহাকে বস্তুতন্ত্রবাদ (realism) বলা যায়। আর ন্যায়দর্শনে এই মত কেবল বেদনা (feeling) বা বিশ্বাস (faith) বা অপরোক্ষানুভূতির (intuition) উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কিন্তু ন্যায়সম্মত বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব ইহাকে যুক্তিসিদ্ধ বস্তুতন্ত্রবাদ বলা যায়। অন্যান্য আস্তিক দর্শনের ন্যায় এই দর্শনমতেও পরম পুরুষার্থ বা মুক্তি তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা লাভ করা যায়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান, জ্ঞান প্রমাণ প্রামাণ্য প্রভৃতির যুক্তিযুক্ত জ্ঞান বা বিচারসাপেক্ষ। অর্থাৎ প্রমা-বিজ্ঞানের (theory of knowledge or epistemology) উপর তত্ত্ববিদ্যার (theory of reality or metaphysics) প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এ জন্য ন্যায়দর্শনে প্রমা ও প্রামাণ্যবিষয়ে বিস্তৃত বিচার করা হইয়াছে।

ন্যায়দর্শন যুক্তিসিদ্ধ বস্তু-তন্ত্রবাদ।

২। ন্যায়দর্শনে প্রমা ও প্রামাণ্য-বিচার
(Nyāya Theory of Knowledge)

ন্যায়দর্শনে তত্ত্বজ্ঞান প্রমা ও প্রামাণ্য-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রমাণ চারিপ্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। ইহারা পৃথক্ এবং ভিন্ন-প্রকার, একটি অন্যের অন্তর্গত নহে। এগুলি ব্যাখ্যা করিবার পূর্বে আমাদিগকে জ্ঞানের লক্ষণ ও প্রকারভেদ এবং যথার্থ ও অযথার্থ জ্ঞানের ভেদ ও তাহা নিশ্চয় করিবার উপায় প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। তৎপরে প্রমাণ কাহাকে বলে তাহাও বুঝিতে হইবে। এসব বিষয় বুঝিলে আমরা প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণগুলি একে একে আলোচনা করিতে পারিব।

(১) জ্ঞানের লক্ষণ ও প্রকারভেদ

জ্ঞান, অর্থের প্রকাশ বা উপলব্ধি। প্রমা ও অপ্রমা ইহার দুইটি প্রকারভেদ। প্রমার লক্ষণ।

ন্যায়দর্শনে জ্ঞান, বুদ্ধি ও উপলব্ধি পর্যায়শব্দ অর্থাৎ এ শব্দগুলি একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। জ্ঞান বলিতে অর্থ বা বিষয়ের প্রকাশ বুঝায়। প্রদীপের আলোক যেমন ঘট পট প্রভৃতিকে প্রকাশ করে, জ্ঞান সেইরূপ সকলপ্রকার অর্থকে প্রকাশ করে। জ্ঞান বিভিন্নপ্রকারের হইতে পারে। প্রমা ও অপ্রমা, জ্ঞানের দুইটি প্রধান প্রকারভেদ। প্রমাজ্ঞান চারিপ্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রমাজ্ঞানকে প্রমিতিও বলে। স্মৃতি, সংশয়, ভ্রম বা বিপর্যয় এবং তর্ক অপ্রমাজ্ঞানের অন্তর্গত। কোন অর্থ বা বিষয়ের যথার্থ ও অসন্দিগ্ধ অনুভবকে প্রমা বলে। যেমন আমার নিকটস্থ ঘটের প্রত্যক্ষ একটি প্রমাজ্ঞান। এখানে ঘটকে ঘট বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, অতএব ইহা যথার্থ। ঘটটি আমার অনুভবের বিষয়, অতএব ইহা অনুভব-জ্ঞান। আর আমার জ্ঞান যে যথার্থ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, অতএব ইহা অসন্দিগ্ধ জ্ঞান। এরূপ জ্ঞানকে প্রমা বা প্রমিতি বলে। স্মৃতি প্রমা নহে, কারণ ইহা অনুভব-জ্ঞান নয়। পূর্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞানকে স্মৃতি বলে, এবং ইহা কেবল-মাত্র পূর্বানুভবের সংস্কার হইতে উৎপন্ন হয়। যখন আমি পূর্বদৃষ্ট বারাণসী নগরী স্মরণ করিয়া বলি 'সেই বারাণসী' তখন আমার বারাণসীর কোন অনুভব-জ্ঞান হয় না, কেবল পূর্বানুভবের সংস্কারমাত্র উদ্বুদ্ধ হয় এবং তজ্জন্য যে জ্ঞান হয় তাহা অনুভব হইতে ভিন্নরূপ জ্ঞান। অবশ্য স্মৃতি পূর্বানুভবের যাথার্থ্য বা অযাথার্থ্য অনুসারে যথার্থ বা অযথার্থ হইতে পারে।

অপ্রমার প্রকারভেদ।

যেমন পূর্বদৃষ্ট ঘটের স্মৃতি যথার্থ, আর পূর্বদৃষ্ট রজ্জুসর্প বা মায়ামৃগের স্মৃতি অযথার্থ। সংশয় প্রমা নহে, কারণ ইহা অসন্দিগ্ধ অবধারণ জ্ঞান নহে। ভ্রম-জ্ঞান অসন্দিগ্ধ ও অনুভবাত্মক হইতে পারে। কিন্তু ইহা অযথার্থ বলিয়া প্রমাজ্ঞান নহে। যাহার রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় তাহার ভ্রমকালে সর্পবিষয়ে কোন সন্দেহ হয় না, আর সর্পটি তাহার প্রত্যক্ষ-অনুভবের বিষয়ও হয়। তথাপি ভ্রম অযথার্থ জ্ঞান বলিয়া প্রমা হইতে পারে না। তর্কও প্রমা নহে। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, তর্কদ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করা যায় না, কেবল প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণদ্বারা লব্ধ জ্ঞানের সমর্থন করা যায়।

যথার্থ ও অযথার্থ জ্ঞানের ভেদ নির্ণয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে : যথার্থ ও অযথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ কি? কোন জ্ঞান যথার্থ বা অযথার্থ তাহা আমরা কিরূপে জানিতে পারি? যে জ্ঞান উহার বিষয়ের স্বরূপ বা যথার্থ রূপকে প্রকাশ করে (তদ্বতি তৎপ্রকারকম্), তাহাই যথার্থ জ্ঞান। যেমন কাহারও চক্ষুসন্নিকৃষ্ট ঘটের জ্ঞান ঘটের স্বধর্মানুযায়ী হইলে যথার্থ হইবে। পক্ষান্তরে, কেহ যদি কোন ঘটকে পট বলিয়া জানে, তাহার জ্ঞান অযথার্থ হইবে। কারণ এখানে যে দ্রব্যে পটধর্ম নাই তাহাতে পটধর্মের আরোপ হইতেছে (তদভাববতি তৎপ্রকারকম্)। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, প্রথম জ্ঞানটি যে যথার্থ এবং দ্বিতীয়টি যে অযথার্থ তাহা আমরা কিরূপে নির্ণয় করিতে পারি? ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে (তথা বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনে) প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য নির্ণয়ের উপায় এইরূপ :—জ্ঞান যথার্থ হইলে তদ্দ্বারা আমাদের প্রবৃত্তি বা কর্ম সফল হয়, অপরপক্ষে, অযথার্থ বা ভ্রমজ্ঞান-প্রণোদিত প্রবৃত্তি বিফল হয় এবং কর্মে বিঘ্ন ও বিসংবাদ উপস্থিত হয়। পিপাসার্ত ব্যক্তি পুষ্করিণীতে জল প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা পান ও তাহাতে স্নান করিয়া তাঁহার প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য বিষয়ে নিশ্চিত হন। অপর দিকে, মরুভূমিতে কখন কখন সূর্যকিরণে জলভ্রম হয়। কিন্তু যখন কেহ এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া সে জল পান করিতে বা তাহাতে স্নান করিতে যাইয়া বিফলমনোরথ হন, তখন তাহার জ্ঞানের অযাথার্থ্য বা অপ্রামাণ্য বুঝিতে পারেন। অতএব ন্যায়-বৈশেষিক-মতে প্রবৃত্তিসামর্থ্য ও প্রবৃত্তিবিসংবাদদ্বারা জ্ঞানের যাথার্থ্য ও অযাথার্থ্য অনুমিত হয়।

প্রমার করণের নাম প্রমাণ।

প্রমার করণকে প্রমাণ বলে, অর্থাৎ যাহাদ্বারা প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহাই প্রমাণ। পূর্বে বলিয়াছি প্রমা চারি-প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। ইহাদের করণকে প্রমাণ বলে। অতএব প্রমাণও চারিপ্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি শব্দদ্বারা

CENTRAL LIBRARY

প্রমাও বুঝায় প্রমাণও বুঝায়। যখন প্রত্যক্ষ প্রভৃতি একপ্রকার জ্ঞান বুঝায়, তখন ইহাদের প্রমা বলে। আর যখন ইহারা একপ্রকার জ্ঞানের করণ বুঝায়, তখন ইহাদের প্রমাণ বলে।

কারণ ও করণ।

করণ কাহাকে বলে? অসাধারণ কারণকে করণ বলে। কারণ ও করণের প্রভেদ কি? কোন কার্যের নিয়তপূর্বভাবী এবং কার্যান্তরে অপ্রযুক্ত বস্তুকে **কারণ** বলে। যেমন তন্তু বস্ত্রের কারণ, তন্তুর বর্ণ বস্ত্রের কারণ নয়। তন্তুর বর্ণ বস্ত্রের নিয়তপূর্বভাবী হইলেও বস্ত্রের বর্ণ উৎপাদনে প্রযুক্ত, বস্ত্র উৎপাদনে প্রযুক্ত নয়। অতএব কারণকে অন্যথাসিদ্ধিশূন্য নিয়তপূর্বভাবী বস্তু বলে।

কারণ ত্রিবিধ, যথা—সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত। কার্য উৎপন্ন হইয়া যাহাতে সমবেত থাকে তাহাকে **সমবায়ী কারণ** বলে। যেমন পট উৎপন্ন হইয়া তন্তুসমূহে সমবেত থাকে, অতএব তন্তুসমূহ পটের সমবায়ী কারণ।[১]

যে কারণ সমবায়ী কারণে সমবেত থাকিয়া কার্য উৎপন্ন করে, তাহাকে **অসমবায়ী কারণ** বলে। যেমন তন্তুসংযোগ তন্তুতে সমবেত থাকিয়া পটরূপ কার্য উৎপন্ন করে, অতএব তন্তুসংযোগ পটের অসমবায়ী কারণ। সেইরূপ তন্তুর বর্ণ তন্তুতে সমবেত থাকিয়া পটের বর্ণের কারণ হয়। অতএব তন্তুর বর্ণ পটের বর্ণের অসমবায়ী কারণ।

সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ ভিন্ন অন্য কারণকে **নিমিত্ত কারণ** বলে। যেমন মাকু, বেমা প্রভৃতি পটের নিমিত্ত কারণ।

অসাধারণ কারণের নাম করণ।

এই ত্রিবিধ কারণের মধ্যে অসাধারণ কারণকে **করণ** বলে। অথবা যাহা সাধকতম কারণ তাহাই করণ। যেমন বৃক্ষচ্ছেদন-রূপ কার্যে বৃক্ষ-কুঠার-সংযোগ অসাধারণ বা সাধকতম কারণ বলিয়া করণপদবাচ্য। এখানে দেশ কাল প্রভৃতি সাধারণ কারণ, যেহেতু কোন দেশে ও কালে থাকিয়াই বৃক্ষচ্ছেদন করিতে হয়, নতুবা বৃক্ষচ্ছেদনরূপ কার্য হয় না। কিন্তু দেশ কাল প্রভৃতি ছেদন-কার্যের করণ নহে।

(২) প্রত্যক্ষ

প্রত্যক্ষের লক্ষণ।

প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বলে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা সংযোগ হইলে বিষয়ের যে যথার্থ অনুভব হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ কোন বস্তু ইন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্ট হইলে, তাহার যে যথার্থ ও নিশ্চিত অনুভব হয়,

১। সমবায় সম্বন্ধের ব্যাখ্যা বৈশেষিকদর্শনে দ্রষ্টব্য।

তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। অতএব বিষয়-সন্নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। তর্কশাস্ত্রে প্রত্যক্ষ বলিতে যথার্থ ও অবধারিত জ্ঞান বুঝায়। চক্ষুরিন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্ট ঘটজ্ঞান যথার্থ অবধারণ হইলে প্রত্যক্ষ-প্রমা হইবে। পক্ষান্তরে, 'দূরস্থ বস্তুটি স্থাণু কি মনুষ্য?' এরূপ অনবধারণ-জ্ঞান বা সংশয় প্রত্যক্ষ নহে। রজ্জুতে দৃষ্ট অযথার্থ সর্পজ্ঞানও প্রত্যক্ষ-প্রমা নহে। অবশ্য সাধারণভাবে এবং মনোবিদ্যায় এগুলিকে প্রত্যক্ষ বলা হয়।

(ক) লৌকিক ও অলৌকিক প্রত্যক্ষ

লৌকিক ও অলৌকিক প্রত্যক্ষ।

প্রত্যক্ষের বিভিন্নভাবে প্রকারভেদ করা হইয়াছে। একভাবে প্রত্যক্ষ দুই-প্রকার—লৌকিক ও অলৌকিক। লৌকিক প্রত্যক্ষ স্বাভাবিক বা সাধারণ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্য। ইহাতে সাধারণভাবে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইয়া বিষয়টির প্রত্যক্ষ হয়। অলৌকিক প্রত্যক্ষে বিষয়টি স্বভাবতঃ যে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত অসাধারণভাবে সন্নিকৃষ্ট হয় এবং তাহার প্রত্যক্ষ হয়। লৌকিক প্রত্যক্ষ বাহ্য এবং আন্তর বা মানস ভেদে দুইপ্রকার। বাহ্য প্রত্যক্ষ চক্ষু, শ্রোত্র, ত্বক্, ঘ্রাণ ও রসনা এই পঞ্চ বাহ্য-ইন্দ্রিয়জন্য। বাহ্য-ইন্দ্রিয়সকল ভৌতিক অর্থাৎ ভূত হইতে উৎপন্ন। ভূত পাঁচপ্রকার—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ। ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব, রসনেন্দ্রিয় জলীয়, চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস, ত্বগিন্দ্রিয় বায়বীয় এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয় আকাশীয়। ইহাদের বিষয় যথাক্রমে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। আন্তর বা মানসপ্রত্যক্ষ মনের সহিত সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আন্তর বিষয়ের সন্নিকর্ষজন্য। মন অভৌতিক। এজন্য মন সর্ব-বিষয়, অর্থাৎ সব বিষয়ই প্রত্যক্ষ করিতে পারে। ন্যায়-বৈশেষিকমতে মন অন্তরিন্দ্রিয় এবং আন্তর বা মানসিক বিষয় প্রত্যক্ষের করণ। ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হইলে যে প্রত্যক্ষ হয় তাহাকে লৌকিক বা সাধারণ প্রত্যক্ষ বলে।

বাহ্য ও আন্তর প্রত্যক্ষ

অলৌকিক প্রত্যক্ষ তিন-প্রকার—সামান্যলক্ষণ,

অলৌকিক বা অসাধারণ প্রত্যক্ষ তিনপ্রকার—সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ। যে প্রত্যক্ষে সামান্য-স্বরূপ সন্নিকর্ষ-দ্বারা একজাতীয় সকল বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় তাহাকে সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ বলে। আমরা বলি 'সকল মানুষ মরণশীল'। এরূপ কথা বলিলে বুঝা যায় যে, আমাদের সকল মনুষ্য সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান আছে, নতুবা আমরা **'সকল মানুষ মরণশীল'** এ কথা বলিতে পারি না। কিন্তু সাধারণ প্রত্যক্ষদ্বারা আমরা সকল মনুষ্যকে জানিতে পারি না। কারণ প্রত্যক্ষের জন্য ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ আবশ্যক। কিন্তু সকল মনুষ্য তো

আমাদের ইন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্ট নহে। অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের এবং বর্তমান কালের দূরস্থ মনুষ্যগণ আমাদের ইন্দ্রিয়ের সন্নিহিত নহে, সুতরাং সে সকল মনুষ্যের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে পারে না। তথাপি আমরা সকল মনুষ্যকে কিরূপে জানি? ন্যায়-বৈশেষিকমতে সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষদ্বারা তাহা জানা যায়। সকল মানুষেরই মনুষ্যত্বধর্ম আছে, যেমন সকল ধূমের ধূমত্বধর্ম আছে। মনুষ্যত্ব, ধূমত্ব প্রভৃতিকে সামান্য বলে।[১] কোন মনুষ্য বা ব্যক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্ট হইলে 'মনুষ্য' এইরূপ প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় এবং মনুষ্যটির মনুষ্যত্বধর্মেরও প্রত্যক্ষ হয়। সেইস্থলে মনুষ্যত্বদ্বারা সকল মনুষ্যের প্রত্যক্ষ হয়। মনুষ্যত্ব প্রত্যক্ষ করিলে মনুষ্যত্বের ধর্মীরূপে সকল মনুষ্যের প্রত্যক্ষ হয়। মনুষ্যত্বটি সামান্য এবং এই সামান্যই সন্নিকর্ষের কাজ করে। অতএব সকল মনুষ্যের প্রত্যক্ষ সামান্য-স্বরূপ সন্নিকর্ষজন্য। সামান্য-স্বরূপ সন্নিকর্ষজন্য বলিয়া এ জ্ঞানকে সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ বলে।

জ্ঞানলক্ষণ।

জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষে যে বিষয়টি প্রত্যক্ষ হয় তাহার জ্ঞানই প্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ষ হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষের কাজ করে। আমরা অনেক সময় দূর হইতে দেখিয়া বলি 'ঐ সুরভি চন্দন, শীতল তুষার, উষ্ণ বহ্নি ইত্যাদি'। কিন্তু সাধারণভাবে চক্ষুরিন্দ্রিয় গন্ধ ও স্পর্শগুণ গ্রহণ করিতে পারে না। চক্ষুদ্বারা গন্ধ ও স্পর্শগুণের যে প্রত্যক্ষ হয়, ন্যায়-বৈশেষিকমতে তাহা জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষ। ইহাতে পূর্বে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা ত্বগিন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষলব্ধ গন্ধ বা স্পর্শ-জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত ঐ সব গুণের সন্নিকর্ষ উৎপন্ন করে। পূর্বে ভূয়োদর্শনের ফলে চন্দনের চাক্ষুষ ও ঘ্রাণজ-জ্ঞান ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ হয়। এজন্য পরবর্তী কালে চন্দনের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ ঘ্রাণজ গন্ধ-জ্ঞানকে উদ্বোধিত করে। এই গন্ধ-জ্ঞানই চাক্ষুষ গন্ধপ্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ হয়। অতএব যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ তাহার জ্ঞানই প্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ষ হইতেছে। এজন্য ইহাকে জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ বলে এবং ইহা স্বাভাবিক বা সাধারণ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্য নহে বলিয়া ইহাকে অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে।

যোগজ।

যোগজ প্রত্যক্ষ তৃতীয়প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রে যোগাভ্যাসজনিত ধর্মবিশেষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এরূপ যোগজ ধর্মের সহায়ে যোগীরা মনের দ্বারা আকাশ, পরমাণু, ভূত-ভবিষ্যৎ সকল পদার্থই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ইহাকে যোগজ প্রত্যক্ষ বলে। যোগজ প্রত্যক্ষ দুইপ্রকার—যুক্ত বা সিদ্ধ যোগীর প্রত্যক্ষ এবং যুঞ্জান বা যোগারোহী

১। সামান্যের লক্ষণ ও ব্যাখ্যা বৈশেষিকদর্শনে দ্রষ্টব্য।

CENTRAL LIBRARY

যোগীর প্রত্যক্ষ। যুক্ত যোগীর সমস্ত পদার্থবিষয়ক জ্ঞান সর্বদা ও স্বতঃই হইতে পারে। যুঞ্জান যোগীর এরূপ প্রত্যক্ষে ধ্যান বা চিন্তাবিশেষও সহকারীরূপে আবশ্যক।

(খ) সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ

নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষ।

আর একভাবে প্রত্যক্ষের প্রকারভেদ করা হয়। এভাবে প্রত্যক্ষ দুই-প্রকার—নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক। কোন বস্তুর নিষ্প্রকারক জ্ঞানকে নির্বিকল্পক জ্ঞান বলে। অর্থাৎ যে প্রত্যক্ষে বস্তুর জ্ঞান হয়, কিন্তু বস্তুটি 'এই প্রকার' এরূপ জ্ঞান হয় না, তাহাকে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে। যেমন কোন ঘটের সহিত আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইবামাত্র আমি অনুভব করি 'এটি কোন দ্রব্য, কোন রূপ, কোন আকার ইত্যাদি'; কিন্তু দ্রব্যটি যে বিশেষ্য এবং রূপ, আকার প্রভৃতি যে তাহার বিশেষণ, অথবা এটি যে ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট এরূপে অনুভব হয় না। এরূপ বিশেষ্য-বিশেষণ-সম্বন্ধ-অনবগাহি (অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ-সম্বন্ধাকারে অপরিণত) জ্ঞানকে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে। পক্ষান্তরে, কোন বস্তুর সপ্রকারক জ্ঞানকে সবিকল্পক বলে। অর্থাৎ যে প্রত্যক্ষে বস্তুটির এবং রূপ, আকার প্রভৃতির শুধু পৃথক্ অস্তিত্ব জ্ঞান হয় না, কিন্তু বস্তুটি যে এইরূপ ও এইজাতীয় এরূপ জ্ঞান হয় তাহাকে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে। যেমন কোন ঘটের সহিত আমার চক্ষু-রিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা সংযোগ হইবার দ্বিতীয় ক্ষণে আমি অনুভব করিতে পারি যে, ঘটটি বিশেষ্য এবং রূপ, আকার প্রভৃতি তাহার বিশেষণ, অথবা ইহা ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট। এরূপ নামজাত্যাদি-বিশেষণ-বিশেষ্য-সম্বন্ধ-অবগাহি জ্ঞানকে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে। সবিকল্পক জ্ঞানে নির্বিকল্পক জ্ঞান অপেক্ষিত, অর্থাৎ সবিকল্পক জ্ঞান হইতে হইলে পূর্বে নির্বিকল্পক জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। কারণ প্রথমে দ্রব্য ও গুণের পৃথক্ জ্ঞান থাকিলে, তবে পরে তাহাদের বিশেষ্য-বিশেষণ-সম্বন্ধ জ্ঞান হইতে পারে।

প্রত্যভিজ্ঞা।

ন্যায়-বৈশেষিকমতে প্রত্যভিজ্ঞাও একপ্রকার সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। কোন পূর্বদৃষ্ট বস্তুকে পুনরায় দেখিয়া 'ইহা সেই' এইরূপ জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে। যেমন আজ কোন বালককে দেখিয়া কেহ বলিতে পারেন 'এই সেই বালক যাহাকে গতকল্য দেখিয়াছিলাম'। ন্যায়-বৈশেষিকমতে ইহা অনুভবাত্মক এবং সপ্রকারক জ্ঞান। অতএব ইহা একপ্রকার সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। অবশ্য লৌকিক ও অলৌকিক, নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রভৃতি প্রত্যক্ষের প্রকারভেদ সম্বন্ধে ন্যায়-বৈশেষিকদের মত ভারতীয় দর্শনের সকল শাখায় স্বীকৃত হয় নাই। বৌদ্ধ ও অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনে এ মত খণ্ডন করা হইয়াছে।

(৩) অনুমান

অনুমানের লক্ষণ।

অনুমান শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতেছে, কোন জ্ঞানের পশ্চাদ্‌ভাবী জ্ঞান (অনু—পশ্চাৎ, মান—জ্ঞান), অর্থাৎ যে জ্ঞান অন্য জ্ঞানের পরে হয়। অনুমিতিস্থলে প্রথমতঃ লিঙ্গদর্শন হয়, তৎপরে লিঙ্গ-লিঙ্গীর বা হেতু-সাধ্যের সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়, পরিশেষে অপ্রত্যক্ষ অর্থের অর্থাৎ সাধ্যের জ্ঞান হয়। এই সাধ্যের জ্ঞান অনুমিতি এবং ইহা লিঙ্গদর্শনের পরে হয় বলিয়া এই জ্ঞানকে অনুমান বলে। লিঙ্গদর্শনের পরেই ব্যাপ্তিজ্ঞানদ্বারা এই জ্ঞান হয়, অতএব ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমানের করণ বা অনুমান প্রমাণ। দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টি বুঝান যায়—'দূরস্থ পর্বত বহ্নিমান্, কারণ ইহা ধূমবান্ এবং যেখানে যেখানে ধূম আছে, সেখানে সেখানে অগ্নি আছে।' দৃষ্টান্তস্থলে পর্বতস্থ বহ্নি প্রত্যক্ষগোচর নহে। কিন্তু পর্বতশীর্ষে ধূমের প্রত্যক্ষ হয় এবং ধূম ও বহ্নির নিয়ত সম্বন্ধের স্মরণ হয়। তদ্দ্বারা অপ্রত্যক্ষ বহ্নির অনুমান হয়। এখানে ধূম হইল লিঙ্গ, অগ্নি হইল সাধ্য এবং ধূম-বহ্নির নিয়ত সম্বন্ধ হইল ব্যাপ্তি। অতএব আমরা বলিতে পারি, লিঙ্গদর্শন ও ব্যাপ্তিজ্ঞানের মূলে অপ্রত্যক্ষ অর্থের যে যথার্থ জ্ঞান হয় তাহার নাম অনুমানপ্রমা।

(ক) অনুমানের অঙ্গ (Constituents of Inference)

অনুমানে তিনটি তর্কপদ এবং অন্ততঃ তিনটি তর্কবাক্য থাকে।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, অনুমানে তিনটি তর্কপদ (term) থাকে এবং অন্ততঃ তিনটি তর্কবাক্য (proposition) থাকিবে। অনুমানে কোন বস্তুতে কোন লিঙ্গ দর্শন করিয়া এবং সেই লিঙ্গের সহিত কোন অপ্রত্যক্ষ ধর্মের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ স্মরণপূর্বক সেই বস্তুতে সেই ধর্মের অস্তিত্ব-জ্ঞান হয়। যেমন পর্বতে ধূম দর্শন করিয়া এবং ধূমের সহিত অগ্নির ব্যাপ্তিসম্বন্ধ স্মরণ করিয়া, পর্বতে অগ্নি আছে এরূপ জ্ঞান হয়, যদিচ পর্বতস্থ অগ্নি তখন প্রত্যক্ষগোচর নয়। এই অনুমানে পর্বত হইল **পক্ষ** (minor term), কারণ এখানে পর্বত সম্বন্ধে অগ্নির অনুমান করা হয়; অগ্নি হইল **সাধ্য** (major term), কারণ এ অনুমানে পর্বতে অগ্নির অস্তিত্ব সাধনীয় বা অনুমেয় ধর্ম; আর ধূম হইল লিঙ্গ বা **হেতু** বা **সাধন** (middle term), কারণ ধূমই পর্বতে অপ্রত্যক্ষ অগ্নির ইঙ্গিত করে বা সাধন করে। পাশ্চাত্ত্য তর্কশাস্ত্রের ন্যায় ভারতীয় তর্কশাস্ত্রেও অনুমানের অন্তর্গত তিনটি তর্কপদ (terms) স্বীকৃত হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

অনুমানে অন্ততঃ তিনটি তর্কবাক্য (proposition) থাকিবে। যেভাবে আমরা সাধারণতঃ অনুমান করি তদ্দৃষ্টে বলিতে হয়, প্রথমতঃ পক্ষে (পর্বতে) লিঙ্গ (ধূম) দর্শন হয়, তৎপরে লিঙ্গ বা হেতুর (ধূমের) সহিত সাধ্যের (অগ্নির) ব্যাপ্তি স্মরণ হয়, পরিশেষে পক্ষে (পর্বতে) সাধ্যের (অগ্নির) সম্বন্ধজ্ঞান হয়। কিন্তু যৌক্তিক বা তার্কিক বাক্যবিন্যাস (formal statement) অনুসারে অনুমানে প্রথমতঃ পক্ষে সাধ্যের আরোপ অর্থাৎ নির্দেশ করা হয়—যথা 'পর্বত বহ্নিমান্'। তৎপরে হেতুটি যে পক্ষের ধর্ম এরূপ নির্দেশ করা হয়—যথা 'যেহেতু পর্বত ধূমবান্'। পরিশেষে হেতুর সহিত সাধ্যের যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে তাহার নির্দেশ করা হয়—যথা 'ধূম বহ্নিব্যাপ্য' অর্থাৎ 'যেখানে যেখানে ধূম আছে সেখানে সেখানে বহ্নি আছে'। অতএব অনুমানে অন্ততঃ তিনটি তর্কবাক্য থাকিবে। পাশ্চাত্ত্য তর্কশাস্ত্রের ন্যায় এখানেও অনুমানের তিনটি তর্কবাক্য স্বীকৃত হইয়াছে। এই তিনটি তর্কবাক্যকে যথাক্রমে পাশ্চাত্ত্য তর্কশাস্ত্রের Syllogism নামক অনুমানের নিগমন (conclusion), পক্ষ-তর্কবাক্য (minor premise) এবং সাধ্য-তর্কবাক্যের (major premise) সমকক্ষ বলা যায়। কিন্তু ন্যায়দর্শনে ইহাদের ক্রমসন্নিবেশ একেবারে ভিন্নরূপ বা বিপরীত।

ন্যায় বা পঞ্চাবয়ব অনুমান।

নৈয়ায়িকদের মতে কেহ পর্বতে ধূম দেখিয়া এবং ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তিসম্বন্ধ স্মরণ করিয়া ঐ পর্বতে বহ্নির যে অনুমান করেন, তাহার নাম স্বার্থানুমান। যদি কেহ এই অনুমান সম্বন্ধে সন্দিহান হন তবে তাহার সন্দেহ দূর করিয়া অনুমানটির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, অর্থাৎ পরার্থানুমানস্থলে পাঁচটি তর্কবাক্য আবশ্যক হয়। যে তর্কবাক্যসমূহ অনুসারে সাধনীয় অর্থের বা সাধ্যের সিদ্ধি হয় অর্থাৎ অনুমিতি পরিসমাপ্ত হয় তাহাকে ন্যায় বলে। ন্যায়ে পাঁচটি তর্কবাক্য থাকে—যথা প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। দৃষ্টান্তদ্বারা পঞ্চাবয়ব ন্যায় বুঝান যায়—

(১) পর্বতটি বহ্নিমান্ (প্রতিজ্ঞা);

(২) কারণ ইহা ধূমবান্ (হেতু);

(৩) যেখানে যেখানে ধূম আছে সেখানে সেখানে বহ্নি আছে, যেমন মহানস (উদাহরণ);

(৪) পর্বতটিও সেইরূপ ধূমবান্ (উপনয়);

(৫) অতএব ইহা বহ্নিমান্ (নিগমন)।

দৃষ্টান্তে দেখা যাইবে—সাধনীয়-ধর্মযুক্ত-রূপে পক্ষের নির্দেশ প্রতিজ্ঞা। যদ্দ্বারা সাধনীয় ধর্মের সাধন হইতে পারে, তাহার নির্দেশ হেতু। দৃষ্টান্তসহ

CENTRAL LIBRARY

হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিসম্বন্ধের নির্দেশ উদাহরণ। পক্ষে যে সাধ্যব্যাপ্য হেতু আছে তাহার নির্দেশ হইল উপনয়। এজন্য পক্ষে যে সাধ্য আছে তাহার নির্দেশ হইল নিগমন।

(খ) অনুমানের সাধনসামগ্রী (Grounds of Inference)

অনুমানের সাধন দুইটি—প্রথম, পক্ষে লিঙ্গ বা হেতুর দর্শন; দ্বিতীয়, লিঙ্গ বা হেতুর সহিত সাধ্যের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ-জ্ঞান। পর্বতে অপ্রত্যক্ষ অগ্নির অনুমানস্থলে প্রথমতঃ ধূমরূপ হেতুর দর্শন এবং তৎপরে ধূমের সহিত অগ্নির ব্যাপ্তিসম্বন্ধের স্মরণ হয় বলিয়াই আমরা পর্বতে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করি। এখন প্রশ্ন হইতেছে : (১) ব্যাপ্তি কাহাকে বলে অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণ কি? এবং (২) ব্যাপ্তি কি প্রকারে জানা যায় অর্থাৎ ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় কি?

অনুমানের দুইটি সাধন—পক্ষধর্মতা ও ব্যাপ্তি।

ব্যাপ্তির লক্ষণ সম্বন্ধে প্রথমে বলা যায়, 'যেখানে ধূম আছে সেখানেই অগ্নি আছে' এরূপ সাহচর্য্য বা সহাবস্থান-নিয়মকে ব্যাপ্তি বলে। এখানে ধূম ব্যাপ্য এবং অগ্নি ব্যাপক, কারণ অগ্নিদ্বারা ধূম ব্যাপ্ত অর্থাৎ অগ্নি ধূমের সহগমন করে, কিন্তু ধূমদ্বারা অগ্নি ব্যাপ্ত নহে অর্থাৎ ধূম সর্বদা অগ্নির সহগমন করে না, যেমন জ্বলন্ত লৌহপিণ্ডে বা বিদ্যুতে অগ্নি আছে কিন্তু ধূম নাই। এখানে একটি বস্তু (অগ্নি) অন্য বস্তুর (ধূমের) সহগমন করে, কিন্তু অন্যটি (ধূম) প্রথম বস্তুর (অগ্নির) সহগমন করে না; এরূপ ব্যাপ্তিকে অসম বা বিষম ব্যাপ্তি বলে। আর যেখানে একটি বস্তু অন্য বস্তুর সহগমন করে এবং অন্যটিও প্রথম বস্তুর সহগমন করে অর্থাৎ উভয়েই পরস্পরের সহগমন করে, তাহাদের সম্বন্ধকে সমব্যাপ্তি বলে। যেমন কার্য ও কারণের সম্বন্ধ; কার্য থাকিলেই কারণ থাকে এবং কারণ থাকিলেই কার্য থাকে। জ্ঞেয় ও অভিধেয় বস্তুর সম্বন্ধও এইরূপ। দুইটি বস্তুর সমব্যাপ্তি সম্বন্ধস্থলে যে কোনটি হইতে অন্যটির অনুমান হইতে পারে, যেমন কার্য হইতে কারণের এবং কারণ হইতে কার্যের অনুমান করা যায়। কিন্তু দুইটি বস্তুর অসম বা বিষম ব্যাপ্তিস্থলে একটি অর্থাৎ ব্যাপ্য হইতে অন্যটির অর্থাৎ ব্যাপকের অনুমান করা যায়; অন্যটি অর্থাৎ ব্যাপক হইতে প্রথমটির অর্থাৎ ব্যাপ্যের অনুমান করা যায় না। যেমন ধূম হইতে অগ্নির অনুমান করা যায়, কিন্তু অগ্নি হইতে ধূমের অনুমান করা যায় না। ইহার কারণ এই যে, অগ্নির সহিত ধূমের সাহচর্য নিয়ত দৃষ্ট হইলেও ইহা উপাধি-বর্জিত নহে। অগ্নির সহিত ধূমের সম্বন্ধ

ব্যাপ্তির লক্ষণ।

সম ও অসম ব্যাপ্তি।

আর্দ্রেন্ধনরূপ উপাধিবিশিষ্ট। যখন অগ্নি আর্দ্রেন্ধনজন্য হয়, তখনই তাহাতে ধূম দেখা যায়, নতুবা নয়। এরূপ উপাধিযুক্ত সম্বন্ধ ব্যাপ্তি নহে। ব্যাপ্তিসম্বন্ধ নিয়ত ও উপাধিমুক্ত হওয়া আবশ্যক। অতএব শেষে বলিতে হয়, নিয়ত ও অনৌপাধিক অর্থাৎ উপাধিবিধুর সম্বন্ধের নাম ব্যাপ্তি।

ব্যাপ্তিগ্রহোপায়।—বৌদ্ধমত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে—ব্যাপ্তিসম্বন্ধ জানিবার উপায় কি? আমরা কিরূপে জানি যে, সকল মনুষ্য মরণশীল, অথবা সকল ধূমই বহ্নিমান্? ইহাই হইল ব্যাপ্তিগ্রহের মূল সমস্যা (problem of induction)। বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে তাদাত্ম্য এবং তদুৎপত্তি অর্থাৎ কার্যকারণভাবদ্বারা অবিনাভাব জানা যায় অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়। যদি দুইটি ভিন্ন বস্তু স্বরূপতঃ এক হয় অর্থাৎ একটির সহিত অন্যটির একাত্মতা থাকে, তবে তাহারা ব্যাপ্তি-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইবে অর্থাৎ একটি থাকিলেই অন্যটি থাকিবে। যেমন অশ্বত্থ ও বৃক্ষ ভিন্ন বস্তু হইলেও স্বরূপতঃ এক বা অভিন্ন। অতএব আমরা বলিতে পারি, 'সকল অশ্বত্থই বৃক্ষ', কারণ বৃক্ষত্বহীন অশ্বত্থ অশ্বত্থই হইতে পারে না। সেইরূপ কার্যকারণসম্বন্ধদ্বারাও ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়। যদি দুইটি বস্তুর মধ্যে কার্যকারণসম্বন্ধ থাকে, তবে একটি থাকিলেই অন্যটি থাকিবে, অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ হইবে। কারণ বিনা কার্য হয় না এবং কার্যবিনা কারণও হয় না। কারণ বিনা কার্য হইতেও পারে এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নয়। কারণ তাহাতে আমাদের সব কাজকর্মের ব্যাঘাত হয় এবং জীবন অচল হইয়া পড়ে। অতএব এরূপ আশঙ্কা হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে। বৌদ্ধমতে কার্যকারণসম্বন্ধের পাঁচটি লক্ষণ আছে; ইহাদের পঞ্চকারণী বলে। ইহা এইরূপ :—(১) উৎপত্তির পূর্বে কার্যের উপলব্ধি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হয় না, (২) কারণের উপলব্ধি হইবামাত্র (৩) কার্যের উপলব্ধি হয়, (৪) তৎপরে পূর্বোপলব্ধ কারণটির অনুপলব্ধি বা বিনাশ হইবামাত্র (৫) কার্যের অনুপলব্ধি বা বিনাশ হয়। এই পঞ্চকারণীদ্বারা ধূমের সহিত অগ্নির কার্যকারণসম্বন্ধ জ্ঞাত হয় এবং ফলে তাহাদের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ নির্ণীত হয়।

বেদান্তমত।

বেদান্তমতে অবাধিত সহচার দর্শনদ্বারা ব্যাপ্তি নির্ণয় হয়। যখন আমরা দেখি যে, দুইটি বস্তু সব স্থলেই একত্র থাকে এবং কুত্রাপি একটি ব্যতীত অন্যটি দৃষ্ট হয় না (অর্থাৎ তাহাদের সহাবস্থান নিয়মের ব্যতিক্রম বা ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না), তখন তাহাদের সম্বন্ধকে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ বলিয়া নির্ণয় করি। অতএব বেদান্তমতে ব্যভিচারের অদর্শনসহ সহচারদর্শন ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণ। ইহাকে পাশ্চাত্ত্য তর্কশাস্ত্রে 'Induction by simple enumeration' বলে।

CENTRAL LIBRARY

নৈয়ায়িকদের মতেও দুইটি বস্তুর অবাধিত সম্বন্ধপ্রত্যক্ষদ্বারা ব্যাপ্তি নির্ণয় হয়; তাদাত্ম্য বা কার্যকারণ নিয়মমূলে তাহা হয় না। কিন্তু এজন্য তাঁহারা তর্ক ও সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষেরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনে ব্যাপ্তিগ্রহ প্রণালী এইরূপ: প্রথমে দুইটি বস্তুর অন্বয় প্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ একটি থাকিলেই অপরটি থাকে দেখা যায়, যেমন ধূম থাকিলেই বহ্নি থাকে দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ ইহাদের ব্যতিরেক প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ একটি না থাকিলে অপরটিও থাকে না, যেমন বহ্নি না থাকিলে ধূমও থাকে না। অন্বয় ও ব্যতিরেক প্রত্যক্ষ একত্র করিলে জে এস মিলের 'Joint Method of Agreement in presence and in absence' পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ আমরা কুত্রাপি তাহাদের ব্যভিচারদর্শন করি না অর্থাৎ একটি আছে কিন্তু অপরটি নাই এমন কোথায়ও দেখি নাই। এসব দেখিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি যে, এই দুইটি বস্তুর মধ্যে স্বাভাবিক নিয়ত সম্বন্ধ আছে।

নৈয়ায়িকমত।

(১) অন্বয়দর্শন।

(২) ব্যতিরেক দর্শন।

(৩) ব্যভিচারের অদর্শন।

কিন্তু এখনও আমরা নিশ্চিত হইতে পারি না যে, বস্তু দুইটি ব্যাপ্তি-সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ তাহাদের সম্বন্ধ কোন উপাধির উপর নির্ভর করে না। অতএব চতুর্থতঃ উপাধি নিরাস করা আবশ্যক অর্থাৎ সম্বন্ধটি যে উপাধিমুক্ত তাহা স্থির করা প্রয়োজন। উপাধি কাহাকে বলে? যে বস্তুটি হেতু বা সাধনদ্বারা ব্যাপ্ত নহে এবং সাধ্যের সহিত যাহার সমব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে তাহাকে উপাধি বলে। যেমন বহ্নিদ্বারা ধূমের অনুমানস্থলে বহ্নি হইল হেতু বা সাধন, ধূম হইল সাধ্য এবং আর্দ্রেন্ধন হইল উপাধি। এখানে দেখা যায় যে, আর্দ্রেন্ধন ও ধূমের মধ্যে সমব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ আর্দ্রেন্ধন থাকিলেই ধূম থাকে এবং ধূম থাকিলেই আর্দ্রেন্ধন থাকে। অপরপক্ষে, আর্দ্রেন্ধন ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ নাই, কারণ আর্দ্রেন্ধন ব্যতীতও বহ্নি দেখা যায়। অতএব দুইটি বস্তুর নিয়ত সম্বন্ধ উপাধিমুক্ত কি না তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক। এজন্য বিভিন্ন স্থলে ও বিভিন্ন পরিবেশে ইহাদের অন্বয় ও ব্যতিরেক দর্শন করিতে হয়। যদি এরূপ ভূয়োদর্শনদ্বারা আমরা নির্ণয় করিতে পারি যে, কোন স্থলে এমন কোন তৃতীয় বস্তু নাই যাহাদ্বারা বস্তু দুইটির সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হয়, তবেই আমরা বলিতে পারি যে, বস্তু দুইটির সম্বন্ধ নিয়ত ও উপাধিবর্জিত অর্থাৎ ব্যাপ্তিসম্বন্ধ।

(৪) উপাধিনিরাস।

অবশ্য এখানে হিয়ুম বা চার্বাকের মত কোন সংশয়বাদী দার্শনিক বলিতে পারেন, যদিও অতীত ও বর্তমান কালে ধূম ও বহ্নির নিয়ত

সম্বন্ধের কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না, তথাপি ভবিষ্যৎ কালে বা অন্য গ্রহে যে ইহার ব্যতিক্রম হইবে না এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। এরূপ সংশয় নিরাস করিবার জন্য নৈয়ায়িকগণ ব্যাপ্তিসাধনের পঞ্চম অঙ্গ হিসাবে তর্কের আশ্রয় লইয়াছেন। তর্কটি এইরূপ : যদি 'যেখানেই ধূম সেখানেই বহ্নি' একথা অস্বীকার করা হয়, তবে বলিতে হয় 'কখন কখন অগ্নি না থাকিলেও ধূম হয়'। কিন্তু এরূপ কথা কার্যকারণরূপ সার্বভৌম নিয়মবিরুদ্ধ হয়। বহ্নিই ধূমের একমাত্র জ্ঞাতকারণ। অতএব বহ্নি ব্যতীত ধূম হয় বলিলে কারণ ব্যতীত কার্য হয় বলিতে হয়। যদি কেহ তাহাই বলেন তবে সে কথা জীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবে, রন্ধনার্থ বহ্নির অন্বেষণ করা চলিবে না, পিপাসা নিবারণ করিবার জন্য জল পান করা চলিবে না। এরূপ তর্ককে পাশ্চাত্ত্য তর্কশাস্ত্রে *reductio ad absurdum* বলা হয়।

(৫) তর্ক।

অন্বয় ব্যতিরেক প্রভৃতির মূলে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে এরূপ বিবেচনা করিয়া পরিশেষে নৈয়ায়িকগণ সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষের সাহায্যে তাহা দৃঢ়তর করিয়াছেন। ধূমবিশেষ ও বহ্নিবিশেষের অথবা মনুষ্যবিশেষ ও মৃত্যুর নিয়তসম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা বলি যে 'সকল ধূমই বহ্নিমান্' অথবা 'সকল মনুষ্যই মরণশীল'। কিন্তু অতীত ও বর্তমান কালে বহু মানুষের মৃত্যু দেখিলেও আমরা কি করিয়া একেবারে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, **সকল** মানুষ মরণশীল। এজন্য সকল মানুষের কোনরূপ জ্ঞান এবং তাহার সহিত মরণশীলতার সম্বন্ধজ্ঞান আবশ্যক। সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষদ্বারা আমরা এরূপ সর্বমনুষ্যবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিতে পারি। মনুষ্যবিশেষ যে মরণশীল তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি। এখন মনুষ্যবিশেষ মরণশীল এরূপ প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গেই মনুষ্যত্ব ও মরণশীলতা এবং তাহাদের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হয়। কোন মনুষ্যকে **মনুষ্য বলিয়া** জানিতে হইলে তাহাকে মনুষ্যজাতির অন্তর্গত অর্থাৎ মনুষ্যত্ব-সামান্য-বিশিষ্ট বলিয়া জানিতে হইবে। সেইরূপ মরণশীল গুণ জানিতে হইলে মরণশীলতারূপ-সামান্য-জ্ঞান আবশ্যক। এখন 'মনুষ্য-বিশেষ মরণশীল' এ জ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান। সুতরাং মনুষ্যত্ব ও মরণশীলতা এবং ইহাদের সম্বন্ধও প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হইবে। আমরা কোন মানুষকে **মানুষ বলিয়া** প্রত্যক্ষই করি, অনুমান বা কোনও যুক্তিতর্কদ্বারা বুঝি না। কাজেই মনুষ্যবিশেষ প্রত্যক্ষ করিবার সময় মনুষ্যত্বের প্রত্যক্ষ হয়। সেইভাবে মরণশীলতারও প্রত্যক্ষ হয়। অনুরূপভাবে ধূমবিশেষ বহ্নিমান্ এরূপ প্রত্যক্ষকালে ধূমত্ব ও বহ্নিত্ব এবং ইহাদের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হয়। এখন সামান্য-লক্ষণ প্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ষদ্বারা সকল মনুষ্যের বা মনুষ্যজাতির প্রত্যক্ষ হয় এবং তাহাদের মরণশীলতার প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপে ধূমত্ব ও বহ্নিত্বের সম্বন্ধ

(৬) সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ।

CENTRAL LIBRARY

প্রত্যক্ষ হইলে সকল ধূমের ও সকল বহ্নির এবং তাহাদের সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয়। অতএব সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষমূলে আমাদের নিরঙ্কুশ ও নিঃসন্দেহ ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়।

(গ) অনুমানের প্রকারভেদ

নৈয়ায়িকগণ বিভিন্নভাবে অনুমানের প্রকারভেদ করিয়াছেন। একভাবে বলা হয় অনুমান দুইপ্রকার—স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। নিজে নিজে যে অনুমান করা হয় তাহাকে স্বার্থানুমান বলে। অন্যকে বুঝাইবার জন্য যে অনুমান হয় তাহা পরার্থানুমান। অনুমানের অঙ্গ আলোচনাকালে ইহাদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

স্বার্থ ও পরার্থ অনুমান।

প্রকারান্তরে অনুমান তিনপ্রকার—পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। কারণ ও কার্যের মধ্যে কারণ কার্যের পূর্বভাবী অর্থাৎ কার্যের পূর্বে থাকে, আর কার্য শেষে অর্থাৎ কারণের পরে থাকে। এজন্য পূর্বশব্দের অর্থ কারণ এবং শেষশব্দের অর্থ কার্য। যেখানে কারণ হইতে কার্যের অনুমান হয় তাহাকে পূর্ববৎ অনুমান বলে, যেমন আকাশে ঘন কাল মেঘ দেখিয়া ভবিষ্যৎ বৃষ্টির অনুমান। কার্য হইতে কারণের অনুমানের নাম শেষবৎ। নদীর জলবৃদ্ধি এবং স্রোতের প্রখরতাবিশেষ দর্শনে যে অতীত বৃষ্টির অনুমান হয়, তাহা শেষবৎ অনুমান। পূর্ববৎ ও শেষবৎ অনুমান কার্যকারণসম্বন্ধমূলে হইয়া থাকে। এই দুইপ্রকার অনুমান ভিন্ন অন্য সব অনুমানের নাম সামান্যতোদৃষ্ট। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানে কার্যকারণসম্বন্ধ-জ্ঞান থাকে না। ইহাতে লিঙ্গ সাধ্যের কারণ বা কার্য বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু সাধারণভাবে অন্যত্র তাহাদের সম্বন্ধ দেখিয়া লিঙ্গদ্বারা সাধ্যের অনুমান হয়। এখন এক দেশে দৃষ্ট চন্দ্র পরে দেশান্তরে দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে আমরা চন্দ্রের গতি অনুমান করি, যদিচ সে গতি প্রত্যক্ষ হয় না। আমরা জানি যে, এক স্থানে দৃষ্ট বস্তুর স্থানান্তরে দর্শন ঐ বস্তুর গতিপূর্বক হইয়া থাকে, যেমন গৃহে দৃষ্ট ব্যক্তির রাজপথে দর্শন তাহার গতিপূর্বক হইয়া থাকে। চন্দ্রও এক সময়ে এক স্থানে দৃষ্ট হইয়া পরে অন্য স্থানে দৃষ্ট হয়। অতএব অপ্রত্যক্ষ হইলেও চন্দ্রের গতি অনুমান করা যায়। এই অনুমান সামান্যতো-দৃষ্ট।

পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্য-তোদৃষ্ট অনুমান।

এই ত্রিবিধ অনুমানের আরএকপ্রকার ব্যাখ্যা আছে। তদনুসারে ইহাদের ব্যাখ্যা করা হইতেছে। সম্বন্ধ-গ্রহণকালে সাধ্য ও সাধন প্রত্যক্ষ করিয়া পরে প্রত্যক্ষীভূত সাধনদ্বারা পূর্বদৃষ্ট সাধ্যের তুল্যরূপ সাধ্যের

যে অনুমান হয়, তাহাকে পূর্ববৎ অনুমান বলে। যেমন মহানসে ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ দেখিয়া পরে মহানসে দৃষ্ট ধূমের তুল্য ধূম দেখিলে, পর্বতে মহানসদৃষ্ট বহ্নির তুল্য বহ্নি অনুমান করা যায়। এরূপ অনুমান হইল পূর্ববৎ। পরিশেষ অনুমানকে শেষবৎ অনুমান বলে। একটি দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা বুঝান যায়। শব্দ একটি গুণ, কারণ ইহা দ্রব্য হইতে পারে না, কর্ম হইতে পারে না, সামান্য, বিশেষ বা অন্য কিছু হইতে পারে না। এখানে শব্দকে অন্য কোন পদার্থ বলা যায় না বলিয়া পরিশেষে যে গুণ-পদার্থ থাকে তাহার শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাই শেষবৎ অনুমান। যে বস্তু কখন প্রত্যক্ষগোচর হয় না, অথচ অন্যত্রদৃষ্ট সাধ্য ও সাধনের সাধারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান-বলে অনুমিত হয়, তাহার অনুমানকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানজন্য জ্ঞান। আমরা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কিরূপে জানি? এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, চক্ষুগোলক চক্ষুরিন্দ্রিয় নহে। চক্ষুগোলকস্থিত যে সূক্ষ্ম শক্তি দর্শনক্রিয়া সম্পন্ন করে তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয়। এখন দেখা যায়, চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপাদি সব প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তাহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু রূপাদি প্রত্যক্ষের করণরূপে তাহার অনুমান হয়। ছেদনাদি ক্রিয়া কুঠার প্রভৃতি করণসাধ্য, সেইরূপ দর্শনাদি ক্রিয়াও কোন করণসাধ্য হইবে। যে করণদ্বারা দর্শনক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয়। রূপাদির প্রত্যক্ষদ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অনুমান সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান।

অন্বয়ব্যতিরেকী, কেবলান্বয়ী ও কেবলব্যতিরেকী অনুমান।

আরও একপ্রকার অনুমান ত্রিবিধ—অন্বয়ব্যতিরেকী, কেবলান্বয়ী ও কেবলব্যতিরেকী। যে অনুমানে হেতুর সহিত সাধ্যের অন্বয়-ও ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি দেখা যায় তাহাকে অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান বলে। যেমন পর্বতে ধূমদ্বারা বহ্নির অনুমান। ধূমের সহিত বহ্নির অন্বয়-ও ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি আছে। 'যেখানে যেখানে ধূম আছে সেখানে সেখানে বহ্নি আছে' ইহা অন্বয়-ব্যাপ্তি। 'যেখানে বহ্নি নাই সেখানে ধূম নাই', যথা হ্রদ, ইহা ব্যতিরেকী-ব্যাপ্তি।

কেবলান্বয়ী অনুমানস্থলে হেতুর সহিত সাধ্যের কেবল অন্বয়-ব্যাপ্তি থাকে, ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি হয় না। পট অভিধেয়, যেহেতু ইহা প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞেয়, যেমন ঘট। এই অনুমানে প্রমেয়ত্ব হেতু এবং অভিধেয়ত্ব সাধ্য। এখানে যাহা প্রমেয় তাহাই অভিধেয়, এরূপ অন্বয়-ব্যাপ্তিই হইতে পারে। যাহা প্রমেয় নয় তাহা অভিধেয় নয়, এরূপ ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির দৃষ্টান্ত নাই, কারণ সব বস্তুই প্রমেয় ও অভিধেয়। যেবস্তু

CENTRAL LIBRARY

প্রমেয়ও নয় এবং অভিধেয়ও নয়, তাহার সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিতে পারি না।

কেবলব্যতিরেকী অনুমানস্থলে হেতুর সহিত সাধ্যের কেবল ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি দেখা যায়, পক্ষ ব্যতীত অন্য কোনস্থলে ইহাদের অন্বয় দেখা যায় না। পৃথিবী অন্য সকল মহাভূত হইতে ভিন্ন, কারণ ইহা গন্ধবৎ, যাহা অন্য সব হইতে ভিন্ন নয় তাহা গন্ধবৎ নয়, যথা জল। এখানে পৃথিবীর অন্য-সব-হইতে-ভিন্নত্ব বা ইতরভিন্নত্ব সাধ্য এবং গন্ধবত্ত্ব হেতু। হেতুর সহিত সাধ্যের ব্যতিরেক সম্বন্ধই দৃষ্ট হয়, যেমন জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতিতে ইতরভিন্নত্বও নাই, আর গন্ধবত্ত্বও নাই। কিন্তু ইহাদের অন্বয় (অর্থাৎ যেখানে ইতরভিন্নত্ব সেখানেই গন্ধবত্ত্ব) এক পৃথিবীতেই আছে, ইহার অন্য দৃষ্টান্ত নাই। সেইরূপ 'সূর্য অন্য গ্রহ হইতে ভিন্ন, কারণ ইহা স্থিতিশীল, যাহা অন্য গ্রহ হইতে ভিন্ন নয়, তাহা স্থিতিশীল নয়', এরূপ অনুমানও কেবলব্যতিরেকী। কারণ এখানে হেতুর অভাবের (অর্থাৎ যাহা অন্য-গ্রহ-ভিন্ন নয়) সহিত সাধ্যের অভাবের (অর্থাৎ তাহা স্থিতিশীল নয়) ব্যাপ্তি আছে; কিন্তু সূর্য ব্যতীত অন্যত্র ইহাদের অন্বয় দৃষ্ট হয় না। এরূপ অনুমানের নাম কেবলব্যতিরেকী।

(ঘ) হেত্বাভাস

কখন কখন আমাদের অনুমান অযথার্থ বা ভ্রমাত্মক হয়। ইহার কারণ এই যে, কোন কোন অনুমানের সাধন বা হেতু দোষদুষ্ট থাকে। কিন্তু দুষ্ট হেতুকে দুষ্ট বলিয়া জানিয়া কেহ কোন অনুমান করেন না। হেতুটি অদুষ্ট বা সদ্ধেতু এরূপ জ্ঞানেই তিনি ইহা অনুমানে প্রয়োগ করেন।

হেত্বাভাসের লক্ষণ।

অনুমানে যেহেতু আপাততঃ সদ্ধেতুর মত আভাসমান অর্থাৎ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বাস্তবিক সদ্ধেতু নয় তাহাকে হেত্বাভাস বলে। ভারতীয় তর্কশাস্ত্রে অনুমানের আকারগত কোন দোষ (formal fallacies) স্বীকার করা বা আলোচনা করা হয় না। কারণ অনুমানের অবয়বগত আকার সর্বত্র একরূপ ও অদুষ্ট হইবে, নতুবা ইহা অনুমানই হইবে না। অনুমান যদি ভ্রমাত্মক হয়, তবে তাহা আকারগত দোষের জন্য নয়, পরন্তু হেতুর বস্তুগত দোষের জন্য। অতএব হেত্বাভাস বলিতে বস্তুগত্যা দুষ্ট হেতু অর্থাৎ হেতুর বস্তুগত দোষ (material fallacy) বুঝায়। নৈয়ায়িকদের মতে হেত্বাভাস পাঁচপ্রকার—সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ ও বাধিত।

হেত্বাভাস পাঁচপ্রকার।

CENTRAL LIBRARY

(১) সব্যভিচার।

সব্যভিচারের অপর নাম অনৈকান্তিক। যে হেতু একান্তে থাকে না অর্থাৎ যেখানে সাধ্য আছে কেবল সেখানেই থাকে না, যেখানে সাধ্যের অভাব আছে সেখানেও থাকে, তাহাকে অনৈকান্তিক বলা যায়। এরূপ একস্থানে নিয়মিতভাবে অবস্থিত না থাকাই ব্যভিচার। অতএব ইহা সব্যভিচার। এইরূপ হেতুদ্বারা সাধ্যের সিদ্ধি হয় না। যেমন 'পর্বত বহ্নিমান্, যেহেতু ইহা প্রমেয়'। এ অনুমানে প্রমেয়ত্ব হেতু সব্যভিচার, কারণ প্রমেয়ত্ব বহ্নিমান্ দ্রব্য মহানসাদিতেও থাকে এবং বহ্নিহীন দ্রব্য হ্রদাদিতেও থাকে, কেননা বহ্নিমান্ বা বহ্নিহীন সব পদার্থই প্রমেয় বা জ্ঞানের বিষয়। অতএব প্রমেয়ত্ব হেতুদ্বারা পর্বতে বহ্নির অনুমিতি হইতে পারে না। এরূপ দুষ্ট হেতুকে সব্যভিচার বলে।

(২) বিরুদ্ধ।

যে হেতু সাধ্যের রোধ করে অর্থাৎ সাধ্যের সিদ্ধি না করিয়া সাধ্যাভাবের সিদ্ধি করে তাহাকে বিরুদ্ধ বলে। যখন কোন প্রস্তাবিত হেতু সাধ্যের অধিকরণে (অর্থাৎ সাধ্য যে আশ্রয়ে বা বস্তুতে থাকে তাহাতে) না থাকিয়া সাধ্যের অভাবের অধিকরণে থাকে, তখন তদ্দ্বারা সাধ্যের সিদ্ধি না হইয়া সাধ্যের অভাবেরই সিদ্ধি হয়। যেমন 'শব্দ নিত্য, যেহেতু ইহা কার্য'। এই অনুমানে কার্যত্ব নিত্য দ্রব্যে না থাকিয়া অনিত্য দ্রব্যে থাকে বলিয়া শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ না করিয়া অনিত্যত্বই সিদ্ধ করে। এতাদৃশ সাধ্য-বিরোধী হেতুর নাম বিরুদ্ধ।

(৩) সৎপ্রতিপক্ষ।

যে হেতুর সাধ্যের অভাব অন্য হেতুদ্বারা প্রমাণিত হয়, তাহার নাম সৎপ্রতিপক্ষ। যেমন 'শব্দ নিত্য, কারণ ইহা শ্রবণীয় অর্থাৎ শ্রবণযোগ্য'। এই অনুমানের প্রতিপক্ষরূপে আর একটি অনুমান হইতে পারে, যেমন 'শব্দ অনিত্য, যে-হেতু ইহা ঘটের মত একটি কার্য'। এখানে দ্বিতীয় অনুমানের হেতু কার্যত্ব, প্রথম অনুমানের হেতু শ্রবণীয়ত্বের সাধ্যের (অর্থাৎ নিত্যত্বের) অভাব প্রমাণিত করে। এরূপ হেত্বন্তরদ্বারা বাধিত হেতুকে সৎপ্রতিপক্ষ বলে।

(৪) অসিদ্ধ।

অসিদ্ধ হেতুর অপর নাম সাধ্যসম। যে হেতু সাধ্যের ন্যায় সাধনীয় তাহাকে সাধ্যসম বলে। অনুমানে হেতুটি বাদী ও প্রতিবাদী উভয় কর্তৃক স্বীকৃত হওয়া উচিত। বাদী কর্তৃক উল্লিখিত হেতু প্রতিবাদী অস্বীকার করিলে, বাদীকে সাধ্যের ন্যায় হেতুরও সিদ্ধি করিতে হয়। এরূপ সাধনীয় হেতুই অসিদ্ধ বা সাধ্যসম হেত্বাভাস। যেমন 'আকাশকুসুম কোমল, যেহেতু ইহাতে কুসুমত্ব আছে'। এই অনুমানে কুসুমত্ব অসিদ্ধ, কারণ আকাশকুসুমই যখন নাই তখন কুসুমত্ব কোথায় থাকিবে?

CENTRAL LIBRARY

(৫) বাধিত।

যে হেতুর সাধ্যাভাব প্রমাণান্তরদ্বারা নিশ্চিত বা অবধারিত হয় তাহার নাম বাধিত। যেমন, 'বহ্নি শীতল, যেহেতু ইহা একটি দ্রব্য'। এই অনুমানে বহ্নির শীতলত্ব সাধ্য এবং ইহার দ্রব্যত্ব হেতু। এই হেতু বাধিত, কারণ ত্বগিন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষদ্বারা বহ্নিতে শীতলতার অভাব অবধারিত হয়। সৎপ্রতিপক্ষ ও বাধিত হেত্বাভাসের পার্থক্য এই যে, সৎপ্রতিপক্ষে এক অনুমান অন্য অনুমানদ্বারা বাধিত হয়, বাধিত হেত্বাভাসে এক অনুমান প্রত্যক্ষ বা অনুমান ভিন্ন কোন প্রমাণদ্বারা বাধিত হয়।

(৪) উপমান

সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সম্বন্ধ-জ্ঞানের করণ উপমান।

উপমিতি জ্ঞানের করণকে উপমান-প্রমাণ বলে। সংজ্ঞা ও সংজ্ঞী অর্থাৎ নাম ও নামীর সম্বন্ধ-জ্ঞানই উপমিতি। প্রসিদ্ধ পদার্থের সাদৃশ্যদ্বারা অপ্রসিদ্ধ পদার্থের সংজ্ঞার যে জ্ঞান হয়, অর্থাৎ এই পদার্থের এই নাম এরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহাকে উপমিতি বলে। অতএব সাদৃশ্যজ্ঞান হইল উপমিতির করণ, এবং সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সম্বন্ধ-জ্ঞান হইল ইহার ফল। উদাহরণদ্বারা ইহা বুঝা যায়। গবয়নামক একপ্রকার বন্য পশু আছে। কোন নগরবাসী গবয় কিরূপ পশু তাহা জানেন না। কোন সময়ে এক অরণ্যবাসী তাঁহাকে বলিল যে, 'গবয়-পশু গো-পশুর মত'। কালে ঐ নগরবাসী কোন কারণে অরণ্যে গমন করিয়া দৈবাৎ একটি গবয়-পশু দেখিলেন। তিনি এই অদৃষ্ট-পূর্ব পশুতে অত্যন্ত গোসাদৃশ্য দেখিয়া এবং অরণ্যবাসীর কথা স্মরণ করিয়া বুঝিলেন যে, এই পশুই গবয় বা এইজাতীয় পশু গবয়পদবাচ্য। এস্থলে অদৃষ্টপূর্ব পশুতে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ পূর্বজ্ঞাত গো-পশুর সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষদ্বারা ইহার নাম গবয় বা এইজাতীয় পশু গবয়পদবাচ্য এরূপ সংজ্ঞাজ্ঞান হইল। এইপ্রকারে সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীর যে সম্বন্ধ-জ্ঞান হয় তাহাকে উপমান বলে।

ন্যায়দর্শনে উপমানকে একটি পৃথক্ প্রমাণ বলা হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধ, বৈশেষিক এবং অন্যান্য দর্শনে ইহাকে পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। বৌদ্ধদর্শনে ইহাকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানজন্য জ্ঞান বলা হইয়াছে। বৈশেষিকদর্শনে ইহাকে অনুমানের অন্তর্গত করা হয়। মীমাংসা ও বেদান্ত-দর্শনে উপমানের ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

(৫) শব্দ

শব্দের লক্ষণ।

আপ্তপুরুষের উপদেশের নাম শব্দপ্রমাণ। তত্ত্বের বা অর্থের সাক্ষাৎকরণকে আপ্তি বলে। যিনি তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিয়াছেন এবং যেরূপ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন ঠিক সেইরূপভাবে তত্ত্বোপদেশ করেন তাঁহাকে আপ্তপুরুষ বলে। এরূপ আপ্তপুরুষের বাক্যের অর্থবোধদ্বারা অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে যে জ্ঞান হয় তাহার নাম শব্দ-প্রমা। আপ্তের উপদেশ বা বাক্য এই জ্ঞানের করণ বলিয়া উহাকে শব্দপ্রমাণ বলে। এই হিসাবে মুনি, ঋষি, আর্য ও অনার্য সকলেই আপ্ত হইতে পারেন এবং তাঁহাদের বাক্য শব্দপ্রমাণ হইতে পারে।

দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ শব্দ

একভাবে শব্দ দুইপ্রকার—দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ। যে বাক্যের অর্থ ইহলোকে দৃষ্ট হয় তাহাকে দৃষ্টার্থ শব্দ বলে, যেমন বিচারালয়ে প্রদত্ত সত্যবাদী সাক্ষীর সাক্ষ্য, জলের উপাদান বিষয়ে বৈজ্ঞানিকের যথার্থ উক্তি, পুত্রেষ্টি অর্থাৎ পুত্রকামনায় যাগ সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য ইত্যাদি। যে বাক্যের অর্থ প্রত্যক্ষযোগ্য নহে তাহাকে অদৃষ্টার্থ শব্দ বলে, যেমন পরলোক সম্বন্ধে শাস্ত্রবচন, পরমাণু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের বাক্য, ধর্মাধর্ম বিষয়ে সাধু-মহাত্মাদের উপদেশ।

লৌকিক ও বৈদিক শব্দ।

আরএকভাবে শব্দ লৌকিক ও বৈদিক হিসাবে দুইপ্রকার। বেদ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট। ভগবদ্‌বাক্যই বৈদিক শব্দ। ভগবদ্‌বাক্য বলিয়া বেদ নির্দোষ ও অভ্রান্ত প্রমাণ। মনুষ্যের বাক্য লৌকিক শব্দ। ইহা সর্বত্র অভ্রান্ত হয় না। আপ্তপুরুষের বাক্যই শব্দপ্রমাণ হইবে। অনাপ্তবাক্য শব্দপ্রমাণ নহে। যে বাক্যের বক্তা অর্থের বা তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করেন নাই, অথবা অর্থের বা তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিয়াও যিনি তাহা যথার্থভাবে উপদেশ করেন না, তিনি অনাপ্ত। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, নৈয়ায়িকগণের মতে সব শব্দই পৌরুষেয় অর্থাৎ কোন আপ্তপুরুষের বাক্য। তাঁহারা বেদকেও পৌরুষেয় বলেন, যেহেতু তাঁহাদের মতে বেদ পরমপুরুষ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট বা ভগবদ্‌বাক্য। কিন্তু প্রামাণ্য হিসাবে লৌকিক ও বৈদিক শব্দের কোন পার্থক্য নাই, উভয়েই সমভাবে প্রমাণ বা প্রমাজ্ঞানের হেতু।

পদ ও বাক্য।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, আপ্তপুরুষের বাক্যের অর্থবোধদ্বারা অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের যে জ্ঞান হয় তাহার নাম শব্দ-প্রমা। এখন বাক্য কাহাকে বলে এবং বাক্যার্থ জ্ঞানের হেতু কি তাহার আলোচনা করিতে হইবে। পদসমূহকে বাক্য বলে, যেমন 'গাভীটিকে আন', 'বৃষ্টি পড়িতেছে' ইত্যাদি। পদ কাহাকে বলে? যে বর্ণ

বা বর্ণসমূহের কোন পদার্থকে সঙ্কেত করিবার অর্থাৎ বুঝাইবার শক্তি আছে তাহাকে পদ বলে। এরূপ একাধিক পদের সমষ্টিকে বাক্য বলে। কিন্তু যে-কোন পদসমূহ বা পদসমষ্টিকে বাক্য বলা যায় না। কেবল অর্থবৎ পদসমূহকে বাক্য বলে। বাক্যার্থজ্ঞানে অর্থাৎ বাক্যের অর্থবোধে চারিটি হেতু আছে, যথা আসত্তি, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও তাৎপর্যজ্ঞান।

(১) আসত্তি।

প্রথম হেতু আসত্তি। বাক্যমধ্যস্থ পদসমূহের সন্নিধানকে আসত্তি বলে। দেশ-কালে ব্যবহিত পদসমূহ বাক্য হয় না, যেমন কেহ প্রাতঃকালে বলিলেন 'গাভী', আর সন্ধ্যাকালে বলিলেন 'আনয়ন কর'। এরূপ অসন্নিহিত অর্থাৎ দীর্ঘকাল পরে উচ্চারিত পদদ্বয় বাক্য হইবে না। অতএব পদসমূহের আসত্তি বা সন্নিধি বাক্যার্থবোধের প্রথম হেতু।

(২) যোগ্যতা।

দ্বিতীয় হেতু যোগ্যতা। পদসমূহের অর্থের অবিরোধের নাম যোগ্যতা। অথবা এক পদার্থে অপর পদার্থের সম্বন্ধের নাম যোগ্যতা। যেমন কেহ বলিলেন 'জলদ্বারা সিঞ্চন কর'। এখানে জলের সহিত সিঞ্চনক্রিয়ার সম্বন্ধ থাকায় যোগ্যতা আছে। কিন্তু কেহ বলিলেন 'অগ্নিদ্বারা সিঞ্চন কর'। এখানে অগ্নির সহিত সিঞ্চনক্রিয়ার বিরোধ থাকায় যোগ্যতার অভাব হইল।

(৩) আকাঙ্ক্ষা।

তৃতীয় হেতু আকাঙ্ক্ষা। যে পদ যে পদান্তর ব্যতীত অন্বয় অনুভবের জনক হয় না, সেই পদান্তরের সহিত সেই পদের আকাঙ্ক্ষা আছে। অর্থাৎ যে পদের সহিত যুক্ত না হইলে একটি পদ অন্বয়বোধ কিনা অর্থবোধ জন্মায় না, সেই পদের সহিত ইহার আকাঙ্ক্ষা-সম্বন্ধ আছে। কারকপদ ব্যতীত ক্রিয়াপদ অন্বয়বোধ জন্মায় না। অতএব কারকপদের সহিত ক্রিয়াপদের আকাঙ্ক্ষা আছে। যেমন কেহ বলিলেন 'আনয়ন কর'। এ ক্রিয়াপদে 'গো' বা 'অশ্ব' এরূপ কারকপদের আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষা আছে, কারণ শুধু 'আনয়ন কর' বলিলে কোন অর্থবোধ হয় না, 'গাভী বা অশ্ব আনয়ন কর' বলিলে তবে অন্বয়বোধ হয়। সেইরূপ শুধু 'গো' বা 'অশ্ব' বলিলেও অর্থবোধ হয় না; 'আনয়ন কর' বা 'বন্ধন কর' বলিলে তবে অর্থবোধ হয়। এখানে ক্রিয়াপদের সহিত কারকপদের আকাঙ্ক্ষা আছে।

(৪) তাৎপর্য।

চতুর্থ হেতু তাৎপর্যজ্ঞান। বক্তার ঈপ্সিত বা অভিলষিত অর্থের নাম তাৎপর্য। যদি বক্তা এক অর্থে কোন পদ ব্যবহার করেন, তবে ভিন্ন অর্থে তাহা বুঝিলে যথার্থ বাক্যার্থজ্ঞান হইবে না। যেমন কেহ বলিলেন 'সৈন্ধব আনয়ন কর'।

CENTRAL LIBRARY

সৈন্ধব শব্দের অর্থ অশ্ব বা লবণ হইতে পারে। গমনকালে (বা গমন প্রসঙ্গে) ইহার অর্থ অশ্ব এবং ভোজনকালে (বা ভোজন প্রসঙ্গে) ইহার অর্থ লবণ হইবে। অতএব প্রসঙ্গ বা প্রকরণ অনুসারে পদ ও বাক্যের তাৎপর্য বুঝিতে হয়। তাৎপর্য না বুঝিলে কোন বাক্যের অর্থের যথার্থজ্ঞান হয় না।

৩। ন্যায়দর্শনে ভূতসর্গ
(Nyāya Theory of the Physical World)

ভূতসর্গ পঞ্চভূত ও দিক্-কালের সমষ্টি।

ন্যায়দর্শনের প্রমা ও প্রামাণ্য বিচারের পর প্রমেয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ এই দ্বাদশটি প্রমেয় অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানের বিষয়। বৈশেষিকদর্শনে উল্লিখিত সপ্ত পদার্থ, যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব—প্রমেয়ের অন্তর্গত। ন্যায়মতে সকল প্রমেয়ই ভূতসর্গের অন্তর্গত নহে। কেবল ভূত ও ভৌতিক এবং ভূতসংশ্লিষ্ট বস্তুগুলি ভূতসর্গের অন্তর্গত। আত্মা, বুদ্ধি বা জ্ঞান ও মন ভৌতিক নহে। দিক্ (space) ও কাল (time) অভৌতিক, কিন্তু ইহারা ভৌতিক বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট, অতএব ভূতসর্গের অন্তর্গত। আকাশ ভৌতিক পদার্থ, কিন্তু ইহা কোন বস্তুর সমবায়ী কারণ নহে, অর্থাৎ কোন বস্তু উৎপন্ন করে না। ভূতসর্গ বা ভৌতিক জগৎ পৃথিবী, অপ্ বা জল, তেজ ও বায়ু এই চারিটি মহাভূত-দ্বারা গঠিত। মহাভূতগুলি পরিণামশীল। কিন্তু যে চারিপ্রকার পৃথিব্যাদি পরমাণু মহাভূতগুলির উপাদান-কারণ অর্থাৎ যেগুলি হইতে ইহারা উৎপন্ন হয়, তাহারা অপরিণামী বা নিত্য। আকাশ, দিক্ ও কাল এক একটি নিত্য ও অসীম দ্রব্য। অতএব ভূতসর্গ মূলে পৃথিব্যাদি চারিপ্রকার পরমাণুদ্বারা গঠিত। পরমাণু হইতে উৎপন্ন সকল যৌগিক পদার্থ এবং ইহাদের গুণধর্ম ও সম্বন্ধসমূহ, যেমন শরীর, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ এসবই ভূতসর্গের অন্তর্গত। আকাশও ইহার অন্তর্গত। দিক্ ও কাল অভৌতিক হইলেও ভৌতিক বস্তুনিচয়ের আধার ও সম্বন্ধহেতু। এসব বিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনের মতৈক্য দেখা যায়। ন্যায়দর্শনে বৈশেষিকমত সমানতন্ত্র হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। বৈশেষিকদর্শনেই এসব বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এজন্য বৈশেষিকদর্শন ব্যাখ্যাকালে এসব বিষয়ের যথাযথ আলোচনা করা হইবে।

CENTRAL LIBRARY

৪। আত্মা ও অপবর্গ বা মোক্ষ

এখানে আত্মা বলিতে জীবাত্মা বুঝিতে হইবে। জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। চার্বাকমতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। ইহাই জড়বাদীদের মত। বৌদ্ধমতে বিজ্ঞানধারাই আত্মা অর্থাৎ পরস্পর-সম্বন্ধ, পরিবর্তনশীল জ্ঞানসমূহের প্রবাহ আত্মা। অদ্বৈত বেদান্তমতে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, চেতন পুরুষ নয়; ইহা জ্ঞানমাত্র, জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় নয়। বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তমতে আত্মা জ্ঞানগুণবিশিষ্ট, জ্ঞানমাত্র নয়; ইহা জ্ঞাতা ও অহংপদবাচ্য। ন্যায়-বৈশেষিকমতে আত্মা একটি অভৌতিক দ্রব্য এবং জ্ঞান, বেদনা ও প্রযত্ন ইহার বিশেষগুণ। রাগ, দ্বেষ, ইচ্ছা, মানসিক প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান প্রভৃতি এক একপ্রকার গুণ। এই গুণগুলি কোন দ্রব্যে অধিষ্ঠিত বা সমবেত থাকিবে। কিন্তু এ গুণগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের ন্যায় ভৌতিক নহে। অতএব ইহারা ভৌতিক দ্রব্যে থাকিতে পারে না। এজন্য ইহাদিগকে কোন অভৌতিক দ্রব্যের গুণ বলিতে হইবে। আত্মাই এই অভৌতিক দ্রব্য। ভিন্ন ভিন্ন জীব-শরীরে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা আছে; আত্মা এক নয়, বহু। কারণ বিভিন্ন জীবের জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন একরূপ নহে, পরন্তু বিভিন্নরূপ দেখা যায়। আত্মা অবিনাশী ও নিত্য দ্রব্য। ইহা বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী, যেহেতু ইহা দেশ-কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ নয়।

আত্মা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত।

ন্যায়-বৈশেষিকমতে আত্মার লক্ষণ।

দেহ আত্মা হইতে পারে না, যেহেতু দেহ জড় পদার্থ, কিন্তু চৈতন্য জড় পদার্থের গুণ হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়সমূহও আত্মা হইতে পারে না, কারণ চিন্তা, কল্পনা, স্মৃতি প্রভৃতি মনোবৃত্তি ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ। কোন ইন্দ্রিয় নষ্ট হইয়া গেলেও তৎসংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষের স্মৃতি থাকে, ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইলে চিন্তা ও কল্পনা চলিতে পারে। মনও আত্মা হইতে পারে না। ন্যায়-বৈশেষিকমতে মন অণুপরিমাণ হওয়ায় প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। সুখ-দুঃখ আত্মার গুণ। মনকে আত্মা বলিলে সুখ-দুঃখকেও মনের গুণ বলিতে হইবে এবং মনের ন্যায় ইহাদেরও প্রত্যক্ষ হইবে না। কিন্তু সকল মানুষেরই সুখ-দুঃখের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বৌদ্ধদর্শনে বর্ণিত বিজ্ঞানধারাকেও আত্মা বলা যায় না। কারণ সে-স্থলে পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে না। ধারাবাহিক বিজ্ঞানগুলি একটির পরে আর একটি উৎপন্ন হয়, একটি বিজ্ঞান পূর্ববর্তী বা পরবর্তী বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই অবগত হয় না, যেমন রুদ্রাক্ষ-মালার একটি রুদ্রাক্ষ অপরগুলির অবস্থিতি জানে না। অতএব এক বিজ্ঞানের বিষয়কে অপর বিজ্ঞান স্মরণ করিতে পারে না। এক ব্যক্তির

আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন বা বিজ্ঞানধারা নহে।

অনুভূত বিষয় অন্য ব্যক্তি স্মরণ করিতে পারে না। যাঁহার পূর্বে কোন বিষয়ের অনুভূতি হইয়াছিল কেবল তিনিই সেবিষয় স্মরণ করিতে পারেন। অতএব পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতি বুঝিতে হইলে পূর্ব ও পরকালে একই অপরিণামী চেতন আত্মা স্বীকার করিতে হয়। অদ্বৈত বেদান্তে যে, আত্মাকে শুদ্ধ জ্ঞান বা চৈতন্য বলা হইয়াছে, তাহাও ঠিক নয়। কারণ জ্ঞান কোন জ্ঞাতার জ্ঞান এবং কোন বিষয়ের জ্ঞান হইবে। জ্ঞানের অধিষ্ঠানরূপে আত্মাকে স্বীকার করিতে হইবে। অতএব আত্মা জ্ঞানমাত্র নহে, পরন্তু জ্ঞানগুণবিশিষ্ট দ্রব্য। আত্মা জ্ঞাতা ও ভোক্তা এবং অহঙ্কারাশ্রয় অর্থাৎ অহংপদবাচ্য।

জ্ঞান আত্মার স্বভাবগত গুণ নহে।

আত্মা জ্ঞানগুণবিশিষ্ট হইলেও জ্ঞান ইহার স্বভাবগত অবিচ্ছেদ্য গুণ নহে, পরন্তু আগন্তুক গুণমাত্র। আত্মা মনের সহিত, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত এবং ইন্দ্রিয় বাহ্য অর্থের সহিত সংযুক্ত হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং আত্মায় গুণরূপে অধিষ্ঠিত থাকে। নতুবা আত্মার কোন জ্ঞানগুণ থাকে না। এজন্য মোক্ষাবস্থায় আত্মার দেহমন-সম্বন্ধ না থাকায় জ্ঞানও থাকে না, আত্মা শুদ্ধ অচেতন দ্রব্যরূপে বিদ্যমান থাকে।

আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে প্রমাণ—অনুমান ও শব্দ।

দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের অতিরিক্ত আত্মা যে আছে তাহার প্রমাণ কি? প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না। অনুমান বা আপ্তবাক্য হইতে আত্মার অস্তিত্ব জানা যায়। ইচ্ছা, রাগ, দ্বেষ, প্রযত্ন ও জ্ঞান প্রভৃতির কারণরূপে অপরিণামী আত্মা স্বীকার করিতে হয়। আমরা কোন বস্তুকে সুখপ্রদ বলিয়া পাইবার ইচ্ছা করি, অথবা দুঃখপ্রদ বলিয়া পরিহার করি। কিন্তু বস্তুটি লাভ করিবার পূর্বে আমাদের সুখ বা দুঃখের অনুভূতি হয় না। কেবল বস্তুটি পূর্বানুভূত সুখ বা দুঃখপ্রদ কোন বস্তুর তুল্য বা সদৃশ বলিয়াই আমরা ইহা পাইবার বা পরিহার করিবার ইচ্ছা করি। কিন্তু বস্তুটিকে পূর্বানুভূত কোন বস্তুর তুল্য বলিয়া জানিতে হইলে পূর্ব কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত স্থায়ী আত্মা স্বীকার করিতে হয়। যিনি অতীত কালে কোন বস্তুকে সুখ বা দুঃখপ্রদরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কেবল তিনিই বর্তমানে দৃষ্ট অন্য বস্তুকে তৎসদৃশ বলিয়া জানিতে পারেন। সেইরূপ জ্ঞানও আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে প্রমাণ। কোন বিষয় প্রথমে জানিবার ইচ্ছা করিয়া পরে তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিলে তাহার জ্ঞানলাভ করা যায়। অতএব এজন্য এক অপরিণামী আত্মা স্বীকার করিতে হয়। কেহ বস্তুটি জানিবার ইচ্ছা করিলেন, অপর কেহ তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিলেন এরূপ হইলে কাহারও বস্তু সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হইবে না।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

পরবর্তী কালে নৈয়ায়িকগণ আত্মার মানসপ্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষই আত্মা বিষয়ে প্রমাণ। অবশ্য আত্মবিষয়ক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতভেদ আছে। কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলে 'অহম্ অস্মি' অর্থাৎ 'আমি আছি' ইত্যাকার প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। অপরপক্ষে, কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে শুদ্ধ আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না। আত্মা কোন গুণ বা ক্রিয়াবিশিষ্ট বলিয়া প্রত্যক্ষীভূত হয়, যেমন আমরা বলি 'আমি ইচ্ছা করিতেছি' বা 'আমি জানিতেছি', 'আমি সুখী' বা 'আমি দুঃখী'; ইত্যাদি। অবশ্য কোন ব্যক্তির স্বকীয় আত্মারই প্রত্যক্ষ হয়, পরকীয় আত্মা অনুমানগম্য। অপর ব্যক্তির শারীর-প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রয়োজনসাধক শারীরিক কর্ম দেখিয়া আমরা তাহার প্রয়োজকরূপে তাঁহার আত্মার অনুমান করি। কারণ এরূপ বুদ্ধিমৎ কর্ম অচেতন শরীরদ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে না।

আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির নাম মুক্তি।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ন্যায়দর্শনে প্রমা ও প্রামাণ্য প্রভৃতি বিষয়ের বিচার প্রাধান্য লাভ করিলেও ইহা একপ্রকার মোক্ষশাস্ত্র এবং মোক্ষ বা মুক্তিই ইহার চরম উদ্দেশ্য। মুক্তির হেতুরূপেই ন্যায়দর্শনে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা এবং প্রমা ও প্রামাণ্য বিচার করা হইয়াছে। এখন মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন মত দেখা যায়। নৈয়ায়িকদের মতে সকল দুঃখের নিবৃত্তিই মুক্তি। অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি বলিতে তাঁহারা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিমাত্র বুঝিয়াছেন। মুক্তিদশায় আত্মার দেহ বা ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। কারণ দেহসম্বন্ধ থাকিলে সর্বদুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে না। দেহেন্দ্রিয়বিশিষ্ট আত্মার এক না এক অবস্থায় অপ্রিয় ও অনিষ্ট বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ অনিবার্য, সুতরাং ইহার দুঃখভোগও অবশ্যম্ভাবী। অতএব মুক্তির অবস্থায় আত্মার দেহেন্দ্রিয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না বলিতে হইবে। কিন্তু দেহেন্দ্রিয়-সম্বন্ধরহিত

মুক্তিদশায় আত্মা সুখ-দুঃখ ও জ্ঞান রহিত শুদ্ধ দ্রব্যরূপে থাকে।

আত্মার যেমন দুঃখভোগ হয় না, তেমন সুখভোগও হইতে পারে না, কারণ দেহ ও ইন্দ্রিয় ব্যতীত কোন ভোগই হয় না। অধিকন্তু দেহেন্দ্রিয়মুক্ত আত্মার জ্ঞান বা চৈতন্যরূপ গুণও থাকে না, যেহেতু আত্মার জ্ঞানগুণ মন ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব মুক্ত আত্মা শুদ্ধ দ্রব্যরূপে বিরাজ করে, ইহার দুঃখ, সুখ, জ্ঞান কিছুই থাকে না। এরূপ অবস্থায় আত্মার আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় এবং তাহারই নাম মুক্তি। দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি আত্যন্তিক নিবৃত্তি নহে। সুষুপ্তিতে বা রোগমুক্ত হইলে যে দুঃখ-নিবৃত্তি হয় তাহা

(ক) কার্যত্বলিঙ্গক অনুমান

ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রথম প্রমাণ হইল কার্যত্বলিঙ্গক অনুমান। অনুমানটি এইরূপ : পর্বত, সাগর, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি পার্থিব পদার্থের কোন কর্তা আছেন, যে-হেতু ইহারা সকলেই এক একটি কার্য এবং কার্য থাকিলেই তাহার কর্তা অবশ্য থাকিবে, যেমন ঘটরূপ কার্যের কর্তা কোন কুম্ভকার অবশ্য আছে। পর্বত ও সাগর প্রভৃতি যে কার্য তাহা তাহাদের সাবয়বত্ব এবং অবান্তরমহত্ত্ব হইতে বুঝা যায়। পর্বতাদি বস্তু বহু অবয়ব বা অংশের সংযোগে গঠিত। তৎপরে ইহারা দেশ, কাল ও আকাশের ন্যায় অতি মহৎও নয় এবং পরমাণুর ন্যায় অতি ক্ষুদ্রও নয়, কিন্তু মধ্যমপরিমাণ-বিশিষ্ট। অতি মহৎ বা অসীম দ্রব্য দেশ-কাল প্রভৃতি কার্য নয়। সেইরূপ অতি ক্ষুদ্র পরমাণুও কার্য নয়। ইহারা নিত্য দ্রব্য এবং ইহাদের কোন কর্তা নাই। কিন্তু পর্বত, সাগর প্রভৃতি অতি মহৎ বা অসীম দ্রব্য নয়, অথবা তাহারা অতি ক্ষুদ্র দ্রব্যও নয়। ইহারা মধ্যমপরিমাণ-বিশিষ্ট। এরূপ সাবয়ব ও অবান্তরমহত্ত্ব-বিশিষ্ট দ্রব্যমাত্রই কার্য এবং ইহাদের কোন কর্তা আছে। পর্বত, সাগর প্রভৃতির অবয়বসংযোগের জন্য কোন বুদ্ধিমান্ কর্তা প্রয়োজন। এরূপ কর্তার পর্বতাদির উপাদান যে পরমাণুপুঞ্জ তাহার প্রত্যক্ষজ্ঞান থাকিবে, পর্বতাদি কার্য উৎপন্ন করিবার ইচ্ছা থাকিবে এবং সেই ইচ্ছানুসারে কার্য করিবার প্রযত্নও থাকিবে, অর্থাৎ পর্বতাদির কর্তা জ্ঞান, চিকীর্ষা ও কৃতিসম্পন্ন হইবেন। অধিকন্তু তিনি সর্বজ্ঞ হইবেন, কারণ কেবলমাত্র কোন সর্বজ্ঞ পুরুষই অতিসূক্ষ্ম পরমাণু প্রভৃতি এবং অসীম দ্রব্য দেশ-কাল প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এরূপ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ পুরুষের নাম ঈশ্বর।

পর্বতাদি কার্যবস্তুর কোন কর্তা আছে। ঈশ্বরই সেই কর্তা।

(খ) অদৃষ্টলিঙ্গক অনুমান

ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে দ্বিতীয় প্রমাণ এইরূপ: সংসারে মানুষের সুখ-দুঃখের এত তারতম্য কেন? কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ হয় কেন? অবশ্য এজন্য মানুষের কর্মই দায়ী। যে যেমন কর্ম করে সে তেমন ফলভোগ করে। সুকর্ম সুখরূপ সুফল এবং কুকর্ম দুঃখরূপ কুফল প্রসব করে ইহা আমরা

জীবের শুভ ও অশুভ কর্মের ফল—পুণ্য ও পাপ, তাহার সমষ্টির নাম অদৃষ্ট।

এই জীবনেই দেখিতে পাই। অবশ্য কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় সত্য। কিন্তু সেস্থলে বলিতে হইবে যে, জীবের পূর্বজন্মের শুভ বা অশুভ কর্মের ফল এত প্রবল যে, তাহা এ জীবের কর্মের যথাযোগ্য ফলোদয়ে বাধাপ্রদান করে এবং তাহাকে রোধ করিতে হইলে প্রবলতর কর্ম বা চেষ্টা আবশ্যক। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, আমাদের কর্মই আমাদের সব সুখ-দুঃখের কারণ। শুভকর্মদ্বারা জীবাত্মা পুণ্য অর্জন করে এবং অশুভ-কর্মদ্বারা পাপ অর্জন করে। পাপ বা পুণ্য আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না। এজন্য জীবাত্মার পাপ-পুণ্যের সমষ্টিকে তাহার অদৃষ্ট বলে। অদৃষ্ট বা দৈব বলিতে পূর্বজন্মকৃত কর্মের পাপ-পুণ্যরূপ ফলমাত্রই বুঝায়, তদ্ব্যতীত কোন অদৃষ্ট বা দৈব নাই। জীব তাহার অদৃষ্ট অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে।

অদৃষ্ট অচেতন, তাহার নিয়ামকরূপে ঈশ্বর স্বীকার্য।

এখন প্রশ্ন হইতেছে : জীবের অদৃষ্ট কিরূপে তাহাকে যথাযোগ্য ফল প্রদান করে? অদৃষ্ট জড় ও অচেতন পদার্থ। ইহা কিরূপে বুঝিবে যে, এই শুভাশুভ কর্মের এইরূপ এবং এই পরিমাণ শুভাশুভ ফল হওয়া উচিত? কোন চেতন পুরুষদ্বারা পরিচালিত হইলে অচেতন যন্ত্রাদি ঠিকমত কাজ করে ইহা আমরা বুঝিতে পারি। অচেতন দ্রব্য বা শক্তি নিজে কোন প্রয়োজন সাধন করিতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, অদৃষ্ট কোন চেতন পুরুষদ্বারা পরিচালিত হইয়া জীবকে তাহার কর্মানুযায়ী ফলপ্রদান করে। জীব অদৃষ্টের পরিচালক হইতে পারে না। কারণ সে নিজেই জানে না যে, তাহার অদৃষ্টে কি আছে এবং কখন কখন অদৃষ্ট তাহার সকল প্রচেষ্টা বা পুরুষকার ব্যর্থ করিয়া দেয়। অতএব অদৃষ্টের পরিচালক হিসাবে কোন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ পুরুষকে স্বীকার করিতে হইবে, আর তাঁহারই নাম ঈশ্বর। এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে, জার্মান দার্শনিক কাণ্ট অনুরূপ যুক্তিদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

(গ) বেদপ্রামাণ্যমূলক অনুমান

মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের প্রামাণ্যের ন্যায় বেদের প্রামাণ্য আপ্ত-প্রামাণ্যমূলক। ঈশ্বর সেই আপ্তপুরুষ।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিকদর্শনে উল্লিখিত তৃতীয় প্রমাণটি এইরূপ : বেদ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র যে অভ্রান্ত জ্ঞানের আকর তাহা সকল আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই স্বীকার করেন। বেদ প্রামাণিক শাস্ত্র ইহা সকলের স্বীকার্য। এখন প্রশ্ন হইতেছে—বেদের প্রামাণ্যের হেতু কি? বেদকে কেন প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা হয়? ন্যায়-বৈশেষিকমতে আয়ুর্বেদ ও মন্ত্রবিজ্ঞানের প্রামাণ্যের মত বেদের প্রামাণ্য

CENTRAL LIBRARY

আপ্তপ্রামাণ্যমূলক। আয়ুর্বেদ একটি প্রামাণিক বিজ্ঞান। ইহা যে প্রামাণিক তাহা ইহার অনুশাসনের ফল দৃষ্টে বুঝা যায়। আয়ুর্বেদের বিধান অনুসারে অনেক রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য তাহার কর্তা বা রচয়িতার আপ্তত্বের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ কোন অভ্রান্ত ও বিশ্বস্ত পুরুষ কর্তৃক রচিত বলিয়াই আয়ুর্বেদ প্রামাণিক। বেদের প্রামাণ্যও সেইরূপ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ বেদও আপ্তপুরুষের বাক্য বলিয়াই প্রামাণিক শাস্ত্র। বেদ যে প্রামাণিক তাহা দৃষ্টার্থ বেদবাক্য হইতে বুঝা যায়। কোন কোন বৈদিক ক্রিয়ার ফল আমরা ইহলোকেই দেখিতে পাই। অতএব অদৃষ্টার্থ বেদবাক্যকেও প্রামাণিক বলা যায়। আয়ুর্বেদের ন্যায় বেদও কোন আপ্ত-পুরুষের উপদেশ বলিয়াই প্রামাণিক। আমাদের মতো অল্পজ্ঞ পুরুষ বেদের রচয়িতা হইতে পারে না, কারণ বেদে অনেক অতিসূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় পদার্থ বিষয়ে উপদেশ আছে এবং সেগুলি সাধারণ মানুষের জ্ঞানগম্য নয়। অতএব কোন সর্বজ্ঞ পুরুষকেই বেদের রচয়িতা বা উপদেষ্টা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই সর্বজ্ঞ পুরুষই হইলেন ঈশ্বর।

(ঘ) শ্রুতিপ্রমাণ

ঈশ্বরবিষয়ক শ্রুতিবাক্যই তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ।

শ্রুতিতে অর্থাৎ বেদ ও উপনিষদে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট উক্তি আছে। যেহেতু শ্রুতি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে, জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে১ বলা হইয়াছে, সকলের শাসনকর্তা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা এক জন্মরহিত আত্মা আছেন, তিনি সকলের পূজা গ্রহণ করেন, এবং সকলকে সুফল দান করেন।' শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে২ কথিত হইয়াছে, 'এক ঈশ্বর সর্বভূতের অন্তরে নিহিত আছেন, তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্বভূতের অন্তর্যামী ও সর্বভূতের আশ্রয়স্থল।' কৌষীতকি উপনিষদেও৩ বলা হইয়াছে, 'তিনি সকল পুরুষের কর্তা এবং এই জগতের স্রষ্টা'। ভগবদ্গীতায়৪ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'ঈশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি সর্বভূতকে মায়াদ্বারা যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় চালিত করেন'। তিনি আরও

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ৪. ৪. ২২-২৩।
২। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৬. ১১।
৩। কৌষীতকি উপনিষৎ, ৪. ১৮।
৪। ভগবদ্গীতা, ১৮. ৬১।

CENTRAL LIBRARY

বলিয়াছেন, 'আমি এই জগতের পিতা, মাতা ও কর্মফলদাতা, পিতামহ ও একমাত্র জ্ঞেয় এবং পবিত্র বস্তু। আমিই ওঙ্কার এবং ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ-স্বরূপ। আমি সকলের গতি, ভর্তা ও প্রভু, সকল জীবের কৃতাকৃতের সাক্ষী ও বাসস্থান। আমি সকলের শরণ ও হিতকারী বন্ধু, আমি স্রষ্টা ও সংহর্তা, আমিই আধার ও প্রলয়স্থান এবং আমিই জগতের অক্ষয় কারণ।' এসকল শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে।

শ্রুতিবাক্য প্রমাণ কেন ?

এখানে কোন তর্ককুশল ব্যক্তি আপত্তি করিতে পারেন যে, কেবল শ্রুতি ও স্মৃতির উক্তিদ্বারা ঈশ্বর প্রমাণিত হন না। তর্কযুক্তিদ্বারাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইবে। কেবল শ্রুতিমূলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তাহা যুক্তিহীন মতবাদমাত্র হইয়া পড়িবে এবং সকলের গ্রাহ্য হইবে না। এরূপ আপত্তির খণ্ডনে দুইটি কথা বলিতে পারা যায়। প্রথমে বলা যায় যে, কোন তর্কযুক্তি বা প্রমাণ-প্রয়োগদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। কাণ্ট এবং লট্জে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কোন বস্তুকে প্রমাণ করার অর্থ হইতেছে উহাকে কোন স্বীকৃত ও ব্যাপক তত্ত্ব হইতে অনিবার্যভাবে প্রসক্ত বলিয়া প্রদর্শন করা। যেমন 'এ ব্যক্তি মরণশীল' এই প্রতিজ্ঞা বাক্যটি, 'সকল মানুষ মরণশীল, এবং এ ব্যক্তি একজন মানুষ' এই দুই তর্কবাক্যের সহযোগে প্রমাণিত হয়, যেহেতু উহা তাহাদের সংযোগ হইতে অনিবার্যভাবে প্রসক্ত হয়। কিন্তু ঈশ্বর সকল তত্ত্বের উপরে পরমতত্ত্ব, অন্য কোন উচ্চতর তত্ত্ব হইতে তাঁহার প্রসক্তি বা নিগমন প্রদর্শন করা যায় না, যেহেতু তাঁহার উপরে কোন তত্ত্ব নাই, অন্য সব তত্ত্ব তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত। দর্শনশাস্ত্রে সাধারণতঃ যেসব তথাকথিত প্রমাণদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহাদের আলোচনা করিলে ঈশ্বর যে কোন প্রমাণগ্রাহ্য নহেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের Ontological argument-কে প্রত্যয়মূলক প্রমাণ বলা যায়। প্রমাণটি এইরূপ : মানুষ ক্ষুদ্র ও অপূর্ণ জীব হইলেও তাহার মনে এক মহান্ ও পূর্ণ পুরুষের প্রত্যয় বা ধারণা আছে। যেহেতু তিনি পূর্ণ, তাঁহার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। কারণ অস্তিত্ব ব্যতীত তিনি অপূর্ণ হইয়া পড়িবেন। এখানে পূর্ণতার প্রত্যয় হইতে অস্তিত্বের অনুমান করা হয়। সেইরূপ কার্যলিঙ্গক অনুমানে (cosmological argument) দৃশ্যমান জগতের কার্যত্ব হইতে আদিকারণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। উপযোগিতালিঙ্গকে অনুমানে (teleological argument) জগতের রচনানৈপুণ্য ও শৃঙ্খলা এবং প্রাকৃতিক বস্তুর প্রয়োজন-সাধন-যোগ্যতা দর্শন করিয়া সর্বজ্ঞ ও রচনানিপুণ জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের অনুমান করা হয়। কিন্তু

তর্কযুক্তিদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না।

এখানে বক্তব্য এই যে প্রত্যেক প্রমাণই দোষদুষ্ট। প্রমাণগুলিতে আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কোন প্রত্যয় হইতে তাঁহার অস্তিত্ব অনুমান করি। প্রথম প্রমাণে দেখা যায় যে, ঈশ্বরের পূর্ণতার ধারণা করিতে হইলে তাঁহার অস্তিত্বের ধারণা করিতে হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরকে পূর্ণ ভাবিতে হইলে তাঁহার অস্তিত্ব ভাবিতে হয়। সেইরূপ জগৎকে কার্য ভাবিলে কোন আদিকারণ ভাবিতে হয়, জগতের সুশৃঙ্খলার ব্যাখ্যা করিতে হইলে কোন নিপুণ রচয়িতার কথা ভাবিতে হয়। কিন্তু **প্রত্যয়** বা ভাবনা হইতে বাস্তবিক **সত্তা** প্রসক্ত হয় না। যেমন আমার বস্ত্রাঞ্চলে স্বর্ণমুদ্রা বাঁধা আছে ভাবিতে পারি, কিন্তু তাহাতে বাস্তবিক স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যাইবে না। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোন প্রমাণদ্বারা প্রতিপাদিত হয় না।

তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারই তত্ত্ব-নির্ণয়ের একমাত্র পথ।

এখন দ্বিতীয় কথা হইতেছে, ঈশ্বরতত্ত্ব বা কোন তত্ত্ব-নির্ণয়ের প্রকৃষ্ট উপায় হইল সেই তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার। তর্কযুক্তিদ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় হয় না। জন্মান্ধ ব্যক্তি তর্কযুক্তি করিয়া আলোকের জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। যদি ভাগ্যক্রমে তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসে, তবে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষদ্বারা সে আলোকের জ্ঞানলাভ করে এবং কোন তর্কযুক্তির অপেক্ষা করে না। সেইরূপে ঈশ্বর-দর্শন বা ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকাশিত করে, এবং তখন আর প্রমাণপ্রয়োগের কোন প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে সাক্ষাৎকারের অভাবে বহু প্রমাণও ঈশ্বরে দৃঢ়প্রত্যয় জন্মাইতে পারে না।

যাহাদের তত্ত্বদর্শন হয় না তাহাদিগকে তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষিদের উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রুতি ঋষিবাক্য বলিয়া প্রমাণ।

অতএব যাহাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষানুভূতি নাই, তাহাদিগকে ঈশ্বরদ্রষ্টা সাধু ও ঋষিদের উপদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। বেদ বা শ্রুতি সাধু ও ঋষিদের উপদেশ। এজন্য শ্রুতিবাক্য ঈশ্বর-বিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। যেমন যুগে যুগে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকদের উপদেশ হইতে আমরা অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি, সেইরূপ বেদ ও উপনিষদের বাক্য হইতে ঈশ্বর ও অধ্যাত্মতত্ত্ব জানিতে পারা যায়।

(৩) ঈশ্বর-বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি

ঈশ্বর-বিষয়ে তিনটি আপত্তি ও তাহার খণ্ডন।

ঈশ্বর সম্বন্ধে ন্যায়-বৈশেষিকগণ যেসব মত পোষণ করেন তাহাতে কতগুলি আপত্তি হইতে পারে। এখন সেগুলির আলোচনা করিতে হইবে। প্রথম আপত্তি হইতে পারে যে, নৈয়ায়িকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে গেলে যে দুইটি প্রমাণ দিয়াছেন তাহারা পরস্পরাশ্রয়-দোষদুষ্ট।

তৃতীয় প্রমাণে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বেদ ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া প্রামাণিক শাস্ত্ররূপে গণ্য হইবার যোগ্য। আবার চতুর্থ প্রমাণে তাঁহারা বলিতেছেন যে, বেদ বা শ্রুতিবাক্যই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। অতএব দেখা যায় যে, তাঁহাদের মতে ঈশ্বর কর্তৃক বেদ প্রতিষ্ঠিত এবং বেদ কর্তৃক ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এরূপ বলিলে ঈশ্বর ও বেদ পরস্পরাশ্রিত হওয়ায় কেহ কাহারও প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না, উভয়েই অপ্রতিষ্ঠ হয়। নৈয়ায়িকগণ এই আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন পরস্পরাশ্রয় সর্বত্র দূষণীয় নহে। যদি দুইটি বস্তু একই বিষয়ে পরস্পর-নির্ভরশীল হয়, তবে অন্যোন্যাশ্রয় বা পরস্পরাশ্রয়দোষ ঘটে। কিন্তু এখানে বেদ ঈশ্বরসৃষ্ট বলিয়া উৎপত্তি বিষয়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। অপরপক্ষে, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান শ্রুতি-বাক্যজন্য বলিয়া ঈশ্বর জ্ঞপ্তিবিষয়ে বেদের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু শ্রুতিবাক্যের অর্থজ্ঞানের জন্য আমাদের ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে হয় না, যোগ্য আচার্যের নিকট আমরা সে জ্ঞানলাভ করিতে পারি। অতএব বেদ এবং ঈশ্বর বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পর নির্ভরশীল হওয়ায় পরস্পরাশ্রয়দোষ হয় না।

দ্বিতীয় আপত্তি এইরূপ, ঈশ্বর অশরীরী আত্মা, তাঁহার দেহ নাই। কিন্তু দেহ না থাকিলে কোন কর্ম সম্ভবপর হয় না। অতএব ঈশ্বর সৃষ্টি-কর্ম করিতে পারেন না। এই আপত্তির খণ্ডনে নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব শ্রুতিমূলে প্রমাণিত হইলে, এই আপত্তি অর্থহীন হয়, কারণ প্রমাণিত বস্তু সম্বন্ধে কোন আপত্তি অসংগত। পক্ষান্তরে, ঈশ্বরের অস্তিত্বই যদি প্রমাণিত না হয়, তবে তিনি দেহধারী নহেন বলিয়া কর্ম করিতে পারেন না এরূপ আপত্তির অবকাশই হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পূর্বোক্ত আপত্তি উভয়সংকটের (dilemma) মুখে পতিত হইয়া খণ্ডিত হয়।

শেষ আপত্তি এই যে, ঈশ্বর আপ্তকাম পুরুষ, তাঁহার কোন অভিলষিত বা বাঞ্ছিত বস্তু থাকিতে পারে না। কিন্তু কোন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই কোন ব্যক্তি কর্ম করেন। ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন না থাকায় তিনি সৃষ্টিকর্মে লিপ্ত হইতে পারেন না। আর যদি বলা যায় যে, ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণাবশতঃ সৃষ্টি করেন, তবে সংসারে জীবের এত দুঃখকষ্ট কেন, ঈশ্বর সর্বজীবকে সমভাবে সুখভোগী করেন না কেন? ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকেরা বলেন ঈশ্বর জীবে করুণাপরবশ হইয়া সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ম করেন একথা সত্য। কিন্তু কেবল সুখভোগের জন্য সৃষ্টি হয় না। জীবগণ তাহাদের সুকর্ম ও দুষ্কর্ম অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিবেই, তাহাতে ঈশ্বরের হাত নাই, ইহাই তাঁহার স্বকৃত নিয়ম ও স্বভাব। কিন্তু তজ্জন্য

CENTRAL LIBRARY

ঈশ্বরের পূর্ণতার হানি হয় না। এই সৃষ্ট জীবজগৎ তাঁহার শরীর। কাহারও শরীর তাহার কর্মের বাধা সৃষ্টি করে না, বরং কর্মের সহায়ই হয়। অতএব জীবজগৎদ্বারা ঈশ্বরের শক্তি সীমাবদ্ধ হয় না, অথবা তাঁহার পূর্ণতার হানি হয় না। জীবজগৎ ঈশ্বরের নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া এক মহান্ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ রূপায়ণে যন্ত্রবৎ চলিতেছে। তদ্দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যাহত না হইয়া পূর্ণই হইতেছে।

৬। উপসংহার

প্রমা ও প্রামাণ্যবিচারই ন্যায়দর্শনের বৈশিষ্ট্য এবং ইহার উপরই ন্যায়দর্শন প্রতিষ্ঠিত। কেহ কেহ অনুযোগ করেন যে, ভারতীয় দর্শন ধর্মশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা তর্কযুক্তি বা বিচারের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু এ ধারণা যে একেবারে ভ্রান্ত তাহা ন্যায়দর্শন পাঠে বুঝা যায়। ন্যায়দর্শনের প্রমা ও প্রামাণ্যবিচার শুধু ন্যায়দর্শনেরই নয়, পরন্তু সকল ভারতীয় দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ, যদিচ অন্যান্য দর্শনে ইহার কিছু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ন্যায়দর্শনে বিচারসম্মত উপায়েই জীবজগতের সমস্যাসমূহ সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে তর্কযুক্তিদ্বারাই দার্শনিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ও সমর্থন করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে যে বহুতত্ত্ববাদের স্বীকৃতি দেখা যায় তাহা ইহার প্রামাণ্যবাদের ন্যায় প্রশংসনীয় বা গ্রহণীয় নয়। ইহাতে জড় পরমাণু, মন, জীবাত্মা, ঈশ্বর, দেশ, কাল ও আকাশ প্রভৃতি বহু স্বতন্ত্র তত্ত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। কোন একটি সর্বগত তত্ত্বের মূলে জীবজগতের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয় নাই। এজন্য ন্যায়দর্শনকে সাংখ্য ও বেদান্ত-দর্শনের নিম্নে স্থান দেওয়া হয়। ন্যায়দর্শনের আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা করিলে ইহার যৌক্তিকতা বুঝা যায়। ন্যায়মতে আত্মা স্বরূপতঃ জড়দ্রব্য, চৈতন্য ইহার দেহসম্বন্ধজনিত একটি আগন্তুক গুণমাত্র। কিন্তু এ মত আত্মার সাক্ষাৎ প্রতীতিদ্বারা সমর্থিত হয় না, বরং ইহা আত্মার সাক্ষাৎ অনুভূতির বিরুদ্ধ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। আত্মার সাক্ষাৎ অনুভূতিতে আমরা আত্মাকে স্বরূপতঃ চেতন তত্ত্ব বলিয়াই উপলব্ধি করি, ইহা একটি গুণবিশিষ্ট দ্রব্যমাত্র এরূপ উপলব্ধি হয় না। ন্যায়মতে মোক্ষদশায় আত্মা জড় দ্রব্যে পরিণত হয়। তারপর ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরকে একজন অতিমানবের সমকক্ষ করা হইয়াছে। কোন শিল্পী যেমন মাটি, জল প্রভৃতি উপাদানের সাহায্যে কোন গৃহ নির্মাণ করেন, ঈশ্বর সেইরূপ নিত্য পরমাণু প্রভৃতির সাহায্যে জগৎ রচনা করেন। তিনি কেবল জগতের নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নহেন। অবশ্য ন্যায়মতে জীবজগৎ ঈশ্বরের শরীর এবং তিনি ইহার

আত্মা। কিন্তু এরূপ মত যে পূর্ণাঙ্গ ঈশ্বরবাদের সূচনা করে, ন্যায়দর্শনে তাহা পাওয়া যায় না। তথাপি জীবন-দর্শন হিসাবে ন্যায়দর্শনের উপযোগিতা কম নয়। ইহাতেও অনেক লোক আধ্যাত্মিক প্রেরণা, প্রসাদ ও প্রশান্তি লাভ করিতে পারেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৈশেষিকদর্শন

১। ভূমিকা

বৈশেষিকদর্শন মহর্ষি কণাদ-প্রণীত। শস্যক্ষেত্র হইতে শস্য কাটিয়া লইবার পর যেসব ধান্যকণা পড়িয়া থাকে তাহা সংগ্রহ করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেন বলিয়া বৈশেষিকদর্শন-প্রণেতা 'কণাদ' নামে অভিহিত হইয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে 'কণভক্ষ' বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃত নাম উলূক। এইজন্য বৈশেষিকদর্শনের অপর দুইটি নাম কাণাদ-দর্শন ও ঔলূক্যদর্শন। 'বিশেষ' পদার্থ বিচার করায় ইহার 'বৈশেষিক' নাম হইয়াছে।

বৈশেষিকদর্শন মহর্ষি কণাদ-প্রণীত।

কণাদের **বৈশেষিক-সূত্র** বৈশেষিকদর্শনের মূল গ্রন্থ। ইহাতে দশটি অধ্যায় আছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি করিয়া আহ্নিক বা ভাগ আছে। প্রশস্তপাদাচার্যের **পদার্থধর্মসংগ্রহ** বৈশেষিকদর্শনের ঠিক ভাষ্য নয়, ইহাতে বৈশেষিক-সূত্রের তাৎপর্য সংগৃহীত হইয়াছে মাত্র। লঙ্কেশ্বর রাবণ বৈশেষিক-সূত্রের এক ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, বেদান্তগ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। ব্যোমশিবের **ব্যোমবতী**, উদয়নের **কিরণাবলী** এবং শ্রীধরের **ন্যায়কন্দলী** পদার্থধর্মসংগ্রহের উৎকৃষ্ট টীকা। বল্লভাচার্যের **ন্যায়লীলাবতী** এবং উদয়নের **লক্ষণাবলী** বৈশেষিকদর্শনের উৎকৃষ্ট সংগ্রহগ্রন্থ। এই দর্শনের পরবর্তী কালের গ্রন্থ-সমূহে বৈশেষিকদর্শনের সহিত ন্যায়দর্শনের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ইহার পরিচয় শিবাদিত্যের **সপ্তপদার্থী**, লৌগাক্ষি ভাস্করের **তর্ককৌমুদী** এবং বিশ্বনাথের **ভাষাপরিচ্ছেদ** ও তাহার টীকা **সিদ্ধান্তমুক্তাবলী** প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়।

এই দর্শনের মূল গ্রন্থসমূহ।

ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শন সমানতন্ত্র। উভয়েরই চরম উদ্দেশ্য মোক্ষ। উভয়ের মতেই অবিদ্যা বা অজ্ঞান সর্বদুঃখের মূল এবং তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি-রূপ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু দুইটি প্রধান বিষয়ে ইহাদের মতভেদ দেখা যায়। ন্যায়মতে প্রমাণ চারিপ্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। বৈশেষিকমতে প্রমাণ দুইপ্রকার—প্রত্যক্ষ ও অনুমান; উপমান ও শব্দ ইহাদের অন্তর্গত। ন্যায়মতে পদার্থ ষোড়শপ্রকার

ন্যায়-বৈশেষিকদর্শন সমানতন্ত্র।

এবং বৈশেষিকদর্শনোক্ত সপ্তপদার্থ ইহার অন্তর্গত। বৈশেষিকদর্শনে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সপ্তপদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। বৈশেষিকদর্শনে ইহাদের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

সপ্তপদার্থ—ভাবপদার্থ ছয়টি এবং অভাব।

পদের অর্থের নাম পদার্থ, অর্থাৎ যে-কোন পদদ্বারা যে অর্থ অভিহিত হয় তাহাকে পদার্থ বলে। বৈশেষিকমতে সকল পদার্থকে দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—যথা ভাবপদার্থ ও অভাবপদার্থ। সকল অস্তিত্ববান্ বস্তু ভাবপদার্থ, যেমন বিদ্যমান বাহ্য দ্রব্য, মন, আত্মা প্রভৃতি। নাস্তিত্ব অভাবপদার্থ। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টি ভাবপদার্থ। সকলপ্রকার নাস্তিত্ব অভাবপদার্থ, যেমন ভূতলে চন্দ্রের নাস্তিত্ব, বিনষ্ট ঘটের নাস্তিত্ব, বায়ুতে রূপের নাস্তিত্ব ইত্যাদি।

২। পদার্থসমূহ

(১) দ্রব্য

যে পদার্থে গুণ ও কর্ম থাকে তাহার নাম দ্রব্যপদার্থ।

যে পদার্থ গুণ ও কর্মের আশ্রয় অর্থাৎ যাহাতে গুণ ও কর্ম থাকে এবং যাহা ব্যতীত ইহারা থাকিতে পারে না, তাহার নাম দ্রব্যপদার্থ। দ্রব্য সর্ব কার্যের সমবায়ী কারণ। যে উপাদানে কার্য নির্মিত হয় তাহাই সমবায়ী কারণ: অথবা কার্য যে কারণে সমবেত বা সমবায়-সম্বন্ধে থাকে, তাহার নাম সমবায়ী কারণ। যেমন ঘট কপাল ও কপালিকার সংযোগদ্বারা উৎপন্ন হয়, পট তন্তুসমূহের সংযোগদ্বারা উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন ঘট কপাল ও কপালিকায় এবং পট তন্তুসমূহে সমবেত থাকে। কপাল ও কপালিকা ঘটের এবং তন্তুসমূহ পটের সমবায়ী কারণ।

দ্রব্য নয়প্রকার।

দ্রব্যপদার্থ নয়প্রকার—ক্ষিতি বা পৃথিবী, অপ্ বা জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি দ্রব্যকে পঞ্চভূত বলে। যাহাতে বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ গুণ থাকে, তাহাকেই ভূত বলা যায়। পৃথিবীর গন্ধ, জলের রস, তেজের রূপ, বায়ুর স্পর্শ ও আকাশের শব্দ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ গুণ। জ্ঞান আত্মার বিশেষ গুণ, কিন্তু জ্ঞান মনোগ্রাহ্য, বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। এজন্য আত্মাকে ভূত বলা যায় না, আত্মা অভৌতিক দ্রব্য। গন্ধ পৃথিবীর বিশেষ গুণ, পৃথিবী ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্যে গন্ধ নাই। জলে বা বায়ুতে কোন কোন স্থলে গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু

তাহা জল বা বায়ুর সহিত পৃথিবী-পরমাণুর সংমিশ্রণে ঘটে, বিশুদ্ধ জলে বা বায়ুতে গন্ধ নাই। রস জলের বিশেষ গুণ, রূপ তেজের বিশেষ গুণ, স্পর্শ বায়ুর, এবং শব্দ আকাশের বিশেষ গুণ। এই পাঁচটি বিশেষ গুণ যথাক্রমে ঘ্রাণ, রসন, চক্ষু, ত্বক্ ও শ্রোত্র এই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। যে ইন্দ্রিয় যে ভূতের বিশেষ গুণ প্রত্যক্ষ করে, তাহা সেই ভূতের উপাদানে গঠিত। পৃথিবী ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উপাদান-কারণ, জল রসনেন্দ্রিয়ের, তেজ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের, বায়ু ত্বগিন্দ্রিয়ের, এবং আকাশ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের উপাদান-কারণ।

পৃথিব্যাদি পরমাণু নিত্য, পৃথিব্যাদি মহাভূত অনিত্য।

পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু পদার্থ দুইপ্রকার—নিত্য ও অনিত্য। পৃথিবী-পরমাণু, জল-পরমাণু, তেজ-পরমাণু ও বায়ু-পরমাণু নিত্য। ইহাদের উৎপত্তি বা বিনাশ নাই। তদ্ভিন্ন সমস্ত পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু অনিত্য। ইহারা পরমাণুসংযোগদ্বারা উৎপন্ন, অতএব পরিবর্তনশীল ও বিনাশী।

পরমাণুর অনুমানপ্রণালী।

পরমাণু প্রত্যক্ষ নহে, কিন্তু অনুমেয়। অনুমানের প্রণালী এইরূপ : ঘট, পট প্রভৃতি বস্তু সাবয়ব অর্থাৎ বিভিন্ন অবয়বসংযোগদ্বারা উৎপন্ন হয়। একটি ঘটের অবয়ব-বিভাগ করিতে করিতে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, এবং সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম অবয়বে উপনীত হইতে হয়। যে সূক্ষ্মতম অবয়বের আর বিভাগ করা যায় না, যাহা অভেদ্য তাহাই পরম সূক্ষ্ম, তাহাই পরমাণু। পরমাণুর উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ অবয়বসংযোগেই দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, কিন্তু পরমাণুর অবয়ব নাই, ইহা নিরবয়ব। পরমাণুর বিনাশও হইতে পারে না। কারণ অবয়ব-বিভাগদ্বারাই দ্রব্যে বিনাশ হয়, কিন্তু পরমাণুর কোন অবয়ব নাই। অতএব পরমাণু নিত্য দ্রব্য। পরমাণুসমূহের গুণগত ভেদ আছে। পরমাণু চারিপ্রকার—পৃথিবী-পরমাণু, জল-পরমাণু, তেজ-পরমাণু ও বায়ু-পরমাণু। ডেমোক্রিটাস্‌প্রমুখ গ্রীক্ পরমাণুবাদীরা পরমাণুসকলের গুণগত ভেদ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে সকল পরমাণুই একপ্রকারের, ইহাদের পরিমাণগত ভেদ আছে, কিন্তু গুণগত ভেদ নাই।

আকাশ এক, নিত্য, সর্বগত, অপ্রত্যক্ষ ভৌতিক দ্রব্য।

আকাশ পঞ্চম ভৌতিক দ্রব্য। শব্দের আশ্রয়-দ্রব্যের নাম আকাশ। শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু আকাশের প্রত্যক্ষ হয় না। কোন দ্রব্যের বাহ্য প্রত্যক্ষ হইতে হইলে উহা মহত্ত্ব অর্থাৎ প্রত্যক্ষযোগ্য পরিমাণযুক্ত হইবে এবং উহার একটি উদ্ভূত অর্থাৎ প্রকট রূপ থাকিবে। কিন্তু আকাশে পরিমেয় পরিমাণও নাই এবং প্রকট রূপও নাই। ইহা সর্বব্যাপী দ্রব্য এবং শব্দরূপ গুণের আশ্রয়। ইহা অনুমানগ্রাহ্য। অনুমানটি এইরূপ : প্রত্যেক গুণের

আশ্রয়রূপে কোন দ্রব্য থাকিবে। শব্দ একটি বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু শব্দের আশ্রয় নয়, কারণ এসব দ্রব্যের গুণ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, কিন্তু শব্দ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। অধিকন্তু এসব দ্রব্যের অভাবস্থলেও শব্দ থাকিতে পারে, যেমন নির্বাতপ্রদেশেও শব্দ হইতে পারে। দিক্, কাল, আত্মা ও মন শব্দের আশ্রয় নয়, কারণ শব্দ না থাকিলেও এসব দ্রব্য থাকিতে পারে। অতএব অন্যসব দ্রব্য হইতে পৃথক্ কোন দ্রব্য শব্দের আশ্রয় হইবে, ইহাই আকাশ। আকাশ এক ও নিত্য দ্রব্য, কারণ ইহার কোন অবয়ব বা অংশ নাই এবং ইহার অস্তিত্ব অন্য সব দ্রব্য-নিরপেক্ষ। যেহেতু আকাশের কোন সীমা নাই এবং ইহার শব্দরূপ গুণ সর্বত্র প্রত্যক্ষ হয়, ইহাকে সর্বব্যাপী বলিতে হয়।

দিক্ এবং কালও অপ্রত্যক্ষ দ্রব্য।

আকাশের ন্যায় দিক্ ও কাল (space and time) প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্য নহে। দিক্ ও কাল প্রত্যেকটিই এক, নিত্য ও সর্বগত দ্রব্য। 'এখানে' ও 'সেখানে', 'নিকটে' ও 'দূরে' ইত্যাদি ব্যবহারের হেতুরূপে দিক্ অনুমিত হয়। 'ভূত', 'ভবিষ্যৎ' ও 'বর্তমান' ইত্যাদি ব্যবহারের হেতুরূপে কাল অনুমিত হয়। আকাশ, দিক্ ও কাল প্রত্যেকেই এক এবং অবিভাজ্য হইলেও উপাধিভেদে নানা বা বহু বলিয়া কথিত হয়। একই আকাশকে উপাধিভেদে 'ঘটাকাশ', 'মঠাকাশ' বলা হয়, একই দিক্‌কে উপাধিভেদে পূর্ব-দক্ষিণাদি বলা হয় এবং একই কালকে উপাধিভেদে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বলা হয়। অতএব দিক্, কাল ও আকাশের নানাত্ব ঔপাধিকমাত্র, পরমার্থতঃ সত্য নহে। আরও এককথা এই যে, কণাদের মতে দিক্ ও কাল বাস্তবিকপক্ষে আকাশ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে, উহারা আকাশের কার্যভেদে নামভেদমাত্র, ইহাদের ভেদ ঔপাধিক অর্থাৎ কার্য ও নামভেদদ্বারা সৃষ্ট। অতএব কণাদের মতে আকাশ, কাল ও দিক্ এক পদার্থ, কার্যভেদে নামভেদমাত্র।

আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়, নিত্য ও বিভু দ্রব্য।

জ্ঞানের আশ্রয়-দ্রব্য আত্মা। ইহা নিত্য ও বিভু বা সর্বব্যাপী পদার্থ। আত্মা দুইপ্রকার—জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ঈশ্বর। ঈশ্বর এক এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন-সম্পন্ন পরম পুরুষ। ক্ষিতি প্রভৃতির কর্তারূপে ঈশ্বর অনুমেয়। জীবাত্মা মানসপ্রত্যক্ষগম্য। কোন একটি বিশেষ গুণের সহকারে জীবাত্মার মানসপ্রত্যক্ষ হয়। যেমন 'আমি জানিতেছি', 'আমি সুখী' ইত্যাদিরূপে জ্ঞান ও সুখাদি বিশেষগুণযোগে জীবাত্মার মানসপ্রত্যক্ষ হয়। জীবাত্মা এক নহে, পরন্তু বহু এবং প্রতিশরীরে ভিন্ন। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনাখ্য সংস্কার, ধর্ম ও অধর্ম জীবাত্মার এই চতুর্দশটি গুণ।

CENTRAL LIBRARY

মন একটি দ্রব্য এবং জীবাত্মা ও সুখ-দুঃখাদির প্রত্যক্ষের করণ। ইহা অণুপরিমাণ অর্থাৎ পরম সূক্ষ্ম এবং নিত্য পদার্থ। অণুপরিমাণ বলিয়া ইহার প্রত্যক্ষ হয় না। ইহা অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ। মনের অস্তিত্ব-বিষয়ে দুইপ্রকার অনুমান হইতে পারে। প্রথম অনুমান এইরূপ : রূপাদি বাহ্যবিষয়ের প্রত্যক্ষের জন্য যেরূপ চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের প্রয়োজন, সুখাদি অন্তর্বিষয়ের উপলব্ধির জন্যও সেইরূপ কোন অন্তরিন্দ্রিয় অপেক্ষিত। মন এই অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয়। দ্বিতীয় অনুমানপ্রণালী এইরূপ : রূপ, শব্দ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে তত্তদ্বিষয়ের উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু রূপ, শব্দ প্রভৃতি একাধিক বিষয় যুগপৎ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট হইলেও, আমাদের এককালে বিভিন্ন বিষয়ের উপলব্ধি হয় না। ইহাতে বুঝা যায় যে, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের অতিরিক্ত কোন সহকারি-কারণ আছে, যাহা থাকিলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং যাহা না থাকিলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। মন এই সহকারি-কারণ, যে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ হয়, সেই ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট বিষয়ের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে; যে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ থাকে না, তৎসন্নিকৃষ্ট বিষয়ের জ্ঞান জন্মে না। আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি 'মনোযোগ করি নাই বলিয়া শুনিতে বা দেখিতে পাই নাই'। এখানে মনোযোগের অর্থ আর কিছুই নহে—চক্ষু বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগমাত্র। মনের অস্তিত্ববিষয়ে শেষোক্ত প্রমাণদ্বারা মনের অণুত্বও প্রমাণিত হয়। এককালে যদি একাধিক জ্ঞান বা ক্রিয়া না হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, এককালে মন একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না। মন বিভু অর্থাৎ মহৎ-পরিমাণ হইলে এককালে তাহার একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হইতে পারে এবং তজ্জন্য এককালে একাধিক জ্ঞান ও ক্রিয়া হইতে পারে। কিন্তু এককালে একাধিক জ্ঞান বা ক্রিয়া হয় না। অতএব মনের মহৎ-পরিমাণ স্বীকার করিবার উপায় নাই, মনকে অণুপরিমাণই বলিতে হইবে।

মন অণুপরিমাণ অপ্রত্যক্ষ দ্রব্য। মনের অস্তিত্বের প্রমাণ।

(২) গুণ

যাহা দ্রব্যে সমবেত থাকে এবং যাহার নিজের কোন গুণ বা কর্ম নাই, তাহার নাম গুণ। দ্রব্যের স্বতন্ত্র সত্তা আছে, গুণের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। গুণের অস্তিত্ব দ্রব্য-সাপেক্ষ, গুণ কোন দ্রব্যেই থাকিবে, ইহার দ্রব্যনিরপেক্ষ সত্তা নাই। দ্রব্য কোন কার্যের সমবায়ী বা উপাদান কারণ, গুণ তাহার অসমবায়ী কারণ হইতে

গুণের লক্ষণ।

পারে, সমবায়ী কারণ হয় না। যেমন তন্তু বস্ত্রের সমবায়ী কারণ, তন্তুর রূপ বস্ত্রের সমবায়ী বা উপাদান-কারণ নয়। উহা তন্তুতে সমবেত থাকিয়া বস্ত্রের রূপ উৎপাদন করে, এজন্য তন্তুর গুণ অর্থাৎ রূপ বস্ত্রের অসমবায়ী কারণ। সকল গুণই দ্রব্যে সমবেত, এজন্য গুণের কোন গুণ হয় না। সকল কর্মও দ্রব্যে সমবেত, এজন্য গুণের কোন কর্ম বা ক্রিয়া হয় না। গুণ গুণরহিত ও কর্মরহিত দ্রব্যসমবেত পদার্থ। ইহা দ্রব্য ও কর্ম হইতে ভিন্ন।

ইহার চতুর্বিংশতি প্রকারভেদ।

গুণ চতুর্বিংশতিপ্রকার—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম ও অধর্ম। রূপ শুক্ল, কৃষ্ণ, লোহিত, পীত, নীল ও সবুজ ভেদে অনেকপ্রকার। রস মধুর-অম্ল-তিক্তাদিভেদে অনেকপ্রকার। গন্ধ সুরভি ও অসুরভিভেদে দুইপ্রকার। স্পর্শ তিনপ্রকার—উষ্ণ, শীত ও অনুষ্ণাশীত। শব্দ দুইপ্রকার—ধ্বনি ও বর্ণ। ঘণ্টা বা মৃদঙ্গাদির শব্দের নাম ধ্বনি। কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতি প্রদেশে উৎপন্ন শব্দের নাম বর্ণ। এক-দুই ইত্যাদি ব্যবহারের কারণ গুণবিশেষের নাম সংখ্যা। এক হইতে পরার্ধ পর্যন্ত সংখ্যা অনেকপ্রকার। মহৎ, হ্রস্ব ইত্যাদি ব্যবহারের হেতু গুণবিশেষের নাম পরিমাণ। পরিমাণ চারিপ্রকার—অণু, মহৎ, হ্রস্ব ও দীর্ঘ। যে গুণদ্বারা এক দ্রব্য অপর দ্রব্য হইতে পৃথক্ (যেমন ঘট হইতে পট পৃথক্) বলিয়া প্রতীত হয়, তাহার নাম পৃথকত্ব।

যে সকল বস্তু পরস্পর-সম্বন্ধ-শূন্য হইয়াও থাকিতে পারে (যেমন দুইটি লৌহ-গোলক) তাহাদের সম্বন্ধের নাম সংযোগ। কার্য ও কারণ সম্বন্ধ-শূন্য হইয়া থাকে না, এজন্য কার্যকারণের সম্বন্ধ সংযোগ নহে, উহা সমবায়। সংযোগ তিনপ্রকার—অন্যতর-কর্ম-জন্য, উভয়-কর্ম-জন্য, ও সংযোগ-জন্য। যে দুই বস্তুর সংযোগ হয়, তাহাদের মধ্যে একটিমাত্রের ক্রিয়াজন্য সংযোগ হইলে তাহাকে অন্যতর-কর্ম-জন্য বলে। যেমন পর্বতে একটি পক্ষী বসিলে পর্বত ও পক্ষীর যে সংযোগ হয়, তাহা কেবল পক্ষীর ক্রিয়াজন্য, ইহাই অন্যতর-কর্ম-জন্য সংযোগ। উভয় বস্তুর ক্রিয়াজন্য সংযোগের নাম উভয়-কর্ম-জন্য সংযোগ। পরস্পরাভিমুখে ধাবমান দুইটি গাড়ীর সংযোগ উভয়-কর্ম-জন্য। এক সংযোগ হইতে উৎপন্ন অন্য সংযোগের নাম সংযোগ-জন্য সংযোগ। আমার হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা ভূতল স্পর্শ করিলে, হস্তের সহিত ভূতলের যে সংযোগ হয়, তাহা যষ্টি ও ভূতলের সংযোগ-জন্য।

সংযোগের প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ যে গুণ উৎপন্ন হইলে সংযোগ বিনষ্ট হয়, তাহার নাম বিভাগ। সংযোগের ন্যায় বিভাগও তিনপ্রকার—একতর-কর্ম-জন্য, উভয়-কর্ম-জন্য ও বিভাগ-জন্য। পর্বত হইতে কোন পক্ষী উড়িয়া

গেলে পর্বত ও পক্ষীর যে বিভাগ হয়, তাহা একতর-কর্ম-জন্য। সংযুক্ত দুইটি গাড়ী বিপরীত দিকে ধাবমান হইলে তাহাদের যে বিভাগ হয়, তাহা উভয়-কর্ম-জন্য। ভূতল হইতে যষ্টি তুলিয়া লইলে ভূতল ও হস্তের যে বিভাগ হয় তাহা যষ্টি ও ভূতলের বিভাগ-জন্য।

পরত্ব ও অপরত্ব কালিক ও দৈশিকভেদে দুইপ্রকার। কালিক পরত্ব ও অপরত্ব জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্বরূপ। দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব দূরত্ব ও অন্তিকত্বরূপ।

বুদ্ধির লক্ষণ ও প্রকারভেদ।

বুদ্ধি বলিতে উপলব্ধি, জ্ঞান বা প্রত্যয় বুঝায়। বিষয়ভেদে বুদ্ধি বা জ্ঞানের বহু প্রকারভেদ আছে। সংক্ষেপে বলা যায়, জ্ঞান দুইপ্রকার—বিদ্যা বা প্রমা ও অবিদ্যা বা অপ্রমা। অসন্দিগ্ধ, অবাধিত ও ব্যবসায়াত্মক অর্থাৎ অবধারিত প্রতীতির নাম বিদ্যা বা প্রমা। তাহার বিপরীত প্রতীতির নাম অবিদ্যা বা অপ্রমা। অবিদ্যা চারিপ্রকার—সংশয়, বিপর্যয় বা ভ্রম, অনধ্যবসায় ও স্বপ্ন। যে জ্ঞানের বিষয় বিশেষরূপে অবধারিত হয় না, কেবল 'ইহা একটা কিছু হইবে' এরূপে প্রতীত হয় তাহাকে অনধ্যবসায় বলে। যেমন রাজা চলিয়া গেলে পর কেহ বলিলেন, 'রাজা কোন একটা পথ দিয়া গিয়াছেন'। স্বপ্নকালে জাগ্রদবস্থার ন্যায় বিষয়সকলের অনুভব হয়। কিন্তু স্বপ্নে অনুভূত বিষয়ের বিদ্যমানতা নাই। এজন্য উহা মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা। বিদ্যা বা প্রমাও চারিপ্রকার—প্রত্যক্ষ, লৈঙ্গিক বা অনুমিতি, স্মৃতি ও আর্ষ বা যোগজ প্রত্যক্ষ।[১] ন্যায়দর্শনের ব্যাখ্যাবসরে জ্ঞান ও তাহার নানারূপ প্রকারভেদের আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা ও দ্বেষের ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। এগুলি সকলেরই অনুভব-সিদ্ধ ও সুবিদিত। যত্ন তিনপ্রকার—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি। কোন বস্তু ইষ্টসাধন এরূপ জ্ঞানে তাহা লাভ করিবার জন্য যে প্রচেষ্টা হয় তাহার নাম প্রবৃত্তি। কোন বস্তু অনিষ্টসাধন এরূপ জ্ঞানে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তির অভাবের নাম নিবৃত্তি। যে যত্নপ্রভাবে শরীরে প্রাণবায়ুর গতি অর্থাৎ নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদি সম্পন্ন হয়, তাহার নাম জীবনযোনি যত্ন। গুরুত্ব বস্তুর পতনের কারণ। স্যন্দন বা ক্ষরণের হেতু গুণবিশেষের নাম দ্রবত্ব। জলে দ্রবত্ব আছে বলিয়া উহা স্থিরভাবে থাকে না, গড়াইয়া পড়ে। যে গুণপ্রভাবে গুঁড়া দ্রব্য পিণ্ডাকারে পরিণত হয়, সেই গুণবিশেষের নাম স্নেহ। জল ভিন্ন আর অন্য কোনও দ্রব্যের স্নেহগুণ নাই। তৈলাদিতে যে স্নেহগুণ দেখা যায়, তাহাও জলীয় অর্থাৎ তৈলাদির জলীয় অংশ হইতে উৎপন্ন।

১। প্রশস্তপাদভাষ্য দ্রষ্টব্য।

সংস্কার তিনপ্রকার—বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপক। কোন দূরস্থ লক্ষ্য বেধ করিবার জন্য ধনু হইতে বাণ নিক্ষেপ করিলে বাণে যে গতিক্রিয়া জন্মে তাহা স্বল্পক্ষণ স্থায়ী। কিন্তু ধনু হইতে লক্ষ্য পর্যন্ত বাণ পৌঁছাইতে লক্ষ্যের দূরত্ব অনুসারে বহুক্ষণ আবশ্যক করে। বৈশেষিকমতে ধনুর নিপীড়নে বাণে গতিক্রিয়া জন্মে। সেই গতিক্রিয়া বেগাখ্য সংস্কার উৎপন্ন করে এবং সেই সংস্কার বাণগত পর-পর গতিক্রিয়া জন্মাইয়া দেয়। এইভাবে বাণ লক্ষ্যস্থানে পৌঁছাইয়া লক্ষ্য বেধ করে। ভাবনাখ্য সংস্কার স্মরণের কারণ। কোন বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান হইলে এবং তদ্বিষয়ে উপেক্ষাবুদ্ধি না থাকিলে মনে যে সংস্কার জন্মে তদ্দ্বারা সেই বিষয়ের স্মরণ হয়। এইরূপ সংস্কারের নাম ভাবনা। কোন বস্তুর অবস্থান্তর ঘটাইলে উহা যে সংস্কার বা গুণবশতঃ পূর্বাবস্থায় স্থিত হয়, তাহার নাম স্থিতিস্থাপক সংস্কার। যেমন কোন বৃক্ষশাখাকে টানিয়া ছাড়িয়া দিবামাত্র উহা পূর্ববৎ অবস্থিত হয়, স্থিতিস্থাপক সংস্কার ইহার কারণ। পুণ্য ও পাপের নাম ধর্ম ও অধর্ম। শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠানে ধর্ম জন্মে, উহা সুখের হেতু। শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠানে অধর্ম জন্মে, উহা দুঃখের হেতু। ধর্ম ও অধর্মের সাধারণ নাম অদৃষ্ট। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, স্নেহ, স্বাভাবিক দ্রবত্ব, ভাবনাখ্য সংস্কার ও অদৃষ্ট, এইগুলির সাধারণ নাম বিশেষগুণ।

সংস্কার, ধর্ম ও অধর্ম।

(৩) কর্ম

ভৌতিক গতিক্রিয়ার নাম কর্ম। গুণের ন্যায় কর্মও দ্রব্যে সমবেত থাকে। কিন্তু কর্ম, দ্রব্য ও গুণ হইতে ভিন্ন। দ্রব্য, কর্ম ও গুণ উভয়েরই আশ্রয়। কিন্তু গুণ দ্রব্যের স্থিতিশীল ধর্ম, কর্ম চলনাত্মক ধর্ম। কর্ম সংযোগ ও বিভাগের স্বতন্ত্র কারণ। কর্মের গুণ থাকে না, কারণ সব গুণই দ্রব্যে থাকে। সকল কর্মই পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মন প্রভৃতি মূর্ত অর্থাৎ মধ্যমপরিমাণ দ্রব্যে থাকে। আকাশ, দিক্, কাল ও আত্মা অমূর্ত ও সর্বব্যাপী দ্রব্য। ইহাদের মধ্যে কোন কর্ম হয় না, কারণ ইহাদের গতি নাই।

কর্মের লক্ষণ।

কর্ম পাঁচপ্রকার—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। যে কর্মদ্বারা কোন দ্রব্যের অধোদেশের সহিত বিভাগ এবং ঊর্ধ্বদেশের সহিত সংযোগ হয়, তাহার নাম উৎক্ষেপণ। যেমন লোষ্ট্রাদি ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হইলে, তাহার উৎক্ষেপণ হইল বলা যায়। ইহার বিপরীত কর্ম অবক্ষেপণ, যদ্দ্বারা কোন দ্রব্যের ঊর্ধ্বদেশের

ইহার প্রকারভেদ।

সহিত বিভাগ এবং অধোদেশের সহিত সংযোগ হয়। যেমন ছাদ হইতে নিম্নে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রাদির অবক্ষেপণ হইল বলা যায়। যে কর্মদ্বারা কোন বস্তুর অবয়বসকলের পূর্বে যে নিকটতর সংযোগ ছিল না তাহা সাধিত হয়, তাহার নাম আকুঞ্চন। হস্তের অঙ্গুলীর মুষ্ট্যাকারে অবস্থিতি, বস্ত্রের পিণ্ডাকার সম্পাদন আকুঞ্চনের কার্য। যে কর্মদ্বারা ঐরূপ সংযোগ বিনষ্ট হয়, তাহার নাম প্রসারণ। আকুঞ্চিত হস্তাঙ্গুলীর বা বস্ত্রের যথাবৎ অবস্থিতি প্রসারণের কার্য। এই চারিপ্রকার কর্ম ভিন্ন অন্য সব কর্মের নাম গমন। প্রাণিসমূহের চলাফেরা, অগ্নির ঊর্ধ্বজ্বলন প্রভৃতি গমনের অন্তর্গত। সকলপ্রকার কর্মের প্রত্যক্ষ হয় না। মন অপ্রত্যক্ষ দ্রব্য, ইহার ক্রিয়াও অপ্রত্যক্ষ। পৃথিব্যাদি প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্যের কর্ম চক্ষু ও স্পর্শেন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়।

(৪) সামান্য

সামান্যের লক্ষণ।

নিত্য ও অনেকসমবেত পদার্থের নাম সামান্য বা জাতি। একজাতীয় অনেক দ্রব্যের একই নাম দেওয়া হয়, কারণ তাহাদের প্রকৃতি বা স্বভাব একই রকম। আমরা সকল মানুষকে মনুষ্য বলি, সকল গরুকে গো বলি, কারণ তাহাদের প্রকৃতি-গত একটা ঐক্য আছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে : এ ঐক্যের স্বরূপ কি? আমাদের মনে অবশ্য একজাতীয় বস্তুর প্রকৃতিগত ঐক্যের একটা প্রত্যয় বা ধারণা আছে, যাহাকে সামান্য-প্রত্যয় (general idea) বা জাতি-প্রত্যয় (class-concept) বলা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে : আমাদের মানসিক প্রত্যয়ানুযায়ী একজাতীয় বস্তুতে কোন ঐক্য আছে কি না এবং তাহার স্বরূপ কি? ন্যায়-বৈশেষিকমতে একজাতীয় বস্তুতে কোন ঐক্য আছে এবং তাহার নাম সামান্য। অতএব প্রশ্ন হইল : সামান্যের স্বরূপ কি?

সামান্যের স্বরূপ সম্বন্ধে বৌদ্ধমত।

বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে একজাতীয় বস্তুর যে এক নাম দেওয়া হয়, তাহাই তাহাদের একমাত্র ঐক্য, তদ্ব্যতীত অন্যকোন বস্তুগত ঐক্য নাই। মনুষ্যজাতি অনেক মনুষ্যব্যক্তির সমষ্টিমাত্র। সকল মনুষ্যব্যক্তির একই নাম মনুষ্য। এই নামের ঐক্যই তাহাদের একমাত্র ঐক্য। তাহাদের এক নাম দিবার কারণ এই নয় যে, তাহাদের মধ্যে কোন সমান সদ্বস্তু আছে। ব্যক্তির অতিরিক্ত জাতির কোন বাস্তব সত্তা নাই। একজাতীয় বস্তুর এক নাম দিবার কারণ এই যে, তাহারা অন্যজাতীয় বস্তু হইতে ভিন্ন। এই ভেদই তাহাদের নাম-দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাদের কোন সমান ধর্ম বা প্রকৃতিগত ঐক্য প্রকাশিত হয় না। অতএব বৌদ্ধমতে নামের সমতাই সামান্যের স্বরূপ। পাশ্চাত্ত্য তর্কশাস্ত্রে এই মতকে nominalism বলে।

জৈন ও বেদান্ত দর্শনমতে সামান্য একজাতীয় বস্তুর নামগত ঐক্যমাত্র নহে। অপরপক্ষে, ইহা একজাতীয় বস্তুসকলের অতিরিক্ত কোন পদার্থও নয়। সামান্য বলিতে একজাতীয় বস্তুতে অনুগত সমান ধর্ম বা গুণের সমষ্টি বুঝায়। এক মনুষ্যব্যক্তি অপর সকল মনুষ্যব্যক্তি হইতে ভিন্ন হইলেও সকল মনুষ্যেরই কতকগুলি সমান গুণ বা ধর্ম আছে—যথা সজীবতা, সচেতনতা, চিন্তাশীলতা ইত্যাদি। এইগুলি সকল মনুষ্যের সমান ধর্ম। এসব সমান ধর্মের সমষ্টিই তাহাদের ঐক্য বা একজাতীয়তার মূল। অতএব মনুষ্যস্বরূপ সামান্য বলিতে সকল মনুষ্যে অনুগত সমান গুণ বা ধর্মই বুঝায়। ইহা তদতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র সত্তা বা পদার্থ নহে। পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রে এই মতকে conceptualism বলে।

জৈন ও বেদান্তমত।

ন্যায়-বৈশেষিকগণের মতে সামান্য একজাতীয় বস্তুর সমানধর্মমাত্র নহে। উহা তদতিরিক্ত নিত্য এবং অনেক বস্তুতে অনুগত বা সমবেত স্বতন্ত্র পদার্থ। তাঁহারা সামান্যের লক্ষণ নির্দেশ করিতে বলিয়াছেন, নিত্য ও অনেক সমবেত পদার্থের নাম সামান্য বা জাতি। একজাতীয় বস্তু বা ব্যক্তির উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, কিন্তু তদনুগত সামান্যের উৎপত্তি বা বিনাশ হয় না, উহা নিত্য। সামান্য একজাতীয় সকল ব্যক্তিতে সমবায়সম্বন্ধে বিদ্যমান। যেমন মনুষ্যত্ব সকল মনুষ্যে সমবেত নিত্য পদার্থ। মনুষ্যবিশেষের জন্ম ও মরণ হইলেও মনুষ্যত্বের হানি হয় না, উহা নিত্য বা চিরস্থায়ী পদার্থ। অতএব সামান্য বা জাতি নামগত ঐক্যমাত্র নয় বা সমান গুণধর্মের সমষ্টিমাত্রও নয়। ইহা ব্যক্তি ও ব্যক্তিসকলের সমান ধর্মের অতিরিক্ত, কিন্তু সকল ব্যক্তিতে সমবেত নিত্য পদার্থ। পাশ্চাত্য তর্ক ও দর্শনশাস্ত্রে এই মতকে realism বলে।

ন্যায়-বৈশেষিকমত।

একজাতীয় বস্তুতে একটিমাত্র সামান্য থাকে, এজন্য সামান্যের আর কোন সামান্য হয় না। একজাতীয় বস্তুতে একাধিক সামান্য থাকিলে, সেই বস্তু-সকলের বিরুদ্ধধর্ম দেখা যাইবে, এবং ইহারা ঠিক কোন্ জাতীয় বস্তু তাহার নির্ণয় হইবে না। মানুষে যদি মনুষ্যত্ব ও গোত্ব দুই সামান্য থাকে, তবে এখন যাহাদিগকে মানুষ বলা হয়, তাহাদিগকে গো বলা যাইত।

ব্যাপকতা হিসাবে সামান্য বা জাতি তিনপ্রকার—পরা, অপরা ও পরাপরা। যে জাতি সর্বাধিক ব্যাপক, অথবা সর্বাধিকদেশবৃত্তি তাহা পরা। সত্তাজাতি পরা। ইহা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিন পদার্থেই আছে এবং ইহা অপেক্ষা অধিক ব্যাপক জাতি নাই। যে জাতি সর্বাল্প-ব্যাপক, অথবা সর্বাপেক্ষা অল্পদেশবৃত্তি, তাহা অপরা। ঘটত্বাদি জাতি সর্বাপেক্ষা অল্পদেশবৃত্তি, এইজন্য ইহারা অপরা জাতি। দ্রব্যত্বাদি জাতি ক্ষিতিত্বাদি জাতি অপেক্ষা

অধিকদেশবৃত্তি বলিয়া পরা এবং সত্তা অপেক্ষা অল্পদেশবৃত্তি বলিয়া অপরা। এইজন্য উহাদিগকে পরাপরা জাতি বলা যায়।

(৫) বিশেষ

বিশেষের লক্ষণ।

সামান্যের বিপরীত পদার্থ বিশেষ। যে পদার্থ একটিমাত্র নিত্য দ্রব্যে সমবেত এবং উহার ব্যাবর্তক অর্থাৎ ভেদসাধক তাহার নাম বিশেষ। সাবয়ব দ্রব্যমাত্র অনিত্য। তাহাদের অবয়বভেদদ্বারা পরস্পরভেদ বুঝা যায়। যেমন একটি ঘট হইতে আর একটি ঘট যে ভিন্ন তাহা তাহাদের বিভিন্ন অবয়বদৃষ্টে আমরা বুঝিতে পারি। একটি পার্থিব পরমাণু হইতে একটি জলীয় পরমাণু যে ভিন্ন তাহাও উহাদের গুণগত ভেদদ্বারা বুঝা যায়। কিন্তু একটি জলীয় পরমাণু যে আর একটি জলীয় পরমাণু হইতে ভিন্ন, তাহা তাহাদের অবয়ব বা গুণের ভেদদ্বারা বুঝা যায় না। কারণ পরমাণুর কোন অবয়ব নাই এবং দুই জলীয় পরমাণুর গুণগত কোন ভেদ নাই। অতএব বলিতে হয় যে, প্রত্যেক পরমাণুর কোন বৈশিষ্ট্য আছে, যদ্দ্বারা উহা অন্য সব পরমাণু বা দ্রব্য হইতে ব্যাবৃত্ত হয় অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া উপলব্ধ হয়। এরূপ অন্ত্য বৈশিষ্ট্যের হেতুই বিশেষ পদার্থ। দিক্, কাল, আকাশ, মন ও আত্মা পরমাণুর ন্যায় নিরবয়ব ও নিত্য দ্রব্য। তাহাদের প্রত্যেকটিতে বিশেষ পদার্থ সমবেত থাকায়, উহা অন্য সব দ্রব্য হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়াছে। অতএব বিশেষ একটিমাত্র নিত্য দ্রব্যে সমবেত এবং উহার ব্যাবর্তক হইতেছে। নিত্য দ্রব্য অসংখ্য হওয়ায়, তাহাদের ব্যাবর্তক বিশেষও অসংখ্য হইবে। বিশেষ অন্য দ্রব্যকে ব্যাবৃত্ত করে, কিন্তু বিশেষের ব্যাবৃত্তির জন্য অন্য বিশেষ আবশ্যক করে না, উহা স্বয়ং ব্যাবৃত্ত হয়। বিশেষ প্রত্যক্ষ হয় না, পরমাণুর ন্যায় উহা অপ্রত্যক্ষ পদার্থ।

(৬) সমবায়

সমবায়ের লক্ষণ।

দুইটি পদার্থের নিত্য সম্বন্ধের নাম সমবায়। ন্যায়-বৈশেষিকমতে পদার্থ-সকলের সম্বন্ধের মধ্যে সংযোগ ও সমবায় এই দুইটি প্রধান সম্বন্ধ। পূর্বে বলা হইয়াছে, যে দুইটি বস্তু পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে তাহাদের সম্বন্ধের নাম সংযোগ। ইহা অনিত্য এবং সংযুক্ত পদার্থদ্বয়ের গুণমাত্র। দুইটি স্বভাবতঃ অযুক্ত পদার্থের যোগ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সংযোগ-সম্বন্ধকে যুতসিদ্ধ বলে। কিন্তু যে দুইটি পদার্থ পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে না, তাহাদের নিত্য

সম্বন্ধের নাম সমবায়। ইহা গুণ নহে, গুণ হইতে ভিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থ। ইহা দুইটি পদার্থের আগন্তুক যোগ হইতে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু তাহাদের স্বাভাবিক নিত্য সম্বন্ধ। এজন্য সমবায় সম্বন্ধকে অযুতসিদ্ধ বলে। অবয়বে অবয়বীর সম্বন্ধ, দ্রব্যে গুণ ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ, ব্যক্তিতে জাতির সম্বন্ধ এবং নিত্য দ্রব্যে বিশেষ-পদার্থের সম্বন্ধ সমবায়। তন্তু অবয়ব এবং বস্ত্র অবয়বী, তন্তু ব্যতীত বস্ত্র থাকিতে পারে না, তন্তুতে বস্ত্রের নিত্যসম্বন্ধ বা সমবায়-সম্বন্ধ আছে। সেইরূপ দ্রব্য ব্যতীত কোন গুণ বা ক্রিয়া থাকে না, জাতির অধিকরণ ব্যক্তি ব্যতীত জাতি থাকে না এবং কোন নিত্য দ্রব্য ব্যতীত বিশেষ পদার্থ থাকে না। অতএব দ্রব্যে গুণ ও ক্রিয়ার, ব্যক্তিতে জাতির এবং নিত্য দ্রব্যে বিশেষ পদার্থের নিত্য-সম্বন্ধ অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধ আছে। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, অবয়বী অবয়বে সমবেত, গুণ ও কর্ম বা ক্রিয়া দ্রব্যে সমবেত, ব্যক্তিতে জাতি এবং নিত্যদ্রব্যে বিশেষ-পদার্থ সমবেত, কিন্তু অবয়ব অবয়বীতে, দ্রব্য গুণ ও কর্মে, ব্যক্তি জাতিতে এবং নিত্যদ্রব্য বিশেষ-পদার্থে সমবেত নহে। ন্যায়-দর্শনমতে সমবায় প্রত্যক্ষযোগ্য, কিন্তু বৈশেষিকমতে উহা অপ্রত্যক্ষ।

(৭) অভাব

ষট্ ভাবপদার্থের আলোচনার পর সপ্তম অভাবপদার্থের আলোচনা করা যাইতেছে। ভাবপদার্থের ন্যায় অভাবপদার্থের সত্যতা অবশ্য স্বীকার্য। রাত্রিকালে আকাশে চন্দ্র ও তারকার অস্তিত্ব যেরূপ সত্য, সূর্যের অভাবও সেইরূপ সত্য। যদিও বৈশেষিকসূত্রে অভাবপদার্থের উল্লেখ নাই, তথাপি অভাববিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। পরবর্তী সমস্ত গ্রন্থে বৈশেষিকমতে অভাব যে সপ্তম পদার্থ তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব আমরা এখানে অভাব সপ্তম পদার্থ, এই মতের অনুসরণ করিব।

সপ্তম পদার্থ অভাব।

অভাব দুইপ্রকার—সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। সম্বন্ধের অভাবকে সংসর্গাভাব বলে। সংসর্গাভাব তিনপ্রকার—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। কোন বস্তু উৎপন্ন হইবার পূর্বে তাহার অভাবকে প্রাগভাব বলে। যেমন ইষ্টকদ্বারা গৃহ নির্মিত হইবে, সুতরাং এখন গৃহ নাই। উৎপত্তির পূর্বে ইষ্টকে গৃহের যে অভাব আছে, তাহা প্রাগভাব। এখানে ইষ্টকের সহিত গৃহের সংসর্গাভাব আছে। প্রাগভাবের আদি নাই, কিন্তু অন্ত আছে। উৎপত্তির পূর্বে গৃহ কখনও ছিল না।

অভাব দুইপ্রকার—সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব তিনপ্রকার—প্রাগভাব,

CENTRAL LIBRARY

কিন্তু গৃহ নির্মিত হইলেই তাহার আর প্রাগভাব থাকে না। যাহার অভাব তাহাকে প্রতিযোগী বলে। ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট, গৃহাভাবের প্রতিযোগী গৃহ। অতএব প্রতিযোগী প্রাগভাবের নাশক।

ধ্বংসাভাব,

উৎপত্তির পরে কোন বস্তু বিনষ্ট হইলে তাহার যে অভাব হয়, তাহাকে ধ্বংসাভাব বলে। যেমন মুদ্গরাদির আঘাতদ্বারা উৎপন্ন ঘটের অভাব। ধ্বংসাভাবের আদি অর্থাৎ উৎপত্তি আছে, কিন্তু অন্ত অর্থাৎ বিনাশ নাই। মুদ্গরাদির আঘাতদ্বারা ঘট বিনষ্ট হইলে উহার অভাব উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেই ঘট আর উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়া উহার অভাবের বিনাশ হয় না। যদিও উৎপন্ন ভাবপদার্থ-মাত্রের বিনাশ হয়, উৎপন্ন অভাবপদার্থের বিনাশ হয় না।

অত্যন্তাভাব।

যে সংসর্গাভাব পূর্ব বা পরকালে সীমাবদ্ধ নহে, যাহা সর্বকালে থাকে, তাহাকে অত্যন্তাভাব বলে। বায়ুতে রূপের অভাব অত্যন্তাভাব। ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্তমান কোন কালেই বায়ুতে রূপ নাই। ঘটের উৎপত্তির পূর্বকালে যে তাহার অভাব, তাহা প্রাগভাব। ঘট বিনষ্ট হইবার পরকালে যে তাহার অভাব, তাহা ধ্বংসাভাব। কিন্তু বায়ুতে রূপের সর্বকালে যে অভাব, তাহা অত্যন্তাভাব। অত্যন্তাভাবের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই, ইহা অনাদি ও অনন্ত।

অন্যোন্যাভাব।

সংসর্গাভাবদ্বারা দুই বস্তুর সংসর্গ অর্থাৎ সম্বন্ধের অভাব বুঝায়। অন্যোন্যাভাবে দুইটি বস্তুর ভেদ বুঝায়। যেমন ঘট পট নহে, অর্থাৎ ঘট পট হইতে ভিন্ন, একথা বলিলে, ইহাদের একটিতে অপরটির অভাব বুঝায়। এইরূপ পরস্পরেতে পরস্পরের যে অভাব, তাহাই অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাবের বিপরীত ভাব হইল সংসর্গ, কিন্তু অন্যোন্যাভাবের বিপরীত ভাব হইল তাদাত্ম্য বা অভিন্নত্ব। যেমন 'বায়ুতে রূপ নাই', একথার বিপরীত কথা হইল 'বায়ুতে রূপ আছে'। 'ঘট পট নহে', বা 'ঘট পট হইতে ভিন্ন' একথার বিপরীত কথা হইল 'ঘট পট', অথবা 'ঘট পট হইতে অভিন্ন'। অত্যন্তাভাবের ন্যায় অন্যোন্যাভাবের আদি ও অন্ত নাই, ইহা নিত্য।

৩। জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের ক্রম

বৈশেষিকদর্শনে সৃষ্টি ও প্রলয়ের ক্রম আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসারী।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় দর্শনের একটি বৈশিষ্ট্য। এ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে জীবজগৎ একটি নৈতিক বা আধ্যাত্মিক সৃষ্টি। এখানে জীব তাহার কৃতকর্মানুসারে ফল-ভোগ করে এবং জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়া ক্রমশঃ পরম-পুরুষার্থ মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। বৈশেষিক-দর্শনে সৃষ্টি ও প্রলয়ের যে ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে এ আধ্যাত্মিক দৃষ্টি-

CENTRAL LIBRARY

ভঙ্গীর ব্যত্যয় হয় না। বৈশেষিকমতে চতুর্বিধ পরমাণুই জগতের সকল উৎপন্ন বস্তুর উপাদান-কারণ। এজন্য জগৎ সম্বন্ধে বৈশেষিকমতকে পরমাণু-কারণবাদ বলা হয়। কিন্তু এ পরমাণু-কারণবাদকেও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী-অনুসারী বলিতে হয়। আরও এককথা, বৈশেষিকমতে দিক্, কাল, আকাশ, আত্মা ও মন পরমাণু হইতে উৎপন্ন নয়। এজন্য বৈশেষিক-দর্শন-সম্মত পরমাণু-কারণবাদকে পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও বিজ্ঞানে ব্যাখ্যাত পরমাণু-কারণবাদ হইতে একেবারে ভিন্নপ্রকার বলিতে হইবে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের পরমাণু-কারণবাদ জড়বাদের নামান্তর। এই মতানুসারে অনন্ত দেশ ও কালে অসংখ্য জড় পরমাণুর যদৃচ্ছ গতিবিধি ও সংঘাতদ্বারা সমগ্র জীবজগতের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা কোন চেতন বা বুদ্ধিমান্ কর্তার ইচ্ছা বা যত্নপ্রসূত নহে। অপরপক্ষে, বৈশেষিকদর্শনে পরমাণু-কারণবাদ ঈশ্বর-কারণবাদের অন্তর্ভূত। ইহাতে মহেশ্বরের সৃষ্টি বা সংহার করিবার ইচ্ছাই পরমাণুসকলের গতিক্রিয়ার আদি কারণ। মহেশ্বর জীবের অদৃষ্ট অনুসারে পরমাণুসমূহের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিয়া জগৎ সৃষ্টি ও সংহার করেন।

ইহা পাশ্চাত্ত্য দর্শনের পরমাণু-কারণবাদ হইতে ভিন্নরূপ।

বৈশেষিকমতে চতুর্বিধ পরমাণু এবং আকাশ, দিক্, কাল, আত্মা ও মন নিত্য দ্রব্য। ইহাদের উৎপত্তি বা বিনাশ হয় না। এসব নিত্য দ্রব্য ভিন্ন অন্য সব দ্রব্য অনিত্য। অতএব জগতের সৃষ্টি বা প্রলয় বলিতে নিত্য-পদার্থ-ভিন্ন দ্ব্যণুকাদি মহাভূতচতুষ্টয়ের সৃষ্টি ও সংহার বুঝায়। বৈশেষিকমতে সকল অনিত্য দ্রব্যই পরমাণু-সংযোগে উৎপন্ন হয় এবং পরমাণু-বিভাগদ্বারা বিনষ্ট হয়। দুইটি পরমাণুর সংযোগে একটি দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয় এবং তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে একটি ত্র্যণুক বা ত্রসরেণুর উৎপত্তি হয়। ত্র্যণুকই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্য। পরমাণু বা দ্ব্যণুকের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহারা অনুমেয়।

জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় বলিতে অনিত্য দ্রব্যসমূহের সৃষ্টি ও সংহার বুঝায়।

অনিত্য জগৎ অর্থাৎ অনিত্য দ্রব্যসকলের সৃষ্টি ও প্রলয়ের ক্রম এইরূপ : নিখিল ভুবনের অধিপতি মহেশ্বরের সিসৃক্ষা অর্থাৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা সৃষ্টির আদিকারণ। জীবের পূর্বজন্মার্জিত অদৃষ্ট অনুসারে ভোগসম্পাদনের জন্য মহেশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করেন। সৃষ্টি ও প্রলয়ের ক্রম অনাদি বলিয়া, এক সৃষ্টির পূর্বে প্রলয় এবং প্রলয়ের পূর্বে সৃষ্টি এরূপ ক্রম অনাদিকাল চলিতেছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং জগতের সর্বপ্রথম সৃষ্টি বলিয়া কিছু নাই। এক সৃষ্টির পূর্বে আর এক সৃষ্টি ছিল এবং তাহার সংহার অর্থাৎ প্রলয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পূর্বসৃষ্টিতে জীবকুলের জন্ম ও কর্মার্জিত

সৃষ্টির ক্রম।

অদৃষ্ট সঞ্জাত হইয়াছিল। প্রলয়কালে জীবাত্মা অদৃষ্টযুক্ত হইয়া অবস্থান করে। মহেশ্বরের সিসৃক্ষা জীবের পূর্বসঞ্চিত অদৃষ্টানুসারিণী হয়। তিনি যখন এইভাবে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করেন, তখন জীবের অদৃষ্ট ভোগের অনুকূল বৃত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় অর্থাৎ ভোগ্য জগতের সৃষ্টির অনুকূল বৃত্তি লাভ করে। ঐ অদৃষ্টযুক্ত আত্মার সংযোগে প্রথমতঃ বায়ু-পরমাণুতে কর্মের উৎপত্তি হয়। তজ্জন্য বায়ু-পরমাণুসকলের পরস্পর সংযোগে দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান্ বায়ুর উৎপত্তি হয় এবং উহা অনবরত কম্পমান হইয়া আকাশে অবস্থিত হয়। বায়ুসৃষ্টির পরে ঐরূপে জলীয় পরমাণুতে কর্মের উৎপত্তি হয় এবং জলীয় পরমাণুসকলের পরস্পর সংযোগে দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান্ জলরাশি উৎপন্ন হয়। এই মহান্ জলরাশি বায়ুবেগে কম্পমান হইয়া বায়ুতে অবস্থিত হয়। তৎপরে উক্ত ক্রমে পার্থিব-পরমাণুসকলের সংযোগে মহাভূত পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া ঐ জলরাশিতে অবস্থিত হয়। তৎপরে ঐরূপে মহান্ তেজোরাশি উৎপন্ন হইয়া ঐ জলরাশিতে অবস্থিত হয়। তদনন্তর মহেশ্বরের সংকল্পমাত্রে পার্থিব ও তৈজস পরমাণু হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয় এবং ব্রহ্মা তাহাতে অধিষ্ঠিত হয়েন। ব্রহ্মা অতিশয় জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যসম্পন্ন হইয়াই উৎপন্ন হন। তিনি মহেশ্বর কর্তৃক সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত হইয়া জীবদিগের কর্মানুসারে ক্রমে সমস্ত জগতের সৃষ্টি করেন।

ব্রহ্মা সহস্রযুগ পর্যন্ত সৃষ্ট জগতের স্থিতি সম্পাদন করেন। কিন্তু জগৎ চিরস্থায়ী হইতে পারে না, কারণ ইহা অনিত্য। সৃষ্টি ও স্থিতির পরে জগতের প্রলয় হয়। প্রাণিগণ যেমন সমস্তদিন পরিশ্রম করিয়া রাত্রিতে বিশ্রাম লাভ করে, সেইরূপ সৃষ্ট জগতে নানারূপ সুখ-দুঃখভোগ করিয়া পরিশ্রান্ত জীবগণের কিয়ৎকাল বিশ্রামের জন্য মহেশ্বরের ইচ্ছানুসারে প্রলয়ের আবির্ভাব হয়। এইজন্য পুরাণাদিতে সৃষ্টি ও প্রলয়কে ব্রহ্মার দিন ও রাত্রি বলা হইয়াছে।১ যেমন দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন হয়, সেইরূপ সৃষ্টির পর প্রলয় এবং প্রলয়ের পর সৃষ্টি হয়। এইরূপ সৃষ্টি ও প্রলয়ের ক্রমপ্রবাহ অনাদি-অনন্ত কাল চলিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইতে প্রলয় অবধি কালকে এক কল্প বলে। প্রায় সকল ভারতীয় আস্তিক দর্শনে কল্পের অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয়ের আবর্তন স্বীকৃত হইয়াছে। সৃষ্ট জগৎ যে অনিত্য এবং কালে বিনষ্ট হইবেই, তাহা কয়েকটি দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝা যায়। ঘটাদি পার্থিব বস্তু চূর্ণীকৃত হয়। পর্বতসকলও পার্থিব, অতএব তাহারাও একসময় চূর্ণীকৃত হইবে। জলাশয়সকল শুষ্ক হয়। সমুদ্রও বিশাল

১। বিষ্ণুপুরাণ, ১. ৩ ১৪ ; ভগবদ্গীতা, ৮. ১৭-১৯ দ্রষ্টব্য।

জলাশয়মাত্র, অতএব সমুদ্র শুষ্ক হইবে। প্রদীপ তৈজস, উহা নিবিয়া যায়। সূর্যও মহাতৈজস দ্রব্য, অতএব সূর্যও কালে নির্বাপিত হইবে।

প্রলয়ের ক্রম।

এখন প্রলয়ের ক্রম প্রদর্শিত হইতেছে। অনন্তকালবশে ব্রহ্মার দেহনাশ হইলে সকল ভুবনের অধিপতি মহেশ্বরের সঞ্জিহীর্ষা অর্থাৎ সংহারের ইচ্ছা প্রাদুর্ভূত হয়। তৎকালে সকল জীবাত্মার ভোগ বা সৃষ্টিহেতু অদৃষ্ট, সংহার বা প্রলয়হেতু অদৃষ্টদ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়। এমত অবস্থায় প্রলয়হেতু-অদৃষ্ট-যুক্ত আত্মার সংযোগে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের উৎপাদক পরমাণুসকলে কর্মের উৎপত্তি হয়। তজ্জন্য শরীর ও ইন্দ্রিয়ের পরমাণুসকল বিভক্ত হইয়া পড়ে। ফলে শরীরেন্দ্রিয় বিনষ্ট হয় এবং পরমাণুগুলি বিভক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। এইরূপে, পৃথিবীর উৎপাদক পরমাণুতে কর্ম হইয়া তাহাদের বিভাগ হয় এবং ফলে মহাপৃথিবী নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রণালীতে পৃথিবীর পর জল, জলের পর তেজ, তেজের পর বায়ু নষ্ট হয়। তখন চতুর্বিধ মহাভূতের চতুর্বিধ পরমাণুসকল বিভক্তরূপে অবস্থান করে, আর ধর্মাধর্ম এবং ভাবনাখ্য-সংস্কারযুক্ত আত্মাসকল এবং আকাশ, দিক্, কাল ও মন নিত্য পদার্থগুলি মাত্র অবস্থিত থাকে। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, প্রলয়কালে প্রথমে মহাপৃথিবী, তারপর জল, তেজ ও বায়ু মহাভূত ক্রমান্বয়ে নষ্ট হয়। কিন্তু সৃষ্টিকালে প্রথমে মহাবায়ু, তারপর জল, পৃথিবী ও তেজ মহাভূত ক্রমান্বয়ে আবির্ভূত হয়।

৪। উপসংহার

ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শন সমানতন্ত্র। অধিকাংশ বিষয়ে ইহাদের মিল আছে। ন্যায়দর্শনের ন্যায় বৈশেষিকদর্শনে বস্তুতন্ত্রবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। ন্যায়দর্শনের ন্যায় ইহাতেও বহুতত্ত্ববাদের সহিত ঈশ্বরবাদের মিলন সাধিত হইয়াছে। ইহাতে চতুর্বিধ পরমাণু হইতেই জগতের উৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এই পরমাণুকারণবাদ ঈশ্বরবাদের বিরোধী নহে, বরং জীবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রয়োজনানুযায়ী। মহেশ্বর জীবের অদৃষ্ট অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগের জন্য জগতের সৃষ্টি করেন। কিন্তু ইহাতে আত্মা ও ঈশ্বরের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে এবং জগতের সহিত ঈশ্বরের যেরূপ সম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে তাহা আদরণীয় নহে এবং তাহাতে বিপ্রতিপত্তি হইতে পারে। বৈশেষিকমতে আত্মা একটি স্বতন্ত্র দ্রব্যমাত্র, জ্ঞান ইহার আগন্তুক ও আকস্মিক গুণ। কিন্তু এরূপ হইলে আত্মায় চৈতন্য বা জ্ঞানের উৎপত্তি কিরূপে হয় তাহা বুঝা যায় না। দেহ,

CENTRAL LIBRARY

ইন্দ্রিয় ও মন স্বরূপতঃ চেতন নহে। ইহাদের চৈতন্যগুণকে আগন্তুক বলা যায়। কিন্তু ইহাদের চৈতন্য আত্মচৈতন্যের প্রকাশ বলিতে হয়। আত্মচৈতন্য অচেতন দেহ-ইন্দ্রিয় ও মনের সম্বন্ধপ্রসূত হইতে পারে না। অতএব চৈতন্যকে আত্মার স্বভাবগত গুণ বলিতে হয়, উহার আগন্তুক গুণ বলা যায় না। তারপর, বৈশেষিকমতে জীবজগতের সহিত ঈশ্বরের কোন নিবিড় সম্বন্ধ বা প্রাণের যোগ নাই, তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাতীত হইয়া আছেন। কিন্তু এরূপ মত আধ্যাত্মিক জীবনের বিশেষ অনুকূল নয় এবং পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনের আকাঙ্ক্ষার পরিপোষকও নয়।

বৈশেষিকদর্শনে সপ্তপদার্থের যে সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এবং জগতের উৎপত্তি বিষয়ে যে পরমাণুকারণবাদের ব্যাখ্যা আছে, তাহাকেই ইহার বৈশিষ্ট্য বলা যায়। ইহাতে ভাবপদার্থের ন্যায় অভাবপদার্থেরও যথার্থতা স্বীকৃত হইয়াছে এবং উহাদের ভেদও নিরূপিত হইয়াছে। সামান্য বা জাতিবিচার অবসরে বৈশেষিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, যদিও প্রায় সকল প্রকার পদার্থকে কোন না কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তথাপি আকাশ, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাবপদার্থের কোন জাতি বা সামান্য নাই। তাঁহারা সপ্তপদার্থের উদ্দেশ করিয়া তাহাদের যে লক্ষণ ও বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের গুণগত মৌলিক ভেদ স্বীকৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বৈশেষিকদর্শনে ব্যাখ্যাত পরমাণুকারণবাদকে সাধারণ বা লোকায়ত জড়বাদ এবং বৈজ্ঞানিক জড়বাদের দোষমুক্ত বলা যায়। ইহাতে ঈশ্বরে ভক্তি-বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত পরমাণুকারণবাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বলিতে হয়, বৈশেষিকদর্শনে পূর্ণাঙ্গ ঈশ্বরবাদ পাওয়া যায় না। কারণ ইহাতে ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্তকারণমাত্র বলা হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়কারণই, ইহার অন্তরাত্মা, গতি, ভর্তা, প্রভু ও সাক্ষী।

CENTRAL LIBRARY

সপ্তম অধ্যায়

সাংখ্যদর্শন

১। ভূমিকা

প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে সাংখ্যদর্শন মহর্ষি কপিল-প্রণীত। সাংখ্যদর্শন অতি প্রাচীন। সাংখ্যদর্শনের মূল চিন্তাধারা শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বিদ্যমান। মহর্ষি কপিল-প্রণীত "তত্ত্বসমাস" সাংখ্যদর্শনের আদি গ্রন্থ। ইহাতে সাংখ্যদর্শনের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। মহর্ষি কপিল "সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে" তত্ত্বসমাসের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এজন্য সাংখ্যদর্শনকে সাংখ্যপ্রবচনও বলা হয়। এই দর্শনকে নিরীশ্বর-সাংখ্য বলে, যেহেতু মহর্ষি কপিল সাংখ্যসূত্রে ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়াছেন, অন্ততঃ প্রমাণদ্বারা ঈশ্বরসিদ্ধি হয় না, একথা বলিয়াছেন। অবশ্য কোন কোন গ্রন্থকারের মতে সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী নহে। পক্ষান্তরে, যোগ-দর্শনে ঈশ্বর স্পষ্টতঃ অংগীকৃত হওয়ায় উহাকে সেশ্বর-সাংখ্য বলে।

সাংখ্যদর্শন মহর্ষি কপিল-প্রণীত।

মহর্ষি কপিলের পরে তাঁহার শিষ্য আসুরি এবং আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখাচার্য সাংখ্যদর্শনের পরিষ্কার ব্যাখ্যাচ্ছলে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে সেসব গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বরকৃষ্ণের **সাংখ্যকারিকা** সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে প্রাপ্তব্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রথম প্রামাণিক গ্রন্থরূপে পরিগণিত। গৌড়পাদের সাংখ্যকারিকাভাষ্য, বাচস্পতি মিশ্রের তত্ত্বকৌমুদী, বিজ্ঞানভিক্ষুর সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য ও সাংখ্যসার প্রভৃতি সাংখ্য-দর্শনের প্রামাণিক গ্রন্থ।

সাংখ্যদর্শনের কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

'সাংখ্য' নামের উৎপত্তি রহস্যাবৃত। কেহ কেহ মনে করেন যে, 'সাংখ্য' শব্দ 'সংখ্যা' শব্দ হইতে উৎপন্ন এবং এই দর্শনে তত্ত্বের সংখ্যা পরিগণনাদ্বারা তত্ত্বনির্ণয় করা হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম সাংখ্য। পক্ষান্তরে, অপর কেহ কেহ বলেন যে, সংখ্যা শব্দের অর্থ সম্যগ্-জ্ঞান এবং এই দর্শন তত্ত্বজ্ঞান বা সম্যগ্-জ্ঞান প্রদান করে বলিয়া ইহাকে সাংখ্য বলে। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের ন্যায় সাংখ্যদর্শনেরও উদ্দেশ্য হইল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। সাংখ্যদর্শনের প্রথম সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ত্রিবিধ দুঃখের

'সাংখ্য' নামের উৎপত্তিবিষয়ে মত।

অত্যন্তনিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। ন্যায়মতের ন্যায় সাংখ্যমতেও দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তিই মুক্তি। কিন্তু ন্যায়দর্শনে বহু তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, সাংখ্যদর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুইটি পরম তত্ত্ব পরিগৃহীত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনের আলোচনাবসরে এই দুইটি পরতত্ত্ব এবং অন্যান্য অপর তত্ত্বের আলোচনা করা হইবে।

১। সাংখ্যদর্শনে কার্যকারণবাদ

কার্যকারণ সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও ন্যায়-বৈশেষিক মত।

সাংখ্যদর্শনের কার্যকারণবাদকে সৎকার্যবাদ বলে। এই মতে কোন কার্য উৎপত্তির পূর্বে তাহার উপাদানকারণে বিদ্যমান (সৎ) থাকে। তিল তৈলের উপাদানকারণ, যেহেতু তিল হইতেই তৈল উৎপন্ন হয়। তৈলরূপ কার্য তিলের মধ্যে অব্যক্তভাবে থাকে এবং তিলপিষ্ট হইলে তাহা তৈলরূপে ব্যক্ত হয়। কিন্তু বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্যগণ এই মতের বিরোধী। বৌদ্ধেরা অসদ্বাদী। তাঁহাদের মতে অসৎ অর্থাৎ অভাব হইতে ভাবপদার্থের উৎপত্তি হয়। বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। জল ও তাপ প্রভৃতির ক্রিয়াদ্বারা বীজ বিনষ্ট হইলে তবে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়। অতএব বীজের অভাব হইতেই অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় বলিতে হইবে। এবিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিকমতকে অসৎকার্যবাদ ও আরম্ভবাদ বলে। এই মত অনুসারে কার্য উপাদানকারণে বিদ্যমান থাকে না। ইহা উপাদানকারণের অভাব অর্থাৎ বিনাশ হইতেও উৎপন্ন হয় না। কার্য উপাদানকারণে অবিদ্যমান থাকিলেও উপাদানকারণ হইতেই উৎপন্ন হয়। যেহেতু কার্য উপাদানকারণে পূর্বে ছিল না, উহাকে অসৎ বলিতে হয়। এই অসৎ কার্য উপাদানকারণ হইতে আরব্ধ হয়। অতএব সৎ কারণ হইতে অসৎ কার্য আরব্ধ হয় বলিতে হয়। ন্যায়-বৈশেষিকমতে সৎ কারণ হইতে অসৎ কার্যের উৎপত্তি হয় বা আরম্ভ হয়। এজন্য এই মতকে অসৎকার্যবাদ ও আরম্ভবাদ বলে।

সাংখ্যের সৎকার্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি।

সাংখ্যসম্মত সৎকার্যবাদের বিরুদ্ধে ন্যায়-বৈশেষিকগণ কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমে তাঁহারা বলেন যে, যদি কার্য উপাদানকারণে বিদ্যমানই থাকে, তবে কার্য উৎপন্ন হয় একথার কোন অর্থ হয় না। তারপর, যদি উপাদানকারণে কার্য বিদ্যমান থাকে, তবে উহার উৎপত্তির জন্য নিমিত্ত-কারণের প্রয়োজন হয় না। মৃত্তিকার মধ্যে যদি ঘট থাকে, তবে ঘটের উৎপত্তির জন্য কুম্ভকার ও তাহার চক্র-যষ্টি প্রভৃতির ক্রিয়ার কোন প্রয়োজন থাকে না; কিন্তু ইহাদের ক্রিয়া ব্যতীত ঘটের উৎপত্তি হয় না।

তারপর, কার্য উপাদানকারণের অংগীভূত হইলে, কার্য ও কারণের ভেদই থাকে না এবং কার্য ও কারণ অভিন্ন হইলে উভয়ের এক নামই দেওয়া চলিত এবং উভয়েই এক প্রয়োজন সাধন করিতে পারিত। কিন্তু আমরা ঘটকে মৃত্তিকা নামে অভিহিত করি না, অথবা ঘটদ্বারা যেমন জল আনয়ন করি, সেইরূপ মৃত্তিকাদ্বারা করিতে পারি না। সাংখ্যাচার্যগণ বলেন যে, মৃত্তিকা ও ঘটের আকারগত পার্থক্য আছে, অর্থাৎ ঘটের আকার মৃত্তিকাতে নাই। যদি তাহাই হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, কার্যের আকার উপাদান-কারণে বিদ্যমান নহে অর্থাৎ বস্তুতঃ কার্য উপাদানকারণে বিদ্যমান থাকে না। কার্যকে উপাদানকারণে অবিদ্যমান বা অসৎ বলিতে হয় এবং সৎ কারণ হইতে অসৎ কার্যের উৎপত্তি হয় ইহা স্বীকার করিতে হয়। অতএব সাংখ্য-সম্মত সৎকার্যবাদ পরিত্যাগ করিয়া অসৎকার্যবাদ ও আরম্ভবাদ স্বীকার করিতে হয়।

সৎকার্যবাদের সমর্থনে যুক্তি।

এইসব আপত্তি খণ্ডন করিয়া সাংখ্যাচার্যেরা কতকগুলি যুক্তিদ্বারা সৎকার্যবাদ সমর্থন করিয়াছেন। (১) কারণ-ব্যাপারের পূর্বে যদি কার্য বস্তুতই অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান হইত, তবে কেহই শত চেষ্টা করিয়াও কার্য উৎপন্ন করিতে পারিত না। শত শিল্পী শত চেষ্টা করিয়াও নীলকে পীত বা পীতকে নীল করিতে পারে না। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, যখন কোন উপাদান-কারণ হইতে কোন কার্য উৎপন্ন হয়, কার্যটি উপাদানকারণে বিদ্যমান থাকে, তবে উহা অব্যক্ত ও অস্পষ্ট থাকে এবং কারণব্যাপারের পর ব্যক্ত ও স্পষ্ট হয়। তিলে তৈল অব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকে, তিল পিষ্ট হইলে তাহা ব্যক্ত হয় অর্থাৎ বাহির হয়। (২) কারণ ও কার্যের নিয়ত সম্বন্ধ দেখা যায়। কোন কারণ যে কার্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কেবল সেই কার্যই সেই কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু কার্যটি একেবারে অসৎ বা অবিদ্যমান হইলে, কারণ কিরূপে তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবে? অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, কার্যটি কোনরূপে কারণে বিদ্যমান থাকে। (৩) আমরা সর্বদাই দেখি যে, বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ কার্য উৎপন্ন হয়, যে-কোন কারণ হইতে যে-কোন কার্য উৎপন্ন হয় না। যেমন কেবল দুগ্ধ হইতেই দধি উৎপন্ন হয়, মৃত্তিকা হইতেই ঘট উৎপন্ন হয়; দুগ্ধ হইতে ঘট হয় না, অথবা মৃত্তিকা হইতে দধি হয় না। যদি তাহা হইত, তবে যে-কোন কারণ হইতে যে-কোন কার্য হইত এবং কুম্ভকার ঘট নির্মাণ করিবার জন্য মৃত্তিকা সংগ্রহ না করিয়া দুগ্ধ সংগ্রহ করিতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় না। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, কার্য কারণে বিদ্যমান থাকে। (৪) যে কারণে যে কার্য উৎপাদন করিবার শক্তি আছে তাহা সেই কার্য উৎপাদন করিতে পারে। যাহাতে সে শক্তি নাই তাহা সে কার্য জন্মাইতে

CENTRAL LIBRARY

পারে না। কার্য উৎপাদনের শক্তি বলিতে কার্যের সহিত সম্বদ্ধ কোন অসাধারণ শক্তি বুঝায়। কিন্তু কার্য অসৎ হইলে কারণশক্তির সহিত তাহার সম্বন্ধ হইতে পারে না, যাহা অবিদ্যমান তাহার সঙ্গে বিদ্যমান বস্তুর সম্বন্ধ হয় না। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্য বিদ্যমান থাকে। ফলতঃ কারণগতশক্তি কার্যের অব্যক্ত অবস্থামাত্র। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, কারণে কার্য অব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকে। (৫) আরও এককথা, যদি কার্য কারণ হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন হয় এবং কারণে কার্য উৎপাদনের কোন শক্তি না থাকে, তবে বলিতে হয় যে, কার্য বিনাকারণে উৎপন্ন হয়, কিন্তু কারণ বিনা কার্য হইতে পারে না। (৬) শেষকথা, কোন কার্য তাহার কারণের অবস্থাবিশেষমাত্র এবং কারণভাবাপন্ন অর্থাৎ কারণের স্বভাবপ্রাপ্ত। তন্তুদ্বারা যে বস্ত্র নির্মিত হয়, তাহা তন্তুসমূহের বিশেষপ্রকার সংযোগমাত্র এবং তন্তুর সহিত সমভাবাপন্ন। তন্তু ও বস্ত্র পরস্পর ভিন্ন নয়। ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, তন্তুতে বস্ত্র নিহিত আছে। অতএব কার্যকে উৎপত্তির পূর্বে সৎ বলিতে হয়। এইসব কারণে সৎকার্যবাদই স্বীকার করিতে হয়।

পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ।

সৎকার্যবাদ দুইপ্রকার—পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ। পরিণামবাদ অনুসারে কারণ বস্তুতঃ কার্যে পরিণত হয়, যেমন দুগ্ধ বাস্তবিকই দধিতে পরিণত হয়। বিবর্তবাদ অনুসারে কারণ প্রকৃতপক্ষে কার্যে পরিণত হয় না, কেবল পরিণত হয় বলিয়া অবভাস বা ভান হয় মাত্র। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে, রজ্জু যে সর্পে পরিণত হয় তাহা নহে, রজ্জু সর্প বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। সাংখ্যাচার্যেরা পরিণামবাদ স্বীকার করেন, অদ্বৈতবেদান্তে বিবর্তবাদ স্বীকৃত হইয়াছে।

৩। প্রকৃতি ও গুণসমূহ

প্রকৃতির লক্ষণ

সাংখ্যদর্শনে দুইটি পরতত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে—একটি প্রকৃতি অপরটি পুরুষ। এখন প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। প্রকৃতির অপর নাম প্রধান ও অব্যক্ত। প্রকৃতি জড়জগতের অব্যক্ত আদি কারণ। ইহা আমাদের প্রত্যক্ষীভূত নয়, কিন্তু ব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ হইতে অনুমেয়। সৎকার্যবাদ অনুসারে কার্য কারণের পরিণাম মাত্র। অতএব জগদ্রূপ কার্য কোন কারণের পরিণাম হইবে। জাগতিক সব বস্তুই যে কার্য তাহা ইহাদের কতকগুলি লক্ষণ

CENTRAL LIBRARY

হইতে বুঝা যায়। স্থূল মহাভূত হইতে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সকল বস্তুই কার্য, যেহেতু ইহারা অবয়বসংযোগে গঠিত, অনিত্য এবং পরতন্ত্র অর্থাৎ অপর বস্তুসাপেক্ষ। ইহারা অব্যাপী অর্থাৎ দেশ ও কালে পরিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ। অতএব জগদ্রূপ কার্যের কোন আদি কারণ আছে। পুরুষ ইহার কারণ হইতে পারে না, কারণ পুরুষ নিত্য ও চৈতন্যস্বরূপ, ইহার পরিণাম হয় না। পরমাণুও জগতের উপাদানকারণ হইতে পারে না; কারণ জড় পরমাণু হইতে সূক্ষ্ম মন, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতির উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব জগতের কারণরূপে কোন সূক্ষ্ম, নিত্য, ব্যাপী, স্বতন্ত্র ও পরিণামশীল জড়তত্ত্ব স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃতিই সেই মূল কারণ, যাহা জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতির কোন কারণ নাই। প্রকৃতির কারণ স্বীকার করিলে, সেই কারণের কারণ, তাহার কারণ, তাহার কারণ এইরূপে অনুসন্ধান করিতে হয়, ফলে অনবস্থা দোষ হয়। প্রকৃতি জড়জগতের সর্বকারণনিরপেক্ষ মূল বা আদি কারণ, ইহা নিত্য ও সর্বব্যাপী জড় সত্তা। ইহা অতি সূক্ষ্ম, অতি আশ্চর্য ও অসীম শক্তি। ইহাতেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হয়।

প্রকৃতির অস্তিত্বের প্রমাণ।

জড়জগতের মূল উপাদানকারণরূপে প্রকৃতির অস্তিত্ব কয়েকটি হেতু-দ্বারা অনুমিত হয়। প্রকৃতির অস্তিত্বের প্রমাণগুলি এইরূপ: (১) বুদ্ধি হইতে পৃথিবী পর্যন্ত জাগতিক সকল বস্তু সসীম ও পরস্পর নির্ভরশীল। অতএব তাহাদের কোন অসীম ও স্বতন্ত্র কারণ থাকিবে। (২) জগতের সকল বস্তুর সমান ধর্ম হইতেছে যে, উহারা সুখ, দুঃখ ও বিষাদ উৎপাদন করে। অতএব তাহাদের কোন সুখ-দুঃখ ও বিষাদাত্মক কারণ থাকিবে, এবং তাহারই নাম প্রকৃতি। (৩) সকল কার্যই অব্যক্তভাবে তাহাদের কারণে নিহিত থাকে। জাগতিক বস্তুসকল কার্য। অতএব ইহারা কোন কারণে অব্যক্তভাবে নিহিত ছিল। এই জগৎকারণের নাম প্রকৃতি। (৪) কোন কার্য উহার উপাদানকারণ হইতে উদ্ভূত হইয়া পরিশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তাহাতেই বিলীন হয়। জাগতিক বিশেষ বিশেষ বস্তু বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে উদ্ভূত হয়। বিশেষ বিশেষ কারণগুলি ব্যাপকতর কারণ হইতে উদ্ভূত হয়। এইভাবে আমরা কোন ব্যাপকতম আদি কারণে উপনীত হই। সেইরূপ প্রলয়কালে ভূতসকল পরমাণুতে লীন হয়, পরমাণুসকল শক্তিপুঞ্জে লীন হয়। এইভাবে সকল বস্তু এক নিত্য অব্যক্ত শক্তিতে বিলীন হয়। যে অব্যক্ত, অসীম, অনন্ত ও স্বতন্ত্র শক্তি হইতে পুরুষ ব্যতীত সকল পদার্থের উদ্ভব হয় এবং প্রলয়কালে যাহাতে সকল পদার্থের লয় হয়, তাহার নাম প্রকৃতি, প্রধান বা অব্যক্ত। প্রকৃতি সকলের কারণ, কিন্তু ইহার আর কোন কারণ নাই, ইহা সকলের মূল কারণ। এজন্য প্রকৃতিকে পরা বা মূলা প্রকৃতিও বলা হয়।

CENTRAL LIBRARY

প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সমষ্টি এবং উহাদের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ স্থৈর্যের অবস্থা। বৈশেষিক ও অন্যান্য দর্শনে গুণ বলিতে দ্রব্যসমবেত ধর্ম বুঝায়। কিন্তু এখানে গুণ বলিতে এরূপ ধর্ম বুঝায় না। পক্ষান্তরে, গুণ বলিতে এখানে প্রকৃতির উপাদানরূপ দ্রব্য বুঝায়। ইহাদিগকে গুণ আখ্যা দিবার কারণ হইতেছে যে, ইহারা পুরুষের ভোগ-সাধনের অনুকূল দ্রব্য, অথবা ইহারা তিনটি গুণের মত পরস্পর জড়িত হইয়া এক রজ্জু নির্মাণ করে এবং সেই রজ্জুই পুরুষের বন্ধনরজ্জু হয়।

প্রকৃতির উপাদান—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ।

গুণগুলির প্রত্যক্ষ হয় না, উহারা অনুমানগম্য। অনুমানপ্রণালী এইরূপ: কার্য ও কারণ সমভাবাপন্ন অর্থাৎ তাহাদের একই প্রকারের স্বভাব দেখা যায়, কারণের স্বভাব ও ধর্ম কার্যে প্রকাশিত হয়। তিক্ত উপাদানে প্রস্তুত ঔষধ তিক্ত হয়, মিষ্ট উপাদানে প্রস্তুত খাদ্য মিষ্ট হয়ঃ অতএব কার্যের গুণধর্মদ্বারা কারণের গুণধর্ম অনুমান করা যায়। সকল জাগতিক বস্তুতে সুখ, দুঃখ ও বিষাদরূপ তিনটি গুণ দেখা যায়। যে কোনও বস্তু কাহারও সুখ উৎপাদন করে, কাহারও দুঃখ উৎপাদন করে, আবার কাহারও বিষাদ অর্থাৎ জড়তা বা ঔদাসীন্য আনয়ন করে। যেমন একটি পুতুল পাইলে কোন শিশুর সুখ বা আনন্দ হয় এবং তাহা না পাইলে অন্য শিশুর দুঃখ হয়, আবার সেজন্য কোন বৃদ্ধের সুখ-দুঃখ কিছুই হয় না, কেবল একটা ঔদাসীন্যের ভাব দেখা যায়। জাগতিক সকল বস্তুর সুখ, দুঃখ ও বিষাদরূপ তিনটি গুণ আছে। অতএব তাহাদের মূল কারণেও সুখ, দুঃখ ও বিষাদরূপ তিনটি উপাদান থাকিবে। সাংখ্যাচার্যগণ এই তিনটি উপাদানকে যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ আখ্যা দিয়াছেন। ইহারা প্রকৃতিরও উপাদান এবং জাগতিক প্রত্যেক বস্তুরও উপাদান।

গুণসমূহের অস্তিত্বের প্রমাণ।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের লক্ষণ এইরূপ: সত্ত্ব সুখাত্মক, লঘু ও প্রকাশক। জ্ঞানে বিষয়ের প্রকাশ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির বিষয় প্রকাশ করিবার শক্তি, দর্পণ বা স্ফটিকের প্রতিবিম্ব গ্রহণের শক্তি—এসবই তত্তৎ-দ্রব্যস্থ সত্ত্ব গুণের কার্য। অগ্নির ঊর্ধ্বগমন, বায়ুর তির্যগ্ গতি প্রভৃতি লঘুতার পরিচায়ক এবং তাহা সত্ত্ব গুণের কার্য। সেইরূপ সর্বপ্রকার সুখ—যথা প্রীতি, তুষ্টি, আনন্দ প্রভৃতি সত্ত্ব গুণের কার্য।

সত্ত্ব গুণের লক্ষণ।

রজঃ সকলপ্রকার প্রবৃত্তি বা ক্রিয়ার হেতু। ইহা চলনাত্মক ও উপষ্টম্ভক অর্থাৎ ইহা নিজে গতিমান্ এবং অন্য দ্রব্যে গতি সঞ্চার করে। সত্ত্ব এবং তমোগুণ নিজে নিজে কোন কার্য করিতে পারে না, উহারা নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চল। রজোগুণেই

রজো গুণের লক্ষণ।

উহাদিগকে ক্রিয়া করিতে সমর্থ করে। রজঃ দুঃখাত্মক এবং সকল দুঃখের হেতু।

তমোগুণের লক্ষণ।

তমঃ মোহাত্মক এবং সকলের মোহ উৎপাদন করে। ইহা সত্ত্ব গুণের প্রকাশের বাধা সৃষ্টি করে এবং রজোগুণের গতিকে বাধা দেয়। ইহা গুরু অর্থাৎ ভারী এবং বিষয় ও জ্ঞানকে আবৃত রাখে। তমোগুণ হইতেই ভ্রম, প্রমাদ, নিদ্রা, আলস্য প্রভৃতি জন্মে। ইহা মনে বিষাদ ও ঔদাসীন্য আনয়ন করে। এজন্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃকে যথাক্রমে শুভ্রবর্ণ, রক্তবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ বলে।

গুণত্রয় পরস্পরের প্রতিযোগী ও সহযোগী।

গুণত্রয়ের প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা উভয়প্রকার সম্বন্ধ দেখা যায়। ইহারা পরস্পরের প্রতিযোগীও বটে, সহযোগীও বটে। জাগতিক সকল বস্তুর উপাদানরূপে ইহারা একত্র মিলিত হয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, মনুষ্য ও পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর ও জঙ্গম সকল বস্তুতেই এই তিন গুণের সমাবেশ দেখা যায়। আত্মা ব্যতীত এমন কোন বস্তু নাই, যাহার মধ্যে তিনটি গুণ নাই। যেমন তৈলবর্তিকা ও অগ্নি পরস্পরের বিরোধী হইলেও একত্র মিলিত হইয়া প্রদীপের আলোক উৎপন্ন করে, সেইরূপ গুণত্রয় পরস্পর বিরোধী হইলেও সহযোগিতা করিয়া সকল দ্রব্য উৎপন্ন করে। তারপর, একটি গুণ অপর দুইটিকে অভিভূত করিয়া প্রাধান্য লাভ করিবার চেষ্টা করে। ফলে কোন বস্তু বা ব্যক্তি সত্ত্বপ্রধান হয়, কোন বস্তু বা ব্যক্তি রজঃপ্রধান অথবা তমঃপ্রধান হয়। যাহার মধ্যে সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমঃকে অভিভূত করিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সে সত্ত্বপ্রধান। যাহার মধ্যে রজঃ বা তমঃ অপর গুণ দুইটিকে অভিভূত করিয়া প্রাধান্য লাভ করে, সে রজঃপ্রধান বা তমঃপ্রধান হয়। কিন্তু তিনটি গুণই প্রবল অথবা দুর্বল হইয়া প্রত্যেক দ্রব্যে বিদ্যমান আছে।

ইহারা নিয়ত পরিবর্তনশীল। দুইপ্রকার পরিণাম।

গুণত্রয়ের আর একটি ধর্ম এই যে, ইহারা সর্বদাই পরিণামশীল অর্থাৎ সর্বদাই ইহাদের পরিবর্তন হয়, কোন সময়েই ইহাদের পরিবর্তনের বিরতি হয় না। এই পরিণাম দুইপ্রকার—স্বরূপ-পরিণাম ও বিরূপ-পরিণাম। প্রলয়কালে গুণগুলির নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ সত্ত্বগুণের পরিণাম সত্ত্বগুণের মধ্যেই হয়, রজোগুণের পরিণাম রজোগুণের মধ্যেই হয়, এবং তমোগুণের পরিণাম তমোগুণের মধ্যেই হয়। কিন্তু কাহারও পরিণাম অপরকে প্রভাবিত করিতে পারে না, যেমন তিনটি নদীর স্রোত পাশাপাশি চলে, কিন্তু কেহ কাহারও সহিত মিশে না, অথবা কেহ কাহাকেও প্রভাবিত করে না। গুণগুলির এরূপ পরিণামের নাম স্বরূপ-

পরিণাম। ইহাই গুণগুলির সাম্যাবস্থা, এবং ইহাই সাংখ্যের প্রকৃতি। এ অবস্থায় কোন গতি বা ক্রিয়ার (motion) উদ্ভব হয় না। সুতরাং এ অবস্থায় কোন দ্রব্যের সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টির প্রাক্কালে গুণগুলি পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পরকে প্রভাবিত করে এবং একটি অপর দুইটিকে অভিভূত করিয়া প্রাধান্য লাভ করে। গুণগুলির এরূপ পরিণামকে বিরূপ-পরিণাম বলে। এইরূপ পরিণামের ফলে গতিক্রিয়ার (motion) উদ্ভব হয় এবং জড়জগতের সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

৪। পুরুষ বা আত্মা

আত্মার লক্ষণ।

সাংখ্যের দ্বিতীয় পরতত্ত্ব হইল পুরুষ বা আত্মা। সাংখ্যমতে আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি বা অহংকার ইহাদের কোনটিই নহে। আত্মা জ্ঞানের বিষয়ীভূত জড়জগতের কোন দ্রব্যই নয়। ইহা আধ্যাত্মিক সত্তা এবং শুদ্ধ জ্ঞাতা, ইহা কখনও জ্ঞানের বিষয় হয় না। ইহাকে **চৈতন্যগুণবিশিষ্ট** দ্রব্য বলা যায় না, পরন্তু ইহা চৈতন্যময় বা চৈতন্যস্বরূপ। চৈতন্যকে ইহার গুণ বলা যায় না, কারণ চৈতন্যই ইহার স্বরূপ বা সত্তা। অদ্বৈতবেদান্তে ইহাকে আনন্দস্বরূপ বলা হয়, কিন্তু তাহাও ঠিক নয়। কারণ চৈতন্য ও আনন্দ ভিন্ন পদার্থ, ভিন্ন পদার্থ একই দ্রব্যের স্বরূপ হইতে পারে না। আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ সত্তা এবং ইহার কোন বিকার বা পরিবর্তন হয় না। ইহা নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকার জ্ঞান-স্বরূপ। সকল ক্রিয়া ও বিকার প্রকৃতির ধর্ম, প্রকৃতিই সকল কর্ম করে, আত্মা নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকার দ্রষ্টারূপে তাহা দর্শন করে। আত্মা সকল ক্রিয়া ও পরিবর্তনের অতীত। ইহা সকল সুখ-দুঃখের অতীত। আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতেই সকল ক্রিয়া ও সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয়। আত্মা নিত্য, অহেতুক ও সর্বব্যাপী চৈতন্যসত্তা, ইহা প্রকৃতির পরিণামের এবং সকল প্রাকৃতিক বিকারের অতীত। কিন্তু যখন অজ্ঞানবশতঃ আত্মা নিজেকে দেহ, মন, বুদ্ধি বা অহঙ্কারের সহিত একীভূত মনে করে, তখন ইহা যেন ক্রিয়াশীল ও পরিবর্তনশীল এবং সুখ-দুঃখের অধীন হইয়া পড়ে।

আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ।

সাংখ্যদর্শনে আত্মার অস্তিত্ব একাধিক যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। (১) ঘট-পটাদি সংঘাত অর্থাৎ সাবয়ব দ্রব্য পরার্থ অর্থাৎ পরপ্রয়োজন সাধন করে। ইহারা যাহার প্রয়োজন সাধন করে, তাহা জড়দ্রব্য হইতে পারে না; কারণ সকল জড়দ্রব্যই পরপ্রয়োজন সাধন করে। অতএব সংঘাত যাহার প্রয়োজন সাধন করে, তাহা চেতন পুরুষ হইবে। (২) জড়দ্রব্যসকল চেতন পুরুষকর্তৃক

অধিষ্ঠিত না হইলে কোন কার্য করিতে পারে না, যেমন শকটাদি পুরুষ-কর্তৃক চালিত না হইলে চলিতে পারে না। অতএব প্রকৃতি এবং প্রকৃতির পরিণাম মন, বুদ্ধি প্রভৃতির পরিচালনার জন্য চেতন পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। (৩) জাগতিক সকল দ্রব্য সুখ-দুঃখ-বিষাদাত্মক। কিন্তু সুখ, দুঃখ ও বিষাদ ভোগ্যবস্তু। ভোক্তা পুরুষ ব্যতীত সুখ-দুঃখাদি অর্থহীন হইয়া পড়ে। অতএব সুখ-দুঃখাদি ভোগের জন্য চেতন পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। (৪) সংসারে সাধু মহাত্মা ও মুক্তিকামী ব্যক্তি বিরল হইলেও একেবারে নাই বলা যায় না। সাধু ও মহাত্মারা মুক্তিকামী ব্যক্তিদিগকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন। এখন এই মুক্তির কামনা ও মুক্তি-পথের ভাবনা কোথা হইতে আসিল? জড়দেহে বা জড়জগতে ইহা সম্ভব নহে। কারণ জড়দেহ ও জড়জগৎ বন্ধনের কারণ, ইহাদের মুক্তির কামনা ও ভাবনা হইতে পারে না। কেবল জড়ের অতিরিক্ত কোন চেতন পুরুষ থাকিলেই এসব সম্ভব হয়। অতএব কোন কোন লোকের মুক্তিকামনা ও ভাবনা দৃষ্টে চেতন পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার্য।

আত্মার বহুত্বের প্রমাণ।

অদ্বৈতবেদান্তমতে এক সর্বব্যাপী আত্মা সকল জীবদেহে বিরাজ করেন। সাংখ্যমতে ভিন্ন ভিন্ন জীবদেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা আছে। অতএব সাংখ্যাচার্যেরা বহু আত্মা স্বীকার করেন। আত্মার বহুত্ব প্রমাণ করিতে তাঁহারা অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। (১) প্রথমে তাঁহারা বলেন যে, জন্ম-মৃত্যু এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় বিষয়ে বিভিন্ন জীবের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। একটি জীবের জন্ম বা মৃত্যু হইলে সকল জীবেরই জন্ম বা মৃত্যু ঘটে না। একটি লোক অন্ধ বা বধির হইলে সকল লোকই অন্ধ বা বধির হয় না। সকল জীবের এক আত্মা হইলে অবশ্য এইরূপ হইত। কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন বুঝিতে হইবে যে, আত্মা এক নহে, বহু। (২) সকল জীবের এক আত্মা হইলে, একজন লোক কর্মব্যস্ত হইলে সকলেই কর্মব্যস্ত হইত, অথবা একজন কর্ম হইতে বিরত হইলে সকলেই কর্মবিরত হইত। কিন্তু আমরা দেখি যে, যখন এক ব্যক্তি নিদ্রামগ্ন ও কর্মবিরত হয়, তখন অন্য সকলে বিনিদ্র ও কর্মরত থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তাহাদের আত্মা এক নয়, পরন্তু ভিন্ন ও অনেক। (৩) মানুষ পশুপক্ষী ও দেবদেবী হইতে ভিন্ন জীব। কিন্তু মনুষ্য, দেবতা ও পশুপক্ষীর আত্মা এক ও অভিন্ন হইলে, মনুষ্যদেবতাদি প্রকারভেদই হইত না। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, আত্মা এক নহে, বহু। (৪) এক আত্মা সকল জীবে থাকিলে, একটি জীবের মুক্তির সঙ্গে সকল জীবেরই মুক্তি হইত। কিন্তু লক্ষ বদ্ধ জীবের মধ্যে দুই-একটি মুক্ত হয়, তাহাদের সঙ্গে সকলেই ত মুক্ত হয় না। এইসব

CENTRAL LIBRARY

দৃষ্টে স্বীকার করিতে হয় যে, আত্মা এক নহে, বহু। এক-একটি জীবদেহে এক-একটি আত্মা আছে। অবশ্য সকল আত্মাই নিত্য, চেতনস্বভাব এবং জ্ঞাতা ও ভোক্তা পুরুষ; সকল আত্মাই প্রকৃতির এবং জড়জগতের অতীত আধ্যাত্মিক সত্তা।

৫। জগতের ক্রমাভিব্যক্তি—পরিণামবাদ (Theory of Evolution)

পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হইতে সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা। ইহাদের সাম্যাবস্থায় জগতের সৃষ্টি হয় না, যদিচ প্রকৃতিতে উহার বীজ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। প্রকৃতির সাম্যাবস্থার অবসান না হইলে জগতের সৃষ্টি হয় না। পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ হইলে প্রকৃতির সাম্যাবস্থার অবসান হয় এবং জগতের অভিব্যক্তি আরম্ভ হয়। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, এজন্য ইহা এককভাবে সৃষ্টি করিতে পারে না। প্রকৃতিও একাকী সৃষ্টি করিতে পারে না, কারণ ইহা জড় ও অচেতন। জড় চেতনদ্বারা অধিষ্ঠিত ও পরিচালিত না হইলে কোন কার্য করিতে পারে না। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ বা মিলন হইলেই তবে প্রকৃতি সৃষ্টি করিতে পারে। পুরুষ চেতন, কিন্তু নিষ্ক্রিয়; ইহাতে কোন ক্রিয়া হইতে পারে না। প্রকৃতি সক্রিয় কিন্তু অচেতন। সুতরাং পুরুষ বা প্রকৃতি একাকী সৃষ্টি করিতে পারে না। উভয়ে মিলিত হইলেই তবে জগতের সৃষ্টি হয়। যেমন একজন অন্ধ ও একজন খঞ্জ ব্যক্তি পরস্পর মিলিত হইয়া কোন অরণ্য হইতে বাহির হইতে পারে, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ মিলিত হইলে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। ইহাতে উভয়ের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। প্রকৃতি দর্শনার্থ অর্থাৎ পুরুষ কর্তৃক দৃষ্ট ও ভোগ্য হইবার জন্য পুরুষকে চায় এবং পুরুষ কৈবল্যার্থ অর্থাৎ নিজেকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিবার জন্য প্রকৃতিকে চায়। উভয়ের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তাহাদের সংযোগ হয় এবং তাহা হইলেই জগতের সৃষ্টি হয়।

সৃষ্টি বা পরিণামের ক্রম

প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইলে প্রকৃতির সাম্যাবস্থার অবসান হয় এবং প্রকৃতির বক্ষে প্রবল আলোড়ন আরম্ভ হয়। রজোগুণ স্বভাবতঃ চঞ্চল বলিয়া প্রথমে তাহাতেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং পরে সত্ত্ব ও তমোগুণের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। প্রত্যেক গুণ অপর গুণ দুইটিকে অভিভূত করিয়া প্রাধান্য লাভ করিবার চেষ্টা করে এবং তাহারা অল্পাধিক পরিমাণে সংমিশ্রিত হয়। ফলে জাগতিক সকল পদার্থের সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে জগতের অভিব্যক্তির ক্রম নিম্নে বর্ণিত হইল।

বুদ্ধি বা মহৎ।

প্রথমে প্রকৃতি বা অব্যক্ত হইতে মহৎ বা বুদ্ধির অভিব্যক্তি হয়। ইহা জগতের মহৎ বীজ বলিয়া ইহার নাম মহৎ। জীবের মধ্যে ইহা বুদ্ধিরূপে প্রকাশিত বলিয়া ইহার নাম বুদ্ধি। বুদ্ধির বিশেষ ধর্ম হইতেছে ব্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়-জ্ঞান। ইহাদ্বারা আমরা সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া ভাল-মন্দ, কর্তব্যাকর্তব্য প্রভৃতি নিশ্চয় করি। বুদ্ধিতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য আছে। ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য বুদ্ধির সাত্ত্বিক গুণ। অধর্ম, অজ্ঞান, আসক্তি ও অশক্তি বা অনৈশ্বর্য বুদ্ধির তামসিক গুণ। বুদ্ধি চেতন আত্মা হইতে ভিন্ন হইলেও আত্মার অতি সন্নিহিত বলিয়া তাহাতে আত্মচৈতন্যের ছায়াপাত হয় এবং সেজন্য উহা চেতনরূপে প্রতিভাত হয়। আমাদের ইন্দ্রিয় ও মন সকল বিষয় বুদ্ধির নিকট উপস্থিত করে, বুদ্ধি তাহাদের আত্মার নিকট সমুপস্থিত করে। বুদ্ধিদ্বারাই আত্মা নিজেকে প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারে।

অহঙ্কার।

বুদ্ধি হইতে অহংকারের আবির্ভাব হয়। অভিমান বা মমত্ববুদ্ধি অহংকারের লক্ষণ। অহংকারবিমূঢ় অর্থাৎ অহংকার-বুদ্ধিবিশিষ্ট আত্মা নিজেকে কর্তা বলিয়া মনে করে এবং সেজন্য প্রিয় বস্তু পাইবার এবং অপ্রিয় বস্তু পরিহার করিবার চেষ্টা করে এবং সুখ-দুঃখ ভোগ করে। অহংকারবশতঃ আত্মা নিজেকে 'আমি' এবং বিষয়কে 'আমার' বলিয়া ভাবে এবং বিষয়ের জন্য নানা কর্মে প্রবৃত্ত হয়। বস্তুতঃ এগুলি বুদ্ধিরই কার্য। বুদ্ধির কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব পুরুষে প্রতীয়মান হয়। ইহাই পুরুষের সংসার-বন্ধন।

একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ-তন্মাত্র।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্য অনুসারে অহংকার ত্রিবিধ। ইহাতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হইলে ইহাকে সাত্ত্বিক বা বৈকারিক অহংকার বলে, রজোগুণের প্রাধান্য হইলে রাজস বা তৈজস অহংকার বলে এবং তমোগুণের প্রাধান্য হইলে তামস বা ভূতাদি অহংকার বলে। বাচস্পতি মিশ্রের মতে সাত্ত্বিক অহংকার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বা বুদ্ধীন্দ্রিয় (চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসন ও ত্বক্), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) ও মন উৎপন্ন হয়, এবং তামস অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। রাজস অহংকার সাত্ত্বিক ও তামস অহংকারকে কার্য করিতে সাহায্য করে মাত্র। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে কেবল সাত্ত্বিক মনই সাত্ত্বিক অহংকার হইতে উৎপন্ন হয়, রাজস অহংকার হইতে দশ ইন্দ্রিয় এবং তামস অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। সংকল্প ও বিকল্প মনের বিশেষ বৃত্তি বা ধর্ম। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের অপরিস্ফুট প্রত্যক্ষ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম। কথন, গ্রহণ, গমন, ত্যাগ ও জনন পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি। স্মরণ করিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয় বলিতে শরীরের বহির্দেশে অবস্থিত

চক্ষুগোলক, কর্ণগহ্বর প্রভৃতি বুঝায় না, কিন্তু তত্তৎ-দেশস্থ বিশেষ বিশেষ শক্তিকে বুঝায়। এসব শক্তি প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। অতএব ইন্দ্রিয়গুলিকে অতীন্দ্রিয় বলিতে হয়। মনকে উভয়েন্দ্রিয় অর্থাৎ কর্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অপেক্ষিত ইন্দ্রিয় বলে। কারণ মনের সহায়তা ব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয় কার্য করিতে পারে না। সাংখ্যমতে মন অতি সূক্ষ্ম হইলেও পরমাণুপরিমাণ (atomic) ও নিত্য (eternal) নহে। পরন্তু, ইহা সাবয়ব দ্রব্য ও অনিত্য। ইহা প্রকৃতির পরিণাম এবং একাধিক অবয়বের সংযোগে গঠিত। অতএব ইহা মধ্যমপরিমাণ এবং ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হয়। ইহা মধ্যম-পরিমাণ বলিয়া এক সময়েই একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে এবং আমাদের এককালেই একাধিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে। সাংখ্যমতে মন, বুদ্ধি ও অহংকার হইল অন্তঃকরণ এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় হইল বাহ্যকরণ। তিন অন্তঃকরণ ও দশ বাহ্যকরণকে একত্রে সাংখ্যদর্শনে ত্রয়োদশ করণ বলে।

পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি-ক্রম।

তন্মাত্র পাঁচপ্রকার—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র এবং গন্ধতন্মাত্র। পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চ-মহাভূতের অতি সূক্ষ্ম উপাদানকারণ। ইহারা প্রত্যক্ষযোগ্যও নহে এবং আমাদের ভোগ্যও নহে। এজন্য ইহাদিগকে অবিশেষ বলে। ইহারা আমাদের অনুমানগম্য, অবশ্য যোগীরা ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ-মহাভূতের উৎপত্তিক্রম এইরূপ: (১) শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দগুণক আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, শব্দ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। (২) শব্দতন্মাত্রযুক্ত স্পর্শতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শগুণযুক্ত বায়ু উৎপন্ন হইয়াছে। (৩) শব্দস্পর্শতন্মাত্রসহিত রূপতন্মাত্র হইতে শব্দ-স্পর্শরূপগুণযুক্ত তেজঃ উৎপন্ন হইয়াছে। (৪) শব্দস্পর্শরূপতন্মাত্রযুক্ত রসতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শরূপরসগুণযুক্ত জল উৎপন্ন হইয়াছে। (৫) শব্দ-স্পর্শরূপরসতন্মাত্রযুক্ত গন্ধতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধগুণযুক্ত পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবীর বিশেষ গুণ। এই পঞ্চ-মহাভূতের মধ্যে কেহ সুখকর ও লঘু, কেহ দুঃখকর ও চঞ্চল, কেহ বিষাদকর ও গুরু। এজন্য ইহাদিগকে বিশেষ বলে। বিশেষসকল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—সূক্ষ্মশরীর, স্থূলশরীর এবং পঞ্চমহাভূত। সূক্ষ্মশরীর বুদ্ধি, অহংকার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রের সমষ্টি। স্থূলশরীর পিতামাতা হইতে উৎপন্ন এবং পঞ্চভূত-দ্বারা গঠিত হয়।

মহৎ হইতে মহাভূত পর্যন্ত প্রকৃতির পরিণামকে দুই সর্গে বিভক্ত করা হইয়াছে—প্রত্যয়সর্গ ও তন্মাত্রসর্গ। বুদ্ধিসর্গের নাম প্রত্যয়সর্গ। ভূত ও ভৌতিক সর্গের নাম তন্মাত্রসর্গ। মহৎ, অহংকার ও একাদশ ইন্দ্রিয়রূপে

CENTRAL LIBRARY

প্রকৃতির পরিণামকে প্রত্যয়সর্গ বলে। পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ-মহাভূত এবং মহাভূত হইতে উৎপন্ন দ্রব্যসকল ভূতসর্গ বা তন্মাত্রসর্গের অন্তর্গত।

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সাংখ্যের পরিণামবাদে প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ-মহাভূত, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির পরিণাম বা সৃষ্টি নিরর্থক বা নিষ্প্রয়োজন নহে। প্রকৃতির অতীত ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত পুরুষ বা আত্মা-সকলের প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তই প্রকৃতির পরিণাম হয়। এই প্রয়োজন হইল সকল আত্মার কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ। অতএব সাংখ্যের পরিণামবাদ জড়বাদ বা যান্ত্রিক পরিণামবাদ নহে। ইহা একপ্রকার আধ্যাত্মিক পরিণাম-বাদ এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজন সাধন করে।

৬। সাংখ্যদর্শনে প্রমা ও প্রামাণ্যবিচার

প্রমাণ তিনপ্রকার।

সাংখ্যমতে প্রমাণ তিনপ্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। উপমান প্রভৃতি অন্যান্য প্রমাণ এই তিনটি প্রমাণের অন্তর্গত। উহারা পৃথক্ প্রমাণ নহে।

প্রমা ও প্রমাণ।

কোন অনধিগত অর্থাৎ পূর্বে অজ্ঞাত বিষয়ে চিত্তের যে অসন্দিগ্ধ ও যথার্থ বৃত্তি হয়, তাহার নাম প্রমাণ। এই চিত্ত-বৃত্তিদ্বারা পুরুষের যে বিষয়জ্ঞান হয়, তাহাই প্রমাণফল বা প্রমা। কোন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে চিত্তের বিষয়াকারে যে বৃত্তি হয়, তাহাতে পুরুষের চৈতন্য প্রতিফলিত হইলে বিষয়ের জ্ঞান হয়। অতএব চিত্তবৃত্তি হইল প্রমাণ বা জ্ঞানসাধন এবং বিষয়জ্ঞান হইল তাহার ফল বা প্রমা। সাংখ্যমতে মন, বুদ্ধি বা চিত্ত প্রকৃতির পরিণাম, উহারা জড় ও অচেতন। চৈতন্য বা জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে পুরুষেই অধিষ্ঠিত। কিন্তু পুরুষ সাক্ষাৎভাবে বিষয় জানিতে পারে না; যদি তাহা পারিত তবে আমাদের জ্ঞান সর্বব্যাপী হইত, কারণ পুরুষ সর্বব্যাপী। পুরুষ বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় বিষয় জানিতে পারে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হইলে বুদ্ধির বিষয়াকারে বৃত্তি হয় এবং এই বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষের চৈতন্য প্রতিফলিত হইলে পুরুষের বিষয়বোধ বা বিষয়জ্ঞান হয়। এস্থলে বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা জ্ঞান হয় বলিয়া তাহাকে জ্ঞানের করণ বা প্রমাণ বলে এবং পুরুষের বিষয়জ্ঞান তাহার ফল বলিয়া তাহাকে প্রমা বলে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

প্রথম প্রমাণ প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। কোন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে বিষয়ের যে সাক্ষাৎ প্রতীতি হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ। একটি ঘটের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে, ইন্দ্রিয়ের কতকগুলি

বৃত্তি হয় এবং মন সেগুলিকে বিশ্লেষ ও সংশ্লেষ করে। ইন্দ্রিয় ও মনের ক্রিয়াদ্বারা বুদ্ধি বিষয়াকারে পরিণত হয়। বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিতে পুরুষের চৈতন্য প্রতিফলিত হয়। বুদ্ধি অচেতন হইলেও তাহাতে প্রতিফলিত চৈতন্যের আলোকে চেতনবৎ হয় এবং বিষয়টিকে প্রত্যক্ষ করে। যেমন কোন দর্পণে আলোক প্রতিফলিত হইলে দর্পণটি অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে, সেইরূপ বুদ্ধিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়িলে বুদ্ধি বিষয়টিকে প্রকাশিত করে এবং বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। এখন পুরুষের চৈতন্য বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া পুরুষেরই বিষয়বোধ অর্থাৎ বিষয়-প্রত্যক্ষ হয়।

নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষ।

প্রত্যক্ষ দুইপ্রকার—নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক। কোন বস্তুর সহিত কোন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইবামাত্র অর্থাৎ সংযোগের প্রথমক্ষণে অপরিস্ফুটরূপে বস্তুর যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম আলোচন জ্ঞান বা নির্বিকল্পক জ্ঞান। এই জ্ঞানে বস্তুটি কি প্রকারের অথবা ইহার জাতি বা নাম কি, তাহার জ্ঞান হয় না, কেবল 'ইহা একটি বস্তু' এইরূপ জ্ঞান হয়। বালক কিংবা মূক ব্যক্তি যেমন তাহাদের জ্ঞান ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ নির্বিকল্পকজ্ঞান শব্দদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। তারপর ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগের দ্বিতীয়ক্ষণে 'এই বস্তু এই প্রকার' অর্থাৎ 'ইহা অমুক বস্তু এবং ইহা এই জাতীয় বস্তু' এইরূপ যে বিকল্পজ্ঞান হয়, তাহার নাম সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। সবিকল্পকজ্ঞানে বস্তুকে বিশেষ্যবিশেষণভাবে বিবেচনা করা হয়। যেমন একটি বস্তুকে দেখিয়া 'ফুলটি লাল' বলিলে, ফুলটিকে বিশেষ্যরূপে এবং লাল বর্ণকে তাহার বিশেষণরূপে প্রত্যক্ষ করা হয়। নির্বিকল্পকজ্ঞান এরূপ বিশেষ্যবিশেষণভাবাপন্ন নহে।

অনুমান প্রমাণ।

তারপর অনুমান। লিঙ্গ অর্থাৎ হেতু প্রত্যক্ষ করিয়া লিঙ্গীর অর্থাৎ সাধ্যের জ্ঞানকে অনুমান বলে। যেমন ধূম দর্শন করিয়া পর্বতে অপ্রত্যক্ষ বহ্নির জ্ঞান হইলে বহ্নির অনুমান হয়। অনুমানে ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্যক। ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ জানা থাকিলে, তবে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান হইতে পারে। ধূম বহ্নিব্যাপ্য অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধূম আছে সেখানে সেখানেই বহ্নি থাকে, ইহা জানা থাকিলে তবে ধূমদ্বারা বহ্নির যথার্থ অনুমান হয়। ব্যাপ্তিজ্ঞান ভূয়োদর্শনসাপেক্ষ অর্থাৎ বহুস্থলে দুইটি বস্তুর সহচার দর্শন করিয়া আমরা তাহাদের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ জানিতে পারি। মাত্র দুই একটি ক্ষেত্রে তাহাদের সহাবস্থান দর্শন করিয়া আমরা তাহাদের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারি না।

CENTRAL LIBRARY

প্রথমে অনুমানকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—বীত ও অবীত। অন্বয়ব্যাপ্তিমূলক অনুমানকে বীত বলে। বীত অনুমান দুইপ্রকার—পূর্ববৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। যে অনুমান দুইটি বস্তুর পূর্বদৃষ্ট নিয়তসম্বন্ধমূলে করা হয়, তাহার নাম পূর্ববৎ। পূর্বে বহুস্থলে ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধদৃষ্টে এখন পর্বতে ধূম দেখিয়া বহ্নির যে অনুমান হয়, তাহা পূর্ববৎ। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানে হেতু ও সাধ্যের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না, তবে যেসব বস্তুর সহিত সাধ্যের সম্বন্ধ দেখা যায়, তাহাদের সহিত হেতুর বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া সাধ্যের অনুমান করা হয়। ইন্দ্রিয়সকলের অস্তিত্ব সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানসিদ্ধ। আমাদের যে কোন ইন্দ্রিয় আছে তাহা আমরা কিরূপে জানি? ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয় না, চক্ষু নিজেকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, ইন্দ্রিয়সকল অতীন্দ্রিয় পদার্থ। কিন্তু আমরা দেখি যে, সকল ক্রিয়াই করণসাপেক্ষ, যেমন ছেদন-ক্রিয়া কুঠারাদি করণসাপেক্ষ। শব্দাদির প্রত্যক্ষও একপ্রকার ক্রিয়া। অতএব তাহাদের কোন করণ থাকিবে। শ্রোত্র, চক্ষু প্রভৃতি প্রত্যক্ষের করণ এবং তাহাদের নাম ইন্দ্রিয়। এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আমরা প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, কারণ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষই হয় না। অতএব প্রত্যক্ষের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধদৃষ্টে ইন্দ্রিয়ের অনুমান হয় না। কিন্তু প্রত্যক্ষ একপ্রকার ক্রিয়া এবং যেমন ছেদনাদি ক্রিয়ার করণ আছে, সেইরূপে প্রত্যক্ষাদি ক্রিয়ার করণ—ইন্দ্রিয় থাকিবে, এইরূপে ইন্দ্রিয়ের অনুমান করা হয়। দ্বিতীয়প্রকার অনুমানের নাম অবীত। নৈয়ায়িকেরা যাহাকে শেষবৎ বা পরিশেষ অনুমান বলিয়াছেন, তাহাই সাংখ্যের অবীত অনুমান। শব্দ একটি গুণ, কারণ ইহা দ্রব্য বা কর্ম বা অন্য কিছু হইতে পারে না। ইহাই অবীত বা পরিশেষ অনুমানের দৃষ্টান্ত।

অনুমানের প্রকারভেদ।

তৃতীয় প্রমাণ শব্দ। আপ্তবাক্যই শব্দপ্রমাণ। তত্ত্বদ্রষ্টা ও যথাদৃষ্টতত্ত্ব-ব্যাখ্যাতা পুরুষের নাম আপ্ত, অর্থাৎ যিনি তত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন এবং যেমন দর্শন করিয়াছেন ঠিক সেইভাবেই তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তাঁহাকে আপ্ত বলে। সাধারণতঃ শব্দ দুইপ্রকার বলা হয়—লৌকিক ও বৈদিক। বিশেষজ্ঞ ও বিশ্বস্ত সাধারণ লোকের বাক্যকে লৌকিক শব্দ বলে, যেমন জড়তত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের উপদেশ। সাংখ্যাচার্যেরা ইহাকে শব্দপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না, কারণ ইহা প্রত্যক্ষ ও অনুমানসাপেক্ষ। তাঁহাদের মতে প্রকৃতপক্ষে বেদবাক্যই শব্দপ্রমাণ। বেদবাক্যদ্বারা প্রত্যক্ষের অতীত ও অনুমানের অগম্য বিষয়ের জ্ঞান হয়, যেমন ধর্ম, স্বর্গ, পরকাল, ঈশ্বর ইত্যাদি। বেদ কোন পুরুষকর্তৃক রচিত নহে, অতএব ইহা পৌরুষেয় রচনার

শব্দ প্রমাণ ও তাহার প্রকারভেদ।

CENTRAL LIBRARY

অনিবার্য দোষত্রুটিমুক্ত। বেদ অভ্রান্ত ও স্বতঃপ্রমাণ জ্ঞানের আকর। ইহাতে দ্রষ্টা ঋষিদের তত্ত্বার্থবিষয়ে অপরোক্ষানুভূতিসকল সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বেদ অপৌরুষেয়, যেহেতু তত্ত্বার্থ ও ইহার অনুভূতি নিত্যসিদ্ধ এবং পুরুষবিশেষনিরপেক্ষ অর্থাৎ কোন পুরুষের ইচ্ছা ও জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। তথাপি বেদকে নিত্য বলা যায় না, কারণ ইহা ঋষিদের অনুভূতিদ্বারা প্রকাশিত এবং গুরুশিষ্যপরম্পরায় আগত হইয়াছে এবং অব্যাহত আছে।

৭। পুরুষ বা আত্মার বন্ধ ও মোক্ষ

পুরুষ বা আত্মার স্বরূপ।

পুরুষ স্বরূপতঃ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত জ্ঞানস্বরূপ আত্মা। ইহা নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকার। ইহা দেশ, কাল ও কার্য-কারণসম্বন্ধের অতীত। ইহা নিখিল জড় জগতের অতীত। অতএব ইহা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অহংকার ও বুদ্ধির অতিরিক্ত পদার্থ এবং তাহাদের ক্রিয়ার অতীত। প্রকৃতপক্ষে ইহা সকল কর্ম, সুখ-দুঃখ, ধর্মাধর্ম ও পাপ-পুণ্যের অতীত। সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি বাস্তবিকপক্ষে মন ও বুদ্ধির বৃত্তি বা ধর্ম। সুখদুঃখাদি মনেই অনুভূত হয়। মনের লয় হইলে সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয় না। মনে অনুভূত সুখ-দুঃখে অহংকার 'আমার সুখ-দুঃখ' ইত্যাকার অভিমান করে এবং বুদ্ধিতে তদনুরূপ বৃত্তি উৎপন্ন করে। বুদ্ধি সুখ-দুঃখকে আমার বলিয়া নিশ্চয় করে এবং সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখপরিহার করিবার চেষ্টা করে। অতএব কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব বাস্তবিকপক্ষে বুদ্ধিগত। কিন্তু এখানে স্মরণ করিতে হইবে যে, বুদ্ধিতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকায় উহাতে আত্মার চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ে এবং উহা চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব বোধ করে। যেমন অগ্নিসংযোগে লৌহপিণ্ড অগ্নির ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ পুরুষ-সংযোগে চিৎপ্রতিবিম্বদ্বারা বুদ্ধিও চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বুদ্ধির কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব পুরুষে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ইহাই পুরুষের বন্ধ বা সংসার। সংসারদশাতে পুরুষে মিথ্যা কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব আরোপিত হয় এবং ইহা নানা প্রকার দুঃখভোগ করে। দুঃখ প্রধানতঃ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। শরীর ও মনে উৎপন্ন দুঃখের নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ, যেমন শারীরিক পীড়া ও মানসিক ভয়াদিজনিত দুঃখ। মানুষ, পশু এবং অন্যান্য ভৌতিক দ্রব্যজনিত দুঃখের নাম আধিভৌতিক দুঃখ। যক্ষরাক্ষস এবং দেবতাদ্বারা সম্পন্ন দুঃখের নাম আধিদৈবিক দুঃখ।

পুরুষের বন্ধ বা সংসার।

ত্রিবিধ দুঃখ।

এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ বা মোক্ষ। ন্যায়-দর্শনের ন্যায় সাংখ্যদর্শনেও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মোক্ষ বা মুক্তি, উহা কোনরূপ সুখ বা আনন্দানুভূতির অবস্থা নয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে: মুক্তিলাভের উপায় কি? সাংখ্যমতে অবিবেক পুরুষের বন্ধের কারণ। কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধির বৃত্তি। কিন্তু পুরুষের চৈতন্য বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় বুদ্ধি চেতনবৎ প্রতীয়মান হয় এবং তাহার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব চেতন পুরুষেরই কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বরূপে প্রতীয়মান হয়। পুরুষ অবিবেকবশতঃ অর্থাৎ অজ্ঞান-বশতঃ বুদ্ধিগত কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বকে আত্মগত বলিয়া মনে করে। ফলিতার্থ হইতেছে যে, বুদ্ধ্যাদিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষ বুদ্ধ্যাদিগত সুখ-দুঃখ নিজের বলিয়া বিবেচনা করে। ইহাই তাহার বন্ধ। অতএব পুরুষ ও প্রকৃতির অবিবেক অর্থাৎ অভেদজ্ঞান পুরুষের বন্ধের ও সুখ-দুঃখভোগের কারণ। বিবেকজ্ঞানদ্বারা তাহার পরিহার হয়। বিবেকজ্ঞান বলিতে পুরুষ ও প্রকৃতির অত্যন্তভেদজ্ঞান বুঝায়। পুরুষ দেহ বা ইন্দ্রিয় নহে, মন, বুদ্ধি বা অহঙ্কার নহে, প্রকৃতি বা প্রকৃতির কোন পরিণাম নহে, ইহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অতীত, এইরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানের নাম বিবেকজ্ঞান। এরূপ জ্ঞানদ্বারা অবিবেকনিবৃত্তি হয় এবং পুরুষ তাহার নিত্যমুক্তস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন আর তাহার কোন দুঃখভোগ হয় না। ইহাই তাহার মোক্ষ বা মুক্তি। এখানে একথা বলা উচিত যে, অবিবেকজ্ঞানের ন্যায় বিবেকজ্ঞানও বুদ্ধির বৃত্তিবিশেষ। অতএব বলিতে হয়, বুদ্ধিই অবিবেকজ্ঞানদ্বারা আত্মাকে বদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান করে এবং বুদ্ধিই বিবেকজ্ঞানদ্বারা আত্মার মুক্তিসাধন করে। এইজন্য বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি ভোগ্যা বলিয়া ভোক্তা পুরুষের অপেক্ষা করে এবং বিবেকজ্ঞানের জন্য পুরুষও প্রকৃতির অপেক্ষা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুরুষ বা আত্মা নিত্যমুক্ত, সংসারদশাতেও তাহার মুক্তির ব্যাঘাত হয় না, কেবল সে নিজ মুক্তস্বভাব বিস্মৃত হয়। অতএব মুক্তি বা মোক্ষ কোন নূতন উৎপন্ন বস্তু নয়, উহা আত্মার নিত্যসিদ্ধ স্বভাব। বাস্তবিকপক্ষে পুরুষের বন্ধ ও মোক্ষ হয় না। পুরুষের আশ্রয়ে বুদ্ধিই বন্ধ ও মোক্ষভাগিনী হয়।

ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই মোক্ষ।

অবিবেক বন্ধের হেতু।

বিবেকজ্ঞান মুক্তির হেতু।

কোন কোন সাংখ্যাচার্যের মতে যে-কোন পুরুষ ইহজীবনেই মুক্তিলাভ করিতে পারে। এরূপ মুক্তির নাম জীবন্মুক্তি। দেহান্তে মুক্তপুরুষের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ বিগত হইলে যে মুক্তি হয়, তাহার নাম বিদেহমুক্তি। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে বিদেহমুক্তিই বাস্তবিক মুক্তি, কারণ দেহ থাকিলেই

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি।

সুখ-দুঃখভোগ অনিবার্য। কিন্তু সকল সাংখ্যাচার্যের মতে মুক্তি সকল দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিমাত্র, ইহা কোনরূপে সুখানুভূতি নহে, কারণ সুখ থাকিলেই দুঃখ থাকিবে, ইহারা অবিচ্ছেদ্য। বেদান্তমতে মুক্তি আনন্দানুভূতির অবস্থা। সাংখ্যে এই মত পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৮। ঈশ্বরবিষয়ে বিপ্রতিপত্তি

ঈশ্বরবিষয়ে সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারদের মতভেদ দেখা যায়। কাহারও কাহারও মতে সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর নিরাকৃত হইয়াছেন এবং সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী। আবার কাহারও কাহারও মতে সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর একভাবে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং সাংখ্যও যোগদর্শনের ন্যায় ঈশ্বর-বাদী। প্রাচীন সাংখ্যাচার্যেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ে কতকগুলি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। (১) পৃথিব্যাদি কার্য বলিয়া তাহার কর্তারূপে ঈশ্বর অনুমিত হন। ঈশ্বরকে নিত্য ও নির্বিকার চৈতন্যরূপে কল্পনা করা হয়। কিন্তু নির্বিকার চৈতন্যে কোন কর্তৃত্ব সম্ভব নয়, কারণ ক্রিয়া হইলেই তাহার বিকার বা পরিবর্তন হইবে। অতএব নিত্য অথচ পরিণামী প্রকৃতিকেই জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। (২) অবশ্য এখানে কেহ বলিতে পারেন যে, প্রকৃতি জড় ও অচেতন, কোন চেতন পুরুষ কর্তৃক অধিষ্ঠিত না হইলে প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে না। জীব অল্পজ্ঞ বলিয়া প্রকৃতিকে পরিচালনা করিতে পারে না। অতএব সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই প্রকৃতিকে পরিচালনা করেন বলিতে হইবে। কিন্তু একথাও যুক্তিসহ নহে, কারণ পরিচালনা একপ্রকার ক্রিয়া এবং উহা কোন নির্বিকার পুরুষে সম্ভব নহে। আর যদি তাহা সম্ভবও হয়, তবে ঈশ্বর কোন্ প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত জগৎ সৃষ্টি করেন তাহা বুঝা যায় না। তিনি আপ্তকাম পুরুষ। সুতরাং তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজনে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন না। জীব-সকলের প্রয়োজনে অর্থাৎ তাহাদের সুখ-বিধানের জন্য ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, একথাও বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে সংসারে এত দুঃখকষ্ট, এত পাপতাপ থাকিত না। (৩) ঈশ্বরকে জগৎস্রষ্টা বলিয়া স্বীকার করিলে জীবের কোন স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না এবং জীবাত্মাকে নিত্যও বলা যায় না। যদি ঈশ্বর সর্বভূতস্থ হন এবং জীব ঈশ্বরের অংশ হয় তবে জীবাত্মার কোন পৃথক্ সত্তাই থাকে না। আর যদি তিনি জীবাত্মাকে সৃষ্টি করিয়া পৃথক্ সত্তা প্রদান করিয়া থাকেন, তবে জীবাত্মা নিত্য না হইয়া মরণশীল হইবে,

ঈশ্বর বিষয়ে সাংখ্যাচার্যদের মতভেদ।

প্রাচীন সাংখ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ে আপত্তি।

CENTRAL LIBRARY

কারণ যাহার উৎপত্তি হইয়াছে তাহার ধ্বংসও হইবে। এইসব কারণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হয় এবং প্রকৃতিকেই জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বৎসের পরিপোষণের জন্য যেমন গাভীশরীর হইতে অচেতন দুগ্ধ নিঃসৃত হয়, সেইরূপ পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের জন্য অচেতন প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হয় এবং জগৎ সৃষ্টি করে।

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে সাংখ্য ঈশ্বরবাদী।

বিজ্ঞানভিক্ষু এবং সাংখ্যদর্শনের কোন কোন আধুনিক ব্যাখ্যাতা সাংখ্য-দর্শনকে নিরীশ্বরবাদী বলেন না। তাঁহাদের মতে সাংখ্যদর্শনে জগৎস্রষ্টারূপে ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হইলেও, জগতের নিত্য, নিরতিশয়-ঐশ্বর্য-সম্পন্ন দ্রষ্টারূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হইয়াছে। যেমন চুম্বকের সান্নিধ্যমাত্রে লৌহখণ্ড ক্রিয়াশীল হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের সান্নিধ্যমাত্রে প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হয় এবং জগৎ সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে এরূপে ঈশ্বর শ্রুতি ও স্মৃতি-সম্মত এবং যুক্তিদ্বারাও প্রতিপাদিত হন।

উপসংহার।

উপসংহারে সাংখ্যদর্শনের চিন্তাধারার স্থলে স্থলে যে অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান হয়, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যায়। সাংখ্যদর্শনকে দ্বৈতমূলক বস্তুতন্ত্রবাদ (dualistic realism) বলা যায়। ইহাতে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুইটি পরম ও স্বতন্ত্র তত্ত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। প্রকৃতি জড় ও অচেতন, কিন্তু নিত্য ও পরিণামশীলা। প্রকৃতিই নিখিল বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। জড় ভৌতিক দ্রব্য হইতে আরম্ভ করিয়া মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার পর্যন্ত সকল দ্রব্যই প্রকৃতির কার্য। প্রকৃতির প্রথম অবস্থা সাম্যের অবস্থা, তাহার পরিণাম হয় বটে; কিন্তু তাহাতে কোন গতিক্রিয়া (movement) নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে: কি কারণে প্রকৃতির সাম্যাবস্থার নাশ হইয়া তাহাতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল এবং কিরূপে অচেতন প্রকৃতি এই বৈচিত্র্যময় জগৎ রচনা করিল? সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের ফলে প্রকৃতির সাম্যাবস্থার অবসান হয় এবং তাহার জগদাকারে পরিণাম হয়। কিন্তু এই সংযোগ বাস্তবিক কিরূপে হয়, তাহা বুঝা যায় না। দুইটি সাবয়ব দ্রব্যের সংযোগ আমরা বুঝিতে পারি, যেমন ঘট ও পটের সংযোগ। কিন্তু জ্ঞান-স্বরূপ ও নিরবয়ব পুরুষ কিভাবে জড় প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইতে পারে তাহা বুঝা কঠিন। সাংখ্যাচার্যেরা অবশ্য বলেন যে, এই সংযোগ পুরুষের প্রকৃতিসান্নিধ্যমাত্র এবং চুম্বক যেমন সান্নিধ্যমাত্রদ্বারা লৌহকে ক্রিয়াশীল করে, সেইরূপ পুরুষের সান্নিধ্যমাত্রে প্রকৃতির বৈষম্য উপস্থিত হয় এবং তাহাতে গতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। কিন্তু চুম্বক নিষ্ক্রিয়ভাবে লৌহের সন্নিধানে থাকে না। পরন্তু, উহার আকর্ষণী শক্তি প্রয়োগ করিয়া লৌহে গতিক্রিয়া উৎপন্ন

করে। তারপর, সাংখ্যমতে পুরুষের চৈতন্য প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইলে প্রকৃতি চেতনবৎ প্রতীয়মান হয় এবং জগৎরচনা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এখানেও চৈতন্যের প্রতিবিম্ব বলিতে কি বুঝায় তাহা ঠিক বুঝা যায় না। জড় দ্রব্যাদির প্রতিবিম্ব কি তাহা বুঝা যায়, কিন্তু অজড় চৈতন্যের কিরূপে প্রতিবিম্ব হয় তাহা বুঝা যায় না। তারপর, সাংখ্যাচার্যেরা পুরুষের বহুত্ব প্রমাণ করিতে যেসব যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহাতে বহুত্ব প্রমাণিত হয় না। তাঁহাদের মতে জন্ম, মরণ ও ইন্দ্রিয়াদি ভিন্ন ভিন্ন জীবে ভিন্ন, সকল জীবেরই এক সময়ে প্রবৃত্তি অর্থাৎ কর্ম হয় না এবং কোন জীব সত্ত্বপ্রধান, কেহ রজঃপ্রধান, কেহ তমঃপ্রধান, এইসব হেতুদ্বারা পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু জন্মাদি শরীরেরই হয়, পুরুষ বা আত্মার জন্ম বা মরণ হয় না। ইন্দ্রিয়াদি করণও স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরেই থাকে, আত্মায় থাকে না; প্রকৃতিই সকল কর্ম করে, পুরুষ নিষ্ক্রিয়; আর সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির গুণ, পুরুষ গুণাতীত। অতএব এই প্রমাণগুলি জ্ঞানস্বরূপ আত্মার বহুত্ব প্রমাণিত করে না। ইহারা অহংপদবাচ্য জীবের অর্থাৎ অহংকাররূপী ব্যক্তির বহুত্ব প্রমাণিত করে মাত্র। সাংখ্যদর্শনে এইসব অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান হইলেও জীবন-দর্শন হিসাবে ইহার উপযোগিতা স্বীকার করিতে হইবে। মুক্তিকামী ব্যক্তি সাংখ্য-নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিলে দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিরূপ মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন।

CENTRAL LIBRARY

অষ্টম অধ্যায়

যোগদর্শন

১। ভূমিকা

যোগদর্শন পতঞ্জলি-প্রণীত।

ভগবান্ পতঞ্জলি যোগদর্শনের প্রণেতা। তাঁহার নাম অনুসারে যোগদর্শনের অপর নাম পাতঞ্জলদর্শন। যোগই যোগদর্শনের মুখ্যপ্রতিপাদ্য বিষয়। এই দর্শনে যোগের বিস্তৃত ও বিশদ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যোগসাধন আত্মোপলব্ধির প্রধান সহায়। যোগসাধনে দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারের অতীত আত্মার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে এবং মোক্ষলাভ হয়। এজন্য আত্মদর্শনেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই যোগসাধন বিশেষ সহায়ক। ভগবান্ পতঞ্জলি-প্রণীত পাতঞ্জল-সূত্র বা যোগসূত্র যোগদর্শনের মূল গ্রন্থ। মহর্ষি বেদব্যাস পাতঞ্জল-সূত্রের যে সংক্ষিপ্ত অথচ উপাদেয় ভাষ্য রচনা করেন, তাহার নাম যোগভাষ্য বা ব্যাসভাষ্য। বাচস্পতি মিশ্রকৃত তত্ত্ববৈশারদী ব্যাসভাষ্যের প্রামাণিক টীকা। ভোজরাজকৃত বৃত্তি ও যোগমণিপ্রভা এবং বিজ্ঞানভিক্ষুপ্রণীত যোগবার্তিক ও যোগসারসংগ্রহ যোগদর্শনের অন্যান্য মূল্যবান্ গ্রন্থ।

যোগদর্শনে চারিপাদ বা পরিচ্ছেদ।

পাতঞ্জল বা যোগদর্শন চারি পাদে বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পাদের নাম সমাধিপাদ। ইহাতে যোগের উদ্দেশ্য ও লক্ষণ, বৃত্তির লক্ষণ, যোগের উপায় ও প্রকারভেদ, এসব বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদের নাম সাধনপাদ। ইহাতে ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ, কর্মবিপাক অর্থাৎ কর্মফল, কর্মফলের দুঃখত্ব, দুঃখ, দুঃখহেতু, দুঃখনিবৃত্তি ও দুঃখনিবৃত্তির উপায় ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদের নাম বিভূতিপাদ। ইহাতে যোগের অন্তরঙ্গ অঙ্গ, পরিণাম, সংযমবিশেষদ্বারা বিভূতি বা ঐশ্বর্যবিশেষলাভ এবং বিবেকজ জ্ঞান ব্যাখ্যাত হইয়াছে। চতুর্থ পাদের নাম কৈবল্যপাদ। ইহাতে মুক্তির লক্ষণ, মুক্তির প্রকারভেদ, দেহ ও চিত্তের অতিরিক্ত আত্মার সিদ্ধি, পরলোকসিদ্ধি প্রভৃতি বিষয় কথিত হইয়াছে।

সাংখ্য ও যোগদর্শন সমানতন্ত্র।

সাংখ্য ও যোগদর্শন সমানতন্ত্র। সাংখ্যদর্শনের ন্যায় যোগদর্শনেও প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ তিনটি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে এবং পুরুষ, প্রকৃতি প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। কিন্তু যোগদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন। সাংখ্যদর্শনে মুক্তির উপায়রূপে যে বিবেকজ্ঞানের

CENTRAL LIBRARY

কথা বলা হইয়াছে, তাহা লাভের উপায় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা যোগদর্শনে পাওয়া যায়।

যোগের আবশ্যকতা।

আত্মা ও অধ্যাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ প্রতীতির জন্য যোগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ভারতীয় দর্শনের প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। উপনিষদে, স্মৃতি ও পুরাণে যোগের আবশ্যকতা স্বীকার করা হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, মনের পবিত্রতা ও স্থিরতা ব্যতীত অধ্যাত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না। যোগাভ্যাস-দ্বারা দেহ ও মন শুদ্ধ হয় এবং মানসিক একাগ্রতা জন্মে। এরূপ হইলেই আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি অধ্যাত্মবিষয়ের উপলব্ধি হয় এবং তদ্বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। এইজন্যই প্রায় সকল ভারতীয় দর্শনশাখায় যোগাভ্যাসের উপদেশ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ সাংখ্যদর্শনে প্রতিপাদিত দেহ-মন-বুদ্ধি ও অহংকারের অতীত আত্মার উপলব্ধি করিতে হইলে যোগাভ্যাস অপরিহার্য বলিতে হয়। সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতির বিবেকজ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভ হয়। যোগদর্শনে বিবেকজ্ঞান লাভের কার্যকর পন্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে। যোগা-ভ্যাসদ্বারা চিত্ত বা অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ হয়, কিন্তু তখনও জ্ঞানস্বরূপ আত্মার অনুভূতি হয়। ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহংকারের অতীত আধ্যাত্মিক সত্তা। অতএব প্রকৃতি হইতে পুরুষ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। ইহাই হইল সাক্ষাৎ বিবেকজ্ঞান। যোগদর্শন বিবেকজ্ঞানলাভের মানস-শিল্প বা কার্যকর পন্থা।

২। যোগদর্শনে মনস্তত্ত্ব

আত্মা চিত্তবৃত্তির মাধ্যমে বিষয় জানে।

সাংখ্য ও যোগদর্শনের মতানুসারে জীব স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরবিশিষ্ট আত্মা। সূক্ষ্মশরীর ইন্দ্রিয়, মন, অহংকার ও বুদ্ধির সমষ্টি। আত্মা স্বরূপতঃ অপরিণামী, মুক্ত শুদ্ধচৈতন্য এবং দেহ ও অন্তঃকরণের পরিণামের অর্থাৎ পরিবর্তনের অতীত। মন বা অন্তঃকরণের নাম চিত্ত। অবিবেকবশতঃ আত্মা নিজেকে চিত্ত হইতে অভিন্ন মনে করে এবং চিত্তের পরিণাম আত্মার পরিণাম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। চিত্ত স্বরূপতঃ জড় ও অচেতন হইলেও সান্নিধ্যবশতঃ পুরুষের চৈতন্য তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয় এবং উহা চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বিষয়ের সহিত সম্পর্ক হইলে চিত্তের বিষয়াকারে পরিণাম হয়। তাহার সেই বিষয়াকার-প্রাপ্তির নাম বৃত্তি। আত্মা চিত্তবৃত্তির মাধ্যমে বিষয় উপলব্ধি করে। যদিও আত্মার কোন পরিণাম

CENTRAL LIBRARY

বা পরিবর্তন হয় না, তথাপি বুদ্ধিবৃত্তিতে তাহার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হওয়ায় বুদ্ধিগত বৃত্তি বা পরিণামসকল আত্মার বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যেমন চন্দ্রের প্রতিবিম্ব চলমান তরঙ্গে প্রতিফলিত হইলে, চন্দ্রকেই চলমান বলিয়া মনে হয়।

পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তি।

দেহস্থ ইন্দ্রিয় ও বহিঃস্থ বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে চিত্ত বা মনের যে পরিণাম অর্থাৎ পরিবর্তন হয়, তাহার নাম বৃত্তি। এই বৃত্তিকে আমরা জ্ঞান বলিয়া থাকি। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধবশতঃ মনের অসংখ্য বৃত্তি হয়, কারণ বিষয় অসংখ্য। বৃত্তি অসংখ্য হইলেও তাহাদিগকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। অতএব মনোবৃত্তি পাঁচপ্রকার—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। যে বস্তু যেপ্রকার তাহার ঠিক সেইপ্রকার জ্ঞানকে প্রমা বা প্রমিতি বলে, যেমন ঘট-বিষয়ে ঘটজ্ঞান, পটবিষয়ে পটজ্ঞান ইত্যাদি। প্রমার করণের নাম প্রমাণ। প্রমাণবৃত্তি তিনপ্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। ইন্দ্রিয়ের সহিত বহির্বস্তুর সংযোগ হইবার পরেই মনের যে তদ্বস্তুর অনুরূপ বৃত্তি জন্মে, সেই বৃত্তির নাম প্রত্যক্ষ। এক বস্তুর প্রত্যক্ষ হইবার পর তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত অন্য অপ্রত্যক্ষ বস্তুর যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম অনুমান, যেমন ধূম প্রত্যক্ষের পর বহ্নির জ্ঞান। আপ্ত অর্থাৎ বিশ্বস্ত পুরুষের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বাক্যের অর্থবিষয়ক যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম আগম। যে বস্তু বস্তুতঃ যেরূপ নহে, তাহাকে সেইরূপে জানার নাম মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রম বা বিপর্যয়; অর্থাৎ এক বস্তুকে অনুরূপে জানার নাম বিপর্যয়, যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান। কোন শব্দ শ্রবণ করিলে শব্দমাত্রের প্রভাবে যে জ্ঞান হয়, কিন্তু যাহার কোন বিষয়বস্তু নাই, তাহার নাম বিকল্প; শশশৃঙ্গ, আকাশকুসুম প্রভৃতি শব্দ শ্রবণ করিলে, আমাদের শব্দানুপাতী একপ্রকার জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু এরূপ জ্ঞান বিষয়শূন্য অর্থাৎ উহার কোন বিষয়বস্তু নাই। এইরূপ জ্ঞানকে বিকল্প বলে। বিপর্যয় জ্ঞান যথার্থ জ্ঞানদ্বারা বাধিত হয়, যেমন রজ্জুতে দুষ্ট সর্পজ্ঞান রজ্জুজ্ঞানদ্বারা বাধিত হয়। কিন্তু বিকল্প জ্ঞান সর্বসাধারণের পক্ষে বাধিত হয় না। সাধারণ লোকের নিকট 'আকাশকুসুম' শব্দটি বাধিত হয় না, বরং তাহার ব্যবহারই চলে। নিদ্রাও একপ্রকার মনোবৃত্তি। যে অবস্থায় মনে তমোগুণ প্রবল হইয়া প্রকাশক সত্ত্বগুণকে অভিভূত করে এবং জাগ্রত ও স্বপ্নবৃত্তির লয় হয়, তাহার নাম নিদ্রা। অতএব নিদ্রা বলিতে সুষুপ্তি বুঝায়। নিদ্রা একেবারে অজ্ঞানের অবস্থা নহে। নিদ্রাকালেও মনের একপ্রকার বৃত্তি হয়, তমঃ বা অভাব নিদ্রারূপ বৃত্তির অবলম্বন অর্থাৎ নিদ্রাতে জাগ্রৎ ও স্বপ্নবৃত্তির অভাব প্রত্যয় হয়। নিদ্রা যে মনের একটি বৃত্তি তাহা নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির নিদ্রাবিষয়ক স্মৃতিদ্বারা প্রমাণিত হয়। নিদ্রাভঙ্গের পরে

CENTRAL LIBRARY

কেহ কেহ বলেন 'আমার সুনিদ্রা হইয়াছে', 'আমি কিছুই জানিতে পারি না'। কোন বিষয় পূর্বে অনুভূত না হইলে তাহার স্মরণ হয় না। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, নিদ্রাকালে আমাদের একপ্রকার অনুভূতি হয় এবং নিদ্রাও মনের একটি বৃত্তি। পূর্বানুভূত বিষয়ের সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে, তদ্বিষয়ে আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম স্মৃতি। সংস্কারকে দ্বার করিয়া অনুভবই স্মৃতির জনক হইয়া থাকে। এই পাঁচপ্রকার বৃত্তির অতিরিক্ত অন্যপ্রকার চিত্তবৃত্তি নাই। যে-কোন চিত্তবৃত্তি হউক না কেন, তাহা এই পাঁচপ্রকার বৃত্তির কোনও একপ্রকারের অন্তর্ভুক্ত হইবে। যোগাভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা এই পাঁচপ্রকার মনোবৃত্তির নিরোধ করিতে হইবে। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিলে প্রথমতঃ সম্প্রজ্ঞাত ও পরিশেষে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়।

৩। যোগের লক্ষণ ও প্রকারভেদ

যোগ—চিত্তবৃত্তিনিরোধ।

পাতঞ্জলদর্শনের মতে চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ। এখানে যোগ বলিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ বুঝায় না। যোগের উদ্দেশ্য হইল পুরুষের অবিবেকজ্ঞানের নাশ ও বিবেকজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। পুরুষ যে মন, বুদ্ধি, অহংকার অর্থাৎ অন্তঃকরণ বা চিত্ত হইতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত বা ভিন্ন, এরূপ উপলব্ধির নামই বিবেকজ্ঞান। কিন্তু যতক্ষণ চিত্তের বৃত্তি বা পরিণাম হইবে এবং পুরুষের চৈতন্য তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইবে, ততক্ষণ চিত্তবৃত্তিগুলি পুরুষেই প্রতীয়মান হইবে। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে আর এরূপ আশঙ্কা থাকে না। এজন্যই যোগশাস্ত্রের অনুশাসন অর্থাৎ উপদেশ। যোগ শব্দটিও সমাধি অর্থে যুজ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অতএব যোগ বলিতে সমাধি অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি-নিরোধই বুঝিতে হইবে।

পঞ্চবিধ চিত্তভূমি—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত,

সমাধি অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধ চিত্তের সমস্ত ভূমিতে বিদিত ধর্ম, অর্থাৎ চিত্তের সকল ভূমিতে বা অবস্থাতে অল্পবিস্তর-ভাবে ঘটিয়া থাকে। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচটি চিত্তের ভূমি বা অবস্থা। চিত্তের সকল ভূমিতেই কোন না কোন বৃত্তির নিরোধ হয়, কারণ চিত্ত বা মন এক বস্তুতে নিবিষ্ট হইলে অন্য বস্তু হইতে প্রত্যাহৃত হয় এবং কোন এক বিশেষ বৃত্তি উৎপন্ন হইলে তদ্ভিন্ন বৃত্তি উৎপন্ন হইতে পারে না। মন বা চিত্তের অস্থির অবস্থার নাম ক্ষিপ্ত। এই অবস্থায় রজঃ ও তমোগুণের প্রাবল্যবশতঃ চিত্ত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটিয়া বেড়ায় এবং কোন বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না। তমোগুণের প্রাবল্যবশতঃ মন যখন কামক্রোধাদিদ্বারা

অভিভূত হয় এবং আলস্য, তন্দ্রা ও নিদ্রামগ্ন হয়, তখন তাহার মূঢ়াবস্থা। তৃতীয় ভূমি হইল বিক্ষিপ্ত অবস্থা। এই অবস্থায় চিত্ত তমোগুণের প্রভাব-মুক্ত হয় এবং রজোগুণেরও অত্যল্প প্রভাব থাকে। ইহা ক্ষণকালের জন্য কোন সুখজনক বস্তুতে স্থির হয় এবং তাহাকে প্রকাশ করে। অবশ্য অল্পকাল পরেই ইহা বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়। চিত্তের এই ক্ষণিক স্থিরতার নাম বিক্ষিপ্ত। চিত্তের এই তিন ভূমি যোগের উপযোগী বা সহায়ক নহে, কারণ এই তিন ভূমিতে চিত্তের কোন বিষয়ে স্থায়ী স্থিরতা সম্পাদিত হয় না এবং স্থায়িভাবে চিত্তবৃত্তির নিরোধও হয় না।

একাগ্র ও নিরুদ্ধ।

চতুর্থ ভূমির নাম একাগ্র। চিত্ত যখন তমোগুণের ও রজোগুণের প্রভাব-মুক্ত হয় এবং তাহাতে সত্ত্বগুণের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে, তখন ইহা কোন বাহ্য বা আন্তর বস্তুতে দীর্ঘকাল স্থির বা অবিকম্পিতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং তাহার স্বরূপ প্রকাশ করে। চিত্তের এইরূপ স্থির বা একতান অবস্থার নাম একাগ্র। ইহাতে অনেক চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলেও, সকল বৃত্তির নিরোধ হয় না, কারণ তখনও চিত্তে একটি বস্তুর প্রত্যয় বা ধারাবাহিক জ্ঞান থাকে এবং উহা একেবারে নিরালম্বন হয় না। অবশ্য একাগ্র অবস্থাই সকল চিত্তবৃত্তি-নিরোধের প্রথমাবস্থা। তাহার পরেই নিরুদ্ধ নামক পঞ্চম অবস্থার উদ্ভব হয়। নিরুদ্ধ অবস্থায় সকল বৃত্তির, এমন কি, একাগ্রবৃত্তিরও নিরোধ হয়। একাগ্রবৃত্তিতে চিত্তের কোন না কোন অবলম্বন থাকে, কিন্তু নিরুদ্ধ অবস্থায় কোন অবলম্বন থাকে না। তখন চিত্ত সকল বৃত্তিশূন্য হইয়া স্বীয় প্রকৃতিতে লীন হয় এবং পূর্ণ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

চিত্তের একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা যোগের বিশেষ উপযোগী এবং মোক্ষ-লাভের সহায়ক। এই দুই অবস্থাকে যোগের অবস্থা বলা যায়, অবশ্য নিরুদ্ধ অবস্থাই প্রকৃত যোগের অবস্থা। বস্তুতঃ দীর্ঘকালস্থায়ী একাগ্র অবস্থাকেই সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে, কারণ ইহাতে ধ্যেয়বস্তু সম্যক্‌রূপে প্রজ্ঞাত হয়। সেইরূপ নিরুদ্ধ অবস্থাকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে, কারণ ইহাতে সর্ববৃত্তিনিরোধ হওয়ায় কিছুই জ্ঞাত বা সম্প্রজ্ঞাত হয় না। উভয়বিধ যোগকেই সমাধিযোগ বলে, কারণ উভয়বিধ যোগেই আত্মসাক্ষাৎকার হয়।

চতুর্বিধ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

অতএব যোগ বা সমাধি প্রধানতঃ দুইপ্রকার—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। বিষয়ভেদে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চারিপ্রকার—সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত। দেব-দেবীর মূর্তি প্রভৃতি বাহ্য স্থূলবিষয়ে চিত্তের একাগ্রতার নাম সবিতর্ক সমাধি। তন্মাত্র প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিষয়ে সমাধির নাম সবিচার। ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সূক্ষ্মতর বিষয়ে

সমাধির নাম সানন্দ। অস্মিতা বা অহংরূপী আত্মা বিষয়ে সমাধির নাম সাস্মিত। সকল সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতেই তত্তৎবিষয়ের সম্যগ্‌জ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞান হয়। সাস্মিত সমাধিতে অহংরূপী আত্মার সম্যক্‌-জ্ঞান হয় এবং তৎসঙ্গে জ্ঞানস্বরূপ আত্মারও কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়, অবশ্য তখন অহম্‌ ও আত্মা যেন অভিন্ন এরূপ প্রতীত হয়।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি

এইরূপে চিত্ত বা মন বাহ্য ও আভ্যন্তর সকল বিষয়ের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাহাদিগকে পরিহার করে এবং পরিশেষে সকল বিষয়চিন্তা হইতে বিরত হয়। এমত অবস্থায় চিত্তের সকল বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। এমন কি, যে বিবেকখ্যাতি অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানদ্বারা আত্মার সকল বস্তু হইতে পার্থক্য জ্ঞাত হয়, তাহারও নিরোধ হয়, কেবল তাহার সংস্কারমাত্র থাকে। এইরূপে সকল চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে যে যোগ বা সমাধির অবস্থা হয়, তাহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত, কারণ ইহাতে কোন বস্তু বা বিষয় জ্ঞাত বা সম্প্রজ্ঞাত হয় না। ইহাই প্রকৃত যোগ বা সমাধি। ইহাতে ক্লেশাদি সমস্ত বীজ তিরোহিত হয় বলিয়া ইহাকে নির্বীজসমাধিও বলে। কিন্তু এরূপ সমাধি যে অজ্ঞান বা অচৈতন্যের অবস্থা তাহা নহে। অবশ্য এখানে কোন বিষয়জ্ঞান থাকে না। কিন্তু দ্রষ্টা পুরুষ বা আত্মা স্বীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আত্মজ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত হন। অতএব ইহা শুদ্ধ আত্মজ্ঞানের অবস্থা, অজ্ঞানের অবস্থা নয়। এইরূপ আত্মজ্ঞানই মুক্তির কারণ। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে মানুষ সুখ-দুঃখের অতীত হয়। কিন্তু ইহা লাভ করা অতি কঠিন। যদিচ কোন ব্যক্তি যোগাভ্যাসদ্বারা একদা সমাধিস্থ হইয়া সকল দুঃখানুভূতির নিবৃত্তি করিতে পারেন, তথাপি অতীত ও বর্তমান কর্মের প্রভাবে তাঁহাকে পুনরায় নিম্ন-ভূমিতে আসিয়া দুঃখভোগ করিতে হইতে পারে। সকল কর্ম ক্ষয় করিয়া সমাধিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে দীর্ঘকাল যত্নসহকারে যোগাভ্যাস করিতে হয়। যোগাভ্যাসের নিয়ম ও ক্রম যোগাঙ্গব্যাখ্যাবসরে বর্ণিত হইবে।

৪। যোগের অষ্ট অঙ্গ

অষ্ট যোগাঙ্গ।

সাংখ্যযোগমতে আত্মসাক্ষাৎকার দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তির কারণ। কিন্তু অশুদ্ধ ও চঞ্চল চিত্তে আত্মার উপলব্ধি হয় না। কেবল শুদ্ধ বা নির্মল চিত্তে এবং স্থির ও শান্ত মনে আত্মার উপলব্ধি হইতে পারে। চিত্ত বা মনকে শুদ্ধ ও শান্ত করিবার জন্য যোগদর্শনে যে অষ্ট সাধনের উপদেশ করা হইয়াছে তাহা এইরূপ: (১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার,

(৬) ধারণা, (৭) ধ্যান ও (৮) সমাধি। ইহাদিগকে যোগাঙ্গ বলে, কারণ ইহাদের অভ্যাস করিলে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সমাধি লাভ করা যায় এবং আত্মজ্ঞান পর্যন্ত হইয়া থাকে।

(১) যম।

(১) অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটিকে যম বলে। (ক) কায়, মন ও বাক্যদ্বারা কোনও কালে কোনও প্রাণীকে বধ কিংবা ব্যথিত না করাকে অহিংসা বলে। অহিংসা-অনুষ্ঠানে চিত্তে শুক্লধর্মের আবির্ভাব হয় এবং চিত্ত নির্মল হয়। (খ) যথাদৃষ্ট বা যথাজ্ঞাত বিষয়কে সেইরূপে প্রকাশ করার নাম সত্য। অপ্রিয় সত্য না বলিয়া প্রিয় ও হিতকর সত্য বলা উচিত। (গ) কোন বস্তু চুরি না করা বা অশাস্ত্রীয়ভাবে গ্রহণ না করার নাম অস্তেয়। (ঘ) উপস্থ বা জননেন্দ্রিয় সংযমের নাম ব্রহ্মচর্য। (ঙ) অনাবশ্যক ও উপভোগ্য বস্তুর অস্বীকরণের অর্থাৎ অগ্রহণের নাম অপরিগ্রহ।

(২) নিয়ম।

(২) নিয়ম পাঁচপ্রকার—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান। (ক) স্নানাদিদ্বারা বাহ্য অর্থাৎ স্থূল শরীরের শৌচ হয়। সৎচিন্তা ও মৈত্রীকরুণাদি ভাবনাদ্বারা অন্তঃশৌচ হয়। (খ) যথাযোগ্য চেষ্টাদ্বারা যাহা পাওয়া যায় তাহাতে তৃপ্ত থাকার নাম সন্তোষ। (গ) শীতাঞ্চ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সহ্য করাকে এবং কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রত পালন করাকে তপঃ বলে। (ঘ) উপনিষৎ গীতা প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়ন করাকে অথবা ওঁকার জপকে স্বাধ্যায় বলে। (ঙ) ঈশ্বরচিন্তা এবং ঈশ্বরে সর্ব কর্ম অর্পণ করার নাম ঈশ্বরপ্রণিধান। ঈশ্বরপ্রণিধানদ্বারা ঈশ্বরপ্রসাদে সর্বদা যোগযুক্ত হওয়া যায়। তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানকে একত্রে ক্রিয়াযোগ বলে।

(৩) আসন।

(৩) যোগাভ্যাস-কালে যেভাবে শরীরকে স্থির করিয়া অধিক ক্ষণ রাখিলে কষ্টবোধ হয় না, তাহাকে আসন বলে। আসন বহুপ্রকার—যথা পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিকাসন ইত্যাদি। এসব গুরু বা যোগীদের নিকট শিক্ষা করা উচিত। নিজে নিজে করিলে বিপদের আশঙ্কা আছে। দেহ ও মন সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্থির না হইলে যোগাভ্যাস করা যায় না। আসনের অনুষ্ঠানদ্বারা দেহ সুস্থ থাকে এবং মনেরও স্থৈর্য সম্পাদিত হয়।

(৪) প্রাণায়াম।

(৪) আসনসিদ্ধি হইলে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়। শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ অর্থাৎ গতিরোধ করাকে প্রাণায়াম বলে। বহিঃস্থ বায়ুকে শরীরে গ্রহণ করার নাম শ্বাস এবং শরীরস্থ বায়ুকে বাহিরে নিঃসরণ করার নাম প্রশ্বাস। শ্বাস ও প্রশ্বাসবায়ুর নিরোধকে প্রাণায়াম বলে। ইহা রেচক, পূরক ও কুম্ভক,

এই ত্রিবিধ হইতে পারে। প্রাণবায়ুকে বাহির করিয়া সেখানেই স্থির রাখাকে রেচক বলে। বাহিরের বায়ুকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া স্থির রাখার নাম পূরক। প্রাণবায়ুকে রুদ্ধ করার নাম কুম্ভক। এই তিন প্রকারেই প্রাণবায়ু স্থির হয় এবং তাহাতে মনও স্থির হয়। এরূপ হইলে দীর্ঘকাল নিবিষ্ট-চিত্তে ধ্যান করা যায়। সদ্‌গুরুর নিকট প্রাণায়াম শিক্ষা করা উচিত। গুরুর উপদেশ ব্যতীত নিজেই ঐ কার্য করিলে হৃদ্‌রোগাদি কষ্টকর পীড়া হইতে পারে।

(৫) প্রত্যাহার।

(৫) ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজ নিজ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া চিত্তের অনুগামী করার নাম প্রত্যাহার। চিত্ত শব্দাদি বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া চিত্তের অনুকরণ করে। অবশ্য চিত্ত বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ধ্যেয় বিষয় অবলম্বন করে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ কেবল বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, ধ্যেয়কে অবলম্বন করে না। ইহারা চিত্তের ন্যায় নিরুদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়গণকে স্বস্ববিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা অতি দুঃসাধ্য কর্ম, তবে ইহা অসাধ্য নয়। দৃঢ়সংকল্পসহকারে দীর্ঘকাল প্রযত্ন করিলে ইন্দ্রিয়নিরোধ করা যায়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পাঁচটিকে যোগের বহিরঙ্গ-সাধন বলে। পরবর্তী তিনটি সাধনকে যোগের অন্তরঙ্গ-সাধন বলে, কারণ ইহাদের সহিত যোগ বা সমাধির সাক্ষাৎসম্বন্ধ আছে। এখন এগুলির কথা বলা যাইবে।

(৬) ধারণা।

(৬) অপর বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া কোন এক বিষয়ে চিত্তকে স্থির করার নাম ধারণা। এই বিষয় দেহমধ্যস্থ নাভিচক্র, নাসিকার অগ্রভাগ, ভ্রূমধ্য প্রভৃতি অন্তর্বিষয় হইতে পারে, কিংবা দেবতামূর্তি প্রভৃতি বাহ্যবিষয় হইতে পারে।

(৭) ধ্যান।

(৭) পূর্বোক্ত যে বিষয়ে চিত্ত স্থির করা হয়, সেই বিষয়ে চিত্তবৃত্তির একতানতা অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন ভাবনাকে ধ্যান বলে। অথবা, যে বিষয়ে চিত্ত স্থির করা হয়, সেই বিষয়াকারে বারংবার চিত্তবৃত্তি হওয়াকে ধ্যান বলা যায়। ধারণার পরিণাম ধ্যান। বিষয়ান্তর হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ধ্যেয় বিষয়ে চিত্তকে স্থির করার নাম ধারণা, এইরূপে ধ্যেয় বিষয়ে যখন আপনা হইতেই বারংবার একভাবে চিত্তবৃত্তি হইতে থাকে এবং অন্য কোন বিষয়ে চিত্তবৃত্তি হয় না, তখন তাহাকে ধ্যান বলে।

(৮) সমাধি।

(৮) যোগের অষ্টম অঙ্গ সমাধি। কোন বিষয়ে দীর্ঘকাল ধ্যান করিলে যখন ধ্যান ধ্যেয়বস্তুর আকার ধারণ করে এবং তাহাতেই লীন হইয়া যায়, তখন তাহাকে সমাধি বলে। ধ্যানের পরিণাম সমাধি। 'আমি অমুক বিষয় চিন্তা করিতেছি' এই

CENTRAL LIBRARY

ভাবটি ধ্যানের অবস্থায় থাকে, সমাধিতে তাহা থাকে না। তখন যেন ধ্যেয় বস্তুমাত্র ভাসমান থাকে এবং বোধ হয় যেন চিত্তবৃত্তি নাই। ধ্যান ধ্যেয়, ধ্যান ও ধ্যাতা এই তিন আকারে ভাসমান হয়; এই তিন আকারে না থাকিয়া কেবল ধ্যেয়রূপেই ভাসমান হইলে ধ্যানকেই সমাধি বলে। দীর্ঘকাল যাবৎ সমাধির অভ্যাস হইলে প্রথমে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় এবং পরে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়, এবং ইহাকেই মুক্তি বলে। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যোগের অঙ্গরূপে যে সমাধির কথা বলা হইল উহা চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগ বা সমাধি নহে। উহা শেষোক্ত সমাধি লাভের উপায়মাত্র। এই দুইপ্রকার সমাধির প্রভেদ এই যে, যোগাঙ্গরূপ সমাধিতে কেবল ধ্যেয় বিষয়ের স্বরূপজ্ঞান হয়, কিন্তু সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সকল বিষয়ের স্বরূপজ্ঞান হয়, ইহাতে চিত্তে একটি অনির্বচনীয় শক্তির আবির্ভাব হয় এবং সকল বিষয়েরই সাক্ষাৎকার হয়। যোগের শেষোক্ত তিনটি অঙ্গকে অন্তরঙ্গ-সাধন বলে। একই বিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অভ্যাস করা উচিত। একটি বিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকে সংযম বলে। মিলিতভাবে ইহাদের অনুষ্ঠান করিলে যোগরূপ সমাধি হয়।

যোগলব্ধ অলৌকিক শক্তিসমূহ।

যোগাভ্যাস ও যোগসিদ্ধিদ্বারা যোগীদের অনেক প্রকার অলৌকিক শক্তি জন্মে। তাঁহারা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, দূরবর্তী, অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয় জানিতে পারেন। তাঁহারা ভূত ও ভৌতিক সকল পদার্থকে বশ করিতে পারেন, ইচ্ছামাত্রে সকল দ্রব্য পাইতে পারেন, দিব্য গন্ধস্পর্শাদি উৎপন্ন করিতে পারেন, আবদ্ধ দ্বার দিয়া গমন করিতে পারেন, এক সময়েই বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হইতে পারেন, অকস্মাৎ অদৃশ্য হইতে পারেন ইত্যাদি। এগুলিকে সিদ্ধি বলে। যোগাভ্যাস ও যোগসিদ্ধিদ্বারা এসব অলৌকিক শক্তি লাভ করা সম্ভব হইলেও যোগদর্শনে এগুলিকে প্রকৃত যোগের পরিপন্থী ও আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধকরূপে ত্যাজ্য বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। সিদ্ধির প্রলোভনে পতিত হইলে যোগী যোগভ্রষ্ট হন এবং আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া মোক্ষলাভে অসমর্থ হন। যোগের চরম উদ্দেশ্য হইল আত্মসাক্ষাৎকার ও মোক্ষপ্রাপ্তি। অতএব যোগী সিদ্ধির প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া স্থির চিত্তে যোগাভ্যাসপূর্বক মুক্তিপথে অগ্রসর হইবেন।

৫। যোগদর্শনে ঈশ্বরের স্থান

ঈশ্বর যোগের সহায় ও সৃষ্টিকর্তা।

যোগদর্শনে সাংখ্যদর্শনোক্ত পদার্থাবলী স্বীকৃত হইয়াছে। অধিকন্তু, সাংখ্যে অনঙ্গীকৃত ও প্রত্যাখ্যাত ঈশ্বর যোগদর্শনে অঙ্গীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছেন। যোগদর্শনে ঈশ্বরকে যোগসিদ্ধির সহায়রূপে এবং জগৎস্রষ্টা পরমপুরুষরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। যোগসূত্রে ঈশ্বরচিন্তা

ও ঈশ্বরোপাসনাদ্বারাও অচিরাৎ সমাধি ও তৎফললাভ হয় বলা হইয়াছে। অবশ্য যোগদর্শনে ঈশ্বরকে পুরুষ হইতে অতিরিক্ত কোন তত্ত্ব বলা হয় নাই। ঈশ্বর পুরুষতত্ত্বেরই এক তত্ত্ব, তিনি পরমপুরুষ, বা পুরুষবিশেষ অর্থাৎ বিলক্ষণ পুরুষ। এখন ঈশ্বরের বিশেষ লক্ষণ কি এবং তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

ঈশ্বরের লক্ষণ।

যোগদর্শনে ঈশ্বরকে অন্য সকল পুরুষ হইতে ভিন্ন এবং সর্বদোষ-বিনির্মুক্ত পরম পুরুষ বলা হইয়াছে। তিনি সকল ঐশ্বর্যশালী ও সত্যসংকল্প পুরুষ। তিনি নিত্য, বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্। জীবাত্মা মাত্রেই অবিদ্যা, অস্মিতা বা অহংকার, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ অর্থাৎ মৃত্যুভয় এই পঞ্চবিধ **ক্লেশের** অধীন। তাহারা ধর্ম ও অধর্ম **কর্মে** নিরত, কর্মের **বিপাক**-রূপ ফলের ভোক্তা, এবং তদনুকূল **আশয়** অর্থাৎ বাসনা পোষণ করে। অবশ্য মুক্ত পুরুষ বা জীবাত্মা ক্লেশকর্মাদির দ্বারা প্রপীড়িত হন না, তিনি এসব দোষবর্জিত হন। কিন্তু তাঁহাকেও নিত্যমুক্ত বলা যায় না, কারণ এককালে তাঁহারও বন্ধন ছিল এবং তিনি পরে দোষমুক্ত হইয়াছেন। কেবল ঈশ্বরই নিত্যমুক্ত পুরুষ, তিনি কোন কালে ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের দ্বারা সংস্পৃষ্ট হন না। যোগসূত্রে বলা হইয়াছে, 'ক্লেশকর্মবিপাকাশয়দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষের নাম ঈশ্বর'। তিনি পূর্ণজ্ঞানৈশ্বর্যের অধিকারী, তাঁহার সমতুল্য কোন জীব বা পুরুষ নাই। তিনি সংকল্পমাত্রে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ বিশ্ববিধাতা।

ঈশ্বরের প্রমাণ।

যোগদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে যেসব প্রমাণ পাওয়া যায় তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে বিবৃত হইল।

(১) বেদ, উপনিষৎ ও অন্যান্য শাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে স্পষ্ট উক্তি আছে। এসব শাস্ত্রে ঈশ্বরকে পরমাত্মা, পরমপুরুষ বা পরমতত্ত্ব বলা হইয়াছে, তিনি জগতের আদি, অন্ত ও পরাগতি একথা বলা হইয়াছে। অতএব শাস্ত্রমূলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্য।

(২) যেসব পদার্থের তারতম্য অর্থাৎ কমিবেশি আছে তাহা কোনও এক স্থানে নিরতিশয় হইবে। যেমন পরিমাণের তারতম্য দেখা যায়। একটি ছোট দ্রব্য হইতে আর একটি দ্রব্য বড়, তাহা হইতে অন্য একটি দ্রব্য আরও বড়। দ্রব্যসকলের পরিমাণের তারতম্য নিরতিশয় মহৎপরিমাণ আকাশে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছে। সেইরূপ বিভিন্ন পুরুষে জ্ঞানের তারতম্য দেখা যায়। এক ব্যক্তি অপেক্ষা অপর ব্যক্তি অধিক জ্ঞানবান্, তাহা অপেক্ষা অপর এক ব্যক্তি আরও অধিক জ্ঞানবান্। অতএব এমন এক ব্যক্তি বা পুরুষ আছেন, যাঁহাতে এই জ্ঞানের পরিসীমা হয় অর্থাৎ যাঁহার জ্ঞান নিরতিশয়।

CENTRAL LIBRARY

এই নিরতিশয়জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষই সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর। এইভাবে বিভিন্ন পদার্থে শক্তির তারতম্য দেখিয়া আমরা নিরতিশয়শক্তিসম্পন্ন পুরুষের অনুমান করিতে পারি, আর তিনিই হইবেন সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর। ঈশ্বর এক, কারণ একাধিক ঈশ্বর হইলে জগৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতভেদ হইতে পারে এবং তাহাতে জগতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে।

(৩) পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হইলে জগতের সৃষ্টি হয় এবং তাহাদের বিয়োগ হইলে প্রলয় হয়। পুরুষ ও প্রকৃতি দুইটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব, সংযোগ বা বিয়োগ তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম নহে। বিয়োগ তাহাদের স্বভাবগত ধর্ম হইলে সৃষ্টি হয় না, আর সংযোগ তাহাদের স্বভাবগত ধর্ম হইলে প্রলয় হয় না। অতএব পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ ও বিয়োগ সম্পাদন করিবার জন্য কোন শক্তিমান্ পুরুষের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়। জীবাত্মা তাহা করিতে পারে না, কারণ জীবাত্মা তাহার অদৃষ্টবশে জন্মমৃত্যুর অধীন হয় এবং সে তাহার অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। অতএব জীবসকলের অদৃষ্ট অনুসারে জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় সাধনের জন্য সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ ও বিয়োগ সম্পাদন করেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

ঈশ্বরপ্রসাদে যোগসিদ্ধি।

ঈশ্বরপ্রণিধান কেবল যোগসাধনের একটি অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ নহে। পরন্তু ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরে ভক্তিবিশেষ যোগসিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে অচিরাৎ সমাধিসিদ্ধি হয়। কারণ ঈশ্বর একটি সাধারণ ধ্যেয়বস্তু নয়। তিনি পরম ঐশ্বর্যসম্পন্ন পরমেশ্বর। যে যোগী ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণ করিয়া নিরন্তর ঈশ্বরের স্মরণ-মনন করেন, ঈশ্বরপ্রসাদে তাঁহার চিত্তের সকল মলিনতা অপগত হয়, তাঁহার সকল বাধাবিপত্তি দূর হয়। ঈশ্বর তাঁহার সহায় হন এবং তাঁহার যোগসিদ্ধির অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করেন। এরূপ যোগীর যোগসিদ্ধি ও মোক্ষলাভ আসন্ন বুঝিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরপ্রসাদে সবই সম্ভব হইলেও, যোগীকে ঈশ্বরপ্রসাদ লাভের যোগ্য হইতে হইবে। এজন্য তাঁহাকে যম-নিয়ম প্রভৃতি সাধন করিতে হইবে এবং ঈশ্বরে সমর্পিত ও সমাহিত চিত্তে অনুক্ষণ ঈশ্বরের ধ্যান ও উপাসনা করিতে হইবে।

CENTRAL LIBRARY

নবম অধ্যায়

মীমাংসাদর্শন

১। ভূমিকা

মীমাংসাদর্শন
জৈমিনিপ্রণীত

মীমাংসাদর্শন মহর্ষি জৈমিনিপ্রণীত। জৈমিনিরচিত **মীমাংসাসূত্র** মীমাংসাদর্শনের মূলগ্রন্থ। শবরস্বামী মীমাংসা-সূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার পরে মীমাংসা-দর্শনের যেসব ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকার আবির্ভূত হন, তন্মধ্যে কুমারিল ভট্ট এবং প্রভাকর সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহারা মীমাংসাদর্শনের দুইটি শাখার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের নাম অনুসারে ইহাদের নাম ভাট্টমীমাংসা ও প্রাভাকরমীমাংসা হইয়াছে। এইভাবে মীমাংসাদর্শনের ক্রমপরিণতি হয়।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, মীমাংসাদর্শন বেদের কর্মকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কর্মকাণ্ডের অর্থ-বিচারের উদ্দেশ্যে রচিত। ইহা বৈদিক ধর্ম বা ক্রিয়ার বিচারসঙ্গত ব্যাখ্যায় ও সমর্থনে নিয়োজিত। এজন্য ইহাকে পূর্বমীমাংসা, কর্মমীমাংসা ও ধর্মমীমাংসা নামেও অভিহিত করা হয়। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ সমর্থন করিবার জন্য মীমাংসাদর্শনে বেদের নিত্যত্ব ও অভ্রান্তত্ব, আত্মার লোকান্তরপ্রাপ্তি এবং স্বর্গে ধর্মকর্মের ফলভোগ, বর্তমান কর্মের কালান্তরে ফলপ্রসব করিবার শক্তি এবং জীবজগতের সত্যতা প্রভৃতি বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। মীমাংসাদর্শনের ব্যাখ্যাবসরে এইসব বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

২। মীমাংসাদর্শনে প্রমা ও প্রামাণ্য-বিচার

(১) প্রমা ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ

প্রমা দুই প্রকার—
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ।

মীমাংসামতে যে জ্ঞানে কোন অগৃহীত অর্থাৎ অবিজ্ঞাত বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহার নাম প্রমা। প্রমাজ্ঞান দুইপ্রকার—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষজ্ঞানে কোন সদ্‌বস্তু অনুভূত হয়। কোন সৎপদার্থ ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট হইলে প্রথমে ইহার অস্তিত্বমাত্র উপলব্ধ হয়, ইহা কোন্-জাতীয় বস্তু অথবা

কোন্-গুণধর্মবিশিষ্ট বস্তু তাহা জ্ঞাত হয় না। এরূপ অবিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞানকে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বা আলোচন-জ্ঞান বলে। তৎপরে বস্তুটি কি প্রকারের, ইহার জাতি, নাম ও গুণধর্ম কি তাহা জ্ঞাত হয়। এইরূপ গুণ-ধর্মবিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞানকে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে। একই বস্তুর প্রথমে নির্বিকল্পক ও পরে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়। বস্তুর গুণধর্ম বস্তুগত, উহারা আমাদের কল্পিত নয়। সবিকল্পক প্রত্যক্ষে যেসব গুণধর্মের উপলব্ধি হয়, তাহা নির্বিকল্পকে অস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। পূর্বে গুণধর্মের উপলব্ধি না হইলে, পরে বস্তুটি যে কোন্-গুণধর্মবিশিষ্ট তাহা জানা যায় না। যেমন কোন বস্তুকে একটি গৌরবর্ণ মানুষ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, পূর্বে 'ইহা মানুষ' ও 'ইহা গৌরবর্ণ' এরূপ প্রত্যক্ষ থাকা আবশ্যক। অতএব আমরা যেসব দ্রব্যকে যেরূপ গুণধর্মবিশিষ্ট বলিয়া প্রত্যক্ষ করি, তাহারা বাস্তবিক সেইরূপ গুণধর্মবিশিষ্ট সদ্‌বস্তু। এজন্য জাগতিক বস্তুসমূহকে এবং সমগ্র জগৎকে সৎপদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

নির্ব্বিকল্প ও সবিক প্রত্যক্ষ।

(২) পরোক্ষ জ্ঞান ও প্রমাণ

মীমাংসামতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত আরও পাঁচপ্রকার প্রমাণ আছে—যথা অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। অবশ্য কুমারিল ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মীমাংসা-দর্শন-শাখায় অনুপলব্ধিকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। প্রাভাকর-মীমাংসায় ইহা স্বীকৃত হয় নাই। অনুমান সম্বন্ধে মীমাংসকদের মত ন্যায়মতের অনুরূপ। পূর্বে ন্যায়মতের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এখানে অন্য প্রমাণ-গুলির আলোচনা করা যাইবে।

প্রাভাকরমতে পাঁচ এবং ভাট্টমতে ছয় প্রকার প্রমাণ।

(ক) উপমান

ন্যায়মতে উপমান একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। মীমাংসামতেও ইহা স্বতন্ত্র প্রমাণ। কিন্তু মীমাংসাদর্শনে উপমানের যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা ন্যায়মত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ন্যায়মত অনুসারে সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সম্বন্ধজ্ঞানের নাম উপমান। মীমাংসামতে অপ্রত্যক্ষীভূত বস্তুর সাদৃশ্যজ্ঞানের নাম উপমান। কোন পূর্বদৃষ্ট স্মর্যমাণ বস্তুতে কোন দৃশ্যমান বস্তুর সাদৃশ্যজ্ঞানকে উপমান বলে। দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টি বুঝান যায়। কোন ব্যক্তি গৃহে গো দর্শন করিয়াছেন। কালান্তরে তিনি অরণ্যে গমন করিয়া

উপমান—অদৃষ্ট বস্তুর সাদৃশ্যজ্ঞান।

CENTRAL LIBRARY

একটি গবয় দর্শন করিলেন। তাহাতে তাঁহার প্রত্যক্ষ হইল যে, দৃষ্ট গবয় গৃহস্থ গোসদৃশ। তৎপরে তাঁহার গৃহস্থিত গোর স্মরণ হইল এবং তিনি জানিলেন যে, গৃহে দৃষ্ট এবং অধুনা স্মৃত গো এই গবয়ের সদৃশ। শেষোক্ত সাদৃশ্যজ্ঞান অর্থাৎ গৃহে দৃষ্ট গো গবয়ের সদৃশ এই জ্ঞানই উপমান। এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা যায় না, কারণ তখন যে গোর সাদৃশ্যজ্ঞান হয় তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। ইহাকে স্মৃতি বলা যায় না, কারণ পূর্বে গোর প্রত্যক্ষ হইলেও তাহার সাদৃশ্যের প্রত্যক্ষ হয় না এবং পূর্বে যাহার প্রত্যক্ষ হয় না তাহার স্মরণ হইতে পারে না। ইহাকে অনুমানও বলা যায় না, কারণ অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞানসাপেক্ষ, কিন্তু এখানে 'এক বস্তু অপর বস্তুর সদৃশ হইলে, অপর বস্তু প্রথম বস্তুর সদৃশ হয়' এমন কোন ব্যাপ্তিনিয়ম প্রয়োগ না করিয়াই গোতে গবয়সাদৃশ্য জ্ঞাত হয়। এরূপ সাদৃশ্যজ্ঞান স্পষ্টতঃ শব্দজন্য জ্ঞান নহে। অতএব ইহাকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

উপমান সম্বন্ধে ন্যায়মত যুক্তিসহ নহে।

মীমাংসকদের মতে ন্যায়সম্মত উপমান স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে। ন্যায়মতে কোন আপ্তপুরুষের নিকট 'গবয় গোসদৃশ' এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কোন ব্যক্তির অরণ্যে গবয় দর্শনানন্তর তাহাতে যে গবয়জ্ঞান হয়, তাহার নাম উপমান। মীমাংসকেরা বলেন যে, গবয়ে গোসাদৃশ্যজ্ঞান প্রত্যক্ষলব্ধ এবং গোসদৃশ পশু যে গবয়পদবাচ্য তাহা পূর্বশ্রুত আপ্তবাক্যের স্মরণমাত্র। পরিশেষে সম্মুখস্থ পশুটি যে গবয় তাহা আপ্তবাক্য হইতে অনুমিত হয়। অতএব নৈয়ায়িকেরা যাহাকে উপমান বলেন, তাহা স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে।

শবরমতে উপমান।

এখানে একথা বলা উচিত যে, পরকালীন মীমাংসকগণ উপমানের পূর্বোল্লিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু শবরস্বামীর ব্যাখ্যামতে উপমান পাশ্চাত্য তর্ক-শাস্ত্রে বর্ণিত সাদৃশ্যমূলক অনুমানের (analogical argument) তুল্য। তাঁহার মতে যে উপমানদ্বারা আমরা পরকীয় আত্মার অস্তিত্ব অবগত হই তাহা এইরূপ: যেমন কেহ নিজ আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করে, সেইরূপ আত্মোপমাদ্বারা অপরে তাহার আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে। এরূপ হইলে কোন দৃষ্টবস্তুর সহিত সাদৃশ্যবশতঃ কোন অদৃষ্ট বস্তুর জ্ঞানকে উপমান বলিতে হয় এবং তাহাই পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রের সাদৃশ্যমূলক অনুমান।

(খ) শব্দ

যে বাক্যের অর্থবোধদ্বারা পদার্থবিষয়ে জ্ঞান হয় তাহার নাম শব্দপ্রমাণ। শব্দ দুইপ্রকার—পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয়। কোন আপ্তপুরুষের বাক্যকে পৌরুষেয় বলে। বেদবাক্য অপৌরুষেয়। আর একভাবে শব্দ দুইপ্রকার—সিদ্ধার্থবাক্য ও বিধায়কবাক্য। সিদ্ধ অর্থাৎ বিদ্যমান বিষয়ে বাক্যকে সিদ্ধার্থবাক্য বলে। কোন কর্তব্য বিষয়ে বাক্যকে বিধায়কবাক্য বলে। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব এবং বিধায়কবাক্যের প্রাধান্য মীমাংসাদর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। বেদ বিবিধ যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিধিনির্দেশ করে বলিয়াই প্রামাণিক শাস্ত্ররূপে গণ্য। ইহাতে যেসব সিদ্ধার্থবাক্য আছে, সেগুলিও বিধায়কবাক্যের পরিপোষক বলিয়া প্রামাণিকরূপে বিবেচিত হইবার যোগ্য। তদ্ব্যতীত তাহাদের কোন প্রামাণ্য নাই। মীমাংসাদর্শনের এই মত পাশ্চাত্ত্য দর্শনের কার্যকারিতাবাদের (pragmatism) অনুরূপ। কার্যকারিতাবাদ অনুসারে সকলপ্রকার জ্ঞানের মূল্য তাহার কার্যকারিতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। এ হিসাবে মীমাংসাদর্শনকে যাজ্ঞিক কার্যকারিতাবাদ (ritualistic pragmatism) বলা যায়, কারণ ইহার মতে যজ্ঞার্থেই বৈদিক জ্ঞানের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়।

শব্দের লক্ষণ ও প্রকারভেদ।

অধিকাংশ বৈদিক দর্শনের মতে বেদ ঈশ্বরপ্রণীত। কিন্তু মীমাংসামতে জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরই নাই এবং বেদ নিত্য, কোন পুরুষ কর্তৃক রচিত নয়। বেদের নিত্যত্বের প্রমাণ এই যে, ইহার কোন রচয়িতার সন্ধান বা নাম কেহ জানে না। ইহার কোন রচয়িতা থাকিলে তাঁহার নাম অবশ্য সম্প্রদায়পরম্পরায় জানা যাইত। বৈদিক মন্ত্রের সহিত যেসব ঋষির নামের উল্লেখ দেখা যায়, তাঁহারা মন্ত্রের দ্রষ্টা ও প্রকাশয়িতামাত্র, উহার রচয়িতা বা প্রণেতা নয়। অতএব বেদকে অপৌরুষেয় বাক্য বলিতে হইবে।

বেদ নিত্য অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত।

কিন্তু বাক্য পদ বা শব্দের সমষ্টি এবং শব্দ অনিত্য। এরূপ হইলে বেদকেই অনিত্য বলিতে হয়। এই বিপ্রতিপত্তির খণ্ডনে মীমাংসকগণ বলেন যে শব্দ নিত্য। শব্দ দুইপ্রকার—ধ্বনি ও বর্ণ। ধ্বনি শ্রুত ও অনিত্য শব্দ। কিন্তু বর্ণ নিরবয়ব (partless) ও অজাত (uncaused) শব্দ। অতএব বর্ণাত্মক শব্দ নিত্য। পদ (word) বলিতে বাস্তবিক পক্ষে এরূপ বর্ণ বুঝায়। যেসব পদ আমরা শ্রবণ করি তাহা বাস্তবিক পদ নয়, তাহারা পদকে প্রকাশ করে মাত্র। যেমন 'ক্' বর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক উচ্চারিত হইলে বিভিন্ন শব্দ বা ধ্বনি উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিভিন্ন ধ্বনিদ্বারা একই 'ক্' বর্ণ উচ্চারিত বা

CENTRAL LIBRARY

প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন ক্‌-শব্দে একই 'ক্‌' বর্ণ উচ্চারিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, 'ক্‌' বর্ণ দেশে ও কালে উৎপন্ন নহে, উহা দেশ-কালের অতীত ও নিত্য। বৈদিক শব্দ এরূপ বর্ণাত্মক পদ। অতএব বেদকে নিত্যই বলিতে হইবে।

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে আর একটি প্রমাণ এইরূপ। বেদে কোন কোন যজ্ঞের ফল স্বর্গাদিলাভ বলা হইয়াছে। কিন্তু যজ্ঞের সহিত স্বর্গলাভের সম্বন্ধ কেহ প্রত্যক্ষ করেন নাই। অতএব বেদ কোন পুরুষ কর্তৃক রচিত নয় বলিতে হইবে। বেদ কোন পুরুষ কর্তৃক রচিত না হওয়ায়, উহাকে ভ্রমপ্রমাদাদি পৌরুষেয় দোষ স্পর্শ করে না। এবংবিধায় বেদকে অভ্রান্ত জ্ঞানের আকর বলিতে হইবে।

পৌরুষেয় আপ্তবাক্যও শব্দপ্রমাণ।

অপৌরুষেয় বৈদিক বাক্য ব্যতীত পৌরুষেয় আপ্তবাক্যকেও শব্দপ্রমাণ বলিয়া ভাট্টমীমাংসকগণ স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহাদের মতেও ধর্মসম্বন্ধে কেবল বৈদিক বাক্যই প্রমাণরূপে গণ্য হইবার যোগ্য, কারণ ধর্মসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতির দ্বারা কোন জ্ঞানলাভ করা যায় না। পৌরুষেয় বাক্য হইতে যে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহা প্রত্যক্ষ ও অনুমানমূলক এবং তাহা প্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু বেদবাক্য হইতে যে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহা অন্য প্রমাণনিরপেক্ষ এবং অন্য প্রমাণ হইতে অপ্রাপ্তব্য। কিন্তু প্রাভাকরমতে পৌরুষেয় বাক্য স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে, ইহার প্রামাণ্য আপ্তপ্রামাণ্য হইতে অনুমিত হয়। কেহ কেহ বৈশেষিকদের মত পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয় সকল শব্দপ্রমাণকেই অনুমানে পর্যবসিত করিয়াছেন, তাঁহারা শব্দের প্রামাণ্য আপ্তপ্রামাণ্য হইতে অনুমিত হয় বলিয়া থাকেন। তদুত্তরে মীমাংসকগণ বলেন যে, সব জ্ঞানই স্বতঃপ্রমাণ অর্থাৎ জ্ঞানের উৎপত্তির হেতু হইতেই উহার প্রামাণ্যের উৎপত্তি হয়। অতএব সকল জ্ঞানের ন্যায় শব্দজন্য জ্ঞানও স্বতঃপ্রমাণ হইবে। এই মতের প্রতিপাদক হেতুগুলির আলোচনা পরে করা যাইবে।

(গ) অর্থাপত্তি

অর্থাপত্তির লক্ষণ।

যে অদৃষ্ট বিষয় কল্পনা না করিলে কোন একটি অবোধ্য বিষয় বুঝা যায় না, তাহার কল্পনার নাম অর্থাপত্তি। যেমন কোন ব্যক্তি দিবসে ভোজন করে না, অথচ তাহার শরীর স্থূল। ইহা কিরূপে হইতে পারে তাহা বুঝা যায় না। এই বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে অবোধ্য মনে হয় এবং আমরা তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হই। ঐ ব্যক্তি যখন দিনে ভোজন করে না, তখন রাত্রিতে

নিশ্চয়ই ভোজন করে, নতুবা স্থূল থাকিত না, কৃশ হইয়া যাইত। এরূপ রাত্রি-ভোজন-কল্পনাদ্বারাই আমরা তাহার স্থূলত্ব বুঝিতে পারি। কিন্তু আমরা তাহাকে রাত্রিতে ভোজন করিতে দেখি নাই। সুতরাং এখানে কোন অদৃষ্ট বিষয় কল্পনা করিয়া আমরা কোন আপাত-অবোধ্য বিষয় বুঝি অর্থাৎ তাহার ব্যাখ্যা করি। এই কল্পনার নাম অর্থাপত্তি। এখানে ঐ ব্যক্তির দিবা-ভোজনের অভাবসহ স্থূলত্ব নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত বা প্রমিত। এই প্রমিত অর্থ বা বিষয় অন্য একটি অর্থ বা বিষয়ের (এখানে রাত্রি-ভোজনের) কল্পনা না করিলে উপপন্ন হয় না। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, যে অর্থান্তর কল্পনা না করিলে কোন প্রমিত অর্থ উপপন্ন হয় না, সেই অর্থান্তরের কল্পনার নাম অর্থাপত্তি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বহু স্থলে অর্থাপত্তির প্রয়োগ দেখা যায়। কোন জীবিত বন্ধুর গৃহে গমন করিয়া দেখিলাম যে, সে গৃহে নাই। জীবিত ব্যক্তির গৃহে অভাব দেখিলে যে বিসংবাদের সৃষ্টি হয়, তাহা দূর করিবার জন্য গৃহের বহির্দেশে তাহার অবস্থিতির পরিকল্পনা করিতে হয়। এরূপ কল্পনার নাম অর্থাপত্তি।

অর্থাপত্তি দুই প্রকার
দৃষ্ট ও শ্রুত।

অর্থাপত্তি দুইপ্রকার—দৃষ্টার্থাপত্তি ও শ্রুতার্থাপত্তি। যেখানে কোন দৃষ্ট বিষয় উপপাদন করিবার জন্য অন্য কোন অর্থের বা বিষয়ের কল্পনা করা হয়, তাহাকে দৃষ্টার্থাপত্তি বলে। উপরে উল্লিখিত দৃষ্টান্ত দুইটি দৃষ্টার্থাপত্তির উদাহরণ। যেখানে কোন শ্রুত পদ বা শব্দের অর্থ বুঝিবার জন্য কোন অর্থের কল্পনা করা হয়, তাহার নাম শ্রুতার্থাপত্তি। যেমন দুই ব্যক্তির কথোপকথনকালে একজন বলিলেন, 'বন্ধ কর'। এখানে অর্থাপত্তিদ্বারা আমরা 'কথা' বা 'মুখ' এরূপ কোন শব্দের কল্পনা করি। আবার কেহ বলিলেন, 'তিনি গঙ্গায় বাস করেন'। এখানে আমরা গঙ্গা-শব্দদ্বারা গঙ্গার স্রোত না বুঝিয়া গঙ্গার তীর বুঝি।

অর্থাপত্তি স্বতন্ত্র প্রমাণ।

অর্থাপত্তি প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দপ্রমাণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহা স্পষ্টতঃ উপমান ও শব্দ হইতে ভিন্ন। ইহা প্রত্যক্ষও নহে, কারণ ইহাতে দৃষ্টবস্তু হইতে অদৃষ্ট অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষীভূত বিষয়ের জ্ঞান হয়, স্থূল ব্যক্তির রাত্রিভোজন অথবা গৃহে অনুপস্থিত ব্যক্তির বহির্ভাব আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না। অর্থাপত্তিকে অনুমানও বলা যায় না। অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞানসাপেক্ষ। কিন্তু অর্থাপত্তি ব্যাপ্তিসাপেক্ষ নহে। ধূম হইতে বহ্নির অনুমানস্থলে আমরা বলিতে পারি যে, যেখানে ধূম আছে সেখানেই বহ্নি আছে। কিন্তু এখানে আমরা বলিতে পারি না যে, যেখানে স্থূলত্ব আছে সেখানেই রাত্রি-ভোজন আছে, অথবা যেখানে কোন ব্যক্তির গৃহে অভাব আছে সেখানেই তাহার বহির্ভাব আছে,

অর্থাৎ ইহাদের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে। আরও এককথা, অনুমানে আমরা কোন নিশ্চিত হেতু হইতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হই। পক্ষান্তরে, অর্থাপত্তিতে কোন নিশ্চিত ফল বা বিষয় হইতে তাহার উপপাদক হেতুর কল্পনা করি।

(ঘ) অনুপলব্ধি

অনুপলব্ধির লক্ষণ। ইহা স্বতন্ত্র প্রমাণ।

ভাট্টমীমাংসা ও অদ্বৈত বেদান্তমতে কোন বস্তুর অভাবের সাক্ষাৎ প্রতীতির করণকে অনুপলব্ধি প্রমাণ বলে। আমার সম্মুখস্থ ভূতলে আমি কোন ঘটের অভাব কিরূপে জানি? প্রত্যক্ষদ্বারা আমি ইহা জানিতে পারি না। কেবল সদ্‌বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইতে পারে, অভাব অসদ্‌বস্তু হওয়ায় ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট হইতে পারে না, কারণ অভাব ভাবপদার্থের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের উপর কোন ক্রিয়া করিতে পারে না। অতএব সম্মুখস্থ ভূতলের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইয়া তাহার প্রত্যক্ষ হইলেও, তাহাতে ঘটাভাবের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষও হয় না এবং তাহার প্রত্যক্ষও হয় না। ভাট্টমীমাংসক ও অদ্বৈতবেদান্তীদের মতে ভূতলে ঘটের প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়াই আমরা তাহার অভাব জানি, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অভাব বা অনুপলব্ধিদ্বারা অভাবের সাক্ষাৎ প্রতীতি হয়। এখানে একথা বলা যায় না যে, আমরা প্রত্যক্ষের অভাব হইতে ঘটের অভাব অনুমান করি। কারণ অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞানসাপেক্ষ। ঘটাভাবের অনুমানে 'যেখানে প্রত্যক্ষের অভাব আছে সেখানেই বস্তুর অভাব আছে' এরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকা আবশ্যক। কিন্তু এরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে হইলে প্রত্যক্ষের অভাবের সহিত বস্তুর অভাবের নিয়তসম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, যেমন ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তিসম্বন্ধ জানিতে হইলে পূর্বে ধূম ও বহ্নির নিয়তসম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিতে হয়। এখন দেখা যাইতেছে যে, অভাবের অনুমানে পূর্বেই অভাবের কোনরূপে সাক্ষাৎ প্রতীতি স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব অনুমানদ্বারা অভাবের প্রতীতি উপপন্ন হয় না বলিতে হইবে। অবশ্য কোন কোন স্থলে অনুমানদ্বারা অভাবের জ্ঞান হইতে পারে, যেমন সন্ধ্যাকালে কোন গৃহে আলোক না দেখিয়া আমরা অনুমান করি যে, গৃহস্বামী এখন বাটীতে নাই অর্থাৎ এখন বাটীতে তাঁহার অভাব আছে। কিন্তু অভাবের সাক্ষাৎ প্রতীতিস্থলে অর্থাৎ যে অভাবজ্ঞান অনুমান বা ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য নহে, সেস্থলে প্রত্যক্ষের অভাব বা অনুপলব্ধিকেই অভাব অনুভবের করণ বলিতে হইবে। গৃহে আলোকের অভাব আলোকের অনুপলব্ধিদ্বারাই অনুভূত বা সাক্ষাৎভাবে প্রতীত হয়। অভাবের সাক্ষাৎ

প্রতীতি যে উপমান বা শব্দজন্য-জ্ঞান নহে তাহা সহজেই বুঝা যায়, কারণ এখানে সাদৃশ্যজ্ঞান বা বাক্যার্থজ্ঞানের কোন কথা নাই। অতএব অভাবের সাক্ষাৎপ্রতীতির করণরূপে অনুপলব্ধিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

এখানে আর একটি কথা বলা উচিত। সকলপ্রকার অনুপলব্ধিদ্বারা অনুপলব্ধ বস্তুর অভাব প্রমাণিত হয় না। অন্ধকার ঘরে আমরা ঘটপট দেখিতে পাই না, অথবা পরমাণু, আকাশ, ধর্মাধর্ম প্রভৃতি অতীন্দ্রিয়দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু তজ্জন্য আমরা ঘরে ঘটপট নাই অথবা পরমাণু প্রভৃতি নাই একথা বলিতে পারি না অর্থাৎ ইহাদের অভাব নির্ণয় করিতে পারি না। যে দেশে ও যে কালে অর্থাৎ যে অবস্থায় যে সদ্‌বস্তু বিদ্যমান থাকিলে প্রত্যক্ষীভূত হইত, কেবল সেই অবস্থায় সেই বস্তুর অনুপলব্ধি তাহার অভাব প্রমাণিত করে। এইরূপ অনুপলব্ধিকে যোগ্যানুপলব্ধি বলে। অতএব যোগ্যানুপলব্ধিকেই অভাব অনুভবের করণ বলিতে হইবে।

যোগ্যানুপলব্ধি অভাব অনুভবের করণ।

(৩) জ্ঞানর প্রামাণ্য

জ্ঞানের কারণসামগ্রী দুষ্ট না হইলে তজ্জন্য জ্ঞান যথার্থ হয় এবং তাহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ হয় না। যেমন প্রকাশ্য দিবালোকে কোন নিকটস্থ বস্তু আমাদের সুস্থ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকৃষ্ট হইলে, তাহার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয়; কোন ব্যক্তির বাক্য শ্রবণ করিলে, আমাদের শ্রুত বিষয়ের জ্ঞান হয়; দুইটি বস্তুর ব্যাপ্তিসম্বন্ধ জানিলে আমরা একটি হইতে অপরটির অনুমান করি। এসব স্থলে জ্ঞানের কারণসামগ্রীতে কোন দোষ না থাকায় যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা যথার্থই হয় এবং আমরা তাহার যাথার্থ্য পরীক্ষা না করিয়াই তদনুসারে কার্য করিয়া সফলকাম হই। অবশ্য যেস্থলে কারণসামগ্রী দুষ্ট হয় (যেমন চক্ষুর পাণ্ডুরোগ, আলোকের অভাব, দুষ্টহেতু ইত্যাদি) সেস্থলে কোন জ্ঞানই হয় না এবং কোন প্রত্যয়ও হয় না, কেবল সন্দেহই জন্মে। এইসব দৃষ্টে মীমাংসকগণ দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে কারণসামগ্রী হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা হইতেই জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও উৎপত্তি হয়, সেজন্য অন্য কোন কারণ অপেক্ষিত নয়। তাঁহাদের মতে জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃই জ্ঞাত হয়, অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান হইলেই তাহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যয়ও হয়, এজন্য

স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ।

CENTRAL LIBRARY

আমাদিগকে অনুমান বা অন্য কোন প্রমাণদ্বারা কোন পরীক্ষা করিতে হয় না। যদি কোন অনুমানদ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হয়, তবে সেই অনুমানের প্রামাণ্যও অন্য অনুমানদ্বারা নিশ্চয় করিতে হইবে এবং তাহাতে অনবস্থা দোষ হইবে। অতএব জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃউৎপন্ন ও স্বতঃজ্ঞাত হয় বলিতে হইবে। মীমাংসকদের এই মতকে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ বলে।

পরতঃ অপ্রামাণ্যবাদ।

কিন্তু মীমাংসকদের মতে জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ হইলেও, ইহার অপ্রামাণ্য স্বতঃ নহে। কখন কখন কারণসামগ্রীর দোষবশতঃ ভ্রমজ্ঞান হয় অর্থাৎ জ্ঞানের কারণসামগ্রীর অতিরিক্ত কারণ যে ইহার দোষ, তাহা হইতে অপ্রামাণ্যের উৎপত্তি হয়। কোন জ্ঞান যে অপ্রমাণ বা ভ্রান্ত তাহা আমরা ইহার কারণদোষ হইতে অনুমান করি, অর্থাৎ জ্ঞানের অপ্রামাণ্য অনুমানদ্বারা নির্ণীত হয়। অতএব বলিতে হয় যে, জ্ঞানকারণের অতিরিক্ত কারণ হইতে অপ্রামাণ্য উৎপন্ন হয় এবং জ্ঞাত বা নির্ণীত হয়। মীমাংসকদের এই মতকে পরতঃঅপ্রামাণ্যবাদ বলে।

নৈয়ায়িকদের পরতঃ প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যবাদ।

ন্যায়মতে প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য উভয়ই জ্ঞানের কারণের অতিরিক্ত কারণ হইতে উৎপন্ন এবং জ্ঞাত হয়। এই মত অনুসারে জ্ঞানের কারণসামগ্রীর গুণবশতঃ প্রামাণ্যের উৎপত্তি হয় এবং উহার দোষবশতঃ অপ্রামাণ্যের উৎপত্তি হয়। যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সুস্থতা, আলোকের যথেষ্ট প্রকাশ, যথেষ্ট ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ প্রভৃতি হইলে, যথার্থ প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়; আবার ইন্দ্রিয়ের পীড়া প্রভৃতি হইলে ভ্রমপ্রত্যক্ষ হয়। অতএব প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য উভয়ই জ্ঞানের কারণের অতিরিক্ত কারণ হইতে উৎপন্ন হয় বলিতে হয়। সেইরূপ জ্ঞানের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য জ্ঞানের অতিরিক্ত কারণদ্বারা জ্ঞাত বা নির্ণীত হয়। যে জ্ঞানদ্বারা প্রবৃত্তি সফল হয় তাহা যথার্থ, আর যে জ্ঞানদ্বারা প্রবৃত্তি বিফল হয় তাহা অযথার্থ। অতএব জ্ঞানের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য জ্ঞানাতিরিক্ত অনুমানদ্বারা নির্ণীত হয়। নৈয়ায়িকদের এই মতকে পরতঃ-প্রামাণ্য-ও অপ্রামাণ্যবাদ বলে। মীমাংসকগণ নৈয়ায়িকদের পরতঃপ্রামাণ্যবাদ খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারাও নৈয়ায়িকদের ন্যায় পরতঃ-অপ্রামাণ্যবাদী।

৩। মীমাংসাদর্শনে জগৎপ্রপঞ্চ

জগৎপ্রপঞ্চ সৎ অসৎ বা মিথ্যা নহে।

মীমাংসামতে জগৎপ্রপঞ্চ সৎ, ইহা অসৎ বা মিথ্যা নহে। জগৎ এবং জাগতিক বস্তুর সত্যতা প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণসিদ্ধ। বৌদ্ধ দার্শনিকদের শূন্যবাদ ও ক্ষণ-ভঙ্গবাদ এবং অদ্বৈতবেদান্তের জগৎ-মিথ্যাত্ববাদ মীমাংসাদর্শনে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। মীমাংসামতে আমাদের প্রত্যক্ষীভূত

CENTRAL LIBRARY

সকল বস্তুই সত্য। তদ্ব্যতীত অনুমানাদি প্রমাণমূলে আত্মা, স্বর্গ, নরক ও দেবতাদের অস্তিত্ব মীমাংসাদর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে। আত্মা নিত্য দ্রব্য। যে সকল জড়ভূতের সংযোগে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাও নিত্য দ্রব্য। কর্ম-নিয়ম অনুসারেই জাগতিক বস্তুসকলের উৎপত্তি হইয়াছে। জগৎ আত্মার ভোগায়তন শরীর, ভোগসাধন ইন্দ্রিয় ও ভোগ্যবস্তু সকলের সমষ্টি। জগৎ সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের কল্পনা অনাবশ্যক। কোন কোন মীমাংসক বৈশেষিকদের ন্যায় পরমাণুকারণবাদ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বৈশেষিকদের মত তাঁহারা ঈশ্বরকে পরমাণু-সংযোগের কর্তা বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে স্বয়ংক্রিয় কর্ম-নিয়মদ্বারাই পরমাণুসকলের সংযোগ নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রকৃতপক্ষে জগতের সৃষ্টিও হয় না আর নিরন্বয় বা সম্পূর্ণ ধ্বংসও হয় না। মীমাংসাদর্শনের এই মত ভারতীয় দর্শনের অন্যত্র দৃষ্ট হয় না।

৪। শক্তি ও অপূর্ববাদ

শক্তির পদার্থান্তরত্ব স্থাপন।

কার্যকারণসম্বন্ধবিচার অবসরে মীমাংসকগণ শক্তিকে পদার্থান্তর বলিয়া উপপাদন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বীজে কোনরূপ শক্তি নিহিত থাকে বলিয়া উহা অঙ্কুর উৎপাদন করিতে পারে। অগ্নিসংযোগে ঐ শক্তি নষ্ট হইলে, বীজ হইতে আর অঙ্কুর জন্মে না। সেইরূপ অগ্নিতে দাহিকা-শক্তি, আলোকে প্রকাশ-শক্তি এবং পদসকলে অর্থবোধ করাইবার শক্তি আছে। এইরূপ অপ্রত্যক্ষ শক্তি স্বীকার করিবার কারণ এই যে, কোন কোন স্থলে কারণ থাকিলেও কার্যের উৎপত্তি হয় না, যেমন কখন কখন বীজ হইতে অঙ্কুর হয় না। ইহার হেতু এই যে, কারণ বর্তমান থাকিলেও উহার কার্যজননশক্তি বাধাপ্রাপ্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

নৈয়ায়িকেরা শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে কারণে কোন শক্তি স্বীকার না করিলেও কারণ হইতে কার্যের অনুৎপত্তি বুঝা যাইতে পারে। যখন কোন কারণ কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন উহা হইতে কার্যের উৎপত্তি হয় না, বাধামুক্ত কারণ কার্য উৎপন্ন করে। এখানে মীমাংসকগণ বলেন যে, যদি কারণদ্রব্যের অতিরিক্ত কোন পদার্থ স্বীকারই করিতে হয়, তবে অভাবাত্মক পদার্থ (বাধার অভাব) স্বীকার না করিয়া, ভাবাত্মক শক্তি স্বীকার করাই উত্তম। কার্য একটি ভাবপদার্থ, তাহার উৎপত্তির জন্য কারণদ্রব্যে কোন ভাবপদার্থ (শক্তি) স্বীকার করা উচিত। কার্যের অনুৎপত্তিরূপ অভাব শক্তির বাধারূপ বা ধ্বংসরূপ অভাব পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়।

CENTRAL LIBRARY

মীমাংসকগণ শক্তিবাদের মূলে 'অপূর্ব'-নামক কর্মফলপ্রসবিনী শক্তির অস্তিত্ব উপপাদন করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি ইহলোকে যাগযজ্ঞাদি কর্ম সম্পাদন করিলে তাহার ফলে পরলোকে এবং পরকালে স্বর্গলাভ করেন। কিন্তু যাগযজ্ঞ বহুকাল পূর্বে সম্পাদিত ও নিষ্পন্ন হইয়া কিরূপে এতকাল পরে ফল প্রসব করে? মীমাংসকগণ বলেন যে, যাগযজ্ঞ করিলে যজ্ঞকারীর আত্মায় একপ্রকার অপ্রত্যক্ষ শক্তি জন্মে। সেই শক্তির নাম 'অপূর্ব'। ইহা যজ্ঞকারীর আত্মায় থাকিয়া যায় এবং যথাকালে স্বর্গরূপ ফল প্রসব করে। এইরূপে আমাদের অতীত কর্মও বর্তমানে ফল উৎপাদন করে। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, মীমাংসার অপূর্ববাদ ব্যাপক ও সর্বগত কর্ম ও কর্মফল-নিয়মের অন্তর্গত। কর্ম-নিয়ম যজ্ঞাদি কর্ম এবং অন্য সকল কর্মেই প্রয়োজ্য।

অপূর্বের অস্তিত্ব উপপাদন।

৫। মীমাংসাদর্শনে আত্মবাদ

আত্মা সম্বন্ধে মীমাংসাদর্শনের মত ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের মতের অনুরূপ। আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের অতিরিক্ত দ্রব্য। ইহা নিত্য ও সর্বব্যাপী। ইহা দেহ হইতে ভিন্ন হইলেও সংসার-দশায় দেহবিশিষ্ট হয় এবং নিজ কর্মফল ভোগের জন্য দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। চৈতন্য আত্মার স্বরূপ বা স্বরূপগত গুণও নহে। পরন্তু ইহা আত্মার একটি আগন্তুক গুণ। আত্মা মনের সহিত, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত এবং ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে, তবে আত্মার চৈতন্য-গুণের উৎপত্তি হয়। সুষুপ্তিকালে এবং মোক্ষদশায় এরূপ সম্বন্ধ না থাকায় আত্মার চৈতন্যও থাকে না, উহা অচেতন দ্রব্যরূপে অবস্থান করে। ভিন্ন ভিন্ন জীবদেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বর্তমান। আত্মা সংসারে বদ্ধ হয় এবং তাহার বন্ধন হইতে মুক্তিও হইয়া থাকে। এসব বিষয়ে মীমাংসা-দর্শনে যেসকল যুক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা অন্যান্য দর্শন-আলোচনাবসরে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

আত্মার লক্ষণ।

কিন্তু আত্মার উপলব্ধি সম্বন্ধে ভাট্টমীমাংসক ও প্রাভাকর-মীমাংসকদের যে মতভেদ আছে তাহা উল্লেখযোগ্য। ভাট্টমতে প্রতিবিষয়-উপলব্ধির সঙ্গে আত্মার উপলব্ধি হয় না, অর্থাৎ যখনই কোন বিষয়ের উপলব্ধি হয় তখনই আত্মার উপলব্ধি হয় না। আত্মা মানস অহংপ্রত্যয়গম্য, অর্থাৎ যখন মনে অহংপ্রত্যয় হয় তখনই আত্মা তাহার বিষয়রূপে জ্ঞাত হয়। এই মতের

আত্মা অহংপ্রত্যয়গম্য।

CENTRAL LIBRARY

বিরুদ্ধে প্রাভাকর-মীমাংসকদের আপত্তি এই যে, আত্মা জ্ঞাতা, ইহা কখন জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। একই বস্তু কর্তা ও কর্ম হইতে পারে না, যেমন একই অন্ন খাদ্য ও খাদক হইতে পারে না। প্রাভাকর-মীমাংসামতে প্রত্যেক বিষয়-উপলব্ধির সঙ্গে আত্মা বিষয়ী বা জ্ঞাতারূপে প্রকাশিত হয়, যেমন একটি ঘট জানিবার সময় 'আমি ঘট জানিতেছি' এরূপ প্রত্যয় হয়। বিষয়ের জ্ঞানের সমকালে বিষয়ী আত্মার উপলব্ধি না হইলে, আমার জ্ঞান এবং অপর ব্যক্তির জ্ঞানের ভেদ হইত না। ইহার উত্তরে ভাট্টমীমাংসকগণ বলেন যে, সকল বিষয়-উপলব্ধির সঙ্গে আত্মার উপলব্ধি হয় না, কোন বিষয় জানিলেই 'আমি এই বিষয় জানিতেছি' এরূপ প্রত্যয় হয় না। কেবল যখন বিষয়ের উপলব্ধির সঙ্গে মানস অহংপ্রত্যয় হয় তখনই আত্মার উপলব্ধি হয়। অহংপ্রত্যয়ে কর্ম ও কর্তার যে বিরোধের কথা প্রাভাকর-মীমাংসকগণ বলেন, তাহা তাঁহাদের মতেও দেখা যায়। যদি প্রতি বিষয়জ্ঞানের জ্ঞাতারূপে আত্মা জ্ঞাত হয়, তবে তাহাকে এককালেই কর্তা ও কর্ম বলিয়া স্বীকার করা হয়, কারণ জ্ঞাতারূপে আত্মা কর্তা এবং জ্ঞাতরূপে কর্ম হয়। বাস্তবিক পক্ষে এখানে কর্তা ও কর্মের বিরোধ হয় না। যদি তাহা হইত তবে 'আত্মাকে জানিবে' এরূপ শ্রুতিবাক্য নিরর্থক হইত। আরও এককথা, যদি আত্মা কখনও জ্ঞানের বিষয় না হয়, তাহা হইলে এখন আমার অতীতকালীন আত্মার স্মরণ হইতে পারে না। এখন আমি স্মরণ করিতেছি যে অতীত কালে আমার আত্মা ছিল। আমার অতীতকালীন আত্মা বর্তমান স্মৃতি-জ্ঞানের জ্ঞাতা হইতে পারে না। ইহা কেবল বর্তমান আত্মার স্মৃতিজ্ঞানের বিষয়ই হইতে পারে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আত্মা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে এবং ইহা কদাচিৎ অহংপ্রত্যয়গম্য হয় অর্থাৎ কখন কখন অহংপ্রত্যয়ের বিষয়রূপে জ্ঞাত হয়।

জ্ঞান কিরূপে জ্ঞাত হয়?

যেরূপ আত্মার উপলব্ধি সম্বন্ধে ভাট্ট ও প্রাভাকর মীমাংসকদের মতভেদ আছে, সেইরূপে জ্ঞানের জ্ঞান সম্বন্ধেও তাঁহাদের মতভেদ দেখা যায়। এখানে প্রশ্ন হইতেছে: আমাদের যে কোন বিষয়ে জ্ঞান হয়, তাহা আমরা কিরূপে জানি। অর্থাৎ জ্ঞানকে কিভাবে জানা যায়? প্রাভাকর মতে জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞান নিজে নিজেকে প্রকাশ করে। জ্ঞানকে জানিবার জন্য অন্য কোন বস্তু আবশ্যক হয় না, যেমন আলোক দেখিবার জন্য অন্য আলোক আবশ্যক হয় না।

প্রাভাকর মতে জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ।

জ্ঞান কেবল নিজেকেই প্রকাশ করে না, উহা বিষয়কে প্রকাশ করিবার সঙ্গে জ্ঞাতা অর্থাৎ আত্মাকেও প্রকাশ করে। কোন বিষয়কে জানিবার সময় জ্ঞেয় বিষয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতা এককালেই প্রকাশিত হয়। এই তিনটির এক-

কালীন জ্ঞানকে ত্রিপুটীজ্ঞান বা ত্রিপুটীসংবিৎ বলে। ভাট্টমতে জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না, যেমন আমাদের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ অন্য বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারে, কিন্তু নিজেকে স্পর্শ করিতে পারে না। যদি তাহাই হয়, তবে আমাদের যে জ্ঞান বলিয়া কিছু হয়, তাহা আমরা কিরূপে জানি? ভাট্টমতে আমরা অনুমানদ্বারা জ্ঞানকে জানি। কোন বস্তুকে জানিলে উহা জ্ঞাত হয় এবং উহা জ্ঞাততাধর্মবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এখন কোন বস্তু জ্ঞানের বিষয় হইলেই তবে উহার জ্ঞাততাধর্ম হইতে পারে। অতএব বস্তুর জ্ঞাততাধর্ম হইতে আমরা অনুমান করি যে, ঐ বস্তুর জ্ঞান হইয়াছিল। এজন্য জ্ঞানকে অনুমানগম্য বলিতে হয়।

ভাট্টমতে জ্ঞান অনুমানগম্য।

৬। মীমাংসাদর্শনে ধর্মতত্ত্ব

মীমাংসামতে কর্তব্য কর্মের নাম ধর্ম। বৈদিক যুগে বেদবিহিত যজ্ঞকর্মই কর্তব্য কর্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। অতএব মীমাংসামতে বেদবিহিত যজ্ঞকর্মই হইল ধর্ম (চোদনা-লক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ)। যে কর্ম বেদবিহিত তাহাই সৎ ও কর্তব্য কর্ম এবং যে কর্ম বেদনিষিদ্ধ তাহা অসৎ ও অকর্তব্য কর্ম। বেদের বিধান মান্য করিয়া চলিলে জীবন সাধু ও সার্থক হয়।

বেদবিহিত যজ্ঞকর্মই ধর্ম।

বৈদিক যুগে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করা হইত। প্রত্যেক যজ্ঞের যজ্ঞভোজী দেবতা আছেন এবং তিনি যজ্ঞার্থে প্রদত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া যজমানকে যজ্ঞফল দান করেন এরূপ বিশ্বাস করা হইত। কিন্তু মীমাংসাদর্শনে এরূপ যজ্ঞভোজী দেবতায় বিশ্বাস প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। যে দেবতার নামে কোন যজ্ঞ করা হয় এবং ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়, তাঁহাকে ঐ নামেই পর্যবসিত করা হইয়াছে। আহুতি সম্প্রদান করিবার জন্য যে নামটির সম্প্রদানকারক ব্যবহার করা হয়, তাহাই দেবতাস্থানীয়, অন্য কোন জীবন্ত ও ঐশ্বর্যযুক্ত দেবতা নাই। কোন সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসক বলেন যে, কোন দেবতার অর্চনা বা প্রীতিসম্পাদন যজ্ঞের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, এমন কি চিত্তশুদ্ধি বা নৈতিক উৎকর্ষসাধনও যজ্ঞের উদ্দেশ্য নহে। যজ্ঞ কেবল বেদবিহিত বলিয়াই আমাদের কর্তব্য, বৈদিক কর্মসাধনই মানব-জীবনের সার। অবশ্য পরকালে স্বর্গলাভের জন্য এবং ইহকালে পুত্রাদিলাভের জন্য কোন কোন যজ্ঞ করিবার নির্দেশ আছে। কিন্তু সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম

যজ্ঞ বেদবিহিত বলিয়াই কর্তব্য।

CENTRAL LIBRARY

এবং বিশেষ বিশেষ কালে নির্দিষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম কেবল বেদবিহিত বলিয়াই করিতে হইবে। কর্তব্যের অনুরোধেই কর্ম করিতে হইবে, অন্য কোন কারণে তাহা করণীয় নয়। 'কর্তব্য কর্ম কর্তব্য বলিয়াই করিতে হইবে' (duty for duty's sake), মীমাংসাদর্শনে কর্তব্যের এই স্বরূপ, জার্মান দার্শনিক কাণ্টের কর্তব্য সম্বন্ধে মতের অনুরূপ। কাণ্টের মতেও কর্তব্য কর্ম কর্তব্য বলিয়াই করিতে হইবে, কোন লাভের আশায় তাহা কর্তব্য নয়। তারপর, কর্তব্য কর্ম কোন ফলাকাঙ্ক্ষায় না করিলেও, তাহাতে যে শুভফলের উদয় হয়, তাহা কাণ্ট ও মীমাংসা উভয়েই স্বীকার করে। তাহাদের পার্থক্য এই যে, কাণ্টের মতে ঈশ্বর কর্তব্য কর্মের শুভফল প্রদান করেন, আর মীমাংসামতে কর্ম-নিয়ম অনুসারেই কর্তব্য কর্মের শুভফল উৎপন্ন হয়। তারপর, কাণ্টের মতে কর্তব্য মানুষের ক্ষুদ্র আত্মার (lower self) প্রতি তাহার মহান্ আত্মার (higher self) নির্দেশ, আর মীমাংসামতে কর্তব্য অপৌরুষেয় বেদের বিধি নির্দেশ। কাণ্টের মতে মানুষের মধ্যে যেন একটি স্বার্থপর হীন আত্মা এবং একটি পরার্থপর মহান্ আত্মা আছে। এই মহান্ আত্মা হীন আত্মাকে তাহার কর্তব্যের নির্দেশ দেয়। মীমাংসামতে অপৌরুষেয় বেদই কর্তব্যের নির্দেশ দেয়।

৭। মীমাংসাদর্শনে পুরুষার্থ

মহর্ষি জৈমিনি ও প্রাচীন মীমাংসকদের মতে মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য হইল পরলোকে স্বর্গলাভ। অবিমিশ্র স্বর্গসুখ-ভোগই জীবের পরম কাম্য। যজ্ঞকর্মের দ্বারা স্বর্গলাভ হয়। প্রাচীন মীমাংসকগণ মুক্তি বা মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলেন নাই। কিন্তু পরবর্তী কালে মীমাংসকেরা মোক্ষ বা মুক্তিকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সকাম অর্থাৎ ফলকামনায় শুভ বা অশুভ কর্ম করিলে তাহার ফলভোগের নিমিত্ত জীবাত্মাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় এবং সংসারে সুখ-দুঃখভোগ করিতে হয়। সংসারের সকল সুখই দুঃখমিশ্রিত। অতএব দুঃখনিবৃত্তি করিতে হইলে রাগ-দ্বেষ-মুক্ত হইয়া নিষ্কাম কর্ম করিতে হয়। এজন্য আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া নিষ্কামভাবে বেদবিহিত কর্ম করিতে হয়। তাহাতে পূর্বসঞ্চিত কর্মফল নষ্ট হইয়া যায় এবং নূতন কর্মফল উৎপন্ন হয় না। ফলে জীবাত্মাকে স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন শরীর গ্রহণ করিতে হয় না এবং তখন তাহার মুক্তি বা মোক্ষ হয়। দেহবন্ধননিমিত্ত আত্মার সংসারবন্ধন

প্রাচীন মতে স্বর্গই পরম পুরুষার্থ।

পরকালীন মতে মোক্ষ পরম পুরুষার্থ।

CENTRAL LIBRARY

হয়। অতএব মুক্তি বলিতে দেহবন্ধন হইতে মুক্তি বা পুনর্জন্মনিরোধ বুঝায়।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, মীমাংসামতে চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ বা ধর্ম নহে। যখন আত্মা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন উহাতে জ্ঞান বা চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। মুক্ত আত্মার দেহ-ইন্দ্রিয়-মনের সহিত সংযোগ না থাকায় কোন জ্ঞান বা চৈতন্য থাকে না। তখন আর আত্মার কোন সুখ বা দুঃখের অনুভূতিও হয় না। অতএব মুক্তির অবস্থা কোন সুখ বা আনন্দের অনুভূতির অবস্থা নয়। উহা কেবল অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির অবস্থা। মুক্ত আত্মা সকল সুখ-দুঃখবিমুক্ত হইয়া স্বরূপে অর্থাৎ দ্রব্যরূপে অবস্থান করে। অবশ্য পরবর্তীকালে কোন কোন মীমাংসক অদ্বৈতবেদান্তীদের ন্যায় মুক্তিকে আনন্দানুভূতির অবস্থা বলিয়াছেন।

মুক্তি—অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি।

৮। মীমাংসা কি নিরীশ্বরবাদী ?

মীমাংসাদর্শনের প্রণেতা মহর্ষি জৈমিনি ঈশ্বরকে জগৎস্রষ্টা বলিয়া স্বীকার করেন না। প্রাচীন মীমাংসকগণ ঈশ্বরের কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না এবং ঈশ্বরের উল্লেখও করেন না। বৈদিক যজ্ঞই মীমাংসা-দর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। এজন্য ঈশ্বরের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। জগতের সৃষ্টির জন্যও মীমাংসকগণ ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে কর্ম-নিয়ম অনুসারেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই নিয়ম অনুসারে জীবের কর্মফলভোগও হয়। অতএব জগতের স্রষ্টা-পাতা-সংহর্তা এবং জীবের কর্মফলদাতারূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু মীমাংসকেরা বলেন যে, ঈশ্বর যদি স্রষ্টা ও কর্মফলদাতা হন, তবে তিনি একজনকে সুখী এবং একজনকে দুঃখী করিয়াছেন বলিতে হয় এবং তাহাতে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব দোষ হয়। কিন্তু ঈশ্বরকে পক্ষপাতিত্বদোষে দোষী করা যায় না। এইসব দৃষ্টে মীমাংসাকে নিরীশ্বরবাদী বলিতে হয়।

প্রাচীন মীমাংসা নিরীশ্বরবাদী।

কিন্তু মহামতি মোক্ষ মূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে, মীমাংসায় জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর অস্বীকৃত হইলেও ঈশ্বর অস্বীকৃত হন নাই। তাঁহাদের মতে মীমাংসকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে যেসব যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা স্রষ্টা ও কর্মফলদাতা ঈশ্বরের বিপক্ষে প্রয়োজ্য হইলেও ঈশ্বরের বিপক্ষে প্রয়োজ্য

এই মতের বিপক্ষে যুক্তি।

CENTRAL LIBRARY

নহে। অধিকন্তু যে মীমাংসা বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং একান্তভাবে বেদানুসারী তাহা বেদের অঙ্গীভূত ঈশ্বর-বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারে না। অতএব মীমাংসাদর্শনকে নিরীশ্বরবাদী না বলিয়া ঈশ্বরবাদীই বলিতে হইবে।

তাহার খণ্ডন ও সিদ্ধান্ত।

কিন্তু মীমাংসাদর্শন বেদানুগ বা বেদানুসারী বলিয়াই যে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। বিশেষতঃ মীমাংসাদর্শনের আলোচনাবসরে যেসব তথ্য অবগত হওয়া যায়, তদ্দৃষ্টে ইহাকে ঈশ্বরবাদী বলা সমীচীন মনে হয় না। প্রাচীন মীমাংসায় ঈশ্বরের কোন উল্লেখ নাই। পরবর্তীকালের মীমাংসকগণ জৈনদার্শনিকদের ন্যায় ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণগুলি খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সপক্ষে অন্য কোন প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। অতএব তাঁহাদের মনে বৈদিক ঈশ্বর-বিশ্বাস যে জাগ্রত ছিল তাহা বলা যায় না। অবশ্য একথা সত্য যে, মীমাংসায় বৈদিক দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার নির্দেশ আছে। যদি এসব দেবতাকে স্রষ্টা ও পুরুষ তত্ত্ব বলা যায়, তবে মীমাংসাকে বহু-ঈশ্বরবাদী বলিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারা সেরূপ তত্ত্ব নয়। মীমাংসকগণ বলেন, একই স্রষ্টা বা পুরুষরূপী দেবতা একই কালে বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত যজ্ঞে আহূত হইলে বিভিন্ন যজ্ঞে উপস্থিত হইতে পারেন না। অতএব যেসব দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করা হয়, তাহারা কোন ব্যক্তি নয়। তাহারা কেবল গুণবাচক মন্ত্র এবং এরূপ মন্ত্ররূপী দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, মীমাংসায় বৈদিক ঈশ্বর-বিশ্বাস লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং মীমাংসা নিরীশ্বরবাদী। মীমাংসাদর্শনে নিত্য, স্বতঃসিদ্ধ ও অপৌরুষেয় বেদই ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়াছে।

দশম অধ্যায়

বেদান্তদর্শন

১। ভূমিকা

(১) বেদান্তের উৎপত্তি ও ক্রমপরিণতি

বেদান্তকে বিভিন্ন অর্থে বেদের অন্ত বলা যায়।

'বেদান্ত' শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতেছে 'বেদের অন্ত বা শেষ'। বেদান্ত বলিতে মুখ্যতঃ উপনিষৎসমূহকে বুঝায়, যদিচ পরবর্তী কালে বেদান্ত শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং উপনিষদ্‌মূলক সকল চিন্তাধারাকেই বুঝায়। উপনিষৎসমূহকে বিভিন্ন অর্থে বেদের অন্ত বলা যায়। প্রথমতঃ বেদের শেষ ভাগ হইল উপনিষৎ। ঋক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই চারি বেদ। প্রত্যেক বেদের আবার তিন প্রধান অংশ—মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ। মন্ত্রাংশে দেবতাদের স্তুতি আছে। মন্ত্রাংশের অপর নাম সংহিতা অর্থাৎ যে অংশে মন্ত্রসমূহ সংহিত বা একত্র স্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণভাগে মন্ত্রসমূহের প্রয়োগ ও যাগ-যজ্ঞাদি বর্ণিত হইয়াছে। শেষ ভাগ বা অংশ হইল উপনিষৎ। ইহাতে দার্শনিক তত্ত্বসমূহের আলোচনা করা হইয়াছে। এই তিন অংশকেই শ্রুতি বলে এবং বেদ শব্দ ব্যাপক অর্থে এই তিন অংশকেই বুঝায়। দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্র পাঠের ক্রম অনুসারেও প্রথমে মন্ত্র, পরে ব্রাহ্মণ, পরে আরণ্যক এবং শেষে উপনিষৎ পাঠ করিতে হয়। কোন কোন উপনিষৎকে আরণ্যক বলা হয়, কারণ ইহারা বানপ্রস্থাবলম্বী অরণ্যবাসীদের পাঠের উপযোগী। তৃতীয়তঃ উপনিষদ্‌গুলি বৈদিক চিন্তাধারার সর্বোচ্চ স্তর বলিয়া তাহাদিগকে বেদের অন্ত বলা যায়।

বেদান্তের শাখা ও সংহিতা।

উপনিষৎ শব্দের অর্থ হইতেছে যাহা মানুষকে ব্রহ্মের সন্নিকটে লইয়া যায়, অথবা যাহা শিষ্য গুরুর সন্নিকটে বসিয়া শিক্ষা করে (উপ-নি-সদ্‌)। উপনিষদ্‌ অতি গুহ্য শাস্ত্র, তাহা কেবল গুরুর সন্নিকটস্থ (উপাসন্ন) বিশিষ্ট শিষ্যদের শিক্ষা দেওয়া হইত। উপনিষদেই বেদের গূঢ় আধ্যাত্মিক রহস্য নিহিত আছে বলিয়া তাহাকে কখন কখন বেদোপনিষদ্‌ বলা হইত উপনিষদ্‌গুলি বিভিন্ন কালে রচিত এবং বেদের বিভিন্ন শাখায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহাদের

CENTRAL LIBRARY

সংখ্যা বহু, কেহ কেহ ১১২ খানি উপনিষদের উল্লেখ করিয়াছেন। এসব উপনিষদে বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাহাদের অনেক বিষয়ে মতভেদ আছে, যদিচ তাহাদের একটি মূলগত ঐক্যও আছে। কালে তাহাদের বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করিবার জন্য উপনিষদ্‌গুলির অর্থবিচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। মহর্ষি বাদরায়ণ-প্রণীত ব্রহ্মসূত্রে তাহারই প্রয়াস করা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত-সূত্র, শারীরক-সূত্র, বাদরায়ণ-সূত্র, শারীরক-মীমাংসা, উত্তর-মীমাংসা, বেদান্ত-দর্শন প্রভৃতি নামেও পরিচিত। ব্রহ্মসূত্রের চারি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে উপনিষদ্বাক্যসমূহের ব্রহ্মে সমন্বয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার সহিত অন্যান্য শাস্ত্রের অবিরোধ, তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার সাধনসকল এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফল নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু সূত্রগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলিয়া তাহাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা ছিল। এইভাবে ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্যকার তাহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং প্রত্যেকেই নিজ ব্যাখ্যাকে শ্রুতি ও সূত্র অনুযায়ী বলিয়াছেন। এক-একজন ভাষ্যকার এক-একটি বেদান্তশাখার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার অনুগামিগণ এক-এক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন, যেমন শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি সম্প্রদায়। এইভাবে বেদান্ত এখনও লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনে প্রতিষ্ঠিত আছে। পরবর্তী কালে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যগুলির বহু উপভাষ্য, ব্যাখ্যা ও টীকা লিখিত হইয়াছে এবং বহু স্বতন্ত্র বেদান্তগ্রন্থও রচিত হইয়াছে। এইভাবে বেদান্তের বিপুল সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু তাহার অত্যল্প অংশ এযাবৎ মুদ্রিত হইয়াছে।

জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিষয়ে বিভিন্ন মত।

প্রধানতঃ জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ-বিষয়ে বেদান্তশাখাগুলির মতভেদ দেখা যায়। মধ্বাচার্যের মতে জীব ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন তত্ত্ব। এই মতকে দ্বৈতবাদ বলে। শঙ্করাচার্যের মতে জীব ও ব্রহ্ম দুই তত্ত্ব নহে, উহারা এক ও অভিন্ন। এই মতকে অদ্বৈতবাদ বলে। রামানুজাচার্যের মতে জীব ব্রহ্মের অংশ, উহাদের সম্বন্ধ অংশ ও অংশীর সম্বন্ধের অনুরূপ। এই মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলে। জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ-বিষয়ে দ্বৈতাদ্বৈত, ভেদাভেদ প্রভৃতি আরও অনেক মত আছে। তাহাদের মধ্যে শঙ্করের অদ্বৈত-মত এবং রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত-মত সুপ্রসিদ্ধ। এখানে এই দুইটির আলোচনা করা যাইবে।

বেদান্তের চিন্তাধারার তিনটি স্তর।

বেদান্তের চিন্তাধারার তিনটি স্তর দেখা যায়। প্রথম স্তর হইল বেদ ও উপনিষদ্। বৈদিক যুগের দ্রষ্টা ঋষিদের কবিজনোচিত দর্শন ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির মধ্যে বেদান্তের মূল ভাবধারা নিহিত আছে। দ্বিতীয় স্তর হইল বেদান্তসূত্র। এখানে পূর্বস্তরের ভাবরাজি

সুসম্বদ্ধ ও সুসংহত হইয়াছে। তৃতীয় স্তরে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা-গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও বিচার-বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এই তিন স্তরের মিলিত চিন্তাধারার আলোকে এখানে বেদান্তদর্শনের আলোচনা করা হইবে। প্রথমে বেদ ও উপনিষদের মধ্যে বেদান্তের চিন্তা-ধারার পরিণতি লক্ষ্য করিতে হইবে।

(২) বেদ ও উপনিষদে বেদান্তের ক্রমবিকাশ

বেদে দেবতা ও প্রাকৃতিক জগতের ধারণা।

ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিনটি বেদের মধ্যে প্রথমটি মূল বেদ, অপর দুইটিতে ঋগ্বেদের মন্ত্রসকল বিভিন্ন ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। অধিকাংশ ঋগ্বেদের মন্ত্রে অগ্নি, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার প্রশস্তি করা হইয়াছে। এইসকল মন্ত্রে দেবতাদের শৌর্য-বীর্যের ও মহৎ কার্যের বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। যজ্ঞে দেবতাদের আহ্বান করিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিবার সময় তাঁহাদের প্রশস্তিবাচক মন্ত্রসকল পঠিত হইত। এইসব দেবতাকে প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তুর (যেমন অগ্নি, সূর্য, বায়ু ইত্যাদি) অধিষ্ঠাতারূপে কল্পনা করা হইত এবং তাঁহাদের প্রসাদে জীবনধারণের উপযোগী সকল দ্রব্য লাভ করা যায় বলিয়া বিশ্বাস করা হইত। সকল প্রাকৃতিক বস্তুর অধিষ্ঠাতারূপে বহু দেবতায় বিশ্বাস করিলেও, বৈদিক ঋষিগণ ঋত নামে এক সর্বব্যাপী নৈতিক নিয়মে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারা আরও বিশ্বাস করিতেন যে, এই নিয়ম অনুসারে জীবজগৎ চলে এবং নীতি ও ধর্ম সংরক্ষিত হয়।

বেদ বহু-ঈশ্বর-বাদী নয়।

বেদে বহু-দেবতায় বিশ্বাস দৃষ্টে কেহ কেহ বেদকে বহু-ঈশ্বরবাদী (polytheism) বলিয়াছেন। কিন্তু বেদ সাধারণ অর্থে ঠিক বহু-ঈশ্বরবাদী নয়। ইহাতে যে বহু দেবতায় বিশ্বাস দেখা যায়, তাহার একটি বিশেষত্ব আছে। বৈদিক সংহিতায় যখন যে দেবতার প্রশস্তি করা হইয়াছে, তখন তাঁহাকেই পরমদেবতা ও পরমেশ্বর বলা হইয়াছে এবং তাঁহাকে অন্য সব দেবতার অধীশ্বর করা হইয়াছে। ইহা দৃষ্টে মহামতি মোক্ষ মূলর বৈদিক বহু-দেবতাবাদকে বহু-ঈশ্বরবাদ (polytheism) না বলিয়া একস্থ-বহু-ঈশ্বরবাদ (henotheism) বলিয়াছেন, অর্থাৎ সকল ঈশ্বরই পরমেশ্বরে একস্থ বা মিলিত হইয়াছেন এরূপ ঈশ্বরবাদ বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক বহু-দেবতা এক পরমদেবতার বিভিন্ন প্রকাশ বা নাম। ঋগ্বেদের একাধিক মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন দেবতা এক সর্বগত পরমতত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র এইরূপ: 'একং

CENTRAL LIBRARY

সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ', অর্থাৎ এক পরমতত্ত্বকে বিপ্রগণ বা জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করেন। এরূপ হইলে সকল দেবতাকেই পরমেশ্বরস্থানীয় বলা যায়।

ইহা একেশ্বরবাদী।

অনেক গ্রন্থকারের মতে বৈদিক ঈশ্বরবিষয়ক চিন্তাধারার ক্রমপরিণতির ফলে বহু-ঈশ্বরবাদ হইতে একস্থ-বহু-ঈশ্বরবাদের (henotheism) এবং তাহা হইতে একেশ্বরবাদের (monotheism) আবির্ভাব হয়। ইহা সত্য হইলেও একথা মনে রাখিতে হইবে যে, সব দেবতাই এক পরমেশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ এরূপ বিশ্বাস ভারতীয় একেশ্বরবাদে এখনও বর্তমান। এখনও ভারতীয় একেশ্বরবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের কোন প্রকাশ বা রূপকে পরমেশ্বরস্থানীয় বলিয়া পূজা করা যায়। এজন্য আজও ভারতে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের (যেমন শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব) সহাবস্থান ও প্রসার দেখা যায়। এসকল ধর্মসম্প্রদায় মূলে একেশ্বরবাদী এবং সম্ভবতঃ একতত্ত্ববাদী। বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত ভারতীয় একেশ্বরবাদ এক পরমেশ্বরে বহু দেবতার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে,

ইহার বৈশিষ্ট্য।

এক ঈশ্বরের মহিমা ও গরিমা রক্ষার্থে বহু দেবতাকে অস্বীকার করে না। ভারতীয় একেশ্বরবাদের এই বৈশিষ্ট্য আর অন্য কোনরূপ একেশ্বরবাদে দৃষ্ট হয় না। ইহা একটি সাময়িক লক্ষণ নহে, পরন্তু ভারতীয় একেশ্বরবাদের সর্বকালস্থায়ী লক্ষণ।

পুরুষ সূক্তে সকল সত্তার ঐক্য বর্ণিত।

সকল দেবতার ঐক্যে বিশ্বাসের সঙ্গে বেদে সকল সত্তার ঐক্যে বিশ্বাস দেখা যায়। ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ পুরুষসূক্তে সকল জীবজগতের ঐক্য রূপকের ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এখানে তাহার কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল:

'বিরাট পুরুষের সহস্র (অর্থাৎ অনন্ত) মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়া দশাঙ্গুল পরিমিত স্থান অতিক্রম করিয়া অবস্থিত আছেন।'

'বর্তমান এই সমস্ত জগৎই সেই বিরাট পুরুষ, যাহা অতীত, যাহা ভবিষ্যৎ তাহাও সেই পুরুষ। তিনি অমৃতত্বের অধিকারী, কারণ তিনি জীবের জীবন রক্ষার জন্য অন্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন।'

'এসকল তাঁহার মহিমা, কিন্তু তিনি ইহা হইতেও অতিশয় অধিক। কালত্রয়বর্তী সমস্ত জীব তাঁহার একপাদ মাত্র, তাঁহার অবশিষ্ট তিন পাদ অমৃতরূপে আকাশে অবস্থিত।'

CENTRAL LIBRARY

'পুরুষ আপনার তিন পাদ অর্থাৎ অংশ লইয়া উপরে উঠিলেন। তাঁহার চতুর্থ পাদ এই স্থানে রহিল। তদনন্তর তিনি চেতন ও অচেতন তাবৎ বস্তুতে ব্যাপ্ত হইলেন।'

ঈশ্বর বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত।

এখানে সকল জীবজগৎ—পৃথিবী, আকাশ, গ্রহ, দেবতা, চেতন ও অচেতন সকল বস্তু—এক বিরাট পুরুষের অংশ-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সেই বিরাট পুরুষ পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন, আবার তাহাকে অতিক্রম করিয়াও আছেন। বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল বস্তুই তাঁহাতে একস্থ বা ঐক্যবদ্ধ হইয়া আছে। এখানে পুরুষসূক্তের ঋষির দিব্য দৃষ্টিতে কেবল সমগ্র জগতের জীবন্ত ঐক্যই প্রকাশিত হয় না, পরন্তু এক পরমতত্ত্বে সর্ববস্তুর ঐক্যও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই পরমতত্ত্ব বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়াও নিঃশেষিত হয় না, ইহা বিশ্বকে অতিক্রম করিয়াও আছে। এই মতকে বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদ (pantheism) না বলিয়া বিশ্বগত-ও-বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদ (panentheism) বলা উচিত, কারণ এই মতে ঈশ্বর বিশ্বের অন্তর্বর্তী-মাত্র নন, পরন্তু বিশ্বভুবন ঈশ্বরের অন্তর্গত। ঈশ্বর বিশ্বের অন্তর্গত হইয়াও বিশ্বের অতীত হইয়া আছেন। এই মতে একতত্ত্ববাদ (monism), বিশ্বগত-ও-বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদ এবং জগতের জীবন্ত ঐক্যের (organic unity) ধারণার সমাবেশ দেখা যায়।

নাসদীয় সূক্তে নির্বিশেষ তত্ত্বের আভাস।

ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে নির্বিশেষে পরম তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। ইহাতে বলা হইয়াছে, যে পরম তত্ত্ব সকল সত্তার অন্তর্নিহিত এবং যাহা হইতে সকল তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাকে অসৎ বলা যায় না, আবার সৎও বলা যায় না, তাহা অনির্বাচ্য। এইসূক্তের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:

'তৎকালে যাহা আছে, তাহাও ছিল না, যাহা নাই, তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, আকাশও ছিল না, আকাশের উপরে স্বর্গও ছিল না। কে তাহাদিগকে আবৃত করিবে? কোথায় থাকিয়া কাহার ভোগের জন্য আবরণ করিবে? তখন কি নিবিড় অগাধ জলরাশি ছিল?'

'তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। ...তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।'

'এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও নাও জানিতে পারেন।'

পরম তত্ত্ব পুরুষ এবং পরম তত্ত্ব নির্বিশেষ ও অনির্বাচ্য—এই দুই প্রত্যয়ের কিরূপ সম্বন্ধ? এখানে স্মরণ করিতে হইবে যে, বিরাট পুরুষের বর্ণনাতেও তাঁহার একটি বিশ্বাতীত রূপের কথা বলা হইয়াছে এবং এই রূপটি যে অনির্দেশ্য ও অনির্বাচ্য তাহাও বলা হইয়াছে। অতএব পৌরুষেয় পরম তত্ত্ব এবং অপৌরুষেয় ও অনির্বাচ্য তত্ত্ব দুইটি ভিন্ন তত্ত্ব নহে, ইহারা একই তত্ত্বের দুই দিক্ বা রূপ।

পৌরুষেয় ও নির্বিশেষ তত্ত্বের সম্বন্ধ।

বৈদিক চিন্তাধারাকে প্রকৃতপক্ষে যুক্তিসিদ্ধ দার্শনিক চিন্তাধারা বলা যায় না। ইহা দ্রষ্টা ঋষিদের আধ্যাত্মিক অনুভূতির ছন্দোবদ্ধ উচ্ছ্বাসমাত্র। দার্শনিক চিন্তাধারায় কোন বিষয়ে যুক্তিতর্কের সাহায্যে কোন সিদ্ধান্ত করা হয়। এই অর্থে প্রথমে উপনিষদেই দার্শনিক চিন্তাধারার সূচনা হয়। কোন কোন উপনিষদে কথোপকথন-ছলে আত্মা, ঈশ্বর, জগৎ প্রভৃতি বিষয়ের বিচার-পূর্বক আলোচনা দেখা যায়। কিন্তু এরূপ স্থলেও পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক বিচারের অভাব দেখা যায়। তথাপি উপনিষদের যে মনোমুগ্ধকারী আকর্ষণী শক্তি আছে তাহা অনস্বীকার্য। উপনিষদ্ আমাদের হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করে এবং মনে দিব্যভাবের উদ্রেক করিয়া আমাদিগকে অদৃশ্য দিব্য জগতের সন্ধান দেয়। সুপ্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক আর্থার সোপেন্‌হাওয়ার উপনিষদ্ পাঠে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, 'সমগ্র পৃথিবীতে উপনিষদ্‌পাঠের মত কোন গ্রন্থপাঠই এমন উপকারী ও উন্নয়নকারী নহে। ইহাতে আমি জীবনে শান্তি পাইয়াছি, ইহাতে আমি মরণেও শান্তি পাইব।'

বেদে ঠিক দার্শনিক চিন্তাধারা নাই।

উপনিষদেই ইহার সূচনা হয়।

উপনিষদে যেসব সমস্যার প্রায়শঃ আলোচনা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি এইরূপ: যে তত্ত্ব হইতে জগতের জন্ম হয়, যাহাতে উহার স্থিতি ও লয় হয়, তাহার স্বরূপ কি? এমন কোন্ বস্তু আছে, যাহা জানিলে সব বস্তুই জানা যায়? এমন কি বস্তু আছে, যাহাকে জানিলে অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হয়? এমন কি তত্ত্ব আছে, যাহাকে জানিলে মানুষ অমরত্ব লাভ করে? ব্রহ্ম কি? আত্মা কি? এসব প্রশ্ন হইতে বেশ বুঝা যায় যে, উপনিষদের যুগে মানুষ বিশ্বাস করিত যে, কোন এক সর্বব্যাপী সত্তা হইতে জগতের উদ্ভব হইয়াছে, উহাতেই জগতের স্থিতি ও লয় হয়; এবং এমন এক তত্ত্ব আছে, যাহা জানিলে অমরত্ব লাভ করা যায়।

উপনিষদের প্রধান সমস্যাবলী।

CENTRAL LIBRARY

এই সর্বব্যাপী তত্ত্বকে কখন ব্রহ্ম, কখন আত্মা, কখন সৎ-মাত্র বলা হইয়াছে। যেমন ঐতরেয় ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে, 'অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) এই জগৎ আত্মারূপেই ছিল।' ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে, 'এ সবই আত্মা।' আবার বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে, 'আত্মাকে জানিলে সবই জানা হয়।' সেইরূপ ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে, 'অগ্রে কেবল সৎ ছিল, এক এবং অদ্বিতীয়।' মুণ্ডকে ও ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে, 'সবই ব্রহ্ম।' বৃহদারণ্যক ও অন্য উপনিষদে আত্মাকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

আত্মা ও ব্রহ্ম।

উপনিষদের চিন্তাধারা বৈদিক দেবতাসমূহ হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া আত্মায় কেন্দ্রীভূত হয়। ইহাতে আত্মার বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও সুখ-দুঃখাদির অতীত এবং সৎ ও চিৎ-মাত্ররূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। দেহাদি অনিত্য ও পরিবর্তনশীল, ইহাদিগকে আত্মা বলা যায় না। ইহারা আত্মার আবরণ বা কোষমাত্র, যদিচ ইহারা আত্মায় প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তাহাকে প্রকাশ করে। আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, মন বা বুদ্ধিবৃত্তিগুলি আত্মচৈতন্যের অবচ্ছিন্ন প্রকাশমাত্র। আত্মা নিত্য ও সর্বব্যাপী চৈতন্যস্বরূপ। সত্য, জ্ঞান ও অনন্তরূপে জীবাত্মা সর্বভূতাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। 'আত্মা সর্বভূতে আবৃত থাকায় আত্মা-রূপে প্রকাশিত হয় না। কিন্তু একাগ্র ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিসহায়ে মেধাবিগণ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন' (কঠোপনিষৎ, ১।৩।১২)।

আত্মাই পরম তত্ত্ব।

মানুষ যাহাতে আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে, উপনিষদে সর্বতোভাবে তাহারই প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। আত্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বা পরাবিদ্যা, অন্য সব জ্ঞানই তাহার তুলনায় নিকৃষ্ট বা অপরাবিদ্যা। সংযমসহায়ে ও শুদ্ধচিত্তে আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিলে আত্মার উপলব্ধি হয়। ইহা অবশ্য কঠিন পথ। প্রিয় বস্তু ত্যাগ করিয়া শ্রেয়োবস্তু লাভ করিতে যাঁহারা কৃতসংকল্প কেবল তাঁহারাই এই পথ অনুসরণ করিতে পারেন।

আত্মবিদ্যাই পরাবিদ্যা।

যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানদ্বারা পরম শ্রেয় বা মোক্ষ লাভ করা যায় না। যজ্ঞকর্ম করিলে যে পুণ্য-সঞ্চয় হয় তদ্দ্বারা স্বর্গ-লাভ হইতে পারে। কিন্তু স্বর্গসুখ-ভোগদ্বারা পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখভোগ করিতে হয়। কেবল আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই

যাগযজ্ঞ দ্বারা মোক্ষ হয় না।

জন্ম-মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তিলাভ করা যায় এবং তাহাতেই দুঃখের চিরনিবৃত্তি হয়। ব্রহ্ম অমৃতস্বরূপ, যিনি ব্রহ্মের সহিত নিজ আত্মার একত্ব উপলব্ধি করেন, তিনিও অমরত্ব লাভ করেন।

আত্মজ্ঞানেই মোক্ষ লাভ হয়।

উপনিষদে ব্রহ্মকে কেবল সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ বলা হয় নাই, তাঁহাকে আনন্দস্বরূপও বলা হইয়াছে। ব্রহ্মই সকল আনন্দের মূল বা উৎস। জাগতিক বস্তুতে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা ব্রহ্মানন্দেরই পরিচ্ছিন্ন প্রকাশমাত্র। শুদ্ধ আত্মা ও ব্রহ্মের উপলব্ধি করিলে, অনন্ত আনন্দের উপলব্ধি হয়। যেহেতু আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মাই আনন্দস্বরূপ। আত্মা যে আনন্দস্বরূপ তাহার প্রমাণরূপে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন যে, আত্মাই মানুষের প্রিয়তম বস্তু, আত্মার জন্যই সকল বস্তু আমাদের প্রিয় হয়। পতি পতি বলিয়া প্রিয় নয়, আত্মার জন্যই প্রিয় হয়, পত্নী পত্নী বলিয়া প্রিয় নয়, আত্মার জন্যই প্রিয় হয়, পুত্র পুত্র বলিয়া প্রিয় নয়, আত্মার জন্যই প্রিয় হয়, বিত্ত বিত্ত বলিয়া প্রিয় নয়, আত্মার জন্যই প্রিয় হয়। আত্মার জন্যই সকল বস্তু প্রিয় হয়। তারপর আত্মা যে আনন্দস্বরূপ তাহা সুষুপ্তিকালে আত্মার সুস্থ ও শান্তিময় অবস্থাদৃষ্টে বুঝা যায়। যখন কোন ব্যক্তি গভীর নিদ্রামগ্ন হন, তখন তিনি দেহ-ইন্দ্রিয়-মন ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া শান্তিতে ও সুখে অবস্থান করেন।

ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ।

আত্মার জন্যই সকল বস্তু প্রিয়।

ব্রহ্ম বা আত্মা পরম তত্ত্ব হইলে তাহা হইতে কিভাবে জীবজগতের উৎপত্তি হইল তাহা বিবেচনীয়। বিভিন্ন উপনিষদে সৃষ্টির বিভিন্ন বর্ণনা দেখা যায়। কিন্তু সর্বত্রই ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে, আত্মা বা ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁহা হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। অধিকাংশ উপনিষদে সৃষ্টির প্রারম্ভের বর্ণনা এইরূপ: অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এক আত্মাই বিদ্যমান ছিল। ইহা অভিধ্যান অর্থাৎ চিন্তা করিল 'আমি একাকী আছি, আমি বহু হইব, আমি সৃষ্টি করিব।' ইহার পর সৃষ্টির ক্রম সম্বন্ধে বিভিন্ন বর্ণনা দেখা যায়। কোন কোন স্থলে বলা হইয়াছে যে, আত্মা হইতে প্রথমে অতি সূক্ষ্ম ভূত 'আকাশের' সৃষ্টি হয় এবং তারপর অন্যান্য স্থূল ভূতের সৃষ্টি হইয়াছে।

ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি।

পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুসারে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বাস্তবিক জগতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বাস্তবিক জগতের স্রষ্টা। কিন্তু উপনিষদের বহুস্থলে নানা বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে

নানাত্বের অস্বীকৃতি।

যে, যিনি নানা বস্তু দর্শন করেন তিনি মৃত্যুর কবলে পতিত হন। যেমন সকল সুবর্ণনির্মিত দ্রব্য মূলে সুবর্ণমাত্র এবং তাহাদের ভেদ কেবল নামরূপের ভেদ, বাস্তবিক নহে, সেইরূপ জগতের বস্তুনিচয়ের অন্তর্নিহিত সত্তা ব্রহ্মই সত্য, তাহাদের ভেদ নামরূপকৃত, বাস্তবিক নহে। জাগতিক বস্তুর পৃথক্ সত্তা নাই। অনেক স্থলে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম বাস্তবিক সৃষ্টি করেন নাই, তিনি নির্গুণ সত্তামাত্র, অনির্বচনীয় ও অচিন্ত্য। এমন কি, ব্রহ্মের পূজা ও অর্চনাও করা যায় না। **কেন** উপনিষদে বলা হইয়াছে, 'ব্রহ্ম জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সকল বস্তুর অতীত। বাক্য যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, বাক্যই যাহার দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই ব্রহ্ম, উপাস্য দেবতা ব্রহ্ম নয়।'

ব্রহ্ম ও জগৎ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত।

ব্রহ্ম ও জগৎ সম্বন্ধে এই দুইপ্রকার উক্তি লক্ষ্য করিলে মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে—ব্রহ্ম সত্যই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন কি না এবং জগৎ সত্য কি না? অথবা ব্রহ্ম বাস্তবিক জগৎ সৃষ্টি করেন নাই এবং জগৎ মিথ্যা অবভাসমাত্র? ব্রহ্ম সত্যসত্যই নির্বিশেষ ও জ্ঞানের অনধিগম্য, অথবা তিনি সবিশেষ ও সগুণ পুরুষ? এসব বিষয়ে উপনিষদের উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য কি? পূর্বেই বলিয়াছি, বাদরায়ণ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে উপনিষদের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সূত্রগুলি অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় বিভিন্ন ভাষ্যকার বেদান্তসূত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া বিভিন্ন বেদান্তমতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তন্মধ্যে শংকরাচার্য ও রামানুজাচার্যের ব্যাখ্যা ও বেদান্তমত প্রধান ও অধিক পরিচিত। এখানে এই দুইটি বেদান্তমতের আলোচনা করা যাইবে।

(৩) প্রধান বেদান্তশাখাদুইটির সমান তত্ত্ব

শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই অদ্বৈতবাদী।

শংকর ও রামানুজ উভয়েই বাদরায়ণের মতের অনুগামী। তাঁহারা উভয়েই জগৎ জড়ভূতের পরিণাম অথবা জড় প্রকৃতির পরিণাম এরূপ মত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়ের মতেই ঈশ্বর ও জড়পদার্থ দুইটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে এবং ঈশ্বর জড় উপাদান হইতে জগৎ রচনা করিয়াছেন এই মত যুক্তিযুক্ত নহে। তাঁহাদের মতে জড় কারণ হইতে জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না। এমন কি, জড় ও চেতনের পরস্পর সংযোগেও জগতের সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের উভয়ের মতই, 'এসবই ব্রহ্ম' এই উপনিষদ্-বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অচেতন জড় ও চেতন জীবকে স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন না,

পরন্তু, উভয়কেই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াছেন। অতএব শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই অদ্বৈতবাদী, উভয়েই এক স্বতন্ত্র, সর্বব্যাপী পরম তত্ত্বে বিশ্বাসী।

সাংখ্য মতের খণ্ডন।

বাদরায়ণকে অনুসরণ করিয়া শঙ্কর ও রামানুজ সৃষ্টি সম্বন্ধে ভিন্ন-মতাবলম্বীদের মত কিভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যায়। সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমষ্টিরূপে অচেতন প্রকৃতি চেতনকর্তৃক অধিষ্ঠিত না হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে। কিন্তু এমত যুক্তিযুক্ত নয়। প্রকৃতি জড় ও অচেতন। জগতের বৈচিত্র্য ও রচনানৈপুণ্য জড় কারণদ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। সাংখ্যমতে জীবের কর্মানুসারে ফলভোগের জন্য জগতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু জড় প্রকৃতি কিরূপে কর্ম ও কর্মফল অনুযায়ী জগদ্-রচনা করিতে সমর্থ হয় তাহা বুঝা যায় না। সাংখ্যাচার্যেরা বলেন, প্রকৃতি অচেতন হইলেও পুরুষের প্রয়োজন সাধন করে, যেমন বৎসের পরিপোষণের জন্য গাভীর দেহ হইতে দুগ্ধ নিঃসৃত হয়। কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে, গাভী সচেতন জীব এবং বাৎসল্যবশতঃ তাহার দেহ হইতে দুগ্ধ নিঃসৃত হয়। অচেতন পদার্থ কোন প্রয়োজন সাধন করে এরূপ দৃষ্টান্ত নাই। সাংখ্যমতে পুরুষ নিষ্ক্রিয়। অতএব পুরুষ প্রকৃতির পরিণামের কারণ হইতে পারে না।

বৈশেষিক মতের খণ্ডন।

বৈশেষিকদের পরমাণুকারণবাদও সাংখ্যের প্রকৃতিপরিণামবাদের ন্যায় যুক্তিসহ নহে। অচেতন পরমাণুসকলের সংযোগ-বিয়োগদ্বারা বিচিত্র ও সুশৃঙ্খল জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না। অবশ্য এজন্য বৈশেষিকগণ জীবের অদৃষ্টকে পরমাণুর সংযোগ-বিয়োগের কারণ বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু অদৃষ্টও অচেতন পদার্থ, ইহা পরমাণুর যথাযোগ্য সংযোগ-বিয়োগ ঘটাইতে পারে না। অদৃষ্টের অধিষ্ঠানরূপে বৈশেষিকগণ আত্মাকে স্বীকার করেন বটে। কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে আত্মার দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকায়, উহাও অচেতন দ্রব্যরূপেই বিদ্যমান থাকে। অতএব প্রথম পরমাণু-সংযোগ কোন চেতন কারণদ্বারা হইতে পারে না। আর অচেতন পরমাণু চেতন কারণদ্বারা অধিষ্ঠিত না হইলে কোন কার্যই করিতে পারে না। সুতরাং অচেতন পরমাণুদ্বারা জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না।

বৌদ্ধ মতের খণ্ডন।

বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে ক্ষণিক ভৌতিক পদার্থ সকলের সংঘাত হইতে জগতের বস্তুসকলের উৎপত্তি হয়। কিন্তু যাহা ক্ষণিক তাহা কোন কার্য করিতে পারে না। কোন কার্য করিতে হইলে কারণকে অন্ততঃ দুইক্ষণস্থায়ী হইতে হইবে, প্রথম ক্ষণে তাহার উৎপত্তি হইবে এবং দ্বিতীয় ক্ষণে তাহা কার্য করিবে। কিন্তু ক্ষণিকবাদ অনুসারে কোন বস্তু এক ক্ষণের অধিককাল থাকিতে পারে না।

CENTRAL LIBRARY

যদিও ক্ষণিক পদার্থসকল কোনরূপে উৎপন্ন হয়, তাহাদের সংঘাতরূপ কার্য হইতে পারে না। কারণ, বৌদ্ধমতে দ্রব্য বলিয়া কোন পদার্থ নাই, কিন্তু দ্রব্য ব্যতীত বিভিন্ন ক্ষণিক বস্তু একত্র সংহত হইতে পারে না। শেষ কথা, বৌদ্ধমতে চৈতন্য ভৌতিক দ্রব্যের সংঘাতের কার্য। অতএব সংঘাতের পূর্বে চৈতন্যের উৎপত্তি হয় না। সেস্থলে বলিতে হয় যে, অচেতন ভৌতিক দ্রব্য-সকল চৈতন্যের সহায়তা ব্যতীত কার্য করে। কিন্তু অচেতন দ্রব্য যে চৈতন্য ব্যতিরেকে কোন কার্য করিতে পারে না তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের মতে বাহ্য জগতের বাস্তবিক সত্তা নাই, বাহ্য বস্তুসকল স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় কল্পনাপ্রসূত মিথ্যা অবভাসমাত্র। এই মতের বিপক্ষে শংকরাচার্য বাদরায়ণের ন্যায় কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। (১) যে বাহ্য বস্তু, সকল মনুষ্যের প্রত্যক্ষগোচর তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না, যেমন কোন খাদ্য খাইবার সময় তাহার গন্ধের অপলাপ করা যায় না। (২) যদি সাক্ষাৎ-অনুভূতির প্রামাণ্য অস্বীকার করা যায়, তবে যোগাচারগণ যেসব মানসিক প্রত্যয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহাও অস্বীকার করা যায়। (৩) যদি কোন বাহ্য বস্তু স্বীকার না করা হয়, তবে 'মানসিক প্রত্যয়গুলি ভ্রমবশতঃ বাহ্য বস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়' যোগাচারদের এই কথা নিরর্থক হইবে, যেমন 'তাহাকে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় দেখাইতেছে' এরূপ বাক্য অর্থহীন হয়। (৪) ঘট, পট প্রভৃতি বাহ্য বস্তু স্বীকার না করিলে, ঘটের প্রত্যয় ও পটের প্রত্যয়ের কোন পার্থক্য হইতে পারে না, কারণ শুদ্ধ প্রত্যয়রূপে ইহারা অভিন্ন। (৫) স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু ও প্রত্যক্ষগোচর বস্তুর বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু জাগ্রদবস্থায় বাধিত হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষীভূত বস্তু সেইরূপে বাধিত হয় না। জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট বস্তু যাবৎ বাধিত না হয়, তাবৎ অসৎ বা মিথ্যা বলা যায় না। অতএব বিজ্ঞানবাদ তথা শূন্যবাদকে জগৎ-সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত মতবাদ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ-মাত্র—এ মত গ্রাহ্য নয়।

যেসব মত অনুসারে (যেমন শৈব, পাশুপত ইত্যাদি) ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণমাত্র এবং জড়দ্রব্য ইহার উপাদান কারণ, তাহাও গ্রহণীয় নয়। কারণ এসব মত বেদানুগামী নহে। ইহারা লৌকিক প্রত্যক্ষ ও যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু লৌকিক প্রমাণ অনুসারে যে পুরুষ বা আত্মা কোন জড়দ্রব্যের উপর ক্রিয়া করে, তাহার দেহ ও ইন্দ্রিয় থাকে এবং তাহার ক্রিয়ার সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখপরিহাররূপ প্রয়োজনও থাকে। ঈশ্বরের দেহেন্দ্রিয় নাই এবং তাঁহার সুখ লাভ করিবার বা দুঃখ পরিহার

করিবার প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর জড় উপাদান হইতে জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন, এরূপ মত যুক্তিযুক্ত নয়।

ব্রহ্মের দুইরূপ সর্ব বেদান্ত-শাখায় স্বীকৃত।

বেদ ও উপনিষদে ব্রহ্মের দুই রূপের কথা আছে—তিনি বিশ্বগত অর্থাৎ বিশ্বের অন্তর্বর্তী এবং বিশ্বাতীত অর্থাৎ বিশ্বের অতিবর্তী। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২।৩।১) বলা হইয়াছে, 'ব্রহ্মের দুই রূপ—মূর্ত ও অমূর্ত, মর্ত্য ও অমৃত, স্থিত অর্থাৎ গতিহীন ও যৎ অর্থাৎ গমনশীল, এবং সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান ও তৎ অর্থাৎ সর্বকালে পরোক্ষ।' বেদান্তের সর্বশাখাতেই ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের এই দুই রূপ স্বীকৃত হইয়াছে।

২। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ

(১) জগৎ সম্বন্ধে শাঙ্কর মত

জগৎ বস্তুতঃ সৎ নয়।

উপনিষদে দুইভাবের কথা পাওয়া যায়। একদিকে জগতের সৃষ্টির বর্ণনা দেখা যায়, আবার অন্যদিকে নানা বস্তুর অস্তিত্বের অস্বীকৃতিও দেখা যায়। শংকরাচার্যের মতে এই দুইপ্রকার উক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ। তিনি আরও মনে করেন যে, উপনিষদের মূল ও সাধারণ ভাবধারা বিবেচনা করিলে সৃষ্টির বর্ণনাগুলিকে অসাম্প্রত অর্থাৎ অযুক্ত বলিতে হয়। যদি ব্রহ্ম সত্যসত্যই জগৎ সৃষ্টি করেন, তবে তাঁহাকে নির্গুণ ও নির্বিশেষ বলা যায় না। তারপর ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইলে কিরূপে বৈচিত্র্যময় জগৎ অস্তমিত বা অপগত হইতে পারে তাহাও বুঝা যায় না। যাহা সৎ বা সত্য কখনও তাহার অভাব বা অপগম হইতে পারে না। জগৎ সত্য হইলে ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা তাহার নাশ হইতে পারে না। কেবল যাহা মিথ্যা অর্থাৎ সৎ নহে কিন্তু সৎ-রূপে প্রতিভাত হয়, তাহাই তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত বা বাধিত হইতে পারে। ইহা হইতেই শংকর জগৎ-রহস্য উদ্ঘাটন করিবার উপায়ের ইঙ্গিত পাইয়াছেন। জগৎকে যদি স্বপ্নদৃষ্টবস্তু বা ভ্রমপ্রত্যক্ষের বিষয়ের ন্যায় মিথ্যা অবভাসমাত্র (mere appearance) বলা যায়, তবেই আমরা বুঝিতে পারি যে, ইহা এখন দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ হইলেও তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে নিবৃত্ত বা অপগত হইতে পারে। জগৎ যে বস্তুতঃ সৎ নয় কিন্তু অবভাসমাত্র তাহার ইঙ্গিত বেদ ও উপনিষদেই পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে (৬।৪৭।১৮) বলা হইয়াছে, 'ইন্দ্র মায়াদ্বারা বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া যজমানের নিকট উপস্থিত হয়েন।' বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (২।৫।১৯) একথার উল্লেখ আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৪।১০)

স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে ঈশ্বরের মায়াশক্তিই জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারণ। শঙ্কর এইসব শ্রুতিবাক্য অনুসারে জগৎকে সৎ বা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। শঙ্করের মতে জগৎ বস্তুতঃ সৎ নয়, উহা ব্রহ্মের মায়াশক্তির কার্য, ব্রহ্মে আরোপিত অবভাসমাত্র (appearance)।

ইহা ব্রহ্মের মায়ার কার্য—অবভাসমাত্র।

ব্রহ্মের মায়াশক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নি হইতে অভিন্ন। মায়াশক্তিদ্বারা ঈশ্বর জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি করেন। অজ্ঞানবশতঃ সাধারণ লোকে এই প্রপঞ্চকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী পুরুষগণ জগৎ-প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া জানেন এবং তাহার অন্তর্নিহিত ব্রহ্মসত্তাকেই দর্শন করেন।

ব্রহ্ম ও মায়া অভিন্ন।

সচরাচর আমাদের যেসব ভ্রমপ্রত্যক্ষ হয়, তাহা পর্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে অজ্ঞানই ভ্রমপ্রত্যক্ষের কারণ। রজ্জুতে সর্পভ্রমস্থলে মিথ্যা সর্পের অধিষ্ঠান রজ্জু সম্বন্ধে অজ্ঞানবশতঃ আমাদের সর্পের প্রত্যক্ষ হয়। যদি এস্থলে রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান থাকিত, তবে আমাদের সর্পভ্রম হইত না। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এ অজ্ঞান কেবল রজ্জু সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবমাত্র নয়। যদি তাহা হইত, তবে যে ব্যক্তির কখন রজ্জুজ্ঞান হয় না সে সব বস্তুতেই সর্পদর্শন করিত। এই অজ্ঞান ভাবরূপ অজ্ঞান বা অবিদ্যা। প্রথমতঃ ইহা আবরণরূপে রজ্জুকে আমাদের নিকট লুক্কায়িত করে। দ্বিতীয়তঃ ইহা আমাদের মনে রজ্জুতে সর্পরূপ বিক্ষেপের সৃষ্টি করে। অতএব ভ্রম-প্রত্যক্ষস্থলে দেখা যায় যে, ভাবরূপ অজ্ঞান বা অবিদ্যার দুইটি কার্য হইল—সদ্বস্তুর আবরণ এবং উহাতে অন্যবস্তুর বিক্ষেপ। জগৎপ্রপঞ্চও অজ্ঞান বা অবিদ্যার কার্য। ইহা জগতের অধিষ্ঠান ব্রহ্মকে আবৃত করে বা আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে লুক্কায়িত করে এবং তাঁহাতে বৈচিত্র্যময় জগৎ-রূপ বিক্ষেপের সৃষ্টি করে।

অজ্ঞান ভ্রমপ্রত্যক্ষের কারণ।

আবরণ ও বিক্ষেপ অজ্ঞানের দুইটি কার্য।

জগৎ অজ্ঞানের কার্য।

যখন কেহ আমাদের মনে কোন ভ্রমপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে, তখন আমরাই সেই ভ্রমে পতিত হই, ভ্রমোৎপাদনকারী ব্যক্তি কিন্তু ভ্রমে পতিত হয় না। যেমন কোন যাদুকর একটি মুদ্রাকে দশটি করিয়া দেখাইল। এখানে দর্শকদেরই ভ্রম হয়, যাদুকরের কোন ভ্রম হয় না। দর্শকেরা অজ্ঞানবশতঃ একটি বাস্তবিক মুদ্রাস্থলে দশটি মুদ্রা দেখে। অজ্ঞান-হেতু তাহারা বস্তুর স্বরূপ জানিতে পারে না এবং তৎস্থলে অন্য বস্তু দেখে। যদি কোন তীক্ষ্ণবুদ্ধি দর্শক একটি বাস্তবিক মুদ্রাকেই দেখিতে থাকে,

যাদুকরের যাদু অজ্ঞ ব্যক্তিকেই প্রতারিত করে, তাহাকে নয়।

তবে তাহার নিকট যাদুকর কোন যাদুমুদ্রার সৃষ্টি করিতে পারে না। যাদুকরেরও কোন ভ্রমপ্রত্যক্ষ হয় না, তবে তাহার ভ্রমপ্রত্যক্ষ উৎপাদন করিবার যাদুশক্তি আছে এবং তদ্দ্বারাই দর্শকেরা প্রতারিত হয়।

যাদুকরের দৃষ্টান্ত অনুসারে ব্রহ্মের জগৎপ্রপঞ্চসৃষ্টিকারিণী মায়াশক্তিকে দুইভাবে দেখা বা বুঝা যাইতে পারে। ব্রহ্মে মায়া জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিবার শক্তিরূপে বিদ্যমান, তাহাতে ব্রহ্মের কোন ক্ষতি বা হানি হয় না, তদ্দ্বারা তিনি প্রতারিত হন না। কিন্তু আমাদের মত অজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে মায়া ভ্রমপ্রত্যক্ষের উৎপাদক অজ্ঞান বা অবিদ্যা। আমরা তদ্দ্বারা প্রতারিত হই এবং এক অদ্বয় ব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারি না, তৎস্থলে বৈচিত্র্যময় জগৎপ্রপঞ্চ দর্শন করি। অবিদ্যা ব্রহ্মকে আবৃত করে এবং তাহাতে জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করে। আবরণ ও বিক্ষেপ ইহার দুইটি কার্য। যেহেতু ইহা ভাবরূপে প্রপঞ্চের সৃষ্টি করে, ইহাকে ভাবরূপ অজ্ঞান বলিতে হইবে। যেহেতু জগৎপ্রপঞ্চের কোন আদি নির্ধারণ করা যায় না, মায়া বা অবিদ্যাকে অনাদি বলিতে হয়। কিন্তু যে সুধী ব্যক্তি জগৎপ্রপঞ্চদ্বারা প্রতারিত হন না, জগতে কেবল ব্রহ্মকেই দর্শন করেন, তাঁহার নিকট প্রপঞ্চও নাই আর প্রপঞ্চ-প্রসারিণী মায়াশক্তিও নাই। এরূপ সুধী ব্যক্তির নিকট ব্রহ্মের মায়াশক্তি নিষিদ্ধ বা তিরোহিত হয়।

মায়া জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টির ঐন্দ্রজালিক শক্তি।

রামানুজ শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্‌মতে মায়ার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সত্যসত্যই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। মায়া ব্রহ্মের সদ্রূপ জগৎসৃষ্টির বিস্ময়করী শক্তি। অথবা মায়া ব্রহ্মের অন্তর্ভূত, অচিৎ-রূপ ও নিত্য জড়-প্রকৃতি, যাহা সত্যই জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। শঙ্করের মতে মায়া ব্রহ্মের শক্তি বটে, কিন্তু ইহা তাঁহার নিত্য শক্তি নয়, ইহা তাঁহার স্বেচ্ছাধীনা শক্তি, তিনি ইচ্ছামাত্রে ইহার পরিহার করিতে পারেন। জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট জগৎপ্রপঞ্চ নাই আর মায়াও নাই এবং ব্রহ্ম মায়াবীও নহেন। তারপর মায়া ব্রহ্মের শক্তিরূপে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, যেমন দাহিকা শক্তি অগ্নি হইতে অভিন্ন, অথবা ইচ্ছা-শক্তি ইচ্ছার কর্তা আত্মা হইতে অভিন্ন। শঙ্কর কখন কখন মায়াকে প্রকৃতি বলিয়াছেন। কিন্তু সেসব স্থলেও তিনি প্রকৃতি বলিতে কেবল জগৎপ্রপঞ্চে বিশ্বাসকারীর নিকট ইহা জগৎপ্রপঞ্চের কারণ বা প্রকৃতি এইমাত্র বলিয়াছেন। মায়া সম্বন্ধে রামানুজ ও শঙ্করের মতের প্রভেদ এই যে, রামানুজের মতে ব্রহ্মের মায়া বা অন্তঃস্থ জড়-প্রকৃতি সত্যসত্যই জগদাকারে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু শঙ্করের মতে ব্রহ্মের বাস্তবিক জগদাকারে পরিণাম হয় না, মায়াশক্তিদ্বারা তিনি কেবল মায়িক বা প্রাতিভাসিক জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করেন।

শঙ্করমতে মায়া।

CENTRAL LIBRARY

শঙ্করের মত—বিবর্তবাদ, রামানুজের পরিণামবাদ।

কোন বস্তু ভ্রান্তিবশতঃ অন্য বস্তুরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে, যেমন ভ্রমবশতঃ রজ্জু সর্পরূপে প্রতীয়মান হয়। এক বস্তুর অন্য বস্তুরূপে এইপ্রকার প্রাতিভাসিক পরিবর্তনের নাম বিবর্ত। কোন বস্তুর অন্য বস্তুরূপে বাস্তবিক পরিবর্তনের নাম পরিণাম, যেমন দুগ্ধের দধিরূপে পরিবর্তন। এজন্য সৃষ্টি সম্বন্ধে শঙ্করের মতকে বিবর্তবাদ বলে। সাংখ্য-মতে জগৎ প্রকৃতির বাস্তবিক পরিবর্তন। অতএব সাংখ্যমতকে পরিণামবাদ বলে। রামানুজের মতও একপ্রকার পরিণামবাদ, যেহেতু তিনি ব্রহ্মের অন্তর্গত জড়-প্রকৃতি বাস্তবিক জগদাকারে পরিণত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন। বিবর্তবাদ ও পরিণামবাদ সৎকার্যবাদের দুই প্রকারভেদ, যেহেতু উভয় মত অনুসারেই কার্য উহার সমবায়ী কারণে কোনরূপে বিদ্যমান (সৎ) থাকে। এক বস্তুতে অপর বস্তুর কল্পনার নাম অধ্যাস। সকল ভ্রমপ্রত্যক্ষেই অধ্যাস হয়, যেমন রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হয়, ব্রহ্মে জগৎপ্রপঞ্চের অধ্যাস হয়।

মায়াকে কখন কখন প্রকৃতি বলা হইয়াছে।

উপনিষদে সৃষ্টির যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহার তাৎপর্য হইতেছে যে, ব্রহ্ম মায়াশক্তিদ্বারা জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়াছেন। অবশ্য কোন কোন উপনিষদে মায়াকে অব্যক্ত এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী প্রকৃতিও বলা হইয়াছে। কিন্তু এ প্রকৃতি সাংখ্যের স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপ প্রকৃতি নয়। ইহা ব্রহ্মের শক্তি এবং সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মের অধীন।

ব্রহ্ম হইতে জগৎ-সৃষ্টির ক্রম।

মায়াশক্তির মাধ্যমে ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টিক্রম এইরূপ। প্রথমে আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও ক্ষিতি এই পঞ্চ তন্মাত্রের উত্তরোত্তর আবির্ভাব হয়। তৎপরে পঞ্চতন্মাত্রের পঞ্চপ্রকার সংমিশ্রণ হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। মহাভূত আকাশের উৎপত্তিতে অর্দ্ধাংশ আকাশতন্মাত্র এবং বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও ক্ষিতি তন্মাত্রের প্রত্যেকটির একঅষ্টমাংশ সংমিশ্রিত হইয়াছে। সেইরূপ অন্য মহাভূতের উৎপত্তিতে অর্দ্ধাংশ তাহার তন্মাত্র এবং অপর তন্মাত্রগুলির প্রত্যেকটির একঅষ্টমাংশ সংমিশ্রিত হইয়াছে। পঞ্চতন্মাত্রের এরূপ সংমিশ্রণের নাম পঞ্চীকরণ। মানুষের সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চতন্মাত্রের সমষ্টি; তাহার স্থূল শরীর এবং সকল স্থূল দ্রব্য পঞ্চ মহাভূতের সমষ্টি। শঙ্কর সৃষ্টির এই বর্ণনা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি বিবর্তবাদ অনুসারে ইহাকে প্রাতিভাসিকরূপে গ্রহণ করেন।

শঙ্করের সৃষ্টিবাদের গুণাধিক্য।

শঙ্করের মতে বিবর্তবাদ অনুসারেই শ্রুতিবাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় এবং সৃষ্টিরও যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা করা যায়। অন্য মতানুসারে তাহা করা যায় না। ব্রহ্ম স্বতন্ত্র জড়দ্রব্য হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন একথা বলিলে, ব্রহ্মকে

অদ্বৈত পরম তত্ত্ব বলা যায় না এবং তাঁহার অনন্তত্বেরও হানি হয়। যদি জড়দ্রব্যকে ব্রহ্মের অন্তর্ভূত এবং জগৎকে উহার বাস্তবিক পরিণাম বলা যায়, তবে উভয়সংকট (dilemma) হয়। এই জড়দ্রব্যকে ব্রহ্মের অংশ অথবা সমগ্র ব্রহ্মের সমান বলিতে হইবে। যদি জড়কে ব্রহ্মের অংশ বলা যায় (যেমন রামানুজ বলেন), তবে তিনি সাবয়ব দ্রব্য হইয়া পড়েন এবং সকল সাবয়ব দ্রব্যের ন্যায় ধ্বংসশীল হইবেন। তারপর ব্রহ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, তাঁহার অবয়ব থাকা সম্ভবপর নয়। অপর পক্ষে, যদি জড় ব্রহ্মের সমান হয়, তবে জড়ের জগদাকারে পরিণামের সঙ্গে ব্রহ্মও জগদাকার প্রাপ্ত হইবেন এবং সৃষ্টির পর ব্রহ্ম বলিয়া আর কিছু থাকিবে না। ব্রহ্মের আংশিক বা পূর্ণ পরিণাম হইলে, তাঁহাকে নিত্য ও অক্ষর ব্রহ্ম বলা যাইবে না। বিবর্তবাদে এসব দোষ বা ত্রুটি হয় না, কারণ তদনুসারে পরিণাম বাস্তবিক নয়, প্রাতিভাসিকমাত্র।

(২) শঙ্করের ব্রহ্মবাদ

শংকরের মতে দুইপ্রকার দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ব্রহ্মের বর্ণনা করা যায়। ব্যাবহারিক-দৃষ্টিতে জীবজগৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতএব ব্যাবহারিক-দৃষ্টিতে ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টা, পালনকর্তা ও সংহারকর্তা বলা যায়, তাঁহাকে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ পুরুষও বলা যায়। এই দৃষ্টিতে ব্রহ্ম এইসব গুণসমন্বিত বলিয়া প্রতীয়মান হন। ইঁহাকেই শংকর সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আখ্যা দিয়াছেন এবং ইঁহারই পূজার্চনা করা হয়।

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টা ও সগুণ।

কিন্তু শংকরের মতে জগৎ আমাদের অজ্ঞানপ্রসূত অবভাসমাত্র। ব্যাবহারিক-দৃষ্টিতে এই অবভাস সত্য বলিয়া গৃহীত হয় এবং ব্রহ্মকে জগৎস্রষ্টা বলা হয়। অতএব ব্যাবহারিক-দৃষ্টিতেই ব্রহ্মকে জগৎস্রষ্টা-রূপে বর্ণনা করা হয়। এরূপ বর্ণনা তাঁহার আগন্তুক (accidental) রূপের বর্ণনা, স্বরূপের (essence) বর্ণনা নহে, ইহা ব্রহ্মের তটস্থ-লক্ষণ, স্বরূপ-লক্ষণ নহে।

কিন্তু ইহা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ নহে।

একটি দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টি বুঝান যায়। কোন মেষপালক রঙ্গমঞ্চে নটরূপে রাজা হইয়া দেশ জয় করিল এবং বিজিত দেশের শাসনকর্তা হইল। ঐ নট বাস্তবিক পক্ষে মেষপালক এবং তাহাকে মেষপালকরূপে বর্ণনা করিলে তাহার স্বরূপ-লক্ষণ দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে, রঙ্গমঞ্চের নটরূপে তাহাকে

CENTRAL LIBRARY

রাজা, বিজেতা ও শাসনকর্তা বলা হয়। এরূপ বর্ণনা তাহার স্বরূপের বর্ণনা নয়, পরন্তু তাহার আগন্তুক ধর্মের বর্ণনা, তাহার তটস্থ-লক্ষণ।

পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ।

ব্যাবহারিক-দৃষ্টিতে ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা, পালনকর্তা ও সংহারকর্তারূপে প্রতীয়মান হইলেও, পারমার্থিক-দৃষ্টিতে তিনি কেবল সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ। ইহাই তাঁহার স্বরূপ এবং এরূপ বর্ণনা তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ। যেরূপ নটকে রঙ্গমঞ্চের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যতিরেকে অন্য দৃষ্টিতে দেখা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মকে ব্যাবহারিক-দৃষ্টিতে না দেখিয়া পারমার্থিক-দৃষ্টিতে দেখা যায় এবং তাহাতে তাঁহার স্বরূপের জ্ঞান হয়। স্বরূপতঃ ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ। শঙ্করের মতে ইহাই পরম ব্রহ্ম।

মায়াবীর দৃষ্টান্ত।

ব্রহ্মের স্বরূপ ও তটস্থরূপ বুঝাইবার জন্য শঙ্কর সর্বদাই মায়াবীর অর্থাৎ যাদুকরের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই যাদুকরের মায়ার খেলা দর্শন করে এবং তাহাকে মায়াবীরূপে জানে, কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট মায়ার খেলাও হয় না, আর মায়াবীও নাই। সেইরূপ যাঁহারা জগৎপ্রপঞ্চ দর্শন করেন এবং তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের নিকটই ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টারূপে প্রতিভাত হন। কিন্তু যাঁহারা জগৎপ্রপঞ্চকে প্রাতিভাসিক বলিয়া জানেন, তাঁহাদের নিকট বাস্তবিক সৃষ্টিও নাই, আর বাস্তবিক স্রষ্টাও নাই।

শঙ্করমতে ব্রহ্ম বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত।

উপনিষদে ব্রহ্মকে বিশ্বগত (immanent) এবং বিশ্বাতীত **(transcendent)** বলা হইয়াছে। শঙ্করের মতে কেবল এইভাবেই আমরা ব্রহ্মকে বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত বলিয়া বুঝিতে পারি। যতক্ষণ জগৎপ্রপঞ্চ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ ইহা ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত থাকে, যেমন মিথ্যাসর্প রজ্জুতে অধিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু ব্রহ্ম জগৎপ্রপঞ্চদ্বারা কলুষিত বা স্পৃষ্ট হন না, তিনি ইহাকে অতিক্রম করিয়া আছেন, যেমন মিথ্যাসর্প রজ্জুকে সংস্পৃষ্ট করে না, অথবা নট রঙ্গমঞ্চে রাজ্যপ্রাপ্তি বা রাজ্যনাশদ্বারা উল্লসিত বা ব্যথিত হয় না। রামানুজের মতে ব্রহ্মের বিশ্বগতত্ব ও বিশ্বাতীতত্বের সামঞ্জস্য করা কঠিন। অবশ্য তিনি নানাভাবে ইহার চেষ্টা করিয়াছেন। পরে, তাহার আলোচনা করা যাইবে।

ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মের পূজা করা হয়।

ঈশ্বরের পূজার্চনার মূলে পূজ্য ও পূজকের ভেদবুদ্ধি নিহিত আছে। ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্য বা সদ্বস্তু তাহা আমরা অজ্ঞানবশতঃ উপলব্ধি করিতে পারি না এবং জীব ও জগতের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করি। ব্রহ্মকেও জগতের স্রষ্টা ও নিয়ামক বলিয়া পূজা করা হয়। অতএব পূজা ও পূজোর

ধারণাকে ব্যাবহারিক-দৃষ্টি-সম্ভূত বলিতে হইবে। ব্যাবহারিক-দৃষ্টিতে জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টাদি হিসাবে বহুগুণান্বিত বলিয়া প্রতীয়মান হন। এই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের পূজা করা হয়।

পারমার্থিক-দৃষ্টিতে ব্রহ্ম নিগুর্ণ।

পারমার্থিক-দৃষ্টিতে ব্রহ্মে জীবজগতের কোন গুণধর্ম আরোপ করা যায় না। পারমার্থিকরূপে ব্রহ্মে কোনপ্রকার ভেদ নাই। ভেদ তিনপ্রকার—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত। একজাতীয় দুই ব্যক্তির ভেদকে সজাতীয় ভেদ বলে, যেমন দুইটি গাভীর পরস্পরভেদ। ভিন্নজাতীয় দুইটি ব্যক্তির ভেদ বিজাতীয় ভেদ, যেমন একটি গাভী ও একটি অশ্বের ভেদ। একই ব্যক্তির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের ভেদকে স্বগত ভেদ বলে, যেমন কোন জীবশরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভেদ। ব্রহ্মে সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত কোনপ্রকার ভেদ নাই। কিন্তু রামানুজ ব্রহ্মে স্বগত ভেদ স্বীকার করেন, যেহেতু তিনি ব্রহ্মে চিৎ ও অচিৎ-রূপ ভিন্ন ভিন্ন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্করের মতে ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তার কোন বর্ণনা করা যায় না, ইহাকে নির্বিশেষ ও নির্গুণ বলিতে হয়। এমন কি, ব্রহ্মকে যে সত্য, অনন্ত ও জ্ঞানস্বরূপ বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মের সম্পূর্ণরূপে সঠিক বর্ণনা নয়, যদিচ ইহা অন্যরূপ বর্ণনা অপেক্ষা অধিক সঠিক। ব্রহ্মকে সত্য, অনন্ত ও জ্ঞানস্বরূপ বলার তাৎপর্য হইতেছে যে, ইহা অসত্য, সান্ত ও অচিদ্রূপ নয়।

জীবনে দৃষ্টিভঙ্গীর ভেদ করা হয়।

এখন দেখা যাইতেছে যে, পারমার্থিক-দৃষ্টিতে ব্রহ্ম নির্গুণ, যদিচ ব্যাবহারিক-দৃষ্টিতে ইহাকে সগুণ বলা যায়। দৃষ্টিভঙ্গীর ভেদ অদ্বৈতবেদান্তের কোন নূতন কথা নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বহুস্থলে এরূপ ভেদ স্বীকার করা হয়। একটি পত্রমুদ্রা (currency note) বাস্তবিক একখণ্ড কাগজ, কিন্তু দেশের প্রচলিত মুদ্রানীতি অনুসারে ইহা মুদ্রা; একটি ছবি বাস্তবিক নানাবর্ণে চিত্রিত কাগজ, কিন্তু ইহা মনুষ্যাদিরূপে প্রতীয়মান হয়। অদ্বৈতবেদান্তে বাস্তবিক ও প্রাতিভাসিকের যে সুবিদিত ভেদ তাহারই প্রয়োগ করিয়া ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক দৃষ্টির ভেদ করা হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধ নির্ণয় করা হইয়াছে।

ঈশ্বরোপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মোপলব্ধির সোপান।

যদিও পারমার্থিক-দৃষ্টিতে ঈশ্বর ব্রহ্মের প্রাতিভাসিক রূপমাত্র, তথাপি মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁহার উপযোগিতা কম নয়। ঈশ্বরোপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মোপলব্ধির প্রথম সোপান। চিন্তাবিমুখ সংসারী জীব কেবল এই জড়জগৎকেই সত্য বা সদ্বস্তু বলিয়া গ্রহণ করে এবং তাহাতেই আবদ্ধ থাকে। কালক্রমে জগতের অনিত্যতা ও অসারতা উপলব্ধি করিলে, সে কোন

নিত্য সদ্বস্তুর সন্ধান করে এবং জগৎস্রষ্টা ও জগৎপাতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। তখন সে শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের উপাসনা আরম্ভ করে। দীর্ঘকাল ঈশ্বরোপাসনার ফলে মানুষ শেষে দেখে যে, ঈশ্বরই একমাত্র সদ্বস্তু, জগৎ মিথ্যা ও মায়াময়। এরূপ উপলব্ধি হইলে অচিরাৎ তাহার ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। অতএব সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উপাসনাকে নির্গুণ ব্রহ্মোপলব্ধির সহায়ক বলিতে হয়। শংকর সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার উপযোগিতা স্বীকার করেন। ইহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণাই হয় না। অতএব ঈশ্বরোপাসনা অবশ্য কর্তব্য। এমন কি, তিনি দেবদেবীর পূজারও উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। কারণ তাহাতেও চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস জন্মে।

(৩) শঙ্করের মতে আত্মা, বন্ধ ও মোক্ষ

জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

শংকর কেবলাদ্বৈতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার মতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ, বিষয় ও বিষয়ীর অর্থাৎ জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভেদ এবং বিষয় ও বিষয়ান্তরের ভেদ—সর্বপ্রকার ভেদই মায়াকল্পিত ও মিথ্যা। তিনি সর্বপ্রকারভেদবর্জিত একত্বে বিশ্বাস করিতেন। উপনিষদে পুনঃ পুনঃ জীব ও ব্রহ্মের একত্ব-বিষয়ে উপদেশ করা হইয়াছে। শংকরও জীবাত্মা ও ব্রহ্মের একত্বে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে জীবাত্মা ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন।

দেহ সদ্বস্তু নয়।

আপাতদৃষ্টিতে মানুষ দেহ ও আত্মার সমষ্টি। কিন্তু মানুষের দেহ অন্যান্য জড়দ্রব্যের ন্যায় মিথ্যা অবভাসমাত্র। দেহ সদ্বস্তু নয় ইহা উপলব্ধি করিলে দেহাত্মজ্ঞান চলিয়া যায় এবং কেবল আত্মাই থাকে। দেহব্যতিরিক্ত আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মা ও ব্রহ্মের কোন ভেদ নাই। উপনিষদুক্ত 'তৎ-ত্বম্-অসি' মহাবাক্যে আত্মা ও ব্রহ্মের

'তৎ-ত্বম্-অসি' বাক্যের অর্থ

একান্ত অভেদের কথা বলা হইয়াছে। অবশ্য যদি এখানে 'ত্বম্' অর্থাৎ 'তুমি' শব্দদ্বারা দেহবিশিষ্ট ও দেহদ্বারা পরিচ্ছিন্ন জীবকে বুঝা যায় এবং 'তৎ' অর্থাৎ 'সেই' শব্দদ্বারা বিশ্বাতীত ব্রহ্মকে বুঝা যায়, তবে 'ত্বম্' ও 'তৎ' এক বা অভিন্ন হইতে পারে না। অতএব 'ত্বম্' শব্দদ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত শুদ্ধচৈতন্যকে বুঝিতে হইবে এবং 'তৎ' শব্দদ্বারাও বিশেষণবর্জিত শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলেই তাহাদের একতা বা অভেদ প্রতিপন্ন হইবে এবং বেদান্তে বা উপনিষদে তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। অখণ্ডার্থক বাক্যদ্বারা বিষয়টি বুঝান যায়। একত্ব-বিষয়ক বাক্যকে (identity judgment) অখণ্ডার্থক বাক্য বলে, যেমন 'এই সেই দেবদত্ত'—এই বাক্য। এখানে এই

দেশে ও কালে দৃষ্ট দেবদত্ত যে পূর্বকালে ও ভিন্ন দেশে দৃষ্ট দেবদত্ত হইতে অভিন্ন, অথবা একই দেবদত্ত যে পূর্বে ও বর্তমানে দৃষ্ট হইল, তাহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু দেবদত্তের অতীত ও বর্তমান দেশিক ও কালিক অবস্থা ভিন্ন, অতএব ভিন্ন অবস্থাপন্ন দেবদত্ত ভিন্ন হইবে, এক হইতে পারে না। তথাপি দেশ-কাল-সম্বন্ধ-বর্জিত দেবদত্ত যে এক তাহা স্বীকার্য। এইভাবে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ ভেদক অবস্থা ব্যতিরেকে এবং শুদ্ধ চৈতন্যরূপে জীব ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন বুঝিতে হইবে। জীবাত্মা দেহ-মন-সম্বন্ধদ্বারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ব্রহ্মও স্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি গুণদ্বারা জীবাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হন। কিন্তু এসব ভেদক গুণধর্ম বাস্তবিক নয়, ইহারা মায়িক ও প্রাতিভাসিক। অতএব জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন বলিয়া অবভাসিত হইলেও, বস্তুতঃ ইহারা এক ও অভিন্ন। ইহাই প্রতিপাদন করা 'তৎ-ত্বম্-অসি' বাক্যের গূঢ়ার্থ। জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ জীব ব্রহ্মই, অপর কিছু নয়, ইহা ব্রহ্মভূত ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ। অজ্ঞানজন্য দেহসম্বন্ধদ্বারা ইহা ক্ষুদ্র ও পরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর মায়ার কার্য।

দেহ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সমষ্টি। স্থূল শরীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ ও অন্তঃকরণের (মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্তের) সমষ্টি। মৃত্যুকালে স্থূল শরীর বিনষ্ট হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর বিদ্যমান থাকে এবং আত্মার সহিত দেহান্তরে গমন করে। স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়প্রকার শরীরই মায়ার কার্য এবং প্রাতিভাসিকমাত্র।

অজ্ঞানজন্য দেহসম্বন্ধই আত্মার বন্ধন।

অনাদি অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশতঃ আত্মার দেহের সহিত ভ্রান্ত সম্বন্ধবোধ হয়। দেহসম্বন্ধবোধই আত্মার বন্ধ। বন্ধাবস্থায় আত্মা তাহার ব্রহ্মরূপত্ব বিস্মৃত হইয়া নিজেকে ক্ষুদ্র, পরিচ্ছিন্ন ও দুঃস্থ জীব বলিয়া ভাবে এবং মনে করে যে, সে প্রিয় বস্তু পাইলে সুখী হয়, না পাইলে দুঃখী হয়। সে নিজেকে দেহ ও মনের সহিত অভিন্ন বোধ করে। ইহা হইতেই তাহার অহংজ্ঞান বা আমিত্ব-বোধ জন্মে এবং অন্য বস্তুর সঙ্গে তাহার পার্থক্য ও বিরোধের সৃষ্টি হয়। অহং বা আমি বাস্তবিক আত্মা নয়, ইহা আত্মার এক প্রাতিভাসিক পরিচ্ছিন্ন রূপমাত্র।

অহং আত্মা নয়।

বন্ধাবস্থায় আত্মার জ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়।

দেহসম্বন্ধদ্বারা আত্মার জ্ঞানও সীমাবদ্ধ ও পরিচ্ছিন্ন হয়। আত্মা ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের মাধ্যমে বিষয়ের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান লাভ করে। এরূপ পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান দুইপ্রকার—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। যেমন জল কোন নালী দিয়া কোন জমিতে পড়িলে জমির আকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণ কোন ইন্দ্রিয়-

দ্বার দিয়া বহির্বিষয়ে গমন করিয়া তদাকারে পরিণত হয় এবং তাহা হইলেই প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। পরোক্ষজ্ঞান পাঁচপ্রকার—অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। এইসব প্রমাণ বিষয়ে অদ্বৈতমত ভাট্টমীমাংসা-মতের অনুরূপ। ভাট্টমত পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—সাধারণ জ্ঞানের তিনটি স্তর।

আমাদের সাধারণ জ্ঞানের তিনটি স্তর বা ভূমি আছে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রদবস্থায় মানুষ নিজেকে স্থূল-শরীর এবং বাহ্য ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সহিত অভিন্ন মনে করে। স্বপ্নাবস্থায় মানুষের পূর্ব-প্রত্যক্ষের সংস্কারজন্য বিষয়সকলের জ্ঞান হয়। এঅবস্থায় সে জ্ঞাতারূপে বিষয়গুলি জানে এবং বিষয়দ্বারা তাহার জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ হয়। সুষুপ্তিকালে তাহার কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকে না। বিষয় না থাকায় সেও নিজেকে বিষয়ী বলিয়া জানে না। এমত অবস্থায় বিষয়ী ও বিষয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এরূপ ভেদজ্ঞান বা দ্বৈতবোধও থাকে না। তখন সে নিজেকে দেহদ্বারা সীমাবদ্ধ বোধ করে না। কিন্তু তখন যে কোন জ্ঞান থাকে না তাহা নয়। জ্ঞান না থাকিলে নিদ্রাভঙ্গের পর কেহ সুষুপ্তির কথা স্মরণ করিতে পারিত না, কেহ বলিতে পারিত না যে, সে সুখে ও শান্তিতে নিদ্রা গিয়াছিল। অতএব সুষুপ্তিকালে জ্ঞান থাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

সুষুপ্তিকালে আত্মার দেহসম্বন্ধবোধ থাকে না। ইহা হইতে আত্মার স্বরূপের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। আত্মা স্বরূপতঃ ক্ষুদ্র ও দুঃস্থ জীব নয়। ইহা অহং বা আমি নয় এবং তুমি বা অন্য বস্তু হইতে পৃথক্‌ও নয়। ইহার বিষয়-বাসনাও নাই এবং তজ্জন্য শোক ও দুঃখও নাই। ইহা বাস্তবিক অনন্ত জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ।

কিভাবে শুদ্ধ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, শঙ্কর ও তাঁহার অনুগামিগণ তাহার পথনির্দেশ করিয়াছেন। সুষুপ্তি শান্তি ও আনন্দের অবস্থা বটে। কিন্তু ইহা স্থায়ী হয় না। নিদ্রাভঙ্গের পর মানুষের আবার ভ্রান্ত দেহসম্বন্ধের ও দুঃখের অনুভূতি হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সুষুপ্তিকালেও মানুষের পূর্বসঞ্চিত কর্ম বা অবিদ্যার লেশ থাকে এবং তাহাই মানুষকে পুনরায় জগৎভ্রমে পাতিত করে। যতদিন পূর্বসঞ্চিত কর্ম বিনষ্ট না হয়, ততদিন মানুষের দুঃখবন্ধন হইতে মুক্তি হয় না।

বেদান্ত পাঠের জন্য মীমাংসা-বিচার অনাবশ্যক।

বেদান্তবিচারে অবিদ্যা-নিবৃত্তির সহায়তা হয়। কিন্তু বেদান্তের উপদেশ পাঠ করিলেই অভীষ্ট ফললাভ হয় না। এজন্য বেদান্তপাঠের অধিকার অর্জন করিতে হয়। রামানুজের মতে বেদান্ত পাঠ করিবার পূর্বে মীমাংসাসূত্র পাঠ করা আবশ্যক। কিন্তু শঙ্করের মতে মীমাংসা-বিচার

CENTRAL LIBRARY

বেদান্ত-বিচারের অনুকূল নয়, বরং প্রতিকূল। মীমাংসায় দেবতাদের উদ্দেশে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের উপদেশ করা হইয়াছে। ইহাতে পূজ্য, পূজক প্রভৃতি নানা বস্তুর ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব ইহা অদ্বৈতজ্ঞানের বিরোধী। ইহাতে অদ্বৈতজ্ঞানের উন্মেষ না হইয়া দ্বৈত ও নানাত্বভ্রান্তি দৃঢ়মূল হয়।

বেদান্তবিচারের জন্য বিবেক, বৈরাগ্য, শমদমাদি ও মুমুক্ষুত্ব—এই সাধন-চতুষ্টয় অর্জন করা আবশ্যক। প্রথমে নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক অর্থাৎ ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, তদ্ভিন্ন সমস্তই অনিত্য এরূপ জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। তৎপরে ইহলোক ও পরলোকের সকল বস্তুর ভোগবাসনা ত্যাগ করা আবশ্যক। তারপর শম (অন্তরিন্দ্রিয় সংযম), দম (বহিরিন্দ্রিয় সংযম), উপরতি (বিহিত কর্মের যথাবিধি ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ), তিতিক্ষা (শীত-গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা), সমাধি (চিত্তের একাগ্রতা) ও শ্রদ্ধা (শাস্ত্র ও আচার্য-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস)—এই ষট্-সম্পত্তি অর্জন করিতে হইবে। তারপর মোক্ষলাভের আন্তরিক ইচ্ছা থাকাও প্রয়োজন।

কিন্তু সাধন চতুষ্টয় আবশ্যক।

এই সাধনচতুষ্টয়-সমন্বিত ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নিকট বেদান্তপাঠ আরম্ভ করিবেন। বেদান্তপাঠ বা বিচারের তিনটি অঙ্গ হইল—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। প্রথমে আচার্যের নিকট বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিতে হইবে। তৎপরে নিজে যুক্তিতর্ক করিয়া আচার্যের উপদেশের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহার নাম মনন। পরিশেষে আচার্যোপদিষ্ট সত্য বা তত্ত্বগুলির নিরন্তর ধ্যান বা ভাবনা করিতে হইবে। ইহাকেই নিদিধ্যাসন বলে।

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বেদান্তপাঠের তিন অঙ্গ।

বেদান্তোপদিষ্ট তত্ত্বগুলির জ্ঞান হইলেই পূর্বকার দৃঢ়মূল ভ্রান্ত ধারণাগুলি বিনষ্ট হয় না। কেবল তত্ত্বগুলি নিরন্তর ধ্যান করিলে এবং তদনুসারে জীবন যাপন করিলে, সেগুলি ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। সেগুলি দূরীভূত হইলে এবং বেদান্তবাক্যে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিলে, আচার্য মুক্তিকামী ব্যক্তিকে 'তৎ-ত্বম্-অসি' এই মহাবাক্যের উপদেশ করেন। তিনি তখন এই মহাবাক্যনিহিত তত্ত্বের নিরন্তর ধ্যান করেন এবং পরিশেষে 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপে সেই তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করেন। এইরূপে আত্মা ও ব্রহ্মের অপারমার্থিক ভেদদর্শনের নিবৃত্তি হয়। ভেদদর্শনই বন্ধের মূল। অতএব ভেদদর্শনের নিবৃত্তি হইলে বন্ধনিবৃত্তি হয় এবং তাহাই মুক্তি।

আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধিই বন্ধন-মুক্তি।

মুক্তির পরেও মুক্ত পুরুষের দেহ প্রারব্ধকর্মবশে কিছুকাল থাকিতে পারে। কিন্তু মুক্ত পুরুষের আর দেহাত্মবুদ্ধি থাকে না এবং তিনি সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হন না। তিনি সংসারের সব বস্তু দর্শন করেন বটে, কিন্তু তাহাতে আকৃষ্ট হন না।

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি।

তিনি সংসারে নির্লিপ্তভাবে বাস করেন। জীবদ্দশায় এইরূপ মুক্তির নাম জীবন্মুক্তি। বুদ্ধ, সাংখ্য, জৈন এবং অন্য কোন কোন ভারতীয় দার্শনিকের ন্যায় শঙ্কর জীবন্মুক্তির সম্ভাব্যতা স্বীকার করেন। মুক্ত পুরুষের পূর্ব-জন্মের সঞ্চিত কর্ম নষ্ট হইয়া যায় এবং বর্তমানের ক্রিয়মাণ বা সঞ্চীয়মান কর্ম নিষ্কাম বলিয়া কোন ফল প্রসব করে না। প্রারব্ধকর্ম ভোগদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তিনি বিদেহমুক্তি লাভ করেন।

মুক্তিতে নূতন কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না।

মুক্তিতে নূতন কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না, অথবা কোন পূর্বতন অবস্থার সংস্কার-সাধনও করা হয় না। মুক্তির অবস্থা নিত্য সত্য, এমন কি বন্ধাবস্থাতেও তাহার অপগম হয় না। ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বই মুক্তি এবং ইহা সর্বকালেই সত্য। এই সত্য বিস্মৃত হইয়া আত্মা ও ব্রহ্মের মিথ্যা ভেদদর্শন করিলে বন্ধন হয়; আর এই সত্যের উপলব্ধি বা সাক্ষাৎপ্রতীতি হইলে মুক্তি হয়। অতএব যাহা চিরসত্য তাহার উপলব্ধিই মুক্তি। এযেন কেহ নিজের গলদেশস্থ হার বিস্মৃত হইয়া এখানে ওখানে খুঁজিয়া বেড়ায় এবং পরে চমক্ ভাঙ্গিলে দেখে যে তাহার গলদেশেই হার রহিয়াছে।

মুক্তি আনন্দের অনুভূতি।

মুক্তি আত্মা ও ব্রহ্মের মিথ্যা ভেদদর্শনজন্য দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিমাত্র নয়। ইহা এক দিব্য আনন্দের অনুভূতির অবস্থা, কারণ ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ এবং মুক্তি ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বের উপলব্ধি।

মুক্তির সহিত নিষ্কাম কর্মের বিরোধ নাই।

যদিও মুক্ত পুরুষের কাম্য বা প্রাপ্তব্য কোন বস্তু নাই, তথাপি তিনি নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার কর্মবন্ধন হয় না। ভগবদ্‌গীতার উপদেশ অনুসারে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, সকাম কর্মই বন্ধনের হেতু। কিন্তু মুক্ত পুরুষের কোন কামনা-বাসনা থাকে না। তিনি কোন ফলের আশা না করিয়া কর্ম করিতে পারেন। অতএব কর্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে তিনি উল্লসিত বা ব্যথিত হন না। শঙ্কর নিষ্কাম কর্মের বিশেষ উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা মোক্ষপথের পথিক, কিন্তু এখনও মোক্ষলাভ করেন নাই, নিষ্কাম কর্মদ্বারা তাঁহাদের আত্মশুদ্ধি হয়। অহঙ্কার ও স্বার্থ-বুদ্ধি নিষ্কাম কর্মদ্বারাই নিবৃত্ত হয়, কর্মত্যাগদ্বারা তাহা হয় না। যাঁহারা পূর্ণজ্ঞান বা মোক্ষের অধিকারী, তাঁহাদের পক্ষেও নিষ্কাম কর্ম অজ্ঞ ও বদ্ধ জীবগণের হিতার্থে প্রয়োজন। মুক্ত পুরুষ জনসমাজের আদর্শস্থানীয়। তাঁহার আচরণ দেখিয়াই লোকে শিখিবে,—তাহার কর্ম ও অকর্ম যেন

নিষ্কাম কর্মের উপযোগিতা।

জনসাধারণকে বিভ্রান্ত না করে। শংকরের মতে পূর্ণজ্ঞানের সহিত সমাজ-সেবার বিরোধ নাই, বরং সামঞ্জস্যই আছে। ইহা তাঁহার জীবনেই দেখা যায়। জগদ্‌বরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ, লোকমান্য বালগংগাধর তিলক' প্রভৃতি আধুনিক যুগের বেদান্তিগণ জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ের আদর্শই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

সৎ ও অসৎ কর্মের ভেদ বেদান্তে অস্বীকৃত নয়।

অদ্বৈতবেদান্তের সমালোচকগণ প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, যখন অদ্বৈতমতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং সকলপ্রকার ভেদ অসত্য বা মিথ্যা, তখন সৎ ও অসৎ এবং পুণ্য ও পাপ কর্মের ভেদও মিথ্যা হইবে। এরূপ হইলে অদ্বৈতমতকে সমাজের অহিতকারী বলিতে হইবে। কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে, পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক দৃষ্টিভেদের অপলাপ করিয়া এইরূপ আপত্তি করা হয়। ব্যাবহারিক-দৃষ্টিতে সৎ ও অসৎ, পুণ্য ও পাপ কর্মের ভেদ, তথা অন্যান্য ভেদ যথার্থ। বদ্ধপুরুষের পক্ষে যেকর্ম ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বোপলব্ধির সহায়ক তাহা সৎ, যেমন সত্যনিষ্ঠা, দয়া, দান, সংযম ইত্যাদি কর্ম। পক্ষান্তরে, যেসব কর্ম সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ইহার বিঘাতক বা বিঘ্নকারী, তাহা অসৎ, যেমন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা, হিংসা ইত্যাদি। মুক্তপুরুষের পক্ষে সৎ ও অসৎ এবং পুণ্য ও পাপ কর্মের ভেদ ব্যাবহারিক, পারমার্থিক নয়। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অসৎ বা পাপকর্ম করেন না। আত্মা ও ব্রহ্মের একত্বের উপলব্ধি হইলে দেহাত্মবুদ্ধি অপগত হয় এবং তাহার অপগমে স্বার্থপরতা, হিংসা, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতিও দূরীভূত হয়। রাগ-দ্বেষ হইতেই অসৎ বা পাপকর্মের উৎপত্তি হয়। অতএব মুক্তপুরুষের পাপ বা অসৎ কর্মে প্রবৃত্তির হেতুই থাকে না এবং তিনি কেবল সৎ কর্মই করেন।

উপসংহার।

অদ্বৈতবেদান্তের সব সম্ভাব্য দোষ-গুণ সত্ত্বেও, ইহাকে সর্বসত্তার একত্ব-বিষয়ে উপনিষদের উপদেশের সর্বাধিক সংগত ব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। উইলিয়াম্‌ জেমস্‌ বেদান্তকে সর্বোৎকৃষ্ট একত্ববাদ বলিয়া সমাদর করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সকল ব্যক্তির উপযোগী নয়। যেসব ব্যক্তির নিকট সংসারই সারবস্তু এবং ঐহিক সুখভোগই জীবনের চরম উদ্দেশ্য, তাঁহারা অদ্বৈতবেদান্তের সমাদর করিতে পারিবেন না। কিন্তু যে কতিপয় সুকৃতিসম্পন্ন, ধীমান্‌ ও বৈরাগ্যবান্‌ পুরুষ জগতের অনিত্যতা ও অসারতা উপলব্ধি করিয়া নিত্য, অজর ও অমর আত্মা বা ব্রহ্মলাভে দৃঢ়সংকল্প, তাঁহাদের নিকট অদ্বৈতবেদান্তের অতুলনীয় মহিমা সুপ্রকাশিত।

CENTRAL LIBRARY

৩। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

(১) জগৎ সম্বন্ধে রামানুজের মত

রামানুজ উপনিষদে বর্ণিত সৃষ্টি বাস্তবিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সর্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম স্বীয় ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে স্বকীয় দেহ হইতে বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। অচিৎ জড়দ্রব্য ও চিৎ-রূপ জীবাত্মাসমূহ পরব্রহ্মের অন্তর্গত এবং তাঁহার অংশ। জড়দ্রব্য হইতে জাগতিক জড় বস্তুসকল উৎপন্ন হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, স্মৃতি ও পুরাণের মতানুসারে রামানুজ জড়দ্রব্যকে প্রকৃতি বলিয়াছেন। সাংখ্যের ন্যায় রামানুজও ইহাকে অজ ও নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্যমত হইতে তাঁহার মতের পার্থক্য আছে। তিনি প্রকৃতিকে ব্রহ্মের অংশ এবং ব্রহ্মকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বলেন, যেমন মানবদেহ তদন্তর্গত আত্মা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। প্রলয়কালে প্রকৃতি সূক্ষ্ম, অব্যক্ত ও অবিভক্ত অবস্থায় থাকে। পূর্বকল্পে জীবসকলের কর্মানুসারে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্রহ্ম ব্যক্ত জগৎ সৃষ্টি করেন। সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়া অব্যক্ত প্রকৃতি অগ্নি, অপ্ ও ক্ষিতি এই তিনটি সূক্ষ্মভূতে পরিণত হয়। এই তিনটি সূক্ষ্ম ভূতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিনটি গুণ প্রকাশিত হয়। গুণগুলি প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এবং প্রকৃতির ধর্ম, সাংখ্যের গুণের ন্যায় ইহারা প্রকৃতির উপাদানভূত দ্রব্য নয়। ক্রমে সূক্ষ্ম ভূতগুলির সংমিশ্রণ ঘটে এবং তাহা হইতে জড়জগতের স্থূল দ্রব্যগুলির উৎপত্তি হয়। প্রত্যেক প্রাকৃতিক দ্রব্যে এই তিনটি সূক্ষ্ম ভূতের সংমিশ্রণ হইয়াছে। এই তিনটির সংমিশ্রণের নাম ত্রিবৃৎকরণ।

উপনিষদে বাস্তবিক সৃষ্টির বর্ণনা।

ব্রহ্মের অন্তর্গত জড়দ্রব্য হইতে জড় জগতের উৎপত্তি।

রামানুজের মতে সৃষ্টি বাস্তবিক এবং সৃষ্ট জগৎ ব্রহ্মের ন্যায় সৎ। অবশ্য কোন কোন উপনিষদ্-বাক্যে নানা বস্তুর সত্তা অস্বীকৃত হইয়াছে এবং তাহাদের একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। রামানুজের মতে এসব বাক্যে প্রকৃতপক্ষে নানা বস্তুর সত্তা অস্বীকৃত হয় নাই। এসব বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, এক ব্রহ্ম সর্ব বস্তুতে বিদ্যমান এবং সর্ব বস্তুর সত্তা ব্রহ্মসত্তায় প্রতিষ্ঠিত, যেমন সকল সুবর্ণ নির্মিত দ্রব্যের সত্তা সুবর্ণের সত্তায় প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদে নানা বস্তুর ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে অবস্থিতি অস্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্ম হইতে অপৃথকরূপে অবস্থিতি অস্বীকৃত হয় নাই।

জগৎ ব্রহ্মের বাস্তবিক সৃষ্টি।

CENTRAL LIBRARY

রামানুজ স্বীকার করেন যে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৪।১০) ঈশ্বরকে মায়ী অর্থাৎ মায়াবী বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার অর্থ হইতেছে যে, ঈশ্বরের দুর্জ্ঞেয় সৃষ্টি-শক্তি মায়াবীর শক্তির ন্যায় বিস্ময়করী। এখানে মায়া শব্দের অর্থ হইতেছে ঈশ্বরের বিচিত্র-সর্গ-সৃজনকরী শক্তি। ইহা মায়াবীর ইন্দ্রজাল বিস্তার করিবার শক্তি নয় এবং ঈশ্বরও এই অর্থে মায়াবী নহেন। অতএব রামানুজের মতে সৃষ্টি ও সৃষ্ট জগৎ মিথ্যা ও মায়াময় নয়। জগৎ ঈশ্বরের বিস্ময়করী সদ্রূপা শক্তির বাস্তবিক সৃষ্টি।

মায়া ঈশ্বরের বিস্ময়করী বাস্তবিক সৃষ্টির শক্তি।

(ক) অদ্বৈতবাদে অবিদ্যা-কল্পনায় দোষ প্রদর্শন

রামানুজের মতে অদ্বৈতবেদান্তে মায়া বা অবিদ্যার যে কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসহ নহে। ইহাতে সাতপ্রকার অনুপপত্তি দোষ দেখা যায়, অর্থাৎ সাতপ্রকার দোষহেতু ইহাকে উপপন্ন বা প্রতিষ্ঠিত বলা যায় না। এখানে রামানুজের প্রধান আপত্তিগুলির উল্লেখ করা যাইবে এবং শঙ্করের পক্ষ হইতে ইহাদের কিরূপ সমাধান হইতে পারে তাহার আভাস দেওয়া যাইবে।

অবিদ্যার কোন আশ্রয় নাই।

(১) অদ্বৈতবাদে বলা হইয়াছে যে, একমাত্র ব্রহ্ম সত্য, বিবিধ ভেদ-সম্বলিত এই সমস্ত জগৎই অবিদ্যা বা অজ্ঞান-বশতঃ ব্রহ্মে কল্পিত—মিথ্যা। এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞান কাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে? জীবকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে, একথা বলা যায় না; কারণ জীবভাবটিও অবিদ্যাদ্বারাই কল্পিত ও অবিদ্যা-প্রসূত, সুতরাং পরভাবী কার্যকে পূর্বভাবী কারণ অবলম্বন করিতে পারে না। ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াও ভ্রম উৎপাদন করিতে পারে না; কারণ ব্রহ্ম প্রকাশমান জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহাতে অজ্ঞান কোনরূপেই থাকিতে পারে না। আর এক কথা, যদি অজ্ঞান ব্রহ্মকে আশ্রয় করে, তবে তাঁহাকে আর সর্বজ্ঞ বলা যায় না।

ইহার খণ্ডন।

এখানে শঙ্করের সপক্ষে বলা যায় যে, জীবকে অবিদ্যা বা অজ্ঞানের আশ্রয় বলিলে যে দোষের আশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহা অমূলক; কারণ অবিদ্যা ও জীবভাব পূর্ব ও পরভাবী দুইটি বস্তু নয়, ইহারা একই বস্তুর দুই দিক্, যেমন একটি মুদ্রার দুই পৃষ্ঠ। জীবভাবের নামই অবিদ্যা বা অজ্ঞান। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মকে অবিদ্যা বা অজ্ঞানের আশ্রয় বলিলেও দোষ হয় না। ব্রহ্মে অবিদ্যা জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিবার মায়াশক্তি; তাহাদ্বারা জীব জগৎভ্রমে পতিত হয়, কিন্তু ব্রহ্মে

কোন দোষস্পর্শ হয় না, যেমন যাদুকরের যাদুশক্তির দ্বারা যাদুকর প্রতারিত হন না, কেবল অজ্ঞ দর্শকই প্রতারিত হয়।

অবিদ্যাদ্বারা ব্রহ্ম আবৃত হইলে তাঁহার প্রকাশ-স্বভাবের নাশ হয়।

(২) শংকরের মতে অবিদ্যাদ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত বা তিরোহিত হয়। কিন্তু ব্রহ্ম প্রকাশস্বভাব; তাঁহার প্রকাশের তিরোধান হইলে, তাঁহার স্বরূপেরই নাশ হয় এবং তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েন।

ইহার উত্তর।

এই আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, অবিদ্যাদ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত হয়, এই কথার অর্থ হইতেছে, অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তির নিকট ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত হয়, যেমন মেঘদ্বারা সূর্য আবৃত হইলে আমরা ইহাকে দেখিতে পাই না। কিন্তু যেমন মেঘ সূর্যের প্রকাশ-স্বভাবের বিনাশ করিতে পারে না, সেইরূপ অজ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপের নাশ করিতে পারে না। অন্ধ ব্যক্তি সূর্য দেখিতে পায় না বলিয়া সূর্যের প্রকাশ-স্বভাব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না।

অবিদ্যার অনির্বচনীয়ত্ব অর্থহীন।

(৩) অদ্বৈতবাদে অবিদ্যাকে অনির্বচনীয় বলা হইয়াছে। কিন্তু অনির্বচনীয় শব্দের অর্থ কি? অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, ইহা সৎও নহে আর অসৎও নহে, এই অর্থে ইহা অনির্বচনীয়। যাহাকে সৎ বা অসৎ বলিয়া নিরূপণ করা যায় না, তাহাই অনির্বচনীয়। কিন্তু এরূপ বস্তু প্রমাণসিদ্ধ নয়। আমাদের প্রতীতিগম্য সকল বস্তুই হয় সৎ, আর না হয় অসৎ। যাহা সৎও নয়, অসৎও নয়, তাহা প্রতীতিগম্য নয় এবং তাহার কোন প্রমাণ নাই, এরূপ অনির্বচনীয় এক বিচিত্র বস্তু।

ইহার খণ্ডন।

রামানুজ অবিদ্যার অনির্বচনীয়ত্বে যে অনুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার খণ্ডনে বলা যায় যে, মায়া বা অবিদ্যা অথবা যে-কোন ভ্রমপ্রত্যক্ষের বিষয়কে অনির্বচনীয় বলিবার সঙ্গত হেতু আছে। কোন ভ্রমপ্রত্যক্ষের বিষয়, যেমন রজ্জুতে দৃষ্ট সর্প, প্রত্যক্ষীভূত হয়। অতএব ইহাকে বন্ধ্যাপুত্র বা আকাশ-কুসুমের ন্যায় তুচ্ছ বা অসৎ বলা যায় না, কারণ এসব বস্তুর ভ্রমপ্রত্যক্ষও হয় না। পক্ষান্তরে, ভ্রমদৃষ্ট বস্তু কালান্তরে অন্য প্রত্যক্ষদ্বারা বাধিত ও নিরাকৃত হয়। অতএব ইহাকে আত্মা বা ব্রহ্মের ন্যায় পারমার্থিক সৎ বলা যায় না, কারণ আত্মা বা ব্রহ্ম কখনও বাধিত হন না। অতএব দেখা যায় যে, অজ্ঞান অবিদ্যা বা তজ্জন্য ভ্রমদৃষ্ট বস্তু একেবারে অসৎও নয়, আবার একেবারে সৎও নয়। এইঅর্থে ইহাদিগকে সৎ বা অসৎ-রূপে অনির্বচনীয় বলা হইয়াছে। আর এই অর্থে কোন বস্তু যে হয় সৎ আর না হয় অসৎ হইবে এমন নিয়ম নাই, যেমন কোন বস্তু যে অতি উষ্ণ বা অতি শীতল হইবে এমন কথা নাই।

(৪) অদ্বৈতবাদীরা কখন কখন মায়া, অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে ভাবরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা সংগত নয়। জ্ঞানের অভাবের নামই অজ্ঞান, সুতরাং অবিদ্যা বা অজ্ঞান ভাবরূপ হইতে পারে না।

অবিদ্যা ভাবরূপ নহে।

এই আপত্তির খণ্ডনে বলা যায় যে, যেহেতু অজ্ঞান কেবল বস্তুর স্বরূপ আচ্ছাদন করে না, ইহা এক বস্তুতে অন্য বস্তুর প্রতিভাসের সৃষ্টি করে, ইহাকে ভাবরূপ বলাই সমীচীন।

ইহার খণ্ডন।

(৫) রামানুজের আর এক আপত্তি হইল এই যে, যদি অজ্ঞান ভাবরূপই হয়, তবে আত্মা ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞানদ্বারা উহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। যাহা ভাব পদার্থ তাহা জ্ঞানদ্বারা বাধিত ও নিরাকৃত হয় না। পিত্তজনিত চক্ষুরোগ হইলে লোকে শ্বেতদ্রব্যকে পীতবর্ণ দেখে। কোনরূপ জ্ঞানদ্বারা এ ভ্রমদর্শনের নিবৃত্তি হয় না, কেবল পিত্তপ্রকোপ দূর করিলে ইহার নিবৃত্তি হয়। সেইরূপ অজ্ঞান ভাবরূপ হইলে ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানে অজ্ঞান-নিবৃত্তি হইতে পারে না।

অবিদ্যা ভাবরূপ হইলে জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে না।

পূর্বোক্ত আপত্তির এইরূপ উত্তর দেওয়া যায়। অজ্ঞানকে ভাবরূপ বলার অর্থ হইতেছে যে, ইহা কোন মিথ্যা বস্তুকে ভাবরূপে প্রতীয়মান করে। এইঅর্থে অজ্ঞান জ্ঞানদ্বারা বাধিত হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রমস্থলে মিথ্যা সর্প ভাবরূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ঐ মিথ্যা সর্পের অধিষ্ঠান রজ্জুর জ্ঞান হইলে উহা বাধিত হয়।

ইহার উত্তর।

(২) রামানুজের ব্রহ্মবাদ

রামানুজের মতে ব্রহ্মই একমাত্র পরম তত্ত্ব, জড়দ্রব্য (matter) এবং জীবাত্মাসমূহ ব্রহ্মের অন্তর্গত ও অঙ্গীভূত। ব্রহ্মের বহির্দেশে কোন বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা নাই। কিন্তু তাঁহার অভ্যন্তরে অচিৎ বা জড়দ্রব্যসকলের এবং চিৎ বা জীবাত্মাসমূহের বাস্তবিক সত্তা আছে। এক পরম তত্ত্বে বহুর স্থান আছে। রামানুজের মতকে বিশিষ্টাদ্বৈত বলে, কারণ এ মতে চিৎ-অচিৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম এক ও অদ্বৈত। শঙ্করের ন্যায় তিনি ব্রহ্মকে নির্গুণ ও নির্বিশেষ বলেন না। তাঁহার মতে ব্রহ্ম ভেদরহিত নহেন। অবশ্য ব্রহ্মে সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই, কারণ ব্রহ্মের সজাতীয় অর্থাৎ একজাতীয় কোন বস্তু

ব্রহ্ম চিৎও অচিৎ-বিশিষ্ট পরম তত্ত্ব।

CENTRAL LIBRARY

নাই এবং তাঁহার বিজাতীয় অর্থাৎ ভিন্ন জাতীয় কোন বস্তুও নাই। কিন্তু ব্রহ্মে স্বগত ভেদ আছে, যেহেতু তাঁহার অভ্যন্তরে জড় ও চেতন দ্রব্যসকল বিদ্যমান এবং ইহারা পরস্পর ভিন্ন।

ব্রহ্ম সর্ব-সদ্-গুণ-সমন্বিত।

ব্রহ্মের অসংখ্যেয় ও অপরিমেয় সদ্‌গুণ আছে—যথা সর্বশক্তিমত্ত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, করুণাময়ত্ব ইত্যাদি। তিনি সগুণ—নির্গুণ ও নির্বিশেষ নহেন। উপনিষদে ব্রহ্মকে যে নির্গুণ বলা হইয়াছে তাহার অর্থ হইতেছে যে তাঁহাতে কোন হেয় গুণ বা অসদ্‌গুণ নাই, তিনি হেয়গুণ-সম্বন্ধ-বর্জিত। ব্রহ্ম সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন। প্রলয়কালে জাগতিক স্থূল বস্তুসমূহ থাকে না বটে, কিন্তু তখনও সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত জড়দ্রব্য এবং জীবাত্মাসমূহ ব্রহ্মে বিদ্যমান থাকে, কারণ ইহারা উভয়েই নিত্য ও অবিনাশী। জড়দ্রব্যের পরিণাম-জন্য স্থূল বস্তুসমূহের পরিবর্তন হয়, ইহাদের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও নাশ হয়। কিন্তু যে জড়দ্রব্য হইতে ইহারা উৎপন্ন হয়, তাহা চিরকালই থাকে। সেইরূপ জীবসকলের শরীর উৎপন্ন হয় ও বিনষ্ট হয়, কিন্তু তাহাদের আত্মা অবিনাশী ও চিরস্থায়ী। প্রলয়কালে স্থূল জীবজগৎ থাকে না, কিন্তু তখন সূক্ষ্ম জড়দ্রব্য ও অশরীরী আত্মাসমূহ ব্রহ্মে অব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকে। ইহাকে ব্রহ্মের কারণাবস্থা বা কারণ-ব্রহ্ম বলে। তৎপরে

কারণ-ব্রহ্ম ও কার্য-ব্রহ্ম।

যখন আবার স্থূল জগতের সৃষ্টি হয়, ব্রহ্ম জীব-জগৎরূপে ব্যক্ত বা প্রকাশিত হন। ইহাকে ব্রহ্মের কার্যাবস্থা বা কার্য-ব্রহ্ম বলে। ব্রহ্মের কারণাবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়া কোন কোন উপনিষদ্-বাক্যে নানা বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে এবং ব্রহ্মকে বাক্, মন ও বুদ্ধির অতীত বা অগোচর বলা হইয়াছে।

উপমাধারা ব্রহ্ম ও জীব-জগতের সম্বন্ধের ব্যাখ্যা।

রামানুজ জড়দ্রব্য ও জীবাত্মাকে ব্রহ্মের অন্তর্ভূত বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে জড়ের পরিণামের সঙ্গে ব্রহ্মেরও পরিণাম স্বীকার করিতে হয় এবং জীবাত্মার দুঃখ ও দোষত্রুটি ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট বলিতে হয়। এরূপ হইলে ব্রহ্মকে পরিণামী ও দোষযুক্ত বলিতে হয়। কিন্তু ইহা ব্রহ্মের স্বরূপ ও স্বভাব-বিরুদ্ধ। এই দোষ পরিহার করিবার জন্য রামানুজ কখন কখন জীবজগৎ ও ব্রহ্মের অংশাংশী-সম্বন্ধ-কল্পনা ত্যাগ করিয়া অন্যান্য উপমার আশ্রয় লইয়াছেন। কখন তিনি বলিয়াছেন, জীবজগৎ ব্রহ্মের শরীর এবং ব্রহ্ম তাহার অন্তর্বর্তী আত্মা। আত্মা যেমন অন্তরে থাকিয়া দেহকে পরিচালিত করে, সেইরূপ ব্রহ্ম অন্তঃপ্রবেশপূর্বক জীব-জগৎকে পরিচালিত করেন। তিনি জীবজগতের অন্তর্যামী অন্তরাত্মা।

CENTRAL LIBRARY

জীবশরীরস্থ আত্মা যেমন দেহের পরিণাম ও দোষদ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মও জগতের পরিণাম এবং জীবের দুঃখ-দুর্দশার দ্বারা গ্রস্ত বা স্পৃষ্ট হন না। তিনি এসবকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। তারপর রামানুজ অন্যস্থলে জীবজগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, রাজা যেমন দেহধারী হইয়া প্রজা-শাসন করেন, কিন্তু প্রজাদের সুখ-দুঃখে সংস্পৃষ্ট হন না, সেইরূপ ব্রহ্মও জীবজগৎকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করেন, কিন্তু তাহার দোষত্রুটি তাঁহাকে স্পর্শ করে না।

রামানুজের ব্রহ্মবাদকে একপ্রকার ঈশ্বরবাদ (theism) বলা যায়।

রামানুজের ব্রহ্মবাদ—ঈশ্বরবাদ।

যে মত অনুসারে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ পুরুষ (Person) এবং জীবজগতের অন্তর্বর্তী ও অতিবর্তী (immanent and transcendent), তাহার নাম ঈশ্বরবাদ। রামানুজের ব্রহ্মবাদে ব্রহ্মের এসব লক্ষণ বিদ্যমান।

ঈশ্বর আমাদের উপাস্য এবং ধর্মজীবনের চরম লক্ষ্য। উপাসনার দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতি সম্পাদন করিলে, তাঁহার প্রসাদে বা অনুগ্রহে (grace) মুক্তিলাভ করা যায়।

(৩) রামানুজের মতে আত্মা, বন্ধ ও মোক্ষ

রামানুজের মতে উপনিষদে ব্রহ্ম ও জীবাত্মার একত্ব বিষয়ে যেসব উপদেশ

আত্মা ও ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ।

আছে, তাহাতে উহাদের সর্বতোভাবে অভেদ (identity) বুঝায় না। ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ জীব ও ব্রহ্ম যে সর্বতোভাবে অভিন্ন হইতে পারে, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। পক্ষান্তরে, জীব ও ব্রহ্ম ভিন্নও হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম সর্ব জীবে ও সর্ব বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন এবং অন্তর্যামিরূপে তাহাদের পরিচালিত করেন। যেমন অংশকে অংশী হইতে পৃথক্ করা যায় না, গুণ বা পর্যায়কে দ্রব্য হইতে পৃথক্ করা যায় না, প্রাণবন্ত দেহকে তদন্তর্গত দেহী বা আত্মা হইতে পৃথক্ করা যায় না, সেইরূপ জীবাত্মার অস্তিত্ব ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্-ভাবে সিদ্ধ হয় না। অবশ্য একথা সত্য যে, দুইটি একান্ত ভিন্ন বস্তুর (যেমন গো ও অশ্বের) ঐক্য বা তাদাত্ম্য হইতে পারে না। কিন্তু ইহাও সত্য যে, দুইটি একান্ত অভিন্ন বস্তুর ঐক্য বা তাদাত্ম্যের কথা বলা নিরর্থক, কারণ তাহা অনাবশ্যক পুনরুক্তি হইবে, যেমন ঘট ও কলসের ঐক্য বা তাদাত্ম্য। একই দ্রব্যের দুইটি আকার বা প্রকারভেদের ঐক্য বা তাদাত্ম্যের কথা বলা যায়। 'এই সেই দেবদত্ত', এই বাক্যে অতীত-অবস্থা-বিশিষ্ট এবং বর্তমান-অবস্থা-বিশিষ্ট দেবদত্ত যে একই

CENTRAL LIBRARY

ব্যক্তি তাহা বলা হইয়াছে। একই ব্যক্তি বিভিন্ন কালে বিভিন্ন অবস্থাপন্ন হইতে পারে, সুতরাং বিভিন্ন অবস্থাপন্ন হইলেও তাঁহার একত্বের কথা বলা যায়। এইভাবেই উপনিষদুক্ত 'তৎ-ত্বম্-অসি' মহাবাক্যের তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। এখানে 'তৎ' শব্দদ্বারা সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে। 'ত্বম্' শব্দদ্বারা জীবরূপী বা জীবশরীরধারী ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে। মহাবাক্যে ইহাদের যে ঐক্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহা দুইপ্রকার গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের ঐক্যের কথা, অথবা বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট একই দ্রব্যের ঐক্যের কথা। অতএব রামানুজের মতে 'তৎ-ত্বম্-অসি' বাক্যদ্বারা দুই-প্রকার-বিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্ব বুঝায়, নিষ্প্রকারক ও নির্বিশেষ আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব বুঝায় না। এজন্য রামানুজের দার্শনিক মতকে বিশিষ্টাদ্বৈত অর্থাৎ জীবজগৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্ববাদ বা বিশিষ্টের অদ্বৈত বলা সমীচীনই হইয়াছে।

'তৎ-ত্বম্-অসি' বাক্যের অর্থ।

রামানুজের মতে মানুষ বাস্তবিক দেহবিশিষ্ট আত্মা। মানুষের দেহ ব্রহ্মের অংশীভূত জড়-উপাদানে গঠিত এবং ইহা স্পষ্টতঃ সীমাবদ্ধ বা পরিচ্ছিন্ন। আত্মা সৃষ্ট বস্তু নহে, ইহা নিত্য বিদ্যমান। ইহাও ব্রহ্মের অংশ, সুতরাং ইহা অনন্ত হইতে পারে না। উপনিষদে ইহাকে বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী বলা হইয়াছে বটে। কিন্তু ইহা বাস্তবিক সর্বব্যাপী নয়। অতি সূক্ষ্মতাহেতু ইহা স্বভাবতঃ সকল অচেতন দ্রব্যের অন্তঃপ্রবেশ করে বলিয়া ইহাকে সর্বব্যাপী বলা হইয়াছে। আত্মা যখন অনন্ত বা অতি মহৎ নয়, তখন ইহাকে অতি ক্ষুদ্র বা অণুপরিমাণ বলিতে হইবে। ইহা মধ্যম-পরিমাণ নহে, কারণ মধ্যম-পরিমাণ দ্রব্যমাত্রই অবয়ব-সংযোগে গঠিত হয় এবং সাবয়ব দ্রব্যমাত্রই ধ্বংসশীল হয়। চৈতন্য আত্মার দেহ-সম্বন্ধ-জন্য আগন্তুক ধর্ম বা গুণ নহে। ইহা আত্মার স্বরূপও নহে। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক ও নিত্য গুণ এবং সর্বকালে আত্মায় বিদ্যমান থাকে। সুষুপ্তিকালে এবং মোক্ষদশাতেও (যখন আত্মার দেহসম্বন্ধ থাকে না) আত্মা নিজেকে অহংরূপে জানে। অহং-পদার্থই স্বরূপতঃ আত্মা, ইহা আত্মায় অধ্যস্ত বা কল্পিত রূপমাত্র নহে।

মানুষের দেহ ও আত্মা উভয়ই সান্ত।

আত্মা নিত্য ও অণুপরিমাণ।

চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ।

কর্মদ্বারা আত্মার দেহবন্ধন হয়। স্বকৃত কর্মের ফলে আত্মা তাহার কর্মানুযায়ী দেহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়। দেহের সহিত সম্বন্ধ হইলে আত্মার জ্ঞান দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়। আত্মা অণুপরিমাণ অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র হইলেও

আত্মার বন্ধ কর্মজন্য।

সমগ্র দেহকে আলোকিত অর্থাৎ সচেতন করে, যেমন কোন গৃহমধ্যস্থ ক্ষুদ্র আলোক সমগ্র গৃহকে আলোকিত করে। ইহা নিজেকে দেহের সহিত একীভূত করে এবং নিজেকে দেহ বলিয়াই ভাবে। অনাত্মা দেহে অহংবুদ্ধির নাম অহঙ্কার এবং এরূপ শরীরগোচর অহংবুদ্ধিকেই অবিদ্যা বলে। কখন কখন রামানুজ কর্মকেও অবিদ্যা বলিয়াছেন।

কর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়ে মুক্তিলাভ হয়।

কর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়ে অর্থাৎ কর্ম ও জ্ঞানের মিলনে মুক্তিলাভ হয়, কারণ কর্ম ও জ্ঞান হইতেই ভক্তির উন্মেষ হয়। এখানে কর্ম বলিতে রামানুজ বর্ণাশ্রমবিহিত বৈদিক যজ্ঞাদি কর্মসমূহকে বুঝিয়াছেন। স্বর্গাদি ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া এইসব কর্ম যাবজ্জীবন অনুষ্ঠান করিতে হইবে। নিষ্কামভাবে এসব কর্মের অনুষ্ঠান করিলে পূর্বসঞ্চিত কর্মের ক্ষয় হয়।

যজ্ঞকর্মদ্বারা পূর্ব কর্মের ক্ষয় হয়।

পূর্বসঞ্চিত কর্মের ফলেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না। যজ্ঞাদি কর্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে হইলে কর্ম-মীমাংসা অধ্যয়ন করা আবশ্যক। এজন্য রামানুজ কর্ম-মীমাংসাকে বেদান্ত-বিচারের প্রয়োজনীয় পূর্ববৃত্ত বলিয়া স্বীকার করেন। কর্ম-মীমাংসা অধ্যয়ন ও নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করিলে যজ্ঞাদি কর্মদ্বারা যে স্থির বা নিত্য ফল অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করা যায় না, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ইহা হইতেই বেদান্ত অধ্যয়নের ইচ্ছা ও আগ্রহ

বেদান্ত-জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা।

জন্মে। বেদান্ত অধ্যয়ন করিলে জীবজগৎ ও ব্রহ্ম বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। মানুষ তখন বুঝিতে পারে যে, ব্রহ্মই জীবজগৎ সৃষ্টি করিয়া পালন করেন এবং নিয়মিত করেন। মানুষ আরও বুঝিতে পারে যে, তাহার আত্মা দেহাতিরিক্ত দ্রব্য ও ব্রহ্মের অংশীভূত এবং ব্রহ্ম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সে একথাও বুঝে যে, কেবল জ্ঞানবিচারে মুক্তিলাভ হয় না, পরন্তু সেই পরব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীনিবাস ভক্তিতে প্রীত হইয়া যাহাকে বরণ করেন, তাহারই মুক্তিলাভ হয়।

নিরন্তর স্মরণ বা ধ্যানদ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়।

বেদান্ত অধ্যয়ন করিলেই মুক্তি হয় না। অবশ্য একথা সত্য যে, বেদান্তে অর্থাৎ উপনিষদে অবিদ্যা-নিবৃত্তিরূপ মোক্ষের জন্য জ্ঞানের বিধান করা হইয়াছে। কিন্তু সেই জ্ঞান কিরূপ? সেই জ্ঞান শাস্ত্রবাক্য-জন্য বাক্যার্থ-জ্ঞানমাত্র (verbal knowledge) হইতে পারে না; কারণ তাহা হইলে শাস্ত্র পাঠ করিলেই অবিদ্যার নিবৃত্তি ও মোক্ষলাভ হইত। কিন্তু তাহা হয় না। অতএব সেই জ্ঞান নিশ্চয়ই ধ্যান ও উপাসনাদি-শব্দ-গম্য জ্ঞানই হইবে—কেবল বাক্যার্থ-জ্ঞান নহে। নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায়

অবিচ্ছিন্নভাবে ব্রহ্মের সতত স্মরণের নাম ধ্যান (ধ্রুবা স্মৃতি)। ইহাকে উপাসনা ও ভক্তিও বলে। শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিরন্তর ভগবদ্ধ্যান করিলে, ব্রহ্মজ্ঞানের সকল বাধা দূরীভূত হয়। এইরূপ নিরন্তর স্মরণ বা ধ্যানের প্রকর্ষ হইলে তাহা ব্রহ্মের প্রত্যক্ষজ্ঞান বা সাক্ষাৎকারে পরিণত হয় এবং তাহাতেই মুক্তিলাভ হয়। অতএব ধ্রুবা স্মৃতি বা ভক্তিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ও মুক্তির চরম উপায়। ইহাদ্বারা হৃদয়গত কাম-রাগাদি দোষ বিনষ্ট হয়, সকল কর্মের নাশ হয় এবং অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। কর্ম ও অবিদ্যার নাশ হইলে আর দেহ-ধারণ করিতে হয় না। অতএব যে জীবাত্মা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করে, তাহার দেহ হইতে চিরমুক্তি হয় এবং পুনর্জন্মের কোন সম্ভাবনা থাকে না। রামানুজের মতে দেহ-বন্ধন হইতে মুক্তিই বাস্তবিক মুক্তি। দেহ থাকিলে অথবা দেহ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে মুক্তি হয় না। অতএব জীবন্মুক্তি সম্ভব নয়। মানুষ কেবল নিজের শক্তি ও সাধনাদ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারে না। ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরের প্রীতি সম্পাদন করিলে তিনি জীবের জ্ঞানোদয়ের সকল বাধা দূর করিয়া তাহাকে পূর্ণ-জ্ঞান লাভে সমর্থ করেন। সর্বতোভাবে ঈশ্বরের শরণাগত হইলে এবং তাঁহাকে প্রিয়তমরূপে জানিয়া সতত তাঁহার স্মরণ করিলে, তিনি জীবের সর্ব বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাকে মুক্তিফল প্রদান করেন। এইরূপ শরণাগতির নাম প্রপত্তি।

জীবন্মুক্তি সম্ভব নয়।

ভগবৎপ্রসাদে মুক্তি হয়।

রামানুজের মতে মুক্তিকালেও জীবাত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব হয় না, ইহারা পৃথগ্‌ভাবেই অবস্থান করে। তবে জীবাত্মার জ্ঞান দোষবর্জিত ও শুদ্ধ হওয়ায়, উহা ব্রহ্ম-প্রকারতা লাভ করে অর্থাৎ ব্রহ্মের সদৃশ হয়। উপনিষদে মুক্তাত্মা ও ব্রহ্মের যে একত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের জ্ঞানগত সাদৃশ্যই বুঝায়, স্বরূপগত একত্ব নয়।

মুক্তিকালেও জীবাত্মা ও ব্রহ্মের পৃথক্ অবস্থিতি।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শঙ্করের কেবলাদ্বৈতমতে জীবাত্মার জীবভাব অপগত বা দূরীভূত করিয়া ব্রহ্মের সহিত তাহার একান্ত ঐক্য উপলব্ধি করাই পরম পুরুষার্থ। ক্ষুদ্র আত্মাকে বর্জন করিয়া সর্বত্র স্বপ্রকাশ-ব্রহ্ম-দর্শন করিলেই কেবলাদ্বৈত-বাদীর আধ্যাত্মিক জীবনে পরম তৃপ্তি লাভ হয়। কিন্তু রামানুজ ভক্তিমূলক ঈশ্বরবাদী। তাঁহার নিকট অদ্বৈতবাদীর আত্মবর্জনের আদর্শ কাম্য নয়, ইহা দুঃখপ্রদ ও হতাশাজনক। অবশ্য তাঁহার মতেও আধ্যাত্মিক জীবনে আত্মশুদ্ধি ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ প্রয়োজন। কিন্তু তিনি আত্মবিসর্জন বা আত্মবিলোপের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার মতে মুক্তিদশায় কেবল ব্রহ্মানন্দ অনুভব

উপসংহার।

করাই আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ এবং এজন্য জীবের মুক্ত আত্মার পৃথক্ অবস্থিতি স্বীকার্য। ভক্তিসেবিত ভগবৎপ্রসাদেই জীবগণ ব্রহ্মসাযুজ্যাদিরূপ মুক্তিলাভে কৃতার্থ হয়, কিন্তু কখনই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায় না। মুক্তিদশায় জীবাত্মা সর্বপ্রকার অজ্ঞান বা বন্ধনমুক্ত হইয়া এবং পূর্ণজ্ঞান ও প্রেম সহকারে নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে। শ্রীরামকৃষ্ণের সরল কথায় বলা যায়, 'অদ্বৈতবাদী যেন চিনি হইতে চান, আর দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা যেন চিনি আস্বাদন করিতে চান'।

দ্বিতীয় ভাগ

পাশ্চাত্ত্যদর্শন

CENTRAL LIBRARY

একাদশ অধ্যায়

দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রের সম্বন্ধ

১। দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যা
(Philosophy and Metaphysics)

আমরা যে শাস্ত্রকে দর্শন বলি পাশ্চাত্ত্য দেশে তাহাকে 'ফিলসফি' বলে। কিন্তু 'ফিলসফি' শব্দটি দর্শনের ঠিক পর্যায় শব্দ নহে। কারণ দর্শন শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ হইতেছে চাক্ষুষ জ্ঞান এবং সেজন্য ভারতে দর্শন বলিতে সেই শাস্ত্রকে বুঝায় যাহার দ্বারা আমরা আত্মা ঈশ্বর প্রভৃতি অধ্যাত্মতত্ত্বের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ন্যায় সাক্ষাৎজ্ঞান লাভ করিতে পারি। এজন্য আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতগণ দর্শনকে অধ্যাত্মশাস্ত্র বা আত্মবিদ্যাও বলিতেন। 'ফিলসফি' শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতেছে 'জ্ঞানানুরাগ'। মানুষের জীবন ও অনুভূতির (experience) সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সকল বিষয়ের জ্ঞানলাভ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। মানুষের স্বরূপ কি? তাহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি? এই জগতের উৎপত্তি কোথা হইতে হইয়াছে, ইহা জড় প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, না ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট? জন্মের পূর্বে ও মৃত্যুর পরে জীবাত্মার অস্তিত্ব থাকে কি না? জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষ যে জ্ঞানলাভ করিতে পারে তাঁহার আলোকে মানুষ জীবনে কোন্ পথে চলিবে? জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন্ ধারণায় উপনীত হইবে? 'ফিলসফিতে' এরূপ প্রশ্নগুলির বিচারসংগত সমাধান করিবার চেষ্টা করা হয়। ভারতীয় দার্শনিকগণ এসব প্রশ্নের বিচার ও যুক্তিসংগত সমাধান করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তাঁহারা তৎসংশিলষ্ট তথ্য বা তত্ত্বগুলির সাক্ষাৎকার করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশে সাধারণতঃ তত্ত্বসাক্ষাৎকারকে 'ফিলসফির' অংগ বা মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করা হয় না। তাহা হইলেও 'ফিলসফি' ও দর্শনের বিষয়বস্তু প্রায় এক, বিচার-পদ্ধতিও সমান এবং জীবনের সংগে উভয়ের সম্বন্ধও একরূপ বলিয়া এখানে দর্শন শব্দ 'ফিলসফি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

দর্শন শব্দের অর্থ।

ফিলসফি শব্দের অর্থ।

ফিলসফির লক্ষণ।

দর্শন শব্দ ফিলসফি অর্থে ব্যবহৃত।

বস্তুর স্বরূপ ও বাহ্যরূপ।

আমাদের পরিচিত সকল বস্তু সম্বন্ধেই আমরা দুইটি প্রশ্ন করিতে পারি। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি (১) বস্তুটির স্বরূপ বা নিজস্ব রূপ কি এবং (২) উহা দ্রব্যান্তরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে উহাকে কিরূপ দেখা যায়? প্রথম প্রশ্নটিতে আমরা বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণ, দ্বিতীয়টিতে উহার তটস্থ-লক্ষণ জানিতে চাই। কয়েকটি দৃষ্টান্তদ্বারা এ বিষয়টি বুঝান যায়। আকাশে সূর্যের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। প্রাতঃকালের সূর্য ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান ব্যক্তির চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে উহাকে একটা লাল রং-এর প্রকাণ্ড থালার মত দেখায়, মধ্যাহ্নে সাদা রং-এর মাঝারি থালার মত দেখায়, আবার গোধূলিলগ্নে প্রাতঃকালে দৃষ্ট বড় থালার মত দেখায়। এগুলি হইল সূর্যের দৃশ্যমান বা ইন্দ্রিয়গোচর রূপ, স্বরূপ নহে। স্বরূপে সূর্য বহুকোটি যোজন-বিস্তৃত তেজোরাশি, জীবনপ্রদ জ্যোতির্মণ্ডল। দূর হইতে সমুদ্রের জল নীল, কিন্তু কাছে গিয়া হাতে তুলিয়া দেখ—কোন রং নাই। দূর হইতে আকাশ নীল, কাছে গেলে বর্ণহীন। সাগর-জলের উপরে প্রবল তরঙ্গমালা গভীর নিম্নদেশ কিন্তু নিস্তরঙ্গ, স্থির, নিশ্চল। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে —বস্তুর এই দুইরূপের কোন্‌টি তার যথার্থ ও নিজস্ব রূপ, আর কোন্‌টি তার আপেক্ষিক, বাহ্য ও আরোপিত রূপ। দর্শন শাস্ত্রে প্রথমটিকে তত্ত্ব, noumena, reality প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়, দ্বিতীয়টিকে অবভাস, প্রতিভাস, phenomena, appearance প্রভৃতি নাম দেওয়া যায়।

দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যা।

যে শাস্ত্রে জাগতিক বস্তুনিচয়ের এবং সারা বিশ্বসংসারের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করা হয় তাহাকে তত্ত্ববিদ্যা, ontology, metaphysics বলা হয়। উহা বস্তুর বাহ্য ও দৃশ্যমান রূপের অন্তরালে অবস্থিত অর্থাৎ অন্তর্নিহিত তথ্য বা তত্ত্ব কি তাহাই নির্ণয় করিতে চেষ্টা করে, তাহার অবভাস বা প্রাতিভাসিক রূপ (appearance) লইয়া ব্যস্ত নয়। পক্ষান্তরে, দর্শন সকল বস্তুর বা জীবজগতের তত্ত্ব ও অবভাস, আন্তর সত্তা ও বাহ্য রূপ, স্বরূপ ও আপেক্ষিক রূপ (noumena and phenomena, reality and appearance) এতদুভয়েরই আলোচনা করে এবং বিচারপূর্বক তাহাদের জ্ঞানলাভ করিবার ও সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করে।

কিন্তু এ মত সর্বদার্শনিক-সম্মত নহে। কোন কোন দার্শনিকের মতে দর্শন তত্ত্ববিদ্যা (metaphysics) ব্যতীত আর কিছু নয়, উহা তত্ত্বানুসন্ধান-মাত্র, অতত্ত্বের বা অবভাসের জ্ঞান নহে। প্রায় সকল প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে প্লেটো, আরিষ্টটল, হেগেল, ব্রাড্‌লি প্রভৃতি এই মত পোষণ করেন। আবার প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রত্যক্ষবাদী (empiricists), দৃষ্টবাদী (positivists) এবং তার্কিক দৃষ্টবাদী (logical

(positivists) প্রভৃতি দার্শনিকগণ বলেন, তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া কিছু নাই বা হইতেও পারে না, উহা অর্থহীন (nonsensical) বাক্যবিন্যাসমাত্র ও আত্ম-প্রবঞ্চনার নামান্তর। ডেভিড্ হিউম, অগস্ত কোঁত্ এবং এ জে আয়ের প্রভৃতি সমসাময়িক দৃষ্টবাদীরা তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্ববিদ্যা (metaphysics) সম্বন্ধে এইপ্রকার বিরূপ মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে দর্শন কোন না কোনভাবে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষগোচর পদার্থের আলোচনা ও ব্যাখ্যায় নিবদ্ধ এবং পর্যবসিত, উহাতে তত্ত্বালোচনার কোন স্থান নাই। তার্কিক দৃষ্টবাদীরা এবিষয়ে আরও অগ্রগামী এবং বলেন যে, দর্শনশাস্ত্রে কেবল বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়, পদ ও বাক্যের বিশ্লেষণ ও বিচার করা উচিত, তত্ত্বজ্ঞান অর্জনের বা কোন তাত্ত্বিক মতবাদ (speculative theory) প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস অনাবশ্যক ও অর্থহীন। তাঁহাদের মতে দর্শন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের তার্কিক বিচারমাত্র অর্থাৎ উহা বিজ্ঞানের তর্কশাস্ত্র (logic of science).

২। দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যার বিষয়বস্তু

(The Scope of Philosophy and Metaphysics)

দর্শনের আলোচ্য বিষয় ও প্রকারভেদ।

জীব, জগৎ, ঈশ্বর প্রভৃতি সকল বিষয়েরই ন্যায়সংগত (rational) ও বিচার-বিশ্লেষণ-সিদ্ধ (analytical and critical) জ্ঞানকে দর্শন বলে। অতএব পারমার্থিক তত্ত্ব (ultimate reality) এবং জীবজগতের সকল বস্তুই দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। কোন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক বলিয়াছেন 'ভূমণ্ডলের এবং স্বর্গের এমন কোন বস্তু নাই যাহা দার্শনিক আলোচনার বিষয় নহে।' পরমাত্মা, জীবাত্মা, জড় প্রকৃতি, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল ভূতবর্গ সবই দার্শনিক বিচারের বিষয়ীভূত। এককথায় বলা যাইতে পারে সদসদ্ অখিল বস্তুই দার্শনিক বিচারের, তথা দার্শনিক জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। অতএব তত্ত্ব ও অবভাস (phenomena and noumena, appearance and reality) উভয় বিষয়েই দার্শনিক আলোচনা হইতে পারে। এমনকি নীতি (morality), ধর্ম (religion), শিক্ষা (education), সমাজ (society), বিজ্ঞান (science), কলা (art), যুদ্ধ ও শান্তি (war and peace), হিংসা ও অহিংসা (violence and non-violence) প্রভৃতি বিষয়েরও দার্শনিক আলোচনা (philosophy) হইতে পারে।

যদিও দর্শন সর্বব্যাপী ও সর্ববিষয়ক জ্ঞান তথাপি দার্শনিক আলোচনার সুবিধার জন্য উহার তিনটি প্রধান ভাগ স্বীকার করা হয়, যথা জগদ্বিষয়ক দর্শন (philosophy of nature or of the world), জীব বা আত্মবিষয়ক দর্শন (philosophy of mind or soul), এবং ঈশ্বর বা পরমাত্মবিষয়ক দর্শন (philosophy of God or the absolute)। প্রথমভাগে বাহ্য জগৎ বা প্রকৃতির বস্তু-নিচয়ের গুণ-ধর্ম-ক্রিয়া ইত্যাদির আলোচনা ও বিচার করিয়া জগতের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব কি তাহা জানিবার চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয়ভাগে মনের ও জ্ঞানের বৃত্তিগুলির বিচার করিয়া তাহাদের মূলতত্ত্ব আত্মা কি ও তাহার স্বরূপ কি তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়। শেষভাগে মন বা আত্মা বা জীবের সঙ্গে প্রাকৃতিক জগতের সম্বন্ধ কি, উহাদের উভয়ের অন্তর্নিহিত পরম সত্তা বা তত্ত্ব কি এবং কিভাবে সেই তত্ত্বে উহাদের জন্ম-স্থিতি-লয় হয়, জীবাত্মার জগদ্ব্যাপারে কি কর্তব্য এবং কিভাবে তাহার পরম কল্যাণ হয় এসকল বিষয়ের আলোচনা করা হয়। এইরূপে দেখা যায় যে, দর্শন জগতের বাহ্যরূপের জ্ঞান (phenomenology of nature) হইতে উহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব জ্ঞানে (ontology or metaphysic of nature or the physical world) উপনীত হয়, মন-প্রাণ-আত্মার বৃত্তি ও ক্রিয়ার বিচারলব্ধ জ্ঞান (phenomenology of mind) হইতে আত্মতত্ত্বের জ্ঞান (ontology of mind) লাভ করিবার চেষ্টা করে। পরিশেষে উভয় তত্ত্ব হইতে ঈশ্বর বা পরমার্থতত্ত্বের জ্ঞান (ontology or metaphysic of absolute reality) লাভ করিতে পারে।

দর্শনের বিষয়-বিভাগ।

তত্ত্ববিদ্যার বিষয়বস্তু দর্শনের বিষয়বস্তু হইতে কতকটা ভিন্ন হইলেও একেবারে পৃথক্ নয়। সর্বপ্রকার তত্ত্বজ্ঞানই তত্ত্ববিদ্যার মুখ্য লক্ষ্য ও বিচার্য বিষয়। জীব জগৎ প্রভৃতির মূল তত্ত্ব কি এবং উহাদের অন্তর্নিহিত সর্বব্যাপী পরমতত্ত্ব কি, তাহাই উহার প্রধান আলোচ্য বিষয়। ইহাতে অন্যান্য অতাত্ত্বিক বস্তুর বা বস্তুর বাহ্য রূপের (phenomena or appearances) বিচার করা হয় বটে; কিন্তু তাহা নিষেধমুখে করা হয় অর্থাৎ সেগুলি যে তত্ত্ব নহে বা অসৎ ও মিথ্যা ইহাই বিচারপূর্বক প্রতিপাদন করা হয়। উহাদের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তাহার স্বরূপ নির্ধারণ করাই তত্ত্ববিদ্যার প্রধান কর্তব্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতীয় দর্শনের কোন কোন শাখায় ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যথা মাধ্যমিক বৌদ্ধদর্শন বিশেষতঃ নাগার্জুনের দর্শনমত, অদ্বৈত বেদান্ত-দর্শন ইত্যাদি। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মধ্যে এফ্ এচ্ ব্র্যাড্লির *Appearance and Reality* নামক গ্রন্থে তত্ত্ববিষয়ক আলোচনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

তত্ত্ববিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

৩। তত্ত্ববিদ্যার সম্ভাব্যতা

(The Possibility of Metaphysics)

তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে আপত্তি ও উহার খণ্ডন।

কোন কোন দার্শনিক তত্ত্ববিদ্যার সম্ভাব্যতা স্বীকার করেন না। পূর্বে যে প্রত্যক্ষবাদী ও দৃষ্টবাদী দার্শনিকদের কথা বলিয়াছি, তাঁহাদের মতে আমরা দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ-গোচর পদার্থ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু জানিতে পারি না। তত্ত্ব বলিতে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বস্তুর অন্তরালে যে সত্তা লুক্কায়িত আছে তাহাকেই বুঝায়। কিন্তু এরূপ কোন সত্তা নাই, থাকিলেও তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কারণ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই আমাদের জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ, আর তত্ত্ব অতীন্দ্রিয় বস্তু, উহাকে ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না। অতএব তত্ত্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। প্রকৃত-পক্ষে অতীন্দ্রিয় কোন তত্ত্বই নাই, আর যাহা নাই সে-বিষয়ে কোনও বিজ্ঞান হইতে পারে না।

অতীন্দ্রিয় বস্তু ও তাহা জানিবার উপায়।

তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে এরূপ আপত্তি যে যুক্তিসহ নহে তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, অতীন্দ্রিয় কোন তত্ত্ব বা বস্তু নাই এবং ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ ব্যতীত আমাদের জ্ঞান লাভের আর কোনও পথ নাই একথা সত্য নয়। জড় বিজ্ঞানে (physics) পরমাণু, এলেক্‌ট্রন, প্রোটন্‌ প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় এবং সকলেই তাহা স্বীকার করেন, কিন্তু সেগুলি কাহারও ইন্দ্রিয়-গোচর নয়, উহারা অতীন্দ্রিয় বস্তু। জ্যামিতিতে বিন্দু, রেখা প্রভৃতির যে লক্ষণ দেওয়া হয় সেরূপ বস্তু আমরা কোথায়ও দেখিতে পাই না, কিন্তু সেগুলি আমরা জানি ও বুঝি। এসব অতীন্দ্রিয় বস্তুকে আমরা প্রজ্ঞাদ্বারা (reason) বুঝিতে পারি। মানুষের মন, জ্ঞান, বুদ্ধি প্রভৃতি বস্তু যে আছে তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু এগুলিকে আমরা চোখে দেখি না, কাণে শুনি না, এককথায় কোন বাহ্য-ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি না। তথাপি আমাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ মন প্রভৃতির সাক্ষাৎ-প্রতীতি বা প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে। এরূপ প্রতীতি বা প্রত্যক্ষকে অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বলিতে হইবে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, অতীন্দ্রিয় বস্তু বা তত্ত্বও আছে এবং তাহা জানিবার ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য উপায় বা পথও আছে, আর সেপথ হইতেছে প্রজ্ঞা (reason) অথবা অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ (non-sensuous or super-sensuous experience) বা আধ্যাত্মিক অনুভূতি।

CENTRAL LIBRARY

তত্ত্বের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হয় না একথা সত্য। যেসব দ্রব্যের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হয় তাহাদের একটা উদ্ভূত বা স্পষ্ট রূপ থাকিবে এবং মধ্যম পরিমাণ থাকিবে, অর্থাৎ তাহারা পরমাণুর মত অতি হ্রস্ব বা ক্ষুদ্র (infinitesimal) হইবে না, আবার আকাশের মত বিভু অর্থাৎ অতি দীর্ঘ বা মহৎ (infinite) হইবে না। এরূপ হইলেই তবে আমরা তাহা ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। কিন্তু এসব বস্তু ভৌতিক পদার্থই হইবে এবং অবভাস (appearance) হইবে, তত্ত্ব (reality) হইবে না। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষে আমরা বস্তুর বাহ্যরূপ জানিতে পারি, তাহার স্বরূপ জানিতে পারি না। আমাদের ইন্দ্রিয়ের গুণ ও ধর্ম, শক্তি ও অবস্থা অনুসারেই আমরা দ্রব্যের গুণ প্রত্যক্ষ করি। কোন ইন্দ্রিয় বিকল হইলে আমরা দ্রব্যের কোন কোন গুণ প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। একই জল বা ফল একই সময়ে বিভিন্ন লোকের নিকট অথবা বিভিন্ন সময়ে একই লোকের নিকট বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। যেমন সুস্থ এবং অসুস্থ ব্যক্তির নিকট জল যথাক্রমে স্বাদু এবং বিস্বাদ লাগে, জ্বর হইলে একই ব্যক্তির পূর্বে যে জল মিষ্ট লাগিত তাহা তিক্ত লাগে। এসব দৃষ্টে বলিতে হয়, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষে আমরা কোন দ্রব্যের নিজ-রূপ বা স্বরূপ জানিতে পারি না, আমাদের ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধজন্য গুণ-ধর্ম বা প্রকাশিত বাহ্যরূপ (appearance) জানিতে পারি। অতএব আমাদের আরও স্বীকার করিতে হয় যে, বস্তুর স্বরূপ বা তত্ত্ব অতীন্দ্রিয় সত্তা, উহা ইন্দ্রিয়গোচর হয় না।

তত্ত্বের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষাভাবের কারণ।

তত্ত্বের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ না হইলেও তত্ত্বজ্ঞান যে লাভ করা যায় না একথা ঠিক নয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার একটি উপায় হইতেছে প্রজ্ঞা (reason)। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের মতে পারমার্থিক তত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়া প্রজ্ঞার সাহায্য লইতে হইবে। গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটো ও আরিষ্টটল উভয়েই প্রজ্ঞাকে তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। প্রজ্ঞার আলোকে বস্তুর বাহ্যরূপের অন্তরালে অবস্থিত সর্বব্যাপী সত্তাগুলি (universal ideas or forms) সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং আমরা তাহাদের সম্যগ্‌জ্ঞান লাভ করিতে পারি। জার্মান দার্শনিক হেগেলের মতেও তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে আমাদিগকে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও বিচারবুদ্ধি (intellect or analytic understanding) অতিক্রম করিয়া ভাবনাত্মক প্রজ্ঞার (speculative reason) আশ্রয় লইতে হইবে। এই প্রজ্ঞার সাহায্যে আমরা পরিদৃশ্যমান জগতের (phenomenal world) অন্তর্নিহিত পরম-চিৎ-সত্তার (Absolute Idea) বা পরমাত্মার (God) জ্ঞানলাভ করিতে পারিব।

তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রথম উপায়—প্রজ্ঞা।

দ্বিতীয় উপায়— আধ্যাত্মিক অনুভূতি।

কিন্তু ইংরেজ দার্শনিক ব্রাড্‌লির মতে বুদ্ধি (intellect) বা প্রজ্ঞার (reason) দ্বারা পারমার্থিক তত্ত্বের যথার্থজ্ঞান হয় না। তাঁহার মতে শুদ্ধ বা সাক্ষাৎ প্রতীতি (mere feeling or immediate presentation) হইতে আমরা পরমতত্ত্বের কিছু আভাস পাইতে পারি, কিন্তু তৎসম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। এরূপ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তিনি তত্ত্বসাক্ষাৎকারের কোন সম্যক্‌ পন্থা নির্ধারণ করেন নাই। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণ তত্ত্বসাক্ষাৎকারকে তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়াছেন এবং তত্ত্বানুভূতি বা তত্ত্বসাক্ষাৎকারের জন্য যোগসাধনের নির্দেশ দিয়াছেন। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা পরে করা যাইবে।১ এখানে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, তত্ত্বানুভূতি বা আধ্যাত্মিক অনুভূতি (spiritual or yaugic experience) তত্ত্বজ্ঞান লাভের আর একটি উপায়। বস্তুতঃ ইহাই প্রকৃত ও একমাত্র উপায়। আধ্যাত্মিক অনুভূতি অল্পবিস্তরভাবে আমাদের সকলেরই আছে। বোধ হয় এইজন্যই ব্রাড্‌লি বলিয়াছেন, 'এক না এক ভাবে আমরা সকলেই দৃশ্যমান জগতের অতীত সত্তার স্পর্শ অনুভব করি এবং তাহার সাযুজ্য (communion) উপলব্ধি করি'।২ এরূপ সর্বগত আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতে আমরা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারি এবং সে-সম্বন্ধে ন্যায়সংগত আলোচনা ও বিচার করিতে পারি। তত্ত্বার্থ সম্বন্ধে এরূপ বিচারলব্ধ জ্ঞানকেই তত্ত্ববিদ্যা বা তত্ত্ববিজ্ঞান বলা যাইবে। অতএব তত্ত্ববিদ্যার সম্ভাব্যতা (possibility of metaphysics) অবশ্য স্বীকার্য।

তত্ত্ববিজ্ঞানের সম্ভাব্যতা স্বীকার্য।

৪। দর্শন ও বিজ্ঞান
(Philosophy and Science)

প্রাকৃত-জ্ঞান প্রত্যক্ষজন্য, অসম্বদ্ধ, অব্যাপক।

ব্যাপকতাভেদে তিনপ্রকার জ্ঞানের কথা বলা যাইতে পারে, যথা প্রাকৃত বা সাধারণ পর্যায়ের জ্ঞান (common sense), বৈজ্ঞানিক পর্যায়ের জ্ঞান (science) এবং দার্শনিক পর্যায়ের জ্ঞান (philosophy)। ইহাদের মধ্যে প্রাকৃত-জ্ঞান (common-sense knowledge) সর্বনিম্ন-স্তরের। ইহা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষজাত, অসম্বদ্ধ ও অব্যাপক জ্ঞান। আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষে জীবজগৎ যেরূপ প্রতিভাত হয়, আমরা কোন বিচার-বিশ্লেষণ

১। তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় বা সাধন সম্বন্ধে দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২। Bradley, *Appearance and Reality*, 1930, p. 5.

CENTRAL LIBRARY

না করিয়া তাহা সেইরূপ বুঝি এবং তাহাই তাহার তাত্ত্বিক বা যথার্থ রূপ বলিয়া গ্রহণ করি। আমরা সাধারণতঃ বলি, 'সূর্য পূর্ব দিকে উঠে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়'। এই বাক্যটি প্রাকৃত-জ্ঞানের উদাহরণ। আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের নিকট সূর্য গতিশীল, এবং উহার গতি পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে দেখা যায়। কিন্তু প্রত্যক্ষজ্ঞানটি সত্য হইলে বিভিন্ন দেশে দিবারাত্রির ক্রম ও স্থিতিকাল অন্যরূপ হইত। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, প্রাকৃত-জ্ঞানগুলি সুসম্বদ্ধ নহে, একটির সহিত অন্যগুলির মিল নাই, সম্বন্ধও ঠিকভাবে অবধারিত নহে। এগুলি বিচ্ছিন্নভাবে থাকে এবং কখন কখন পরস্পর-বিরোধীও হয়। এজন্য এগুলির ব্যাপকতাও খুব কম। ইহারা সর্বদেশে, সর্বকালে ও সর্বলোকের নিকট সত্য না হইতেও পারে। কাজেই ইহাদিগকে লোকবিশেষের, দেশ বা কালবিশেষের জন্য সত্য বলিতে হয়, ইহাদিগকে সর্বব্যাপী বা সার্বত্রিক বলা যায় না। প্রাকৃতজ্ঞানমূলক দর্শনে (philosophy of common sense) জীবজগৎকে অসংখ্য স্বতন্ত্র পদার্থের সমষ্টিমাত্র বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। জীবজগৎ বহুধা বিভক্ত, ইহাদের মধ্যে কোন ব্যাপক মিলনসূত্র নাই। এজন্য জীবজগতের সমুদায় পদার্থ এক কার্যকারণ-শৃংখলে আবদ্ধ বলিয়া প্রাকৃত দার্শনিক বিশ্বাস করেন না, অথবা কোন একটি দ্রব্য বা ঘটনা হইতে অন্যান্য সব দ্রব্য বা ঘটনা যে বুঝা বা অনুমান করা যাইতে পারে তাহা স্বীকার করেন না। প্রাকৃত বা সাধারণ জ্ঞান এবং দর্শন কোন ব্যক্তিবিশেষের আবিষ্কৃত জ্ঞান ও দর্শন নহে। উহা যুগ যুগ ধরিয়া ব্যক্তিবিশেষের অজ্ঞাতসারে কোন এক সমাজে বা দেশে গড়িয়া উঠে এবং বংশপরম্পরাগত সম্পত্তিরূপে বর্তমান ও ভবিষ্য বংশীয়েরা প্রাপ্ত হয়েন।

প্রাকৃত দর্শনের লক্ষণ।

অপর পক্ষে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান (scientific knowledge) ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের বিচার-বিশ্লেষণ হইতে প্রাপ্ত, সুসম্বদ্ধ ও ব্যাপকতর জ্ঞান। প্রাকৃত-জ্ঞানের ন্যায় ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মূলেই আমরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করি এবং ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষদ্বারাই উহার সত্যাসত্য নির্ণয় করি। কিন্তু প্রাকৃত-জ্ঞানে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের বিশেষ পরীক্ষা বা বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় না। পক্ষান্তরে, বৈজ্ঞানিক তাহার প্রত্যক্ষগুলি (observation or experience) নিপুণ ও নিখুঁতভাবে পাইবার চেষ্টা করেন এবং যান্ত্রিক পরীক্ষার (experiment) সাহায্যে সেগুলি এবং নিজ অনুমান ও সিদ্ধান্তগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখেন। এজন্য বৈজ্ঞানিক-জ্ঞানে আমরা জগতের বা প্রকৃতির (nature) বস্তুনিচয় ও ঘটনাবলী সঠিকভাবে দেখিবার এবং নির্ভুলভাবে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করি। তারপর প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের আলোকে এসব বস্তুর ও ঘটনার একটা যুক্তিসংগত

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান—পরীক্ষিত-প্রত্যক্ষলব্ধ, সুসম্বদ্ধ, ব্যাপকতর।

বৈজ্ঞানিক প্রমাণ-পদ্ধতি

CENTRAL LIBRARY

ব্যাখ্যা অর্থাৎ কার্যকারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করি এবং এ ব্যাখ্যা (explanation) সঠিক কিনা তাহাও নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখি। প্রাকৃতিক পদার্থের (natural things and events) ব্যাখ্যা করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক তাহাদের কার্যকারণ-সম্বন্ধ ও অন্যান্য সাধারণ নিয়মগুলি (causal laws etc.) আবিষ্কার করেন এবং এসব নিয়মানুসারে প্রাকৃতিক পদার্থগুলির উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয় কিনা তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখেন। এজন্য তিনি ব্যাপ্তিগ্রহ ও ব্যাপ্তিপ্রয়োগ অনুমানের (induction and deduction) সাহায্য গ্রহণ করেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে যে কারণ বা নিয়ম মানিলে প্রাকৃতিক বস্তুগুলির ব্যাখ্যা হয় তাহার কল্পনাও করিতে হয়। কারণ কোন বস্তুর সম্ভাব্য হেতু বা কারণ অন্য অমুক দ্রব্য বা ঘটনা হইবে, এরূপ একটি কল্পনা না করিলে আমরা কোন্ দিকে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিব তাহা বুঝিতে পারি না। এরূপ কল্পনাকে উপপাদক-কল্পনা (hypothesis) বলা যায়। তারপর সেই কল্পিত উপপাদক যে যথার্থ কারণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ইহাকে উপপাদক-কল্পনা-পরীক্ষা (proof of an hypothesis) বলা যায়। যদি এইরূপ সতর্কতার সহিত আমরা প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্ন শ্রেণীর পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারি, তবে তাহাকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলা যাইতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আর একটি লক্ষণ হইতেছে যে, ইহাতে বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন জ্ঞানকে সম্বন্ধযুক্ত বা সুসম্বদ্ধ করা হয়, যেন তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ না হয় এবং একটি জ্ঞান বা প্রাকৃতিক নিয়ম হইতে অন্য জ্ঞান বা নিয়মগুলিতে উপনীত হওয়া যায়। এরূপ হইলে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানগুলিকে সুসম্বদ্ধ জ্ঞান বলা যায়। এই অর্থে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সুসম্বদ্ধ জ্ঞান এবং এই কারণে ইহা প্রাকৃত জ্ঞান অপেক্ষা ব্যাপকতর জ্ঞান। অর্থাৎ উহা প্রায় সব দেশ কাল ও লোকে সত্য হইবে। দৃষ্টান্তরূপে টোলেমির ভূকেন্দ্রবাদ ও কপার্ণিকাসের সূর্যকেন্দ্রবাদের কথা বলিতে পারি। প্রথম মত হইতেছে যে, পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া আদিত্যাদি গ্রহ ঘুরিতেছে; দ্বিতীয় মত হইতেছে যে, সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিব্যাদি ঘুরিতেছে। প্রথম মত গ্রহণ করিলে আমরা পৃথিবীর সব দেশের ও সব অবস্থার ও সব ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিতে পারি না, এক বিষয়ের জ্ঞানের সঙ্গে অন্য বিষয়ের জ্ঞানের বিরোধ হয় এবং অন্যান্য ব্যাঘাতও ঘটে। কপার্ণিকাসের মতে এরূপ ব্যাঘাত ঘটে না; পক্ষান্তরে, পার্থিব ব্যাপারের একটা সুসমঞ্জস ব্যাখ্যা করা যায়। এজন্য তাঁহার মতই এখন লোকে গৃহীত ও স্বীকৃত হয়। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পরিবর্তনশীল, সব সময়েই উহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইতে পারে। **বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি** (scientific truths) শাশ্বত, অলঙ্ঘ্য ও অপরিবর্তনীয় নহে।

CENTRAL LIBRARY

আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে একপ্রকার দার্শনিক মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। উহাকে বৈজ্ঞানিক দর্শন (scientific philosophy) বলা হয়। ইহাতে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ-পদ্ধতির (scientific method) প্রয়োগ করা হয়। অধুনা পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মধ্যে দর্শনে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ-পদ্ধতির (scientific method in philosophy) বহুল প্রচার ও সমাদর দেখা যায়। তাঁহারা মনে করেন যে, ইহার দ্বারা দর্শনশাস্ত্রকে বিজ্ঞানের মত সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুনিশ্চিত করা যাইতে পারিবে।

বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ।

পার্থিব বিভিন্নজাতীয় দ্রব্য সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানের রচনা হইয়াছে। এসব বিজ্ঞানকে দুইপ্রকারে বিভক্ত করা যায়—(১) বিষয়বস্তু হিসাবে, (২) উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন হিসাবে। বিষয়বস্তু হিসাবে বিজ্ঞানগুলিকে চারি ভাগে ভাগ করা যায়: (১) জড়বিজ্ঞান (physical sciences)। পদার্থবিদ্যা (physics), রসায়ন (chemistry), ভূবিদ্যা (geology), জ্যোতিষ (astronomy) প্রভৃতি বিজ্ঞান ইহার অন্তর্গত। (২) প্রাণবিজ্ঞান (biological sciences), যথা: উদ্ভিদ্‌বিদ্যা (botany), প্রাণিবিদ্যা (zoology) ইত্যাদি। (৩) সমাজবিজ্ঞান, যথা: মনোবিজ্ঞান (psychology), নীতিবিজ্ঞান (ethics), অর্থশাস্ত্র (economics), রাজনীতি (politics), সৌন্দর্যবিজ্ঞান (aesthetics) ইত্যাদি। (৪) চিন্তার-আকার-বিষয়ক-বিজ্ঞান (formal sciences), যথা: ন্যায়শাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি। এগুলিতে আমরা বাহ্য বা আন্তর দ্রব্য বা বিষয়ের কথা ভাবি না, কিন্তু ঐ বিষয়গুলি জানিবার বা অনুমান করিবার সময় আমাদের চিন্তার রূপ বা আকার কি প্রকার হওয়া উচিত, অর্থাৎ কি প্রকার হইলে তাহা সত্য ও যথার্থ হইবে তাহাই নির্ণয় করিবার চেষ্টা করি।

প্রয়োজন হিসাবে বিজ্ঞানগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—বর্ণনা-মূলক ও আদর্শমূলক (descriptive and normative sciences) উপরি লিখিত প্রায় সকল বিজ্ঞানই বর্ণনামূলক, কারণ উহারা জ্ঞানের বিষয়গুলির বিবরণমাত্র দেয়। পক্ষান্তরে, ন্যায়শাস্ত্র (logic), নীতিশাস্ত্র (ethics), সৌন্দর্যবিজ্ঞান (aesthetics) ইত্যাদি আদর্শমূলক, কারণ উহারা একটি না একটি আদর্শ (ideal) স্বীকার করিয়া তদ্দ্বারা নিজ নিজ বিষয়ের ইষ্টার্থসমূহ (values) নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করে।

এইসব বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উহারা বস্তুসত্তার বাহ্যরূপের (phenomena) আলোচনা করে। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এক একটি বিজ্ঞান প্রকৃতির এক এক বিভাগের বা এক এক জাতীয় বস্তুর আলোচনায় ও জ্ঞানার্জনে নিবদ্ধ এবং কেহ অন্য কাহারও বিষয়বস্তুর আলোচনা বা বিচার করে না। তাহা হইলেও তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ আছে এবং কোন কোন বিষয়ে মতেরও মিল আছে।

CENTRAL LIBRARY

কোন কোন দার্শনিক বলেন যে, দর্শন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্বাভাবিক পরিণতি। বিজ্ঞানগুলির কয়েকটি লক্ষণ আছে যাহা হইতে স্বভাবতঃই দার্শনিক চিন্তা ও গবেষণার উন্মেষ হয়। প্রথমে দেখা যায়, বিজ্ঞানগুলি কয়েকটি তথ্য অবিচারিতভাবে মানিয়া বা স্বীকার করিয়া লয়। আমাদের বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা যে জীবজগৎ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভে সমর্থ তাহা বৈজ্ঞানিক মানিয়া লন, কোন প্রমাণদ্বারা তাহা প্রতিপাদিত করেন না। বৈজ্ঞানিক আরও মানিয়া লন যে, প্রাকৃতিক বস্তুনিচয় দেশে ও কালে অবস্থিত এবং কার্যকারণ-শৃঙ্খলাবদ্ধ। দেশ-কাল ব্যতীত কোন প্রাকৃতিক বস্তু থাকিতে পারে না। কারণ বিনা কোন কার্য হয় না, সব বস্তুরই কারণ আছে এবং সব বস্তুই পরস্পর কার্যকারণ-সম্বন্ধে আবদ্ধ ও তদ্দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এসব তথ্য না মানিলে বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানচর্চা চলে না, এগুলি অবশ্যস্বীকার্য কিন্তু অপ্রমাণিত স্বীকৃতিমাত্র (unproved assumptions)। দর্শনশাস্ত্রে এগুলির যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণ করিতে হয়, কারণ মানুষের প্রজ্ঞা প্রমাণ-প্রয়োগ ব্যতীত কোন মত বা প্রত্যয় গ্রহণ করিতে পারে না।

বিজ্ঞানের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে দর্শনের উৎপত্তি।

বিজ্ঞানের স্বীকৃতি।

তারপর দেখা যায়, বিজ্ঞানগুলির সবসময়েই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটিতেছে। কোন বিজ্ঞানই চিরকাল একভাবে থাকে না। উহারা নিত্য নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া প্রাকৃতিক বস্তু ও ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করিবার জন্য নূতন নূতন সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিতেছে। এইভাবে প্রত্যেক বিজ্ঞান ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর সিদ্ধান্তে (generalisation) উপনীত হইতেছে। এস্থলে দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির একটা সমন্বয় সাধন করিবার জন্য কোন সর্বব্যাপক বা ব্যাপকতম সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। এসব সর্বব্যাপক সিদ্ধান্তকেই দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা দার্শনিক সত্য বলা হয়।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি।

আর এক কথা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান খণ্ডজ্ঞান (selective)। এক একটি বিজ্ঞান প্রকৃতির এক এক ভাগ বা অংশ লইয়া আলোচনা করে। আবার যে বিজ্ঞান যে ভাগের আলোচনা করে তাহারও সব বিষয়ের ও ব্যাপারের অনুসন্ধান করে না। যেমন পদার্থবিদ্যা (physics) জড়পদার্থ এবং উহার গঠন ও শক্তির পরিণামাদির বিচার করে, জড় জগতের অন্যান্য বিষয়ের (যথা—রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদির) আলোচনা করে না। তারপর প্রাণবিজ্ঞান প্রাণসম্বন্ধীয় বিষয়গুলির আলোচনা করে, জড় বা মন সম্বন্ধে কোন গবেষণা করে না। অবশ্য প্রকৃতিকে ভাগ করিয়া তাহার কোন বিশেষ ভাগের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার উপযোগিতা ও উপকারিতা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

বিজ্ঞানের খণ্ডজ্ঞান।

জীবজগৎ কোনরূপ দুর্ভেদ্য প্রাচীরদ্বারা বিভক্ত নহে। ইহার একাংশ অন্য সব অংশের সহিত জড়িত এবং একটিকে সম্পূর্ণভাবে জানিতে হইলে অন্যগুলিকেও জানিতে হয়। কাজেই বলিতে হয় যে, বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান জীবজগৎ সম্বন্ধে অপূর্ণ বা খণ্ডজ্ঞান। মানব মন এরূপ খণ্ডজ্ঞানে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। আমাদের বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞা বিশ্বের সব কিছু জানিতে চায়, সব কিছু বুঝিতে চায়। আমরা বিশ্বের পূর্ণজ্ঞান লাভের প্রয়াসী। অতএব বিশ্বের পূর্ণজ্ঞান পাইতে হইলে আমাদিগকে বিজ্ঞানের খণ্ড খণ্ড জ্ঞানগুলির সমাবেশ ও সমন্বয় সাধন করিতে হইবে, আর সেই সামগ্রিক জ্ঞানের নামই দর্শন।

দর্শন বিজ্ঞানসমূহের সমন্বয় বা সমষ্টি মাত্র।

দর্শনকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্বাভাবিক পরিণতি বা রূপান্তর বলিলে উহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। এই মত অনুসারে কোন কোন দার্শনিক দর্শনকে বিজ্ঞান-সমূহের সমন্বয়শাস্ত্র (synthesis of the sciences) বলিয়াছেন। দৃষ্টান্তরূপে আমরা এখানে ভুণ্ট (Wundt) প্রদত্ত দর্শনের লক্ষণের উল্লেখ করিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন, 'দর্শন সেই সর্বব্যাপী বিজ্ঞান (universal science) যাহাতে বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের জ্ঞানসমূহের মিলনে একটি সুসংগত মতবাদ স্থাপন করা হয়' (Philosophy is the universal science which has to unite the cognitions attained by the particular sciences into a consistent system)। হার্বার্ট স্পেনসারের মতেও 'দর্শন সম্পূর্ণরূপে সুসম্বদ্ধ জ্ঞান (completely unified knowledge), দর্শনের ব্যাপক সিদ্ধান্তে বিজ্ঞানসমূহের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তগুলি অন্তর্ভুক্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়' ('the generalizations of philosophy comprehend and consolidate the widest generalizations of science')।

দর্শন বিজ্ঞানসমূহের সম্পূর্ণরূপে সুসম্বদ্ধ ও ব্যাপকতম জ্ঞান।

এসব মতে আপত্তি।

কিন্তু এ মত গ্রহণীয় নহে। এরূপ হইলে দর্শন বিজ্ঞানসমূহের সিদ্ধান্তগুলির সমষ্টি বা যোগফলমাত্র হইয়া পড়িবে এবং তাহার কোন বিশিষ্ট বা স্বতন্ত্র সত্তা থাকিবে না। তারপর, সর্ববিজ্ঞানের সকল সিদ্ধান্ত জানা যে-কোন মানুষের পক্ষে অসম্ভব, কেন না অতীত ও বর্তমান বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত-গুলি জানা সম্ভব হইলেও ভবিষ্যৎ কালে যেসব বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইবে তাহাদের সম্বন্ধে আমরা এখন কিছু জানিতে পারি না। শেষকথা, দর্শন যদি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির সমষ্টিমাত্র হয়, তবে বিজ্ঞানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক সত্য ও তত্ত্বগুলিরও পরিবর্তন ও বর্জন হইতে পারে। কিন্তু দার্শনিক তত্ত্বগুলি নিত্য ও শাশ্বত বলিয়াই আমরা স্বীকার করি।

আধুনিক কালে নব্য-বস্তুতন্ত্রবাদী (Neo-realist) কোন কোন দার্শনিক বলেন, দর্শন বিজ্ঞানসমূহের সমষ্টি নহে, কিন্তু বিজ্ঞানের মূল-তত্ত্বগুলির বিচারমূলক জ্ঞান (critical study of the fundamental categories of science)। পূর্বে বলিয়াছি যে, প্রত্যেক বিজ্ঞান কতকগুলি তত্ত্ব বিচার না করিয়া মানিয়া লয়, কারণ এগুলি স্বীকার না করিলে বৈজ্ঞানিক আলোচনাই চলে না। এই তত্ত্বগুলি সর্বগত এবং জাগতিক সকল বস্তুরই সাধারণ ও সর্বব্যাপী ধর্ম (pervasive characters)। এরূপ তত্ত্ব হইল দ্রব্যত্ব, একত্ব, দেশ, কাল, কার্যকারণ-সম্বন্ধ ইত্যাদি। যে কোন বস্তুর কথা বলা যাক্ না কেন তাহা দেশ ও কালে অবস্থিত এবং তাহা একটি দ্রব্য বা দ্রব্যনিষ্ঠ ধর্ম এবং তাহার সহিত অন্য বস্তুর কার্যকারণসম্বন্ধ আছে। বিজ্ঞান এইগুলির তত্ত্ব বা স্বরূপ নির্ধারণ করে না। দর্শনে এগুলির বিচার-বিশ্লেষণ ও স্বরূপ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয়। দেশ, কাল প্রভৃতি তত্ত্বগুলি স্বরূপতঃ কি তাহা সাধারণ লোকে বিচার করিয়া দেখে না। বৈজ্ঞানিকগণ সেগুলির বাহ্যরূপ বা বৃত্তিবিশেষের (specific functions) আলোচনা করিলেও সাধারণতঃ তাহাদের স্বরূপ (ultimate nature) সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হন না। দর্শনশাস্ত্রেই আমরা বিচার করিয়া দেখি যে, দেশ-কাল প্রভৃতির স্বতন্ত্র বিষয়গত সত্তা (independent objective reality) আছে, না উহারা কেবল জ্ঞানগত প্রত্যয় বা আকার মাত্র (subjective ideas or forms)। তার্কিক বিচার-বিশ্লেষণদ্বারা (logical analysis and criticism) এসব তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করাই দর্শনের বৈশিষ্ট্য।

দর্শন বিজ্ঞানের মূল-তত্ত্বের বিচারশাস্ত্র।

দর্শনের পূর্বোক্ত লক্ষণটিও দোষমুক্ত বলিয়া মনে হয় না এবং তাহার মূলে বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের যে সম্বন্ধ নির্ণয় করা হইয়াছে তাহাও বোধ হয় ঠিক নয়। দর্শন বলিতে যদি বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলির বিচারমাত্র বুঝায় তবে বিজ্ঞান ও দর্শনের পার্থক্য থাকে না এবং দর্শনকে একটি পৃথক্ শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করার আবশ্যকতাও থাকে না। বিজ্ঞানমাত্রেই তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি যুক্তিদ্বারা সমর্থন করে। ন্যায়সংগত বিচার-প্রণালীর সাহায্যেই বৈজ্ঞানিক সত্য বা তত্ত্বগুলি সমর্থিত হয়। বিজ্ঞানের দুইটি দিক্ আছে। একদিকে বিজ্ঞান প্রাকৃতিক দ্রব্যনিচয়ের জ্ঞানলাভ করিতে এবং প্রাকৃতিক নিয়মগুলি (natural laws) আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। এটিকে বিজ্ঞানের ব্যাবহারিক (practical) দিক্ বলা যাইতে পারে এবং যেসব বিজ্ঞানে শুধু এই দিক্‌টিই আছে তাহাদিগকে ব্যাবহারিক বিজ্ঞান (applied science) বলে। অপরদিকে বিজ্ঞান তাহার তত্ত্বগুলি সমর্থনযোগ্য কি না তাহা বিচার করিয়া দেখে। অবশ্য এই বিচার ন্যায়সংগত প্রণালীতেই করিতে হয়।

এই মতে আপত্তি।

CENTRAL LIBRARY

এটিকে বিজ্ঞানের প্রামাণ্যের (theoretical or logical) দিক্ বলা যাইতে পারে। এখন বিজ্ঞান যদি প্রামাণ্যের দিক্ দিয়া তাহার অপর তত্ত্বগুলির ন্যায় মূলতত্ত্বগুলিও বিচারদ্বারা সমর্থন করে, তবে আর দর্শনের প্রয়োজন কি? বস্তুতপক্ষে আধুনিক বিজ্ঞান, বিশেষতঃ আধুনিক পদার্থবিদ্যা (modern physics) তাহাই করিতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানে জড়তত্ত্ব (matter), দেশ, কাল (space, time) প্রভৃতির স্বরূপ নির্ণয় করিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং তাহা কতকটা ফলবতীও হইতেছে। এরূপস্থলে দর্শনের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন থাকে না। এইজন্যই বোধ হয় কোন কোন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক বর্তমান কালে দর্শন নাম পরিত্যাগ করিয়া তার্কিক দৃষ্টবাদের (Logical Positivism) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পরবর্তীকালে দর্শন বলিয়া কোন শাস্ত্র থাকিবে না এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীও (prediction) করিয়াছেন। অপরপক্ষে বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলির সত্যাসত্য বা স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য যদি দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন হয়, তবে বিজ্ঞানের অপর তত্ত্বগুলিও দর্শনশাস্ত্র-দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে এবং বিজ্ঞানের পৃথক্ সত্তা স্বীকার করার পক্ষে কোন হেতু থাকে না। ফলকথা, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করা এবং যুক্তিদ্বারা সমর্থন করা বিজ্ঞানেরই কাজ, সেজন্য দর্শন নামে পৃথক্ শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। বিজ্ঞান যে প্রণালীতে তাহার অপ্রধান ও বিশেষ তত্ত্বগুলি নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়, সেই প্রণালীদ্বারা তাহার প্রধান বা মূল ও সাধারণ তত্ত্বগুলি কেন নির্ণয় করিতে পারিবে না তাহা বুঝা যায় না। আর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি বিজ্ঞানের দ্বারা নিরূপিত না হইলে দর্শন তাহা কি প্রকারে নির্ণয় করিবে তাহাও সহজবোধ্য নহে। অন্যক্ষেত্রে দার্শনিক মত গ্রহণযোগ্য হইলেও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক মত গ্রহণ করা দার্শনিকের পক্ষে সমীচীন ও অপরিহার্য বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনে দেশ, কাল ও জড়তত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয়ে যে মত পোষণ করা হয়, তাহা আধুনিক বিজ্ঞান হইতেই গৃহীত হইয়াছে মনে হয়। অতএব দর্শনকে বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের বিচারশাস্ত্র (critical study of the foundations of science) বলিলে দর্শন ও বিজ্ঞানের পার্থক্য বুঝা কঠিন হইয়া পড়ে।

দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ অন্যভাবে নির্ণয় করা উচিত।

দর্শন ও বিজ্ঞানের লক্ষণ নির্দেশ করিতে যেসব দার্শনিক দর্শনকে বিজ্ঞানের রূপান্তর বা নামান্তর বলিয়াছেন, তাঁহাদের মত যে গ্রহণীয় নহে তাহা আমরা দেখিয়াছি। কারণ এরূপ বলিলে দর্শন বিজ্ঞানেই পর্যবসিত হয় এবং উহাদের কোন পার্থক্যও থাকে না, আর যাহাদের পার্থক্য নাই তাহাদের সম্বন্ধের কথা ঠিকভাবে বলা চলে না। বরং বিজ্ঞানকেই দর্শনের আসনে বসাইয়া দর্শনকে নির্বাসিত করা বা চিরতরে বিদায় দেওয়া দার্শনিকের পক্ষে সমীচীন হইবে। কিন্তু ইহার কোন পক্ষই গ্রহণীয় নয়।

বিজ্ঞানকে দর্শনের স্থান দেওয়া যায় না, আর দর্শনকে পরিত্যাগ করাও যায় না। অতএব আমাদিগকে অন্যভাবে উহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইবে।

দর্শন ও বিজ্ঞান পরস্পর নির্ভরশীল ও পরস্পরের পরিপূরক।

দর্শনের লক্ষণ নির্দেশ করিতে বলিয়াছি যে, দর্শন সকল বিষয়ের বা জীব-জগতের তত্ত্ব ও অবভাস, স্বরূপ ও আপেক্ষিক রূপ, বাহ্য ও আন্তর সত্তা (phenomena and noumena) এতদুভয়ের আলোচনা করে এবং বিচারপূর্বক তাহাদের জ্ঞানলাভ করিবার ও সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করে। এরূপ হইলে দর্শন ও বিজ্ঞানকে পরস্পর নির্ভরশীল (interdependent) ও পরস্পরের পরিপূরক (complementary) শাস্ত্র বলিতে হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বিজ্ঞান আমাদের যে জ্ঞান প্রদান করে তাহা বস্তুনিচয়ের বাহ্যরূপ-বিষয়ক, অর্থাৎ উহা প্রাকৃতিক জগতের এবং আমাদের মন বা আত্মার প্রত্যক্ষযোগ্য গুণ-ধর্ম-ক্রিয়া ও অবস্থার (empirical states and processes) পরিচয় দেয়। এসব বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করিতে হইলে দর্শন ও দার্শনিককে বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিতে হইবে, কারণ দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ (sensible world) সম্বন্ধে বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানই দার্শনিকের জ্ঞান অপেক্ষা সঠিক, সুসম্বন্ধ ও বিশ্বাসযোগ্য। এ দিক্ দিয়া বলিতে হয়, দর্শনকে বিজ্ঞানের সহায়তা লইতে হইবে।

কিন্তু বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উহাতেই সীমাবদ্ধ। এজন্য ইহা আমাদের ও প্রাকৃতিক জীব-জগতের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব (reality or noumenon) এবং উহাদের তাৎপর্য (significance), উদ্দেশ্য (purpose), ও চরম লক্ষ্য (function and destiny) প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ আলোক বা জ্ঞান দিতে পারে না। তারপর বিজ্ঞান খণ্ডজ্ঞান, ইহাদ্বারা আমরা বিশ্বের বিভিন্ন বিভাগের (different departments of the world) পৃথগ্‌ভাবে জ্ঞানলাভ করিতে পারি বটে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক জ্ঞান বা ধারণায় (conception of the world as a whole) উপনীত হইতে পারি না। এসব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে আমাদিগকে দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য লইতে হইবে। দর্শনেই এসব বিষয়ের যথাযোগ্য বিচার করা হয় এবং নির্ভরযোগ্য জ্ঞানলাভ করা যায়। এ দিক্ দিয়া বলা যায় যে, বিজ্ঞানকে দর্শনের সহায়তা লইতে হইবে এবং উহা দর্শনের উপর নির্ভর করে।

একটি দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টি বুঝান যায়। কোন লোকের আভ্যন্তরিক বা মানসিক অবস্থা জানিতে হইলে আমরা তাহার দৈহিক অবস্থা, কথাবার্তা, আচরণ ইত্যাদি (অর্থাৎ বাহ্য প্রকাশগুলি) প্রত্যক্ষ করি এবং তাহা হইতেই বিচারবুদ্ধি বা প্রজ্ঞার (intellect or reason) সাহায্যে তাহার মানসিক অবস্থা জানি। সেইরূপ জীবজগৎ সম্বন্ধে তত্ত্ব জানিতে হইলে তত্ত্বপ্রকাশক পরিদৃশ্যমান বস্তুনিচয়ের (phenomena) যথার্থ জ্ঞানলাভ করিতে হইবে

এবং তাহা হইতে প্রজ্ঞার সাহায্যে তত্ত্ব ও তত্ত্বার্থ জানিতে হইবে। প্রত্যক্ষজ্ঞানে (sense experience) প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান হইতেই পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান পাওয়া যাইবে। আবার পরিদৃশ্যমান জীবজগতের তত্ত্ব ও তাৎপর্য বুঝিতে হইলে এবং সে-সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক ধারণা করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলির দার্শনিক আলোচনা ও ব্যাখ্যা আবশ্যক। দর্শনশাস্ত্রে আমরা তত্ত্বার্থ এবং জীবজগতের সামগ্রিক রূপের জ্ঞানলাভ করি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দর্শন ও বিজ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক; দর্শনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান (পরিদৃশ্যমান জীবজগতের জ্ঞান) বিজ্ঞানে পাওয়া যায়, আবার বিজ্ঞানে যে জ্ঞানের (অর্থাৎ তত্ত্বার্থ জ্ঞানের) অভাব আছে তাহা দর্শনে পাওয়া যায়। একটি অন্যটির অভাব পূরণ করিলে পূর্ণ জ্ঞান পাওয়া যাইবে এবং তাহাতে আমরা তৃপ্তিলাভ করিতে পারিব। এজন্য দর্শনকে প্রত্যক্ষজ্ঞানের এবং তন্মূলক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমালোচনা ও তাৎপর্য-ব্যাখ্যা বলা যায় (philosophy is the criticism of expérience, or the rational interpretation of scientific knowledge)।

৫। তত্ত্ববিদ্যা ও বিজ্ঞান
(Metaphysics and Science)

তত্ত্ববিদ্যা প্রায়শঃ বিজ্ঞানের সমালোচনা।

পূর্বে বলিয়াছি যে, বিজ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞানের আলোকে জড় প্রকৃতি, অজড় মন প্রভৃতির বাহ্যরূপের বা বাহ্যসত্তার আলোচনা করে এবং সে-সম্বন্ধে সুসম্বদ্ধ জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে, তত্ত্ববিদ্যা সব বস্তুর বা জীবজগতের অন্তর্নিহিত স্বরূপ-সত্তার জ্ঞান অন্বেষণ করে। ইহা হইতে বুঝা যায়, তত্ত্ববিদ্যায় সাধারণতঃ প্রত্যক্ষজ্ঞানলব্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমালোচনা বা নিষেধাত্মক আলোচনাই (negative criticism) পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্যায় বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া ইহাই প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হয় যে, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হইতে আমরা জীবজগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করি তাহা জীবজগতের তত্ত্ব স্পর্শ করে না, উহার বাহ্যরূপ বা অবভাসমাত্রের (phenomena or appearance) জ্ঞান দেয়। তারপর তত্ত্ববিদ্যায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিচার করিয়া দেখান হয় যে, উহা খণ্ডজ্ঞান, অসম্পূর্ণ জ্ঞান এবং উহাতে অন্তর্বিরোধ (inner contradiction) আছে। এজন্য প্রত্যক্ষজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান—কোনটিতেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না ইহাই তত্ত্বদর্শী বা তত্ত্বজ্ঞানী (metaphysician) দেখাইবার চেষ্টা করেন। আবার কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেন যে, পরম তত্ত্বে

CENTRAL LIBRARY

পরিদৃশ্যমান জগতের (sensible world) কোন স্থান বা অস্তিত্ব নাই, তাহাতে উহা ত্রিকালনিষিদ্ধ, অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কোন কালেই উহার তত্ত্বগত অস্তিত্ব নাই। অদ্বৈত বেদান্তে এই মত দেখা যায়। পক্ষান্তরে, অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞানী বলেন যে, পরমতত্ত্বে অবভাসাত্মক (of the nature of appearances) জীবজগৎ একেবারে নিষিদ্ধ বা বিনষ্ট হয় না, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত ও প্রকারান্তরিত (transformed and transmuted) হইয়া যায়। কারণ জাগতিক সব বস্তুর অন্তর্বিরোধ আছে, উহারা স্ববিরোধী (self-contradictory)। কিন্তু পরমতত্ত্বে কোন দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নাই, উহা স্বসংবাদী (self-consistent) পূর্ণ-জ্ঞানসত্তা (sentient whole)। অতএব জাগতিক বস্তুসকল তাহাদের স্ববিরুদ্ধ রূপ পরিহার করিলে তবে পরমতত্ত্বে স্থান পাইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক ব্রাড্‌লির দর্শনে এরূপ মত দেখা যায়। এসব তত্ত্বজ্ঞানীর মতদৃষ্টে আমরা বলিতে পারি যে, তত্ত্ববিদ্যা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং উহার সমালোচনাদ্বারা প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য এখানে বলা আবশ্যক যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমালোচনা করিয়াই আমরা তত্ত্বজ্ঞান পাই না। আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতেই আমরা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করি, সমালোচনাদ্বারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অসারতা দেখাইয়া তত্ত্বজ্ঞানকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি।

৬। দর্শন, তত্ত্ববিদ্যা ও তর্কশাস্ত্র

(Philosophy, Metaphysics and Logic)

তর্কশাস্ত্র কাহাকে বলে?

দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যা বলিতে কি বুঝায় তাহা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন তর্কশাস্ত্রের (Logic) সহিত উহাদের কি সম্বন্ধ তাহার আলোচনা করিতে হইবে। তর্কশাস্ত্র কাহাকে বলে? যে শাস্ত্রে সর্ববিষয়ে আমাদের চিন্তা-প্রণালী ও বিচার-পদ্ধতি কিরূপ বা কি প্রকারের হইলে নির্ভুল ও নির্দোষ হয় তাহার আলোচনা করা হয়, তাহার নাম তর্কশাস্ত্র। (Logic is the science of valid thought)। তর্কশাস্ত্রকে তর্কবিজ্ঞান, তর্কবিদ্যা, ন্যায়-বিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র, আন্বীক্ষিকী প্রভৃতি আখ্যাও দেওয়া হয়। আমরা সব বিষয়েই যুক্তিতর্ক করি। যেমন কেহ বলিলেন—'আজ বৃষ্টি হইবে, কারণ আকাশে মেঘ দেখা যাইতেছে'। কিন্তু বৃষ্টি হইল না। অতএব ঐ অনুমান ভুল হইল। আবার কেহ বলিলেন—'দূরস্থ পর্বতে অগ্নি আছে, কারণ তাহাতে ধূম দেখা যাইতেছে'। কাছে গিয়া পর্বতে অগ্নি দেখিয়া বুঝিলাম যে, এ অনুমান সত্য ও যথার্থ। এখন কিভাবে ও কিপ্রকারে অনুমান করিলে উহা

CENTRAL LIBRARY

নির্ভুল হইবে এবং কিজন্য উহা ভুল হয়, তাহা তর্কশাস্ত্রের বিচার্য। এইভাবে সর্ববিষয়েই আমাদের জ্ঞান কখন ভ্রমাত্মক হয় আর কখন নির্ভুল হয় এবং নির্ভুল জ্ঞানের আকার-প্রকার ও নিয়ম কিরূপ তাহা ন্যায়শাস্ত্রে বা তর্কশাস্ত্রে বিচার করা হয়।

এখন তর্কশাস্ত্রের সহিত দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যার কি সম্বন্ধ তাহা আমরা বুঝিতে পারি। তর্কশাস্ত্রের সহিত দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যার সম্বন্ধ একরূপ বা একপ্রকার। উভয় শাস্ত্রেই আমরা জীবজগৎ সম্বন্ধে যথার্থজ্ঞান লাভ করিবার প্রয়াস করি। কিন্তু জীব, জগৎ ও পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ ও অনুমান, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাদ্বারা লব্ধ জ্ঞান কি প্রকারের হইলে সত্য ও যথার্থ হইবে তাহার নির্ণয় তর্কশাস্ত্রের সাহায্যেই করিতে হইবে। অতএব দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যায় আমরা যে-সব তথ্য, তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তে উপনীত হই তাহাদের সত্যাসত্য, প্রামাণ্যাপ্রামাণ্য নির্ণয় করিতে হইলে তর্কশাস্ত্র বা ন্যায়শাস্ত্রের সহায়তা লইতে হইবে। সুতরাং বলিতে হয় যে, দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যা তাহাদের সত্যাসত্য নির্ধারণ ও প্রমাণের জন্য তর্কশাস্ত্রের উপর নির্ভর করে। আরও দেখা যায় যে, যদি দর্শনের বা তত্ত্ববিদ্যার সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে কোন নাস্তিক সন্দেহ করেন বা সেগুলি অস্বীকার করেন, তবে তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে আমরা সেসব সন্দেহ ও আপত্তি খণ্ডন করিতে পারি। অতএব দার্শনিক ও তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলির প্রতিষ্ঠা ও সমর্থনের জন্যও ন্যায়শাস্ত্র প্রয়োজন। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, যুক্তিতর্ক করিয়া দার্শনিক জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, প্রতিপাদন ও সমর্থন করা যায়, কিন্তু সে জ্ঞান লাভ করা যায় না। তত্ত্বানুভূতি (experience of reality) তত্ত্বজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। এমনকি জাগতিক কোন বস্তুর অস্তিত্ব জানিতে হইলে আমাদের সেবিষয়ে অনুভূতি (experience) আবশ্যক, যুক্তিতর্ক করিয়া আমরা কোন বস্তুরই অস্তিত্ব জানিতে পারি না। তর্ক করিয়া অন্ধ ব্যক্তিকে আলোকের জ্ঞান দেওয়া যায় না, সেজন্য চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ অপরিহার্য ও যুক্তিতর্ক-নিরপেক্ষ। অতএব তর্কশাস্ত্র দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে, উহাকে নাস্তিকের সংশয় ও প্রতিবাদের বিরুদ্ধে সমর্থন ও প্রতিপাদন করিতে সহায়তা করে, কিন্তু আমাদিগকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ করে না। কোন প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক ন্যায়শাস্ত্রকে 'বেদান্তের কণ্টকাবরণ' বলিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে, যেমন কাঁটার বেড়া দিয়া গাছকে গরু-ছাগলের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিতে হয়, তেমনি ন্যায়শাস্ত্রের সহায়তায় বেদান্তের তত্ত্বকে নাস্তিকের কবল হইতে উদ্ধার ও রক্ষা করিতে হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না।

তর্কশাস্ত্র দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যার সহায়ক।

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়ক নহে।

৭। দর্শন, তত্ত্ববিদ্যা ও প্রমাবিজ্ঞান
(Philosophy, Metaphysics and Epistemology)

পাশ্চাত্য দর্শনে যাহাকে Theory of knowledge বা Epistemology বলে, তাহাকে আমরা প্রমাবিজ্ঞান বলিয়াছি। Epistemology শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতেছে জ্ঞানবিচার-শাস্ত্র বা জ্ঞানবিষয়ক বিজ্ঞান (science of knowledge)। 'প্রমাবিজ্ঞান' শব্দের অর্থ হইতেছে প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের বিচার-শাস্ত্র। প্রমাবিজ্ঞানের ন্যায় Epistemology যথার্থ জ্ঞান সম্বন্ধেই বিচার-বিশ্লেষণ করে বলিয়া উহাকে প্রমাবিজ্ঞান বলা যায়।

প্রমাবিজ্ঞানের লক্ষণ।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে দার্শনিকগণ, অনেক দার্শনিক তথ্য ও তত্ত্ব নির্বিচারে (dogmatically) স্বীকার করিয়া লইতেন, তাহার জন্য কোন প্রমাণ-প্রয়োগ করিতেন না। ফলে দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে দার্শনিকদের বড় কম শক্তি ও সময়ের অপব্যয় হয় নাই, অর্থাৎ দার্শনিক আলোচনা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। আধুনিক যুগের প্রবর্তক (father of modern philosophy) ডেকার্ট প্রথমে এবিষয়ে সচেতন হন এবং 'কেন দর্শনে কোন মত বা সিদ্ধান্ত স্বীকার করিব'—এ সন্দেহ ও প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং সেজন্য যথাযোগ্য যুক্তিতর্কের অবতারণা করেন। তারপর জন লক্ আরও সতর্কতার সহিত জ্ঞান-বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি-গুলির প্রকৃতি কিরূপ এবং কিভাবে তাহাদের সাহায্যে আমরা জ্ঞানলাভ করি, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করেন। তাহার জ্ঞানবিচার মনোবিজ্ঞান বা মনোবিদ্যার (psychology) স্তরে নিবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার পরবর্তী কালের দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট তদবধি সতর্কতার সহিত জ্ঞানের বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। জ্ঞানের সম্ভাব্যতা (possibility of knowledge) কোন্ কোন্ প্রত্যয় বা উপপাদক-হেতুর (transcendental conditions) উপর নির্ভর করে, আমাদের বিচারবুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান কোন্ কোন্ বস্তুর বা তত্ত্বের পরিচয় দিতে পারে এবং উহার অলঙ্ঘনীয় সীমারেখা কোথায় অবস্থিত এসব বিষয়ের তথ্যপূর্ণ আলোচনা তাহার 'Critique of Pure Reason' নামক অতুলনীয় গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। জ্ঞান-সম্পর্কে এসব তথ্যানুসন্ধানকেই জ্ঞানবিচার বা সমালোচনা

ডেকার্ট ও লকের দর্শনে প্রমাবিজ্ঞানের সূচনা।

কাণ্টের দর্শনে উহার পরিণতি।

CENTRAL LIBRARY

('criticism') বলা হয় এবং আধুনিক কালে উহাকে প্রমাবিজ্ঞান বা Epistemology আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

প্রমাবিজ্ঞানে আমরা বিচারপূর্বক নির্ণয় করি, যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা কাহাকে বলে, উহা লাভের উপায় বা সাধন কি, অর্থাৎ প্রমাণ কাহাকে বলে এবং কয় প্রকার প্রমাণ আমাদের অবশ্য স্বীকার্য। অবশ্য প্রথমে আমাদিগকে মনোবিজ্ঞানের (psychology) সাহায্যে নির্ণয় করিতে হইবে যে, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রকৃতি কিরূপ, উহা কিভাবে গঠিত, উহার ব্যাপারগুলি (functions)—যথা প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, অনুমান ইত্যাদি—কিপ্রকারের এবং কিভাবে আমাদের বয়সের সঙ্গে উহার ক্রমপরিণতি ঘটে। এভাবে দেখা যায় যে, প্রমাবিজ্ঞানে প্রথমে আমাদিগকে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হয়। তারপর প্রমাবিজ্ঞানে যথার্থ জ্ঞান বা প্রমার (validity, truth) লক্ষণ কি, প্রমা ও ভ্রমের (truth and error) ভেদ কোথায় এবং কিভাবে তাহা জানা যায় (tests of truth and error), প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের লক্ষণ কি, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি কিভাবে পরিচালিত হইলে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণদ্বারা আমরা বস্তুর যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারি, ইত্যাদি সব বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে। এজন্য প্রমাবিজ্ঞানে আমাদিগকে তর্কশাস্ত্রের (logic) সাহায্য লইতে হইবে। অতএব মনোবিজ্ঞানের ন্যায় তর্কবিজ্ঞানও (psychology and logic) প্রমাবিজ্ঞানের অন্তর্গত। কিন্তু প্রমাবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্রকে অতিক্রম করিয়া সুদূরপ্রসারী ও গভীরতর জ্ঞানবিচারে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে আরও প্রশ্ন উঠে—ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদির সাহায্যে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা জ্ঞেয় বস্তুনিচয়ের স্বরূপের জ্ঞান, না তাহাদের বাহ্যরূপের বা অবভাসের জ্ঞানমাত্র, উহাদের সাহায্যে আমরা পরম তত্ত্ব জানিতে পারি কি না, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে মানুষের বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার (intellect and reason) কোন যোগ্যতা ও সামর্থ্য আছে, না উহারা এই দৃশ্যমান জগতের (sensible or phenomenal world) জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ, যদি তাহাই হয় তবে তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় কি? এসব তত্ত্ববিষয়ক চরম প্রশ্নগুলিও প্রমাবিজ্ঞানে উঠে এবং তাহাদের যথাযোগ্য আলোচনা করা হয়। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, প্রমাবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্রকে অতিক্রম করিয়া তত্ত্ববিদ্যার (metaphysics) তটভূমি স্পর্শ করে, অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্যালোচনার শাস্ত্র হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ হেগেল প্রমুখ দার্শনিকগণ তত্ত্ববিদ্যাকে প্রমাবিজ্ঞান হইতে অভিন্ন (metaphysics is identical with logic or epistemology) বলিয়াছেন।

প্রমাবিজ্ঞানে প্রথমে মনোবিজ্ঞানের স্থান।

তারপর তর্কশাস্ত্রের স্থান।

কিন্তু উহা উভয়কে অতিক্রম করিয়া তাত্ত্বিক প্রশ্ন উত্থাপন ও বিচার করে।

CENTRAL LIBRARY

এখন আমরা প্রমাবিজ্ঞানের সহিত দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যার কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে পারি। দর্শন জীবজগৎ সম্বন্ধে সামগ্রিক, যথার্থ ও সুসমঞ্জস (coherent) জ্ঞান; তত্ত্ববিদ্যা পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুরূপ (similar) জ্ঞান। প্রথমে জ্ঞানের প্রামাণ্যাপ্রামাণ্যের বিচার করিলে তবে আমরা বুঝিতে পারি যে, দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যা আমাদের যে জ্ঞান প্রদান করে তাহা যথার্থ ও সুসমঞ্জস কি না এবং তাহার তাত্ত্বিক মূল্য ও উপযোগিতা আছে কি না। এজন্য দর্শনে ও তত্ত্ববিদ্যার প্রমাবিজ্ঞানকে প্রথম স্থান দিতে হয় এবং উহাদের ভিত্তি (foundation) বলিয়া গণ্য করিতে হয়। উভয়কেই প্রমাবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। ভারতীয় দর্শনের সব শাখাতেই তাহা করা হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসে ডেকার্টের পরে, বিশেষ করিয়া ইমানুয়েল কাণ্টের যুগ হইতে প্রমাবিজ্ঞানকে দর্শনের প্রাথমিক অংশ (basic part) বলিয়া বিবেচনা করা হয়। অবশ্য সমসাময়িক যুগে (contemporary period) কোন কোন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক এ মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যাকে প্রমাবিজ্ঞান-নিরপেক্ষ (independent) করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রচেষ্টা ফলবতী এবং স্বসংবাদী (self-consistent) কি না সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। আমাদের মনে হয়, প্রমাবিজ্ঞান কেবল দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যার কেন, সব শাস্ত্রেরই ভিত্তি ও অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, তাহাদের পথযাত্রায় দিঙ্-নির্দেশক আলোক ও আশ্রয়স্থল। এইজন্যই ভারতীয় দার্শনিকগণ ন্যায়শাস্ত্র তথা প্রমাবিজ্ঞানের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—

দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যা প্রমাবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

"প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্তিতা॥"

অর্থাৎ বিভিন্ন বিদ্যা বা বিজ্ঞানের পরিগণনাস্থলে ন্যায়শাস্ত্রকে সর্ববিদ্যার পথপ্রদর্শক আলোক, সর্ব কর্মের উপায় ও সর্ব ধর্মের আশ্রয় বা সহায় বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে।

৮। তত্ত্ববিদ্যা ও মনোবিদ্যা
(Metaphysics and Psychology)

সাধারণভাবে মনোবিদ্যা বলিতে মন সম্বন্ধীয় বিদ্যা বা যথার্থ জ্ঞান বুঝায়। বিশেষভাবে ইহা সুস্থ মানুষের মন অথবা অসুস্থ ও বিকৃত মানুষের মন সম্বন্ধীয় হইতে পারে; প্রথমটিকে শুধু Psychology, দ্বিতীয়টিকে Abnormal Psychology বলা হয়। আবার উহা মানুষের মনের

মনোবিদ্যার লক্ষণ ও প্রকারভেদ।

বিশেলষণাত্মক ও গঠনবিষয়ক (Analytic and Structural) হইতে পারে, অথবা ক্রমপরিণতিজ্ঞাপক ও বৃত্তিবিষয়ক (Genetic and Functional) হইতে পারে। তারপর উহা শিশুদের মন সম্বন্ধীয় (Child Psychology) হইতে পারে বা ইতরজন্তুর মন সম্বন্ধীয় (Animal Psychology) হইতে পারে, শিক্ষা সম্বন্ধীয় (Education Psychology) বা শিল্পবাণিজ্য সম্বন্ধীয় (Industrial and Commercial Psychology) হইতে পারে। এইভাবে আমরা অনেক প্রকারের মনোবিদ্যার কথা বলিতে পারি। কিন্তু তত্ত্ববিদ্যার সঙ্গে মনোবিদ্যার সম্বন্ধ আলোচনাস্থলে মনোবিদ্যার এসব প্রকারভেদের বিশেষ তাৎপর্য নাই। সেজন্য আমাদের দুইটি বিষয় জানা আবশ্যক।

মন ও mind শব্দের অর্থ ভিন্ন।

প্রথমে আমাদের জানা দরকার যে, ভারতীয় দর্শনে যাহাকে মনস্ বা মন বলা হইয়াছে, সাধারণতঃ তাহাকে আমাদের চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের ন্যায় একটি ইন্দ্রিয় ও জড় দ্রব্য বলিয়া গণ্য করা হয়, যদিচ উহা আন্তর বা দেহাভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রিয় এবং উহা অতি সূক্ষ্ম। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দর্শনে যাহাকে mind বলা হইয়াছে উহা ঠিক ভারতীয় দর্শনোক্ত মনস্ বা মন নহে। পরন্তু পাশ্চাত্ত্য দর্শনোক্ত mind বা মন ভারতীয় দর্শনোক্ত আত্মার অনুরূপ চেতন দ্রব্য, উহাতে জ্ঞান (consciousness or cognition), বেদনা (feeling) ও প্রযত্ন (willing) প্রভৃতি গুণ আছে এবং উহাকে প্রায়শঃ জড় দেহ হইতে ভিন্ন ও বিরুদ্ধ গুণবিশিষ্ট বলিয়া বিবেচনা করা হয়। আমরা মনোবিদ্যার সহিত তত্ত্ববিদ্যার সম্বন্ধ আলোচনায় মন বলিতে এরূপ দেশ-কালে অনবচ্ছিন্ন, দেহাভ্যন্তরস্থ অথচ দেহাতিরিক্ত চেতন পদার্থ বুঝিব।

মন শব্দ এখানে পাশ্চাত্ত্য দর্শনোক্ত mind অর্থে ব্যবহৃত।

দ্বিতীয় কথা হইতেছে যে, এরূপ মনের দুইটি দিক্ বা রূপ আছে—একটি তার স্বরূপ (reality), অপরটি বাহ্যরূপ (phenomenon) বা বৃত্তিরূপ (states, processes, functions)। Psychology বা মনোবিদ্যায় এই দুটি রূপেরই আলোচনা হইতে পারে। যাহাতে মনের কেবল তত্ত্বের বা স্বরূপের আলোচনা করা হয় তাহাকে তাত্ত্বিক মনোবিদ্যা (Rational, Metaphysical Psychology) বলা হয়। আর যাহাতে কেবল মনের বাহ্যরূপ বা বৃত্তিগুলির আলোচনা হয় তাহাকে ব্যাবহারিক মনোবিজ্ঞান (Empirical Psychology) বলা হয়। আর যাহাতে মনের তাত্ত্বিক ও বাহিক উভয় দিকের আলোচনা করা হয় তাহাকে দার্শনিক মনোবিদ্যা (Philosophical Psychology) বলা হয়। আমরা এখানে Psychology বা মনোবিদ্যা

Rational or Metaphysical and Empirical Psychology.

এখানে মনোবিদ্যা Philosophical Psychology অর্থে গৃহীত।

বলিতে এরূপ Philosophical Psychology বুঝিব এবং উহার সহিত তত্ত্ববিদ্যার কিরূপ সম্বন্ধ তাহার আলোচনা করিব।

মনোবিদ্যার সঙ্গে তত্ত্ববিদ্যার নিকট সম্বন্ধ দেখা যায়। কোন কোন দার্শনিকের মতে মন বা আত্মা পরম তত্ত্ব (ultimate reality)। এই মত আমাদের গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া মনে হয়। যদি তাহাই হয় তবে মনোবিদ্যার সাহায্যে আমরা তত্ত্বের স্বভাব-প্রকৃতি, গুণ ও ক্রিয়া (nature, quality and activity) সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান লাভ করিতে পারি। মন বা আত্মাই যখন তত্ত্ব বা পরমার্থ তখন তাহাকে জানিলেই পরমার্থ তত্ত্ব জানা যাইবে। ভারতীয় মনোবিদ্যায় তথা দর্শনে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় বা নির্বিকল্প সমাধি প্রভৃতি মনোভূমি বা জ্ঞানস্তরের বিচার করা হইয়াছে। এসব বিচার হইতে জানা যায় যে, স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রদবস্থাদৃষ্ট জগতের লয় হয় এবং মন একটা কাল্পনিক বা মনোময় জগৎ সৃষ্টি করে। সুষুপ্তি ও নির্বিকল্প সমাধিতে সে জগতেরও লয় হয় এবং শুদ্ধ নির্বিষয় জ্ঞান-সত্তামাত্র থাকে, যদিচ সে জ্ঞানের কোন জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় অনুভূত হয় না, অর্থাৎ 'আমি জানিতেছি' 'অমুক বিষয় জানিতেছি' এরূপ বোধ থাকে না। মনোবিজ্ঞান ও যোগশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত এরূপ তথ্যের আলোকে কোন কোন দর্শনে পরম তত্ত্বকে শুদ্ধ চৈতন্য বলা হইয়াছে। অদ্বৈত বেদান্ত ইহার দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের মনে হয়, প্রায় সর্ব দর্শনমতই মনোবিজ্ঞানলব্ধ তথ্যের, অথবা কোন না কোন মানসিক অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তারপর মনোবিদ্যার সাহায্যে আমরা অনেক তাত্ত্বিক সমস্যার (metaphysical problems) সমাধান করিতে পারি। আমেরিকান্ দার্শনিক জোসুয়া রইসের দার্শনিক রচনায় একথার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে। ভগবান্‌কে আমরা ত্রিকালজ্ঞ বা সর্বজ্ঞ (omniscient) বলিয়া থাকি। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে—কেমন করিয়া কোন পুরুষ বর্তমান জ্ঞানে ভূত ও ভবিষ্যৎ কালের কথা জানিতে পারিবেন? অতীত কালের সব ঘটনা ত গত ও লুপ্ত, ভবিষ্যৎ কালের ঘটনা ত অনাগত। কেমন করিয়া আমরা বর্তমান জ্ঞানে (present consciousness) সেসব জানিতে পারি? রইস্ তাঁহার *World and the Individual* গ্রন্থে আমাদের বর্তমান ক্ষণের জ্ঞানে কিভাবে কিছুটা ভূত-ভবিষ্যতের আভাস পাওয়া যায় তাহা দেখাইয়াছেন এবং তাহার সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। এইভাবে দেখা যায় যে, মনোবিদ্যা তত্ত্ববিদ্যার সহায়ক।

মনোবিদ্যার সঙ্গে তত্ত্ববিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—ইহা তত্ত্বজ্ঞান প্রসারক,

তত্ত্ববিদ্যার সহায়ক,

তারপর মনোবিদ্যার সাহায্যে আমরা তত্ত্ববিষয়ক সংশয় দূর করিতে ও কোন তাত্ত্বিক মত পরীক্ষা করিতে পারি। বিমূর্ত চিন্তা (imageless thought) অথবা নির্বিষয় চিন্তা (objectless thought) হইতে পারে কি না এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে হইলে আমাদের এইরূপ কোন অনুভূতি আছে কি না দেখিতে হইবে এবং মনোবিদ্যায় এ সম্বন্ধে কি তথ্য নির্ধারিত হইয়াছে তাহাই জানিতে হইবে। চিন্তার বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা যে তথ্য পাওয়া যাইবে তদনুসারে এবিষয়ে তত্ত্বনির্ধারণ করিতে হইবে। অতএব মনোবিদ্যাকে তাত্ত্বিক মতের (metaphysical views) সত্যাসত্য নিশ্চায়ক বলা যায়।

তাত্ত্বিক মতের যাথার্থ্য নিশ্চায়ক.

শেষ কথা, মনের বা আত্মার স্বরূপ (reality of mind) নির্ধারণ তত্ত্ববিদ্যার একটি কার্য। মনকে পরম তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার না করিলেও মনোবিদ্যার আলোকে আমরা অন্ততঃ মনের তাত্ত্বিক রূপ বা স্বরূপ কতকটা বুঝিতে পারি। এসব দৃষ্টে মনোবিদ্যার সহিত তত্ত্ববিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিতে হইবে।

মনস্তত্ত্ব জ্ঞাপক।

CENTRAL LIBRARY

দ্বাদশ অধ্যায়

দার্শনিক জ্ঞানলাভের পদ্ধতি এবং জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে মতবাদ

(Methods of Philosophy : Theories of the Origin of Knowledge)

পূর্বে বলিয়াছি যে, দর্শন সমগ্র দৃশ্যমান জীবজগৎ ও তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই জ্ঞানলাভের উপায় বা পদ্ধতি কি এবং জ্ঞান কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? এবিষয়ে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। এসব মতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। কতকগুলিকে নির্বিচার পদ্ধতি (dogmatic method) এবং কতকগুলিকে সবিচার পদ্ধতি (critical method) বলা যায়। এখন এগুলির আলোচনা করা যাইবে।

১। নির্বিচার মতবাদ

(Dogmatism)

নির্বিচার মতবাদের লক্ষণ।

প্রাচীন কালে দার্শনিকগণ তাঁহাদের দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা মত স্থাপন করিবার জন্য যুক্তি-তর্ক বা বিচার-বিশ্লেষণের বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা কতকগুলি মূল প্রত্যয় বা সত্যকে স্বতঃসিদ্ধ ও স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া সেগুলি হইতে অন্যান্য প্রত্যয় ও সত্যে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিতেন যে, জন্মাবধি আমাদের মনে কতকগুলি প্রত্যয় নিহিত (innate ideas) থাকে এবং তাঁহারা সেগুলিকে ঈশ্বর-প্রদত্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এজন্য এসব প্রত্যয় নির্ভুল ও নির্দোষ এবং তাহাদের মূলে আমরা যেসব সিদ্ধান্তে বা সত্যে উপনীত হই তাহা আমাদিগকে জীবজগৎ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান প্রদান করে। প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটো ও রেনে ডেকার্ট এরূপ মত পোষণ করিতেন। আবার কেহ কেহ মনে করিতেন যে, ভগবান্ মানুষ সৃষ্টি করিবার সময় তাহাদের মন এরূপভাবে গঠন করিয়াছেন যে,

CENTRAL LIBRARY

তাহারা কতকগুলি মৌলিক সত্য ও তথ্য স্বভাবতঃই বিশ্বাস করে এবং সেগুলি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করে। ইহাদের মূলেই আমরা জীবজগৎ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারি।

উহা গ্রহণীয় নহে।

কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে এরূপ যুক্তিহীন মতবাদ গ্রহণীয় নহে। কোন্ প্রত্যয় জন্মাবধি আমাদের মনে নিহিত থাকে এবং কোন্ সত্য বা তথ্য বিশ্বাস করা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারেন না। এবিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে কোন মতৈক্য দেখা যায় না। যে প্রত্যয় বা সত্য একজনের নিকট অতি স্বাভাবিক, সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ মনে হয়, তাহা অন্যের নিকট সেরূপ না হইতে পারে, বরং তাহার বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট মনে হইতে পারে। অতএব দর্শনের ক্ষেত্রে সব প্রত্যয় ও সিদ্ধান্ত বিচারপূর্বক গ্রহণ করা উচিত। এরূপ বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া যেসব মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে সেগুলিকে সবিচার (critical) বলা যায়। এগুলি অল্পবিস্তরভাবে জ্ঞানবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখন সেগুলির আলোচনা করা যাইবে।

২। প্রত্যক্ষবাদ
(Empiricism)

প্রত্যক্ষবাদের লক্ষণ।

যে মত অনুসারে প্রত্যক্ষ (experience) একমাত্র প্রমাণ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায়, তাহাকে প্রত্যক্ষবাদ (empiricism) বলে। এই মতানুসারে জীবজগৎ সম্বন্ধে আমাদের যাবতীয় জ্ঞান প্রত্যক্ষলব্ধ। জন্ম হইতেই মানুষের মনে কোন প্রত্যয়, ধারণা বা জ্ঞানসংস্কার বর্তমান থাকে না। জন্মকালে মানুষের মন একটি অলিখিত সাদা কাগজের মত পড়িয়া থাকে। আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বহির্জগতের বস্তুরাজি মনের উপর ক্রিয়া করে এবং বিভিন্ন সংবেদন (sensation) উৎপাদন করে। এসব সংবেদন হইতে আমরা বহির্জগতের অস্তিত্ব এবং বাহ্য বস্তুর গুণধর্ম জানিতে পারি। সেইরূপ আন্তর বা মানস প্রত্যক্ষ হইতে আমরা আত্মার অস্তিত্ব জানিতে পারি। এইভাবে আমরা বহির্জগতের ও মনোজগতের বস্তুসমূহ এবং তাহাদের ধর্ম ও সাধারণ নিয়ম জানিতে পারি। আবার এইভাবে জীব ও জগতের কারণরূপে আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানিতে পারি এবং নীতি ও ধর্ম সম্বন্ধেও সকল তথ্য বুঝিতে

পারি। যে-বিষয়ে আমাদের কোন সংবেদন বা প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা আমাদের বুদ্ধিগত হইতে পারে না। অতএব প্রত্যক্ষ ও পর্যবেক্ষণ আমাদের সব জ্ঞানের মূল-কারণ এবং তদ্দ্বারাই আমরা সকল বিষয়ের জ্ঞান প্রাপ্ত হই। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসে ফ্রান্সিস্ বেকন, জন্ লক্-প্রমুখ দার্শনিকগণ এরূপ প্রত্যক্ষবাদের অনুরাগী ও সমর্থক ছিলেন। ইঁহাদের দার্শনিক মতবাদকে প্রত্যক্ষবাদ এবং প্রমাণপদ্ধতিকে প্রত্যক্ষ-পদ্ধতি (empirical method) বলা যায়।

উহার দোষত্রুটি।

কিন্তু কেবল ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষকে প্রমাণ-পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করিলে দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার আশা থাকে না। শুদ্ধ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষদ্বারা কোন যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায় কি না সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ এই যে, তাহা সব সময়ে, সব অবস্থায় ও সকল ব্যক্তির পক্ষে সত্য। কিন্তু ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এরূপ জ্ঞান হইতে পারে না। একই বস্তুর রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গুণ বিভিন্ন লোকের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষে অল্পবিস্তর বিভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। এমনকি একই ব্যক্তি বিভিন্ন অবস্থায় একই বস্তুকে বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারে। অতএব আমরা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষদ্বারা কোন বিষয়ে স্থির ও যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। আরও এক কথা, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এরূপ জ্ঞান হইতে পারে না। একই বস্তুর রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি (reality) জানিতে পারি না। যদি আমাদের ইন্দ্রিয়ের অবস্থান্তর ঘটে, বা কোন ইন্দ্রিয় নষ্ট হইয়া যায়, অথবা কোন নূতন ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়, তবে আমাদের দৃশ্যমান জগতের রূপও পরিবর্তিত হইবে। কিন্তু আমাদের কাছে বস্তুর বাহ্যরূপের পরিবর্তন হইলেও তাহার স্বরূপের পরিবর্তন হয় না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানে আমরা বস্তুর বাহ্যরূপই জানি, স্বরূপ জানিতে পারি না। যদি দর্শনশাস্ত্র কেবল ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষে নিবদ্ধ থাকে তবে তাহা তত্ত্বজ্ঞান হইবে না। পরন্তু দর্শনশাস্ত্রে আমরা যে জ্ঞানলাভ করিব, তাহা জাগতিক পদার্থের বাহ্যরূপেই (phenomena) সীমাবদ্ধ থাকিবে। এমনকি আমাদের তাহারও সমগ্র জ্ঞান হইবে না। আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা জগতের যে ক্ষুদ্র অংশটুকু প্রত্যক্ষ করিতে পারি তাহারই বাহ্যরূপ জানিতে পারিব। ভূত ও ভবিষ্যৎ, অন্তরিত ও দূরস্থ বস্তুবিষয়ে আমাদের কোন স্থির ও নিশ্চিত জ্ঞান হইবে না। অনুমানদ্বারা আমরা এসব বিষয়ে কিছু জানিবার চেষ্টা করিতে পারি বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে এরূপ আনুমানিক জ্ঞান অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ও অনিশ্চিত হইবে। এমনকি আমাদের নিজ নিজ প্রত্যক্ষের গণ্ডির বাহিরে আমরা অন্য কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারিব না। পরবর্তী কালে প্রত্যক্ষবাদের ঠিক এই পরিণতিই ঘটিয়াছে এবং ইহা সংশয়বাদে (scepticism) পরিণত হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

৩। সংশয়বাদ
(Scepticism)

জন্ লক্ নির্বিচারে মানিয়া লইয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষে আমরা বস্তুর স্বরূপ বা যথার্থ গুণধর্ম জানিতে পারি এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানের মূলে বহির্জগতের অস্তিত্ব, আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি অনুমান করিতে পারি। কিন্তু সংশয়বাদীর মতে প্রত্যক্ষ আমাদের সংবেদনমাত্র। প্রত্যক্ষে আমরা কতকগুলি সংবেদন অনুভব করি, সংবেদনের অতিরিক্ত কোন দ্রব্য বা বস্তু জানিতে পারি না। আমরা এক সংবেদন হইতে অন্যান্য সংবেদন অনুমান করিতে পারি, কিন্তু সংবেদনের অতীত কোন বিষয় জানিতে পারি না। অতএব সব বস্তুই সংবেদনের সংঘাত বা সমষ্টিমাত্র। বহির্জগৎ, আত্মা বা ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই।

সংশয়বাদের লক্ষণ।

ভারতীয় নাস্তিক-চূড়ামণি চার্বাকগণ, গ্রীক্ দার্শনিকদিগের মধ্যে যাঁহাদিগকে সফিস্ট (Sophist) বলা হয় তাঁহারা এবং বিশেষভাবে দার্শনিক পিরো (Pyrrho) সংশয়বাদী ছিলেন। আধুনিক যুগে ডেভিড্ হিউম, জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল ও কম্‌তের মতাবলম্বী দৃষ্টবাদীরা প্রকারান্তরে সংশয়বাদ সমর্থন করিয়াছেন। সংশয়বাদ অনুসারে আমাদের সর্ববিধ জ্ঞানই সন্দেহের অধীন। আমরা কোন বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ সত্যে উপনীত হইতে পারি না। সুতরাং দর্শনের কোন মতবাদ বা সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সংশয়বাদী সর্বদিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন, সকল মতের সমালোচনা ও খণ্ডন করেন, কিন্তু নিজে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন না। তাঁহার নিকট সত্য ও মিথ্যার, ন্যায় ও অন্যায়ের, এবং সৎ ও অসতের কোন মৌলিক পার্থক্য নাই অথবা তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁহার নিজ ইচ্ছা, অভিরুচি বা সংবেদন অনুসারে এইসব ভেদ সৃষ্টি ও ব্যবহার করিতে পারেন। কোন দার্শনিক মতবাদ বা সিদ্ধান্ত সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বদেশ-কালে সত্য হইবে এমন কথা নাই। মানুষের জ্ঞান তাহার সংবেদনেই সীমাবদ্ধ। যে-বিষয়ে আমাদের কোন সংবেদন নাই তাহা আমাদের জ্ঞান বা বুদ্ধিগত হয় না। অতএব যে-বিষয়ে আমাদের কোন সংবেদন নাই তাহা আমাদের স্বীকার্য নহে। আত্মা, ঈশ্বর, পরকাল, দ্রব্যসত্তা, কারণ-শক্তি প্রভৃতি বিষয় সংবেদনগ্রাহ্য নহে। অতএব এগুলি কল্পনামাত্র, বাস্তব সত্য নহে। এসব বস্তু বিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই, তথাপি যিনি এসব বিশ্বাস করেন তিনি আত্মপ্রবঞ্চনা করেন মাত্র।

উগ্র সংশয়বাদের পরিণতি।

দর্শনশাস্ত্রে সংশয়ের যথেষ্ট উপযোগিতা থাকিলেও উহাকে দার্শনিক জ্ঞানলাভের পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করা যায় না। আধুনিক কালে কোন দার্শনিক মতবাদ বা সিদ্ধান্ত বিচার-বিশ্লেষণ না করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু পুরাকালে দার্শনিকগণ জ্ঞানবিচার না করিয়াই দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা মতবাদ প্রকাশ করিতেন। এরূপ অসংশয়ে ও নির্বিচারে মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তির শক্তিসামর্থ্যে বিশ্বাস স্থাপন করা দর্শনশাস্ত্রের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে, পরন্তু উহাতে দর্শনের উন্নতি না হইয়া অবনতিই ঘটে। এজন্য পরবর্তী কালের দার্শনিকগণ প্রাচীন-যুগের দর্শনকে যুক্তিহীন মতবাদ (dogmatism) বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ বা বিচারবুদ্ধি-দ্বারা আমরা সকল বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানলাভ করিতে পারি ইহা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস না করিয়া, দর্শনশাস্ত্রে এগুলিরও যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করা উচিত। যখন আমাদের মনে এসব বিষয়ে সন্দেহ জন্মে তখনই আমরা তাহাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হই। সংশয়বাদী দার্শনিকগণ আমাদের মনে এরূপ সন্দেহ জাগ্রত করিয়া দর্শনের উপকার সাধনই করিয়াছেন। হিয়ুমের সংশয়বাদই কাণ্টের দার্শনিক মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষই যে জ্ঞানের একমাত্র কারণ এই ধারণা দূর করে এবং তাঁহাকে সমালোচনামূলক দর্শন (critical philosophy) রচনায় প্রেরণা দেয়। নাস্তিক চার্বাকের মত প্রবল প্রতিপক্ষ না থাকিলে ভারতীয় আস্তিক দর্শনের এরূপ পরিপুষ্টি ও উন্নতি হইত না। এইরূপে সংশয়বাদী যে দর্শনের উপকার সাধন করিয়াছেন তাহা স্বীকার্য। তথাপি সংশয়-পদ্ধতিকে দার্শনিক জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

দর্শনে সংশয়ের উপযোগিতা আছে।

কিন্তু উহা দার্শনিক পদ্ধতি নহে।

সংশয়পূর্বক কোন বিষয়ে দার্শনিক আলোচনা আরম্ভ করা যাইতে পারে, কিন্তু সংশয়ই সে আলোচনার চরম উদ্দেশ্য হইতে পারে না। দার্শনিক আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বনির্ণয়, উহা তত্ত্বের অপলাপ বা সন্দেহমাত্র নহে। যদি আমরা সর্ববিষয়ে অহেতুক সন্দেহ করি তবে আমাদের জীবনযাত্রা ব্যাহত হইয়া পড়ে। সংশয়ের একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলে আমাদের চিন্তা ও কর্মধারা ব্যাহত হয়। এজন্য ভারতীয় দর্শনে ব্যাঘাতের সৃষ্টি হইলেই আশঙ্কা নিবৃত্তির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সংশয় যদি সর্বগ্রাসী হয়, তবে উহা নিজের মূলেও কুঠারাঘাত করে এবং সন্দেহবাদীকেও গ্রাস করে। সন্দেহবাদী যে-কারণে বিভিন্ন তত্ত্ববিষয়ে সন্দেহ করেন, ঠিক সেই কারণেই তাঁহার অনুমত কারণটিও সন্দিগ্ধ হইতে পারে এবং তাঁহার নিজ মতটিও সন্দেহযোগ্য ও পরিত্যাজ্য হইবে। আর যদি তিনি অন্যসব বিষয়ে

সংশয় দর্শনের লক্ষ্য নহে।

সন্দেহ করিয়া নিজ মতটি নির্বিচারে ও নিঃসন্দেহে গ্রহণ করেন, তবে তিনিও যুক্তিহীন মতবাদী (dogmatist) বলিয়া নিন্দনীয় হইবেন। আমাদের সংবেদনের অতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র সত্তা আছে কি না এবং ইহা আমরা জানিতে পারি কি না তাহা দর্শনের বিচার্য বিষয়। সংশয়বাদী যদি প্রথম হইতেই বলেন যে, সংবেদনাতিরিক্ত কোন সত্তা নাই, তবে তিনিও অসংশয়বাদীর ন্যায় নির্বিচারে একটি মত গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার মতবাদও নির্বিচারে স্বীকৃত সিদ্ধান্তের (dogmatic theory) ন্যায় দোষদুষ্ট হইবে। অতএব দার্শনিক আলোচনায় সংশয়, জিজ্ঞাসা ও তর্কবিচারের বিশেষ উপযোগিতা থাকিলেও সংশয়বাদ ও সংশয়পদ্ধতি (scepticism) দার্শনিকের আদরণীয় হইতে পারে না। ডেকার্ট তাঁহার দার্শনিক আলোচনার প্রারম্ভে সর্ববিষয়ে সন্দেহ করেন। কিন্তু তিনি বিচারপূর্বক সন্দেহ অতিক্রম করিয়া আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি তত্ত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। সংশয়ই যদি তাঁহার দর্শনের আদি ও অন্ত হইত, তবে তিনি আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনের প্রবর্তকরূপে সম্মানলাভ করিতে পারিতেন না।

৪। প্রজ্ঞাবাদ
(Rationalism)

প্রজ্ঞাবাদের লক্ষণ।

ডেকার্ট যে দার্শনিক মতবাদের প্রচলন করিয়াছিলেন তাহাকে প্রজ্ঞাবাদ (rationalism) বলা হয়। তাঁহার পরবর্তী দার্শনিকদের মধ্যে স্পিনোজা, লাইব্‌নিজ ও উল্‌ফ এই মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা যে দার্শনিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহাকে প্রজ্ঞাপদ্ধতি (rationalistic method) বলা যায়। প্রজ্ঞাবাদী দার্শনিকদের মতে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। এজন্য আমাদিগকে প্রজ্ঞার সাহায্য লইতে হইবে। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষদ্বারা আমরা যে জ্ঞানলাভ করিতে পারি তাহা তত্ত্বজ্ঞান ত নহেই, উহা সর্বত্র সত্য ও অবশ্য স্বীকার্যও (universal and necessary) নহে। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষে বস্তুর বাহ্যরূপই জানা যায়, উহার অন্তর্নিহিত স্বরূপ জানা যায় না। প্রত্যক্ষ বর্তমান দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ বলিয়া প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানও সেইরূপ সীমাবদ্ধ হইবে। যাহা এখন প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা যে অতীত ও অনাগত কালে এবং অতি দূরদেশে সত্য হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। অতএব দর্শনে তত্ত্বজ্ঞান বা কোনরূপ স্থির ও নিত্য জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিলে চলিবে না। অপর পক্ষে, দার্শনিক জ্ঞানের ভিত্তিরূপে সর্বসম্মত ও স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় ও সত্য স্বীকার

CENTRAL LIBRARY

করিতে হইবে। আমাদের প্রজ্ঞায় এরূপ কতকগুলি প্রত্যয় ও সত্য নিহিত আছে, এগুলি প্রজ্ঞার প্রকৃতি বা স্বভাবগত। এজন্য প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই ঐ প্রত্যয় ও সত্যগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ ও অনস্বীকার্য বলিয়া গ্রহণ করেন এবং তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করেন না। এরূপ প্রত্যয় ও সত্য আমাদের সহজাত ও প্রকৃতিগত বলিয়া এগুলিকে প্রত্যক্ষ-পূর্ব (*a priori*) বলা হয়। প্রত্যক্ষ ও পর্যবেক্ষণ হইতে আমরা যেসব প্রত্যয় ও সত্যে উপনীত হই, সেগুলিকে প্রত্যক্ষ-পর বা প্রত্যক্ষজাত (*a posteriori*) বলে। কিন্তু এমন কতকগুলি প্রত্যয় ও সত্য আছে যাহা স্বীকার না করিলে প্রত্যক্ষই হয় না। যেমন কোন জড়দ্রব্য প্রত্যক্ষ করিতে হইলে তাহাকে দেশ ও কালে (space and time) অবস্থিত বলিয়া জানিতেই হইবে। এরূপ প্রত্যয় বা সত্যের জ্ঞান প্রত্যক্ষদ্বারা উদ্বুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু উহা প্রত্যক্ষ-জাত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইতে উৎপন্ন নহে। অতএব 'যাহা পূর্বে আমাদের সংবেদনে পাওয়া যায় নাই তাহা আমাদের বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাতেও পাওয়া যাইবে না,' প্রত্যক্ষবাদীর এই উক্তি খণ্ডন করিয়া লাইবনিজ বলিয়াছেন 'একথা বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা ব্যতীত অন্য বিষয়ে প্রযোজ্য'। এখন কোন কোন প্রত্যয় বা সত্য যদি বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার প্রকৃতিগত হয়, তবে সেগুলি বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত হইবে। প্রত্যক্ষ সেগুলির উদ্বোধনের সহকারী কারণ হইতে পারে, কিন্তু সেগুলির উদ্ভবের কারণ নহে। দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি হিসাবে এরূপ কতকগুলি প্রত্যয় ও সত্য স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহাদের মূলে অন্য যে-সব সত্য নিঃসন্দেহে উপপাদিত হইতে পারে তাহাই দর্শনে গ্রহণযোগ্য হইবে, অন্য কোন সত্য সন্দেহাধীন বলিয়া স্বীকার্য হইবে না। এই প্রণালীতে দর্শনশাস্ত্র রচনা করিতে পারিলে উহা অঙ্কশাস্ত্রের ন্যায় সন্দেহাতীত ও নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হইতে পারে। দর্শনের প্রজ্ঞা-পদ্ধতিকে কোন কোন দার্শনিক প্রত্যক্ষ-পূর্ব জ্ঞানপদ্ধতি (*a priorism*) বলেন, আবার কেহ কেহ ইহাকে সাক্ষাৎ-জ্ঞান-পদ্ধতিও (intuitionalism) বলিয়া থাকেন। এই পদ্ধতি অনুসারে যে-বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সাক্ষাৎ-প্রতীতি আছে, তাহাই সত্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় উহার শেষোক্ত নাম সার্থক হইয়াছে। ডেকার্টের দর্শনে এরূপ পদ্ধতিতে জ্ঞানের প্রামাণ্য-নিশ্চয় করা হইয়াছে, স্পিনোজা এবং লাইবনিজও তাহা মূলতঃ স্বীকার করিয়াছেন।

একক প্রত্যক্ষবাদ ও প্রজ্ঞাবাদের দোষত্রুটি।

দর্শনে প্রত্যক্ষ-পদ্ধতি ও প্রজ্ঞা-পদ্ধতি দুইটি চরম ও বিপরীত পথ এবং দুইটিই একদেশ-দোষদুষ্ট। প্রত্যক্ষবাদীর মতে সব জ্ঞানই প্রত্যক্ষ বা পর্যবেক্ষণলব্ধ, এবং প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়জ্ঞানেরই সূক্ষ্ম রূপান্তরমাত্র। অপরদিকে প্রজ্ঞাবাদীর মতে সব সত্য বা যথার্থ জ্ঞান প্রজ্ঞার সাহায্যেই পাওয়া যায়,

সেজন্য ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বিশেষ সহায়তা করে না। কিন্তু আমাদের জ্ঞান সম্বন্ধে কোন বিচার-বিশ্লেষণ না করিয়াই যদি আমরা স্বীকার করিয়া লই যে, সব জ্ঞান প্রত্যক্ষলব্ধ বা প্রজ্ঞালব্ধ, তবে আমাদিগকে বিচার বা যুক্তিহীন মতবাদীর ন্যায় নিন্দনীয় হইতে হইবে। এই হিসাবে প্রজ্ঞাবাদে নির্বিচারে দার্শনিক মত স্থাপনের ত্রুটি দেখা যায়। জীবজগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান আছে তাহা কেবল প্রত্যক্ষ বা কেবল প্রজ্ঞা হইতে পাওয়া যায় কি না, অথবা সেজন্য আমাদের উভয়েরই সাহায্য লইতে হয় ইহা দর্শনের বিচার্য বিষয়। এসম্বন্ধে কোন মতই প্রথম হইতে নির্বিচারে গ্রহণ করা উচিত নয়। আর এককথা, প্রজ্ঞার ভিত্তিতে ও যুক্তিতর্কের সাহায্যে আমরা যেসব সত্যে উপনীত হইতে পারি, সেগুলি শুধু জ্ঞানগত (subjective) অথবা বিষয়গত ও বাস্তব (objective and factual) তাহা প্রত্যক্ষ ও পর্যবেক্ষণ ব্যতীত নির্ধারণ করা যায় না। আমাদের চিন্তার সহিত বাস্তব জগতের কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহা কেবল-প্রজ্ঞাবাদী নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। আরও এক কথা, কোন্ প্রত্যয় বা সত্য স্বতঃসিদ্ধ এবং কোন্‌টি তাহা নহে, তাহা জানিবার উপায় কি? আমাদের সাক্ষাৎ-প্রতীতি হইতে আমরা তাহা নির্ধারণ করিতে পারি না। যাহা একজনের সাক্ষাৎ-প্রতীতিগম্য তাহা অন্যের সাক্ষাৎ-প্রতীতিগম্য না হইতে পারে। ঈশ্বর ও আত্মা প্রভৃতি বিষয়ে ডেকার্ট যে সুস্পষ্ট ও সাক্ষাৎ-প্রতীতির কথা বলিয়াছেন, জন্ লক্ তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। এরূপ স্থলে নির্বিচারে কোন সত্যকেই স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। শেষ কথা, প্রজ্ঞা বলিতে আমরা যদি মানুষের বিচারবুদ্ধি (intellect or reasoning power) বুঝি, তবে তদ্দ্বারা আমরা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারি না, কেবলমাত্র সেই জ্ঞানের বিচার-বিশ্লেষণ করিতে পারি। বিচারবুদ্ধিদ্বারা কোন সত্তা বা তত্ত্ব জানা যায় না, কেবল তদ্‌বিষয়ক জ্ঞানে কোন দোষত্রুটি আছে কি না তাহাই নির্ণয় করা যায়। প্রত্যক্ষই তত্ত্বজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষদ্বারা আমরা স্থূল ভৌতিক-তত্ত্ব (physical reality) জানিতে পারি। কোন অভৌতিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে কোনরূপ আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সাহায্য লইতে হইবে। আমাদের বিচারবুদ্ধি উভয়বিধ জ্ঞানেরই সমালোচনা করিয়া উহাদের দোষগুণ নির্ণয় করিতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। এখন দর্শন যদি পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান হয়, তবে প্রজ্ঞা বা বিচার-বুদ্ধিদ্বারা আমরা সে জ্ঞান লাভ করিতে পারি না, যদিও আমরা সে বিষয়ে যুক্তিতর্ক করিতে পারি। য়ুরোপীয় দর্শনে প্রজ্ঞাবাদীরা (rationalists) প্রজ্ঞা অর্থে কোনরূপ বিচারবুদ্ধিই (intellect) বুঝিয়া থাকেন। এজন্য কখন কখন তাঁহাদিগকে যুক্তিবাদী (intellectualist) এবং তাঁহাদের দর্শন-মতকে যুক্তিবাদ (intellectualism) বলা হয়। অতএব আমরা বলিতে

CENTRAL LIBRARY

পারি যে, একাধিক কারণে প্রজ্ঞাবাদ ও প্রজ্ঞা-পদ্ধতি নির্দোষ দার্শনিক মতবাদ ও প্রমাণ-পদ্ধতিরূপে গ্রহণযোগ্য নহে।

৫। সবিচার মতবাদ ও বিচারপদ্ধতি

(Criticism and Critical method)

কাণ্টের সবিচার মতবাদের লক্ষণ।

জ্ঞানবিচার-সম্বলিত মতবাদমাত্রকেই সবিচার মতবাদ (criticism) বলা যায়। কিন্তু এখন criticism বা 'সবিচার মতবাদ' বলিতে বিশ্ববিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কাণ্ট-প্রবর্তিত দার্শনিক পদ্ধতিই বুঝায়। দর্শনে প্রত্যক্ষ-পদ্ধতি ও প্রজ্ঞা-পদ্ধতি পৃথগ্‌ভাবে গ্রহণ করিলে যে দোষত্রুটি হয় তাহা বিবেচনা করিয়া কাণ্ট এই প্রমাণ-পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। ইহাকে আমরা সমালোচনা-পদ্ধতিও বলিতে পারি। ইহাতে প্রত্যক্ষবাদ, প্রজ্ঞাবাদ এবং সংশয়বাদ বা অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism)— সবগুলিরই সমাবেশ দেখা যায়। এই পদ্ধতি অনুসারে জীবজগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান আছে, তাহারই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, তাহার মূলে কোন্ কারণসামগ্রী (conditions) আছে। অঙ্কশাস্ত্রের কথা ভাবিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের জ্ঞান বস্তু-বিষয়কও (objective) বটে এবং সর্বগ্রাহ্য (universal) ও অবশ্যস্বীকার্যও (necessary) বটে। এই জ্ঞানে আমরা নূতন বিষয় জানি এবং তাহাতে জ্ঞানের প্রসার হয়। অতএব ইহা সংশ্লেষাত্মক (synthetic); আবার ইহার সত্যতা সকলেরই স্বীকার্য। যেমন 'দুইটি দ্রব্যের সঙ্গে আর দুইটি দ্রব্য যোগ করিলে চারিটি হয়' অঙ্কশাস্ত্রের এই নিয়মটি সকল লোকেই স্বীকার করেন এবং তাহা হইতে জাগতিক বস্তুসম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে, জ্ঞানসামগ্রী (conditions of knowledge) কিরূপ হইলে আমরা এপ্রকার নিশ্চয়াত্মক ও বস্তুবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে পারি?

ইহার অন্তর্গত প্রত্যক্ষবাদ,

কাণ্টের মতে কেবল প্রত্যক্ষ বা সংবেদন হইতে আমরা এরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারি না, আবার কেবল বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা হইতেও ইহা লভ্য নহে। কাণ্ট আমাদের সাধারণ জ্ঞানের বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জ্ঞানের উৎপত্তির জন্য দুই প্রকার জ্ঞানসামগ্রী আবশ্যক। প্রথম হইল জ্ঞানের উপাদান (materials) এবং দ্বিতীয় হইল জ্ঞানের আকার-প্রকার (forms and categories)। জ্ঞানের উপাদান হইল সংবেদন এবং তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষলব্ধ।

যে-বিষয়ে আমাদের কোন সংবেদন নাই, সে-বিষয়ে আমাদের কোন জ্ঞান হইতে পারে না। এখানে কাণ্ট প্রত্যক্ষবাদ স্বীকার করিতেছেন।

কিন্তু কেবল সংবেদন হইতে জ্ঞান হয় না। পশুপক্ষীদের আমাদের মত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের সংবেদন আছে, বোধ হয় আমাদের অপেক্ষা স্পষ্টতর সংবেদন আছে। কিন্তু তাহাদের জীবজগৎ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট জ্ঞান নাই। তাহার কারণ এই যে, আমরা সংবেদনের যে অর্থ বা তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারি তাহারা তাহা পারে না। আমাদের বোধশক্তি (sensibility) এবং বুদ্ধি (understanding) সংবেদনগুলির অর্থবোধ করিতে কতকগুলি প্রত্যয় বা প্রত্যয়রূপ আকার-প্রকার (forms and categories) প্রয়োগ করে এবং তদ্দ্বারা সংবেদনরূপ উপাদান হইতে পরিদৃশ্যমান জগৎ রচনা করে। এরূপ আকার-প্রকার হইল দেশ (space), কাল (time), দ্রব্য (substance), গুণ (quality), ক্রিয়া (action), কার্য-কারণ-সম্বন্ধ (causality), পরস্পরাশ্রয় (reciprocity) ইত্যাদি প্রত্যয়। এসব প্রত্যয় বা আকার-প্রকারের আলোকে আমরা বুঝিতে পারি যে, সংবেদনগুলি দেশ ও কালে অবস্থিত এবং কার্য-কারণ প্রভৃতি সম্বন্ধদ্বারা আবদ্ধ দ্রব্যনিচয়ের প্রকাশ, আর সব দ্রব্য লইয়া এক বৃহৎ জগৎ-প্রপঞ্চ রচিত হইয়াছে। অতএব বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাদ্বারা সংবেদনের অর্থবোধ হইতেই আমাদের জগৎ-প্রপঞ্চের জ্ঞান হইতেছে। এ জ্ঞান সর্বজনসম্মত ও অবশ্যগ্রাহ্য হইবে, কারণ তাহার মূলে ও গঠনে যেসব প্রত্যয় বা আকার-প্রকার আছে তাহা আমাদের মন ও বুদ্ধির প্রকৃতিগত এবং সেজন্য সব মানব মনের স্বাভাবিক চিন্তাপ্রণালীর নিয়ামক। বিভিন্ন ব্যক্তির সংবেদন ভিন্নরূপ হইতে পারে। কিন্তু সংবেদনগুলি বুঝিবার জন্য দেশ, কাল, দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি যেসব প্রত্যয় বা আকার-প্রকারের প্রয়োজন, তাহা সকল মানুষের পক্ষেই সমান, যেহেতু এগুলি আমাদের বুদ্ধির প্রকৃতিগত এবং প্রত্যক্ষ-পূর্ব (*a priori*) প্রত্যয়। সকল মানুষকেই জগৎ-প্রপঞ্চকে দেশ-কালে অবস্থিত ও কার্যকারণ-সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া জানিতে হয়। এজন্য আমাদের বস্তুবিষয়ক জ্ঞান সর্বসম্মত ও সকলের স্বীকার্য হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে প্রজ্ঞার অবদান অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এখানে কাণ্ট প্রজ্ঞাবাদীদের মত গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রজ্ঞাবাদ,

কিন্তু কাণ্টের মতে প্রত্যক্ষ ও প্রজ্ঞার সহযোগিতায় আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা বস্তুর বাহ্যরূপের (appearance or phenomenon) জ্ঞানমাত্র, উহা বস্তুর স্বগত সত্তার বা স্বরূপের (thing-in-itself or reality) জ্ঞান নহে। আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা কোন বস্তুর যে সংবেদন প্রাপ্ত হই, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও প্রকৃতিসাপেক্ষ। সেইরূপ আমাদের বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাদ্বারা আমরা বস্তুটিকে

সংশয়বাদ ও অজ্ঞেয়বাদ।

যেরূপ বুঝি তাহাও আমাদের মন ও বুদ্ধির প্রকৃতি ও গঠন-সাপেক্ষ। অতএব আমরা বস্তুসম্বন্ধে যাহা জানি তাহা প্রধানতঃ আমাদের উপরই নির্ভর করে এবং আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনের রচনামাত্র। আমাদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি-নিরপেক্ষ বস্তুর স্বরূপ কি তাহা আমরা জানিতে পারি না এবং আমাদের তাহা জানা সম্ভবও নহে। কারণ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও বুদ্ধির প্রক্রিয়া ব্যতীত আমাদের কোন জ্ঞান হয় না। অতএব আমাদের জ্ঞানে বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত না হইয়া তাহার বাহ্যরূপ বা অবভাসমাত্র (appearance) গৃহীত হয়। যদি আমাদের কোন অতীন্দ্রিয় বা বুদ্ধিজন্য সাক্ষাৎ-প্রতীতির (intellectual intuition) সামর্থ্য থাকিত, তবে আমরা বস্তুর স্বসত্তার বা স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু এরূপ শক্তি লাভ করা অসম্ভব না হইলেও, বস্তুতপক্ষে বর্তমানে আমাদের তাহা নাই। অতএব বস্তুর স্বরূপসত্তা বা পারমার্থিক তত্ত্ব আমাদের জ্ঞানের অতীত, উহা চিরদিনই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় (unknown and unknowable) থাকিবে। এখানে কাণ্ট একপ্রকার সংশয়বাদ ও অজ্ঞেয়বাদ স্বীকার করিলেন।

কাণ্টের সবিচার মত ও সমালোচনা-পদ্ধতির দোষত্রুটি।

কাণ্টের সমালোচনা-পদ্ধতি প্রত্যক্ষবাদ ও প্রজ্ঞাবাদের একপ্রকার সমন্বয় সাধন করিয়াছে। তিনি অবশ্য প্রজ্ঞা (reason) শব্দটি বুদ্ধি (understanding) অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে এরূপ প্রজ্ঞা ও প্রত্যক্ষ উভয়েরই যে অবদান আছে তাহা তিনি আমাদের সাধারণ জ্ঞানের বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। এজন্য শুদ্ধ প্রত্যক্ষবাদে বা শুদ্ধ প্রজ্ঞাবাদে যে দোষত্রুটি আছে তাহা কাণ্টের সমালোচনা-পদ্ধতিতে বিশেষভাবে দেখা যায় না। কিন্তু এই সমালোচনা-পদ্ধতি অনুসারে আমাদের জ্ঞান পরিদৃশ্যমান জগতে (world of experience) সীমাবদ্ধ এবং উহা তত্ত্বের বাহ্যরূপ বা অবভাসের জ্ঞানমাত্র, বস্তুস্বরূপের বা তত্ত্বার্থের জ্ঞান নহে। যদি তাহাই হয় তবে সমালোচনা-পদ্ধতিকে দার্শনিক জ্ঞানলাভের পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করা সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ পরিদৃশ্যমান জগৎ দার্শনিক জ্ঞানের মুখ্য বিষয় নহে, উহা প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেরই বিষয়। অবশ্য দর্শনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া উহার সত্যাসত্য নির্ণয় করা যাইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান হইতে দর্শনের পার্থক্য রক্ষা করিতে হইলে দর্শনকে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানই বলিতে হইবে। অতএব কাণ্টের সমালোচনা-পদ্ধতি অনুসারে আমরা যে জ্ঞানলাভ করিতে পারি, তাহাকে দার্শনিক জ্ঞান বলা যায় না। কাণ্ট বলিয়াছেন যে, আমাদের পক্ষে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। তাহার কারণ এই যে, তিনি ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ (sense intuition ব্যতীত কোনরূপ বুদ্ধিজন্য বা অতীন্দ্রিয় অনুভবের (intellectual or pure intuition) অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু যদি আমাদের কোন

অতীন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক অনুভূতি না থাকে, তবে বস্তুর স্বরূপসত্তা বা তত্ত্বার্থের কথাই উঠিতে পারে না। আমাদের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনরূপ তত্ত্বানুভূতির মূলেই আমরা বস্তুর বাহ্যরূপ বা অবভাস এবং স্বরূপ বা তত্ত্বার্থের প্রভেদ বুঝিতে পারি। নতুবা ইতর প্রাণীর মত আমরাও এসব ভেদ সৃষ্টি করিতাম না এবং দর্শনে তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা করিতাম না। কাণ্টের দর্শনের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার অধ্যাপক পেটন বলিয়াছেন যে, কাণ্ট ইন্দ্রিয়জন্য সংবেদনের কারণরূপে স্বয়ংসৎ বস্তুর (thing-in-itself) অনুমান করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, পরন্তু তিনি অবভাসমাত্রের মধ্যেই বস্তুর স্বসত্তা বা তত্ত্বার্থ সাক্ষাৎ-প্রতীতিগম্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন মনে হয়। এসব দৃষ্টে আমরা মনে করি যে, তত্ত্বার্থের আধ্যাত্মিক অনুভূতি (intuition) দার্শনিক জ্ঞানের সাধনের একটি প্রধান অঙ্গ, এবং তাহা অস্বীকার করায় কাণ্টের সমালোচনা-পদ্ধতি অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

৬। দ্বন্দ্বসমন্বয়-পদ্ধতি বা ত্রিভঙ্গি-নয়

(Dialectic)

'Dialectic' শব্দের ব্যুৎপত্তি।

দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা কখন কখন কথোপকথনছলে হইতে পারে। উপনিষদের বহুস্থলে দেখা যায় যে, গুরু ও শিষ্যের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের আকারে কোন কোন দার্শনিক সমস্যার আলোচনা ও মীমাংসা করা হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রে বাদ নামে একপ্রকার বিচার পদ্ধতির উল্লেখ আছে। ইহাতে কোন বিষয়ে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী পক্ষ ও প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে বিতর্ক হয়। তাহারা প্রত্যেকেই নিজমত স্থাপন ও পরমত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু উভয়েই তত্ত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। 'Dialectic' শব্দটির ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ হইতেছে এরূপ বাদ-বিচার। ইহাতে বিচারমুখে কোন মত বা সিদ্ধান্তের মধ্যে যে অন্তর্বিরোধ (contradiction) আছে, তাহা উদ্ঘাটন করিয়া সেই মত বা সিদ্ধান্তকে সংশোধনপূর্বক তাহার অন্তর্বিরোধ দূর করা হয়। মহামতি সক্রেটিস্ এই 'dialectic' পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সফিস্টদের মত খণ্ডন করিতেন। তিনি কোন সফিস্টকে তাঁহারই স্বীকৃত মতে কি অন্তর্বিরোধ আছে এবং তাহাতে কোন্ অনিষ্টাপত্তি হয় তাহা দেখাইয়া দিতেন। ফলে তাঁহাকে নিজমত পরিহার বা সংশোধন করিতে হইত। কাণ্টও তাঁহার সমালোচনামূলক দর্শনে এই 'dialectic' পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া আত্মা,

ঈশ্বর ও সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণায় এবং অবিচারিত দর্শনমতে যে অসামঞ্জস্য ও অন্তর্বিরোধ আছে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

হেগেলের 'Dialectic' এর লক্ষণ।

প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেল 'dialectic' কে দার্শনিক তত্ত্ব নির্ণয়ের প্রকৃষ্ট পদ্ধতিরূপে (method of philosophy) গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা অনুসারে ইহাকে দ্বন্দ্বসমন্বয়-পদ্ধতি বা ত্রিভঙ্গি-নয় বলা যায়। তাঁহার মতে যে নিয়ম অনুসারে আমাদের চিন্তার (thought) প্রগতি হয়, স্বরূপতঃ সেই নিয়ম অনুসারেই সত্তা বা তত্ত্বেরও (reality) পরিণতি ঘটে। চিন্তার ক্রমবিকাশের স্তরগুলি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উহা ত্রিভঙ্গি-নয় (dialectic) অনুসারে চলে। সব চিন্তা বিকাশের তিনটি স্তর আছে। ইহাদিগকে পারিভাষিক অর্থে নয় (thesis), প্রতিনয় (antithesis) এবং সমন্বয় (synthesis) বলা যায়। নয় বলিতে আমরা কোন বস্তুর এক দিকের বা এক দেশীয় জ্ঞান বুঝি। ঐ বস্তুর ভিন্ন দিকের বা ভিন্ন দেশীয় জ্ঞানকে প্রতিনয় বলা হয়। যে জ্ঞানে এই দুইটি পরস্পরবিরোধী জ্ঞানের সামঞ্জস্য করা হয় তাহাকে সমন্বয় বলা যায়। যেমন কোন বস্তুর কেবল গুণগুলি দেখিয়া উহাকে গুণসমষ্টি বলিলে উহার একদিকের পরিচয় পাওয়া গেল; এটি হইল নয় (thesis)। কিন্তু দ্রব্য (substance) ব্যতীত গুণ (quality) থাকিতে পারে না বলিয়া 'বস্তুটি গুণসমষ্টিমাত্র' এই নয়টি দুষ্ট হইতেছে। এই দোষ পরিহারের জন্য কেহ বলিলেন যে, 'বস্তুটি দ্রব্যমাত্র (substance)। ইহাতে বস্তুটির অন্যদিকের বা বিপরীত ভাবের জ্ঞান হইল বলিয়া ইহা প্রতিনয় (antithesis) হইবে। কিন্তু আমরা জানি, যেমন দ্রব্য ব্যতীত গুণ থাকে না, তেমন গুণ ব্যতীত দ্রব্যও থাকিতে পারে না। অতএব নয় ও প্রতিনয় উভয়ই একদেশ-দোষদুষ্ট হইতেছে, এবং এই দোষ দূর করিতে হইলে উহাদের একটা সামঞ্জস্য বিধান করা আবশ্যক। এখন যদি কেহ বলেন যে, 'বস্তুটি গুণবিশিষ্ট দ্রব্য', তবেই উহাদের সামঞ্জস্য হয়। এই সামঞ্জস্য বিধান করে বলিয়া তৃতীয় নয়টিকে সমন্বয় (synthesis) বলা হয়। হেগেলের মতে আমাদের সব চিন্তা বা জ্ঞানের গতি ও পরিণতি এই ত্রিভঙ্গি-নয় অনুসারে ঘটিয়া থাকে। ইহাই হইতেছে চিন্তা বা প্রজ্ঞার (thought or reason) চিরন্তন গতি ও ক্রমবিকাশের পদ্ধতি।

ত্রিভঙ্গি-নয় অনুসারে চিন্তার গতি।

তদনুসারে তত্ত্বের পরিণতি।

হেগেল আরও বলিয়াছেন যে, এই একই নিয়মে বাস্তব জগতের ও পারমার্থিক তত্ত্বের (absolute reality) বিকাশ হইয়া থাকে। কোন প্রাকৃতিক বস্তুর ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার প্রথম অবস্থা সাম্যের অবস্থা

CENTRAL LIBRARY

(homogeneity), পরের অবস্থা বৈষম্যের অবস্থা (differentiation or heterogeneity) এবং শেষের অবস্থা সামঞ্জস্য বা সমন্বয়ের অবস্থা (integration or synthesis)। যেমন একটি গাছের প্রথম অবস্থা উহার বীজ, ইহাতে ভবিষ্যৎ গাছের অংশগুলি বা শক্তিগুলি অবিভক্ত অবস্থায় অর্থাৎ সাম্যাবস্থায় থাকে। তারপরে বীজটি অংকুরিত হইলে উহা বিদীর্ণ হইয়া দুইটি বীজপত্রে বিভক্ত হয়, ইহাই হইল ভেদ বা বৈষম্যের অবস্থা। কিন্তু এই ভেদ বা বৈষম্যের সংগে-সংগেই বিভিন্ন অংশগুলি সম্বন্ধযুক্ত হইয়া বৃক্ষদেহে সমন্বিত থাকে। অতএব চিন্তার নয়, প্রতিনয় ও সম্বন্ধ এই ত্রিভংগী গতির (dialectic) সংগে বৃক্ষের সাম্য, বৈষম্য ও সমন্বয় এই তিন অবস্থার স্বরূপগত মিল আছে। এজন্য হেগেলের মতে চিন্তা বা প্রজ্ঞা সম্বন্ধে যে ত্রিভংগি-নয় (dialectic) প্রয়োজ্য তাহা সত্তা (reality) সম্বন্ধেও সমভাবে প্রয়োজ্য। হেগেল তাঁহার দর্শনে প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, জড় জগৎ, মানব ইতিহাস, নীতি ও ধর্ম প্রভৃতি সকল বিষয়েই ত্রিভংগি-নয় অনুসারে ক্রমোন্নতি হইতেছে। অতএব আমাদের চিন্তা বা প্রজ্ঞার আলোকে আমরা তত্ত্বার্থ বুঝিতে পারি এবং চিন্তা বা প্রজ্ঞার ক্রমবিকাশ অনুধাবন করিয়া তত্ত্বার্থের ক্রমবিকাশও বুঝিতে পারি। এই দার্শনিক পদ্ধতি (method of philosophy) অনুসরণ করিয়া হেগেল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এক বিচারাত্মক চিৎসত্তা (Absolute Thought or Idea) বা পরমাত্মা পারমার্থিক তত্ত্ব। জীবজগৎ ত্রিভংগি-নয় অনুসারে পরমাত্মা হইতে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাতেই অবস্থিত আছে এবং তাঁহার সংগে মিলিত হইবার জন্য অবিরাম গতিতে চলিতেছে। এরূপ ক্রমবিকাশের মাধ্যমে পরমাত্মা তাঁহার স্বারূপ্য (self-realisation) ও পূর্ণতা (perfection) লাভ করিতেছেন।

ত্রিভঙ্গি-নয় সম্যক্ দার্শনিক পদ্ধতি নহে।

হেগেলের মতে দর্শন ইহজগতের বা জড়প্রকৃতির জ্ঞান নহে, উহা বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত পরম তত্ত্বের বা পরমাত্মার বিচারসম্মত জ্ঞান। কিন্তু এই পরম তত্ত্বের জ্ঞান-লাভের উপায়রূপে তিনি যে দ্বন্দ্বসমন্বয়-পদ্ধতি বা ত্রিভংগি-নয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, উহা সম্যক্ পন্থা নহে। তাঁহার সম্মত ত্রিভংগি-নয় একপ্রকার বিচার-পদ্ধতি। এ বিচার-পদ্ধতি অনুসারে আমাদের বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার প্রসার হইতে পারে, কিন্তু ইহাদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না। আমাদের বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা যে আকার ও প্রকারে (forms and categories) প্রকাশিত হয় এবং পরিণতি লাভ করে, পরম তত্ত্ব যে ঠিক সেই আকার-প্রকারে প্রকাশিত হইবে তাহা আমরা বলিতে পারি না। অন্ততঃ হেগেল যে নির্দিষ্ট সংখ্যক বুদ্ধিগত আকার-প্রকারের কথা বলিয়াছেন তাহা ব্যতীত অনারূপ আকার-

CENTRAL LIBRARY

প্রকার ভবিষ্যৎ কালে জ্ঞানের প্রসার ঘটিলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতে পারে। এমত অবস্থায় আমাদের বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা পরম তত্ত্বের স্বরূপ বা বিকাশ সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট পথ নির্ণয় করিতে পারে না। তারপর বিশেষ কথা এই যে, আমাদের বিচারবুদ্ধিদ্বারা আমরা জ্ঞানের সত্যাসত্য বা প্রামাণ্যাপ্রামাণ্য নির্ণয় করিতে পারি। কিন্তু কেবল বিচার করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। যেমন শব্দে বিচার করিয়া আলোকের জ্ঞান লাভ করা যায় না, এজন্য আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ প্রয়োজন। সেইরূপ বিচারবুদ্ধিদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের বিচার চলিতে পারে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে তত্ত্বার্থের কোনরূপ অনুভূতি বা সাক্ষাৎকার প্রয়োজন। হেগেলের ত্রিভঙ্গি-নয়দ্বারা তত্ত্বার্থের প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎকার হয় না, যদিও তাহার সাহায্যে আমরা তত্ত্বার্থের বিচার করিতে পারি। এজন্য হেগেলের দ্বন্দ্বসমন্বয় বা ত্রিভঙ্গি-নয়-পদ্ধতিকে দার্শনিক জ্ঞানলাভের সম্যক্ উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

৭। সাক্ষাৎ-প্রতীতি-পদ্ধতি

(Intuitionism)

সাক্ষাৎ-প্রতীতি বা অপরোক্ষানুভূতি-মতবাদের লক্ষণ।

কোন কোন দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞা-পদ্ধতির (intellect and reason) ব্যর্থতা লক্ষ্য করিয়া এই মত পোষণ করেন যে, দর্শনে সাক্ষাৎ-প্রতীতি বা অপরোক্ষানুভূতি একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভের পথ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার উপযোগিতা থাকিলেও দর্শনের ক্ষেত্রে তাহাদের উপযোগিতা নাই। বিজ্ঞানের বিচার-পদ্ধতি হইতে দর্শনের পদ্ধতি একেবারে ভিন্ন। কারণ বিচারবুদ্ধিদ্বারা বা প্রজ্ঞার সাহায্যে আমরা প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের মূলে জড়জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারি। কিন্তু সে জ্ঞান বস্তুর বাহ্যরূপ বা প্রতিভাসের জ্ঞানমাত্র। তত্ত্বার্থ জানিতে হইলে আমাদিগকে বিচারনিরপেক্ষ কোনরূপ জ্ঞানসাধনের আশ্রয় লইতে হইবে। এই জ্ঞানসাধন হইল তত্ত্বের সাক্ষাৎ-প্রতীতি বা অপরোক্ষানুভূতি (direct experience or intuition)। প্রত্যক্ষ, অনুমান, যুক্তিতর্ক, বিচারবুদ্ধি বা প্রজ্ঞালব্ধ-জ্ঞান এরূপ সাক্ষাৎ-প্রতীতি বা অপরোক্ষানুভূতি নহে। এসকল জ্ঞান পরোক্ষ, কারণ এগুলি ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার মাধ্যমে পাওয়া যায়। যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বা বিচারবুদ্ধির সাহায্য না লইয়া সাক্ষাৎভাবে বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তা প্রকাশ করে তাহাকে সাক্ষাৎ-প্রতীতি বা

অপরোক্ষানুভূতি (intuition) বলে। অতএব এরূপ অপরোক্ষানুভূতিই দর্শনের জ্ঞান-সাধন-প্রত্যক্ষ, বিচারবুদ্ধি বা প্রজ্ঞা নহে। ইহাতে জ্ঞাতা যেন জ্ঞেয় বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তদ্ভাবভাবিত হয় এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একাত্ম হইয়া যায়। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়, কোন দুঃখী বা সুখী ব্যক্তির দুঃখ বা সুখে যদি কাহারও পূর্ণ সহানুভূতি (sympathy or compassion) হয়, তবে তিনি সেই সুখ বা দুঃখ অনুভব করিবেন। এইভাবে কোন জ্ঞানরূপ সহানুভূতিদ্বারা (intellectual sympathy) যদি আমরা বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করিতে পারি, তবে তাহার স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারি, বিচারবুদ্ধি বা প্রজ্ঞার সাহায্যে তাহা সম্ভব নহে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসে ফরাসী দার্শনিক হেন্‌রি বের্গশোঁ দৃঢ়তার সহিত এই মত ব্যক্ত ও প্রতিপাদিত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন।

দর্শনে উহার স্থান সীমাবদ্ধ।

দর্শন তত্ত্বার্থের অপরোক্ষানুভূতি বা সাক্ষাৎ-প্রতীতিতে প্রতিষ্ঠিত একথা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু ইহা তত্ত্বানুভূতিতেই পরিসমাপ্ত নয়। তত্ত্বানুভূতির মূলে এবং বিচার-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সাহায্যে এক বিশ্বজনীন মতবাদ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপাদন করাই দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ লক্ষণ ও মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি দর্শন কেবল তত্ত্বানুভূতিই হইত, তবে ধর্ম বা অতীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদ (mysticism) হইতে দর্শনের প্রভেদ থাকিত না, কারণ ধর্ম ও অতীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষবাদের মূল কথাই হইতেছে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের সাক্ষাৎ-প্রতীতি বা অপরোক্ষানুভূতি। অতএব বলিতে হয় যে, দর্শনে যেমন এক দিকে তত্ত্বের সাক্ষাৎ-প্রতীতির আবশ্যকতা আছে, তেমনি অন্যদিকে বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞারও উপযোগিতা আছে।

দার্শনিক জ্ঞানলাভের উপায় সম্বন্ধে মন্তব্য।

দার্শনিক জ্ঞানলাভের বিভিন্ন উপায় এবং তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা করা হইল। এখন এবিষয়ে আমাদের মতামত ব্যক্ত করিব। দর্শন বলিতে আমরা জীবজগৎ ও পারমার্থিক তত্ত্বের বিচার-সাপেক্ষ জ্ঞান বুঝি। সংক্ষেপে দর্শনকে তত্ত্বার্থের বিচারশাস্ত্র বলা যায়। কিন্তু যদি পূর্বে আমাদের কোন তত্ত্বানুভূতি না থাকে, তবে তত্ত্বার্থ সম্বন্ধে কোন বিচারই চলিতে পারে না। জড়পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে বলিয়াই আমরা উহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও বিচার করিতে পারি। বিজ্ঞানকে জড়জগতের সুসম্বদ্ধ জ্ঞান ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা বলা যায়। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষদ্বারা আমরা ভৌতিক জগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ করি তাহারই বিচার-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষামূলে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। সেইরূপ তত্ত্বার্থ বিচার করিতে হইলে আমাদের কোন প্রকারের তত্ত্বানুভূতি বা তত্ত্বজ্ঞান থাকা আবশ্যক। কিন্তু ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষদ্বারা আমরা তত্ত্বার্থের জ্ঞানলাভ করিতে

পারি না, কেবল উহার বাহ্যরূপ বা প্রকাশমাত্র জানিতে পারি। অতএব বলিতে হয় যে, আমাদের কোনরূপ অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বা আধ্যাত্মিক অনুভূতি আছে এবং তাহাদ্বারাই আমরা তত্ত্বার্থের জ্ঞানলাভ করি, অন্ততঃ উহার কিছু আভাস পাই। দর্শন এরূপ আধ্যাত্মিক অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিচারবুদ্ধির সাহায্যে উহার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়। এরূপ আধ্যাত্মিক অনুভূতির মূলেই বিভিন্ন দার্শনিক মত গড়িয়া উঠিয়াছে মনে হয়। এজন্য দর্শনকে তত্ত্বার্থের ব্যাখ্যাশাস্ত্রও বলা যায়। দর্শনশাস্ত্রে তত্ত্বার্থের ব্যাখ্যা-প্রণালীর দুইটি দিক্ আছে। এক দিকে ইহা একটি সর্বব্যাপক মতবাদ রচনা করিয়া নিখিল বিশ্বের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা ও উহার সমস্যাগুলির সমাধান করিবার চেষ্টা করে। অপর দিকে ইহা আমাদের লৌকিক প্রত্যক্ষ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমালোচনা করিয়া তাহাদের দোষত্রুটি প্রদর্শনপূর্বক দার্শনিক জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করে।

দর্শন আধ্যাত্মিক অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উহার ব্যাখ্যায় নিযুক্ত।

দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রায় সকল দার্শনিক মতবাদে স্বীকৃত মূল তত্ত্বগুলি লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, পরন্তু এগুলি অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব এবং ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের অযোগ্য। এজন্য এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা আমরা দার্শনিক তত্ত্ব বা সত্যকে প্রমাণ করিতে পারি না। কেবল আমাদের প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধির সাহায্যেই আমরা দার্শনিক তত্ত্বগুলির সত্যতা বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিতে পারি। দর্শনে সর্ববিধ লৌকিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিচার-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়া আমরা দেখাইতে পারি যে, দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে জীবজগতের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির যেরূপ ন্যায়সংগত ব্যাখ্যা ও সমাধান করা যায় তাহা আমাদের সাধারণ জ্ঞানের বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে করা যায় না। এইভাবে আমরা দার্শনিক তত্ত্বগুলি প্রতিষ্ঠা ও সমর্থন করিতে পারি, কিন্তু সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক সত্যের মত প্রত্যক্ষ ও যান্ত্রিক পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করিতে পারি না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বিচার-বিশ্লেষণ অর্থাৎ সমালোচনা দার্শনিক জ্ঞানের প্রধান অঙ্গ। দর্শনশাস্ত্রে যে-কোন তত্ত্বের কথা বলা যাক না কেন, তাহার সপক্ষে ও বিপক্ষে যেসব যুক্তিতর্ক হইতে পারে তাহার যথাযথ আলোচনা আবশ্যক। এজন্য কখন কখন যুক্তিদ্বারা সমর্থিত জ্ঞানমাত্রকে দর্শন বলা হয়। তাহা অবশ্য ঠিক নহে, কারণ যে-কোন বিষয়ে যুক্তিদ্বারা সমর্থিত জ্ঞানকে দর্শন বলিলে, দর্শন হইতে বিজ্ঞান ও ন্যায়শাস্ত্রের পার্থক্য থাকে না। পরমার্থ-তত্ত্ব-বিষয়ে বিচারসাপেক্ষ জ্ঞানকেই দর্শন বলিতে হয়।

দর্শনে বিচারবুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা।

কিন্তু এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কেবল বিচারবুদ্ধিদ্বারা দার্শনিক তত্ত্ব বা সত্যের যথার্থ ও সম্যগ্-জ্ঞান হয় না। বিচারবুদ্ধির সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি যে, আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি তত্ত্বগুলি স্বীকার না করিলে জীব ও জগৎ সম্বন্ধে অনেক সমস্যার সমাধান করা যায় না। কিন্তু কেবলমাত্র এই যুক্তিদ্বারা আমাদের আত্মা প্রভৃতি বিষয়ে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয় না। এসব তত্ত্বের যথার্থ ও নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তাহাদের সাক্ষাৎকার প্রয়োজন। যে বিষয়ে আমাদের অনুভূতি বা সাক্ষাৎ-প্রতীতি আছে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। অতএব দার্শনিক তত্ত্বগুলির সম্যক্ ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, সেগুলিকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য আমাদের অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে আমরা এরূপ সাক্ষাৎজ্ঞান লাভ করিতে পারি না। কেবল ধ্যানযোগেই তত্ত্বার্থের অনুভূতি বা সাক্ষাৎ-প্রতীতি হইতে পারে। কোন বিষয়ে নিরন্তর ধ্যানধারণা করিলে তাহা আমাদের নিকট সুস্পষ্টরূপে ও সাক্ষাৎভাবে প্রকাশিত হয়। দার্শনিক তত্ত্ব বা সত্য-বিষয়ে সযত্নে দীর্ঘকাল ধ্যানধারণা করিলে তাহার সাক্ষাৎকার অর্থাৎ অপরোক্ষ অনুভূতি হইবে এবং সে-বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না। এইজন্যই ভারতীয় দর্শনের প্রায় সব শাখাতেই দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে ধ্যানধারণা ও যোগ-সাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে বিশেষভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়রূপে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের নির্দেশ আছে। প্রথমে যোগ্য অধিকারী ব্যক্তি যোগ্য আচার্যের নিকট তত্ত্বার্থ শ্রবণ করিবেন। তারপর সে-বিষয়ে যুক্তিতর্ক করিয়া তাহা বুঝিবার ও তাহাতে দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করিবার চেষ্টা করিবেন। ইহাকেই মনন বলা হইয়াছে। পরিশেষে তত্ত্বজিজ্ঞাসু তত্ত্বার্থ বিষয়ে নিরন্তর ধ্যান করিতে অভ্যাস করিবেন। এইরূপ নিদিধ্যাসনের ফলরূপে তাঁহার তত্ত্বার্থের সাক্ষাৎকার ঘটিবে। তত্ত্বানুভূতিই দার্শনিক জ্ঞানের চরম পরিণতি। অতএব যদি দর্শনকে বিচারপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান বলা যায়, তবে দার্শনিক জ্ঞানলাভের উপায়রূপে ধ্যানধারণা (contemplation) এবং সমালোচনা (criticism) উভয়েরই উপযোগিতা স্বীকার করিতে হইবে। ইহাদের যথাযথ মিলনেই দার্শনিক জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যাইবে।

উহাতে তত্ত্বানুভূতির আবশ্যকতা।

ধ্যানধারণা ও সমালোচনা—দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানের সাধন।

CENTRAL LIBRARY

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অবধারণ ও অনুমান

(Judgment and Inference)

১। অবধারণের লক্ষণ

(The Nature of Judgment)

চিন্তা কাহাকে বলে ?

তর্কশাস্ত্রের লক্ষণ নির্দেশ করিতে বলিয়াছি যে, ইহা আমাদের চিন্তা-প্রণালীর দোষগুণের এবং জ্ঞানের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যের বিচারশাস্ত্র। এখন প্রশ্ন হইতেছে—চিন্তা বা চিন্তন (thought or thinking) কাহাকে বলে? চিন্তা এক-প্রকার মানসিক ক্রিয়া বা বৃত্তি। ইহা অচেতন জড়পদার্থের ক্রিয়ার মত নহে। চিন্তাদ্বারা আমরা সর্ববিষয়ে যথার্থ জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা করি। কোন বস্তুর সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলেই আমরা তাহা জানিতে পারি না। বহির্জগতের বহু বস্তুর সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংযোগ বা সন্নিকর্ষ হইতে পারে। কিন্তু আমরা সেসব বস্তু জানিতে পারি না। আমি এখন যে চেয়ারে বসিয়া নিবিষ্টমনে লিখিতেছি অথবা আমার মাথার উপর ঘড়ির যে টিক্ টিক্ শব্দ হইতেছে, তাহাতে আমার মনোযোগ না থাকায় আমি তাহা অবগত নহি। কিন্তু যখন আমার মন সেবিষয়ে আকৃষ্ট ও সংযুক্ত হয়, তখনই আমার চিন্তা সেবিষয়ে ধাবিত হয় এবং আমি তাহাকে চেয়ার বা ঘড়ির শব্দ বলিয়া বুঝি। অতএব যে মনোবৃত্তি বা বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা আমরা কোন বস্তুকে জানি বা বুঝি, তাহার নাম চিন্তা।

অবধারণ চিন্তার প্রাথমিক রূপ।

কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে হইলে,'ইহা এইরূপ বস্তু' এইভাবেই চিন্তা করিতে হয়। ইহা চিন্তার প্রাথমিক সরল রূপ। পাশ্চাত্ত্য ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্রে ইহাকে ইংরেজীতে 'Judgment' বলে। বাংলা ভাষায় ইহাকে অবধারণ, নির্ধারণ, নিশ্চয়, ব্যবসায়, পরামর্শ ইত্যাদি বলা যায়। এখানে আমরা ইহাকে অবধারণ বলিয়াছি, যদিচ স্থলবিশেষে অন্য শব্দগুলিও ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন বস্তুকে 'judge' করার অর্থ হইতেছে, বস্তুটি এইপ্রকার বলিয়া বিবেচনা করা, যেমন 'ফুলটি লাল', 'ফলটি মিষ্ট' ইত্যাদি।

অবশ্য এখানে ফুলটি দেখিয়া লাল বলিয়া বিবেচনা বা নিশ্চয় করিলেই তাহা একটি 'judgment' হইবে, এবং ঐ judgmentকে 'এই ফুলটি লাল' এরূপ ভাষায় বা বাক্যে প্রকাশ করিলে একটি 'proposition' বা তর্কবাক্য হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 'judgment' হইল কোন বস্তু সম্বন্ধে আমাদের মানসিক অবধারণ বা স্থিরীকরণ, এবং 'proposition' হইতেছে ঐ মানসিক ক্রিয়ার ভাষায় বা বাক্যে প্রকাশ। অবধারণ শব্দের অর্থ হইতেছে 'ইহা এইপ্রকার' এরূপ স্থিরীকরণ। অতএব Judgment ও অবধারণ সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহার করা যায়। ইহারা মানসিক ক্রিয়া বা বৃত্তিকেও বুঝায় এবং সেই ক্রিয়ার ফল যে নিশ্চয় বা ব্যবসায় তাহাকেও বুঝায়। এখানে এই শব্দগুলি দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অর্থে অবধারণ বলিতে নিশ্চয় অর্থাৎ নিঃসন্দেহ জ্ঞান বুঝায়। এই অর্থে অবধারণ যে বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাকে তর্কবাক্য বলে।

অবধারণ ও তর্কবাক্য।

অবধারণের দুইটি অর্থ।

২। প্রত্যয় ও অবধারণ
(Concept and Judgment)

কোন proposition বা তর্কবাক্যকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহাতে অন্ততঃ দুইটি তর্কপদ (term) আছে এবং তাহাদের কোন সম্বন্ধ বা সম্বন্ধাভাবের কথা বলা হইয়াছে। 'Man is mortal' একটি proposition। ইহাতে 'man' ও 'mortal' এই দুই তর্কপদকে 'is' ক্রিয়াদ্বারা সম্বন্ধযুক্ত করা হইয়াছে। 'Man is not God' এই propositionএ 'man' ও 'God' দুই পদের সম্বন্ধাভাব 'is not' বাক্যাংশদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরেজীতে propositionএর তিনটি অংশকে subject, predicate ও copula বলা হয়। বাংলায় ইহাদিগকে যথাক্রমে বিশেষ্য, প্রয়োজ্য ও যোজক বলা যায়। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় সব বাক্যেই copula বা যোজকের উল্লেখ থাকে না। যেমন 'পর্বতো বহ্নিমান্', 'ফুলটি লাল' এইরূপ বাক্যই ব্যবহৃত হয়, 'পর্বতো বহ্নিমান্ ভবতি', 'ফুলটি হয় লাল' এরূপ ব্যবহার হয় না, অবশ্য এখানে ক্রিয়াপদটি উহ্য থাকে। তথাপি এই তর্কবাক্য দুইটির প্রত্যেকটিতে দুইটি তর্কপদ আছে এবং তাহাদের বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে। এগুলি হইল বিধিমূলক তর্কবাক্য

তর্কপদ ও তর্কবাক্য।

(affirmative propositions)। ইহাদের মত নিষেধমূলক তর্কবাক্যেও (negative propositions, e.g. 'man is not God') দুইটি তর্ক-পদ থাকে এবং তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধের অভাব উক্ত হয়।

প্রত্যয় ও অবধারণ।

পূর্বে বলিয়াছি যে, তর্কবাক্য (proposition) অবধারণের ভাষায় প্রকাশিত রূপ। কেহ কেহ বলেন যে, তর্কবাক্যে যেমন দুইটি তর্কপদ থাকে এবং একটি যোজক-দ্বারা তাহাদের সম্বন্ধ বা সম্বন্ধাভাবের কথা বলা হয়, তেমনি অবধারণেও দুইটি প্রত্যয় (concept) থাকে এবং তাহাদের মধ্যে কোন যোগ বা অযোগের নিশ্চয় করা হয়। কোন পদদ্বারা যে অর্থবোধ হয়, সেই অর্থকে ঐ পদের অনুসারী প্রত্যয় (corresponding concept) বলে। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন পদদ্বারা একই প্রত্যয় প্রকাশিত হইতে পারে; যেমন 'man', 'মনুষ্য', 'নর' ইত্যাদি বিভিন্ন পদ একই অর্থ বা প্রত্যয় প্রকাশ করে। অবধারণে এরূপ দুইটি প্রত্যয় থাকে; এবং বিধিমূলক অবধারণে তাহাদের সংযুক্ত, আর নিষেধমূলক অবধারণে তাহাদের বিযুক্ত করা হয়। যদি তাহাই হয় তবে বলিতে হইবে যে, কোনপ্রকার অবধারণের পূর্বে আমাদের মনে দুইটি প্রত্যয় থাকা আবশ্যক। অতএব প্রথমে প্রত্যয়ের উৎপত্তি হইলে, পরে অবধারণ হইতে পারে। যেমন 'ফুলটি লাল' এরূপ অবধারণ করিতে হইলে, 'ফুল' ও 'লাল' কাহাকে বলে তাহা পূর্বে জানিতে হইবে, তবে পরে আমরা 'ফুল' ও 'লাল' প্রত্যয় দুইটি সংযুক্ত করিয়া অবধারণ করিব—'ফুলটি লাল'। অতএব অবধারণকে চিন্তার বা জ্ঞানের প্রাথমিক ও সরলতম রূপ না বলিয়া, প্রত্যয়কেই (concept) চিন্তার সর্বপ্রথম রূপ ও সোপান বলিতে হইবে; এবং প্রত্যয়-প্রতীতিকে (conception) অবধারণের (judgment) পূর্বভাবী বলিতে হইবে।

এক মতে প্রথমে প্রত্যয়, পরে অবধারণের উৎপত্তি।

কিন্তু এই মতটি দুইটি কারণে গ্রহণীয় নহে। প্রথমে দেখিতে হইবে, প্রত্যয় (concept) কিভাবে উৎপন্ন হয়। কোন প্রত্যয়ের উৎপত্তির জন্য একাধিক অবধারণ আবশ্যক। যেমন 'ফুল' এই প্রত্যয়টির জন্য আমাদের অবধারণ করিতে হইবে 'এটি গাছে হয়', 'এটি কোমল-স্পর্শ', 'এটি সুগন্ধ' ইত্যাদি। 'লাল' এই প্রত্যয়ের মূলেও একাধিক অবধারণ নিহিত আছে—যথা 'এটি বর্ণ', 'এটি উজ্জ্বল', 'এটি রক্তবর্ণ' ইত্যাদি। অতএব বলিতে হয়, ক্রমান্বয়ে কতকগুলি অবধারণের ফলেই আমরা একটি প্রত্যয়ে উপনীত হই। এজন্য অবধারণকেই প্রত্যয়ের পূর্বভাবী বলিতে হইবে।

দুই কারণে এই মত গ্রাহ্য নয়।

প্রত্যয় অবধারণ-সাপেক্ষ।

তর্কবাক্যের ন্যায় অবধারণ বিভিন্ন পৃথক্ অংশে বিভাজ্য নহে।

দ্বিতীয় কারণ হইতেছে যে, তর্কবাক্য অবধারণের ভাষায় প্রকাশিত রূপ হইলেও, তর্কবাক্য সম্বন্ধে যে কথা বলা যায়, অবধারণ সম্বন্ধে তাহা বলা যায় না। তর্কবাক্যের অংশীভূত তর্কপদ (terms) দুইটিকে subject ও predicate বলে এবং subject-টি তর্কবাক্যের প্রথমে ও predicate-টি শেষে থাকে। উহাদিগকে এক তর্কবাক্য হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় এবং পরস্পর হইতেও পৃথক্ করা যায়, তাহাতে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হয় না। যেমন 'man' ও 'mortal' এই দুইটি পদকে 'man is mortal' এই তর্কবাক্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্য তর্কবাক্যে সন্নিবিষ্ট করা যায়, আবার 'man' পদকেও 'mortal' পদ হইতে পৃথক্ করা যায়। কিন্তু অবধারণকে এরূপ বিভিন্ন অংশে ভাগ করা যায় না এবং তদ্গত প্রত্যয়গুলিকেও বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যেমন 'লাল ফুল', 'আকাশ নীল' এই দুইটি অবধারণকে 'লাল' ও 'ফুল', 'আকাশ' ও 'নীল' এরূপ দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় না এবং তাহাদের পৃথক্ করা যায় না। ইহাদের প্রত্যেকটি এক ও অবিভাজ্য চিন্তা বা বুদ্ধিবৃত্তি। লাল ফুল ও নীল আকাশ দেখিয়া আমাদের একবারেই 'লাল-ফুল', 'নীল-আকাশ' এরূপ অবধারণ হয়; প্রথমে ফুলের জ্ঞান পরে লালের জ্ঞান, প্রথমে আকাশের জ্ঞান পরে নীলের জ্ঞান, তৎপরে তাহাদের সংযোগ বা সম্বন্ধের জ্ঞান এরূপ হয় না।

অবধারণ হইতেই চিন্তার আরম্ভ হয়।

প্রকৃতপক্ষে অবধারণ (judgment) হইতে চিন্তা ও জ্ঞানের আরম্ভ ও উন্মেষ হয় এবং আমাদের প্রত্যয়গুলির (concepts) মূলে কোন না কোন প্রকার অবধারণ (judgment) নিহিত আছে। অল্পবয়স্ক শিশুও যখন কোন তীব্র শব্দ শুনিয়া বা কোন প্রখর আলোক দেখিয়া সে-দিকে তাকায় তখন তাহার মনেও একটা প্রতিক্রিয়া হয় এবং 'এ একটা কিছু' এরূপ অস্পষ্ট ও অসম্বদ্ধ অবধারণও হয়। বয়োবৃদ্ধি ও মনের পরিণতির সঙ্গে তাহার অস্পষ্ট অবধারণগুলি সুস্পষ্ট ও সুসম্বদ্ধ হয় এবং সে জ্ঞানরাজ্যের অধিকারী হয়। অতএব অবধারণকেই (judgment) চিন্তার প্রাথমিক রূপ ও জ্ঞানের প্রথম সোপান বলিতে হইবে।

৩। অবধারণের বিশেষ ধর্মসমূহ
(The Main Characteristics of Judgment)

অবধারণের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ বা ধর্ম আছে, যদ্দ্বারা ইহাকে অন্যান্য মনোবৃত্তি ও অন্য প্রকার জ্ঞান হইতে পৃথক্ ও ভিন্ন বলিয়া বুঝা যায়।

সংশয়, কল্পনা, ভ্রম, স্বপ্ন প্রভৃতিকে অবধারণ (judgment) বলা হয় না। এখন দেখা যাক্ অবধারণের কি কি বিশেষ ধর্ম আছে যেজন্য আমরা ইহাকে সংশয় প্রভৃতি হইতে ভিন্ন বলি।

(১) অবধারণ—সর্বগ্রাহ্য

অবধারণ—সর্বগ্রাহ্য।

অবধারণের প্রথম বিশেষ ধর্ম এই যে, ইহা সর্বগ্রাহ্য (universal) হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। সংশয় ইত্যাদি সর্বগ্রাহ্য জ্ঞান নহে। কোন মাঠে দূরস্থ বস্তুটি বৃক্ষ বা মানুষ এরূপ আমার সন্দেহ হইল। কিন্তু সকলেরই যে এরূপ সন্দেহ হইবে তাহা নহে। বস্তুটির নিকটস্থ ব্যক্তি ঠিক জানে যে, এটি শুষ্ক বৃক্ষের কাণ্ড, মানুষ নহে। কেহ নিজেকে রাজা বলিয়া কল্পনা করিল। কিন্তু সেজন্য সকলেই তাহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিবে না। আমি সন্ধ্যাকালে পথের পার্শ্বে একটি লম্বা ও বক্র রেখা দেখিয়া ইহাকে সর্প বলিয়া ভয় পাইলাম। কিন্তু সকলেই এ সর্প দেখিবে না; আর আমিও একটু সতর্কতার সহিত দেখিলে বা কোন আলোকের সাহায্য লইলে দেখিতে পাইব যে এটা সর্প নয়, রজ্জুমাত্র। আমরা রাত্রে কখন কখন স্বপ্ন দেখি যে নানা দেশ ভ্রমণ করিতেছি। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিলে দেখি, যে বিছানায় শুইয়াছিলাম, তাহাতেই শুইয়া আছি। অতএব সংশয়, কল্পনা প্রভৃতি জ্ঞানলব্ধ বস্তু সকলের স্বীকার্য নহে এবং সর্ব কালেও স্বীকার্য নহে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, কোন বিষয়ে এক ব্যক্তির যেরূপ অবধারণ হয়, অন্য সকলেরও সেইরূপ অবধারণ হইবে, এবং এক কালে যেরূপ অবধারণ হয়, অন্য কালেও সেরূপ অবধারণ হইবে। যে পত্রে আমি লিখিতেছি, তাহাকে কেবল আমিই কাগজ বলিয়া অবধারণ করি না, পরন্তু আমি জানি বা বিশ্বাস করি যে, আমার মত শিক্ষিত সকল ব্যক্তিই সব সময়ে উহাকে কাগজ বলিয়া অবধারণ করিবে। এই অর্থে অবধারণকে সর্বজনগ্রাহ্য বলিতে হইবে।

অবধারণে আমরা যে বস্তুকে যেরূপ বলিয়া স্থির করি সেটি সকলের কাছেই এবং সব সময়েই সেইরূপ বলিয়া অবধারিত হইবে এরূপ আশা করা যায়। এক ব্যক্তির অবধারণ যে সকলের গ্রাহ্য তাহা স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা আমরা জ্ঞানের সত্যতা বা যথার্থতা সম্বন্ধে কোন বিচার বা সিদ্ধান্ত করিতে পারিব না। একই বিষয়ে আমার একরূপে অবধারণ হইবে, তোমার আর একরূপ, অপর ব্যক্তির আরও অন্যরূপ হইবে ইহা স্বীকার করিলে, জ্ঞানের সত্যাসত্য নির্ণয় করা যাইবে না। পক্ষান্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, সত্যাসত্য বলিয়া কিছু নাই, যাহার কাছে যে-বস্তু যেরূপ দেখায়,

অথবা যাহার যেরূপ মনে হয়, সে তাহাই সত্য বা মিথ্যা বলিবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের কাহাকেও কোন উপদেশ দিবার, অথবা দার্শনিক হিসাবে কোন কথা বলিবার অধিকার থাকে না।

প্রকৃত কথা হইতেছে যে, বস্তুর স্বরূপ বা যথার্থরূপ বলিয়া কিছু আছে এবং সেই যথার্থরূপ জানাই মানুষের চিন্তার মুখ্য উদ্দেশ্য। আর মানুষের বুদ্ধির বা চিন্তার একটা স্বাভাবিক ধারা আছে এবং তাহার কতকগুলি বিশেষ নিয়মও আছে অর্থাৎ একটা শৃংখলা আছে। সকল সুস্থ মনুষ্যেরই চিন্তার ধারা ও শৃংখলা মুখ্যতঃ একপ্রকার। ইহা স্বীকার করিলে আমরা বলিতে পারি যে, কোন বিষয়ে সকল ব্যক্তির অবধারণ একপ্রকার হইবে অর্থাৎ কোন অবধারণ সর্বজনগ্রাহ্য হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

(২) অবধারণ—অবশ্যগ্রাহ্য

অবধারণ—অবশ্যগ্রাহ্য।

অবধারণের দ্বিতীয় বিশেষ লক্ষণ বা ধর্ম হইতেছে যে, ইহা অবশ্যগ্রাহ্য বা **অবশ্যস্বীকার্য** (necessary) হইবে। অবধারণ একপ্রকার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। ইহাতে আমাদের সন্দেহ হয় না। অবধারণে আমরা নিশ্চিতভাবে জানি ও বলি যে 'এ বস্তুটি এইপ্রকার, অন্যপ্রকার নহে'। ইহা হইতে দুইটি বিষয় বুঝা যায়। প্রথম বুঝা যায়, অবধারণ আমার বা কোন ব্যক্তির ইচ্ছা বা কল্পনার উপর নির্ভর করে না। যখন কেহ কোন বস্তু সম্বন্ধে কোন নিশ্চয় করেন, তখন তিনি তাঁহার ইচ্ছা বা খুশিমত কোন সিদ্ধান্ত করেন না, পক্ষান্তরে যে-কোন বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে ইহা অবশ্যকর্তব্য এরূপ বুদ্ধিতেই ঐ সিদ্ধান্ত করেন। অতএব অবধারণের অবশ্যম্ভাবিতা (necessity) স্বীকার করিতে হয়।

তারপর আমরা বুঝিতে পারি, অবধারণে যে নিশ্চয়াত্মক বা ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান হয় তাহার কোন সদ্ধেতু অর্থাৎ নিশ্চিত হেতু আছে। অবশ্য কোন ব্যক্তি অবধারণের সমর্থক হেতু সম্বন্ধে সচেতন না থাকিতে পারেন। যেমন কেহ বলিলেন, 'এবারে যুদ্ধের সময় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে।' কিন্তু তিনি একথার সমর্থনে কোন উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে না পারিয়া শুধু বলিলেন, 'আমি স্পষ্ট দেখিতেছি এরূপ হইবেই'। যদিও অবধারণের হেতু সম্বন্ধে সকলে সচেতন নহেন, তথাপি তাহার যে কোন হেতু নাই তাহা বলা যায় না। প্রায় সব অবধারণের মূলেই কোন না কোন হেতু আছে এবং অনুসন্ধান করিলে তাহা প্রকাশিত (explicit) হইবে। কোন অবধারণের হেতু হইল অন্য কোন জ্ঞান বা অনুভব বা সাধারণ নিয়ম (general law), যাহা হইতে

অবধারণটি অনিবার্যভাবে প্রসক্ত হয়। যখন কোন অবধারণকে তাহার সমর্থক জ্ঞান বা সাধারণ নিয়মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া প্রতিপন্ন করা হয়, তখন অবধারণ অনুমান বা অন্য কোন প্রমাণে পরিণত হয়। দৃষ্টান্তরূপে পূর্বোল্লিখিত অবধারণকে লওয়া যাইতে পারে। 'এবারে যুদ্ধের সময় দ্রব্যমূল্য বাড়িবে' এরূপ নিশ্চয় করিবার কি হেতু আছে? এই প্রশ্নের উত্তর হইবে, 'যুদ্ধের সময় দ্রব্য আমদানি কম হইবে, কিন্তু তাহার চাহিদা বাড়িয়া যাইবে'। একথা শুনিয়া যদি কেহ বলেন, 'সেজন্য এবারে দ্রব্যমূল্য বাড়িবে কেন?' তাহার উত্তর হইবে, 'অর্থনীতির সাধারণ সরবরাহ ও চাহিদা নিয়ম (law of supply and demand) অনুসারে সব সময়েই এরূপ ঘটিয়া থাকে'। অতএব দেখা যাইতেছে প্রথম অবধারণটি এইরূপে অনুমানে পরিণত হইল:—

অবধারণ ও অনুমান।

সরবরাহ অপেক্ষা চাহিদা বাড়িলে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া যায়।
এ যুদ্ধের সময় দ্রব্যের সরবরাহ অপেক্ষা চাহিদা বাড়িবে,
অতএব এ যুদ্ধের সময় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে।

এখন আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি, কি জন্য অবধারণকে অবশ্যস্বীকার্য (necessary) বলা হইয়াছে। অবধারণের মূলে এমন প্রত্যয় বা সাধারণ নিয়ম নিহিত থাকে, যাহা আমাদিগকে মানিতেই হয় এবং যাহা হইতে অবধারণটি তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুসারে প্রসক্ত হয়। অতএব অবধারণটি যুক্তি-যুক্ত বলিয়া অবশ্যস্বীকার্য হইবে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি একটি অবধারণের সমর্থন করিতে আর একটি অবধারণ আবশ্যক হয়, তবে সেই দ্বিতীয় অবধারণের সমর্থনের জন্য অন্য আর একটি অবধারণ আবশ্যক হইবে, এবং আবার তৃতীয়টির জন্য অন্য আর একটি আবশ্যক হইবে। এইরূপে আমাদিগকে চলিতেই হইবে এবং অবধারণ বিষয়ে বিচারের কোথায়ও শেষ বা বিশ্রান্তি হইবে না। যদি তাহাই হয় তবে অবধারণ সম্বন্ধে উপরে ব্যাখ্যাত মতটি অনবস্থা (regresus ad infinitum) দোষদুষ্ট বলিতে হইবে। এই দোষ স্খালনের দুইটি পন্থা আছে। কেহ কেহ বলেন, মানুষের অবধারণ-গুলি পরস্পরের সমর্থক। একটি আর একটি দ্বারা সমর্থিত হয় বটে, কিন্তু প্রথমটি আবার দ্বিতীয়টিকে সমর্থন করিতে পারে, যেমন কোন তুলাদণ্ডে একটি লৌহখণ্ড এক সের ওজন কি না তাহা স্থির করা গেল, আবার কালান্তরে তুলাদণ্ডটি ঠিক আছে কি না তাহা দুই দিকে দুইটি সের পড়িয়ান দিয়া ঠিক করা যায়। কোন কোন দার্শনিক এই পন্থাটি গ্রহণ করেন। অপরপক্ষে কেহ কেহ বলেন, সাধারণতঃ একটি অবধারণকে অন্য অবধারণদ্বারা সমর্থন করিতে করিতে আমরা অবশেষে কতকগুলি মূল সূত্র বা মৌলিক তত্ত্বে

অবধারণের যৌক্তিকতা বিষয়ে অনবস্থা দোষ ও তাহার খণ্ডন।

(fundamental first principles) উপনীত হই, যেগুলি স্বতঃসিদ্ধ সত্য এবং যেগুলিকে কোন যুক্তিদ্বারা সমর্থন করা আবশ্যক হয় না। যেমন আলোকের সাহায্যে অন্য দ্রব্য দেখিতে হয়, কিন্তু আলোক দেখিবার জন্য আর অন্য আলোক আবশ্যক হয় না, তেমনি এরূপে স্বতঃসিদ্ধ অবধারণকে সমর্থন করিবার জন্য অবধারণান্তরের আবশ্যক হয় না। এইখানেই অবধারণ বা জ্ঞানবিচারের বিশ্রান্তি হয়। দৃষ্টান্তরূপে জ্ঞান ও আত্মার অস্তিত্ব-বিষয়ক অবধারণের উল্লেখ করা যায়। এসব অবধারণ স্বতঃসিদ্ধ বা স্বতঃপ্রমাণ। আমার জ্ঞান ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। 'আমি যে আছি অথবা কোন বস্তু জানিতেছি' সেবিষয়ে কোন ব্যক্তির সন্দেহ হয় না বা কেহ সেজন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না। সাধারণ অবধারণে প্রমাণের অপেক্ষা থাকিলেও স্বতঃসিদ্ধ অবধারণ প্রমাণনিরপেক্ষ এবং সেখানেই অবধারণ-বিচারের বিশ্রান্তি হয়।

(৩) অবধারণ—বিশ্লেষাত্মক ও সংশ্লেষাত্মক

অবধারণ—বিশ্লেষ ও সংশ্লেষাত্মক।

অবধারণের তৃতীয় বিশেষ লক্ষণ বা ধর্ম হইতেছে যে, ইহা বিশ্লেষাত্মক ও সংশ্লেষাত্মক (analytic and synthetic)। চিন্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্বে বলিয়াছি যে, ইহা-দ্বারা আমরা জাগতিক বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করি। চিন্তার প্রাথমিক রূপ অবধারণেরও একই প্রকৃতি। তাহাদ্বারা আমরা বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি। এখন দেখা যাক্, আমরা কিভাবে তাহা করি। কোন বয়স্ক ব্যক্তি একটি গোলাপ গাছ দেখিয়া বলিলেন, 'এই গোলাপ গাছের গোল গোল পাতা আছে'। গোলাপ গাছ সম্বন্ধে তাঁহার পূর্বলব্ধ জ্ঞান এক পর্যায় অগ্রসর হইল, তিনি এসম্বন্ধে এক নূতন বিষয় জানিলেন। কিন্তু এবিষয় জানিতে তাঁহাকে বিশ্লেষ ও সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার সহায়তা লইতে হইয়াছে। একদিকে গোলাপের পাতা যে উহার অন্যান্য অংশ হইতে ভিন্ন তাহা বুঝিতে হইয়াছে। পাতাগুলি গাছের শাখা-প্রশাখা, কাঁটা, ফুল, গন্ধ ইত্যাদি নহে এরূপে বুঝিতে হইয়াছে। এরূপে অংশগুলিকে পৃথক্ বা ভিন্ন বলিয়া বুঝার নাম বিশ্লেষ (analysis)। কিন্তু এই বিশ্লেষ ক্রিয়ার সঙ্গে তাঁহাকে সংশ্লেষও করিতে হইয়াছে। গোলাপ গাছের পাতা গোল গোল বুঝিতে হইলে এটি যে 'গোলাপ গাছ' তাহা বুঝিতে হয় এবং পাতাগুলি যে 'গোলাপ গাছের পাতা' তাহাও বুঝিতে হয়। কিন্তু 'গোলাপ গাছ' বলিতে আমরা কি বুঝি? ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল ও গন্ধ প্রভৃতির মিলনক্ষেত্র হইল একটি গোলাপ গাছ। এগুলিকে 'গোল গোল' পাতা'র সহিত

মিলাইলে অর্থাৎ সংশ্লেষ (synthesis) করিলে, আমরা বলিতে পারি, 'এই গোলাপ গাছের গোল গোল পাতা আছে'। অতএব দেখা গেল যে, অবধারণে বিশ্লেষ ও সংশ্লেষ উভয় প্রক্রিয়াই বর্তমান এবং ইহা বিশ্লেষ ও সংশ্লেষাত্মক।

অবধারণে এতদুভয় যুগপৎ হয়।

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, অবধারণে বা কোন প্রকার জ্ঞানে বিশ্লেষ ও সংশ্লেষ উভয় প্রক্রিয়া যুগপৎ চলে, একটি পূর্বে এবং অন্যটি পরে হয় না। কোন গাছকে গোলাপ গাছ বলিয়া বুঝিবার জন্য ইহার বিভিন্ন অংশকে পৃথক্ করিয়া বুঝিবার সংগে সংগে তাহাদের সম্বন্ধও বুঝিতে হয়, অর্থাৎ গাছটিকে বিভিন্ন অংশে বিশ্লেষ করিবার সংগে সংগে তাহাদের সংশ্লেষও করিতে হয়। একটি ঘড়ির দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টি ভাল বুঝা যায়। কোন ঘড়ি কি করিয়া চলে তাহা যদি আমরা বুঝিবার চেষ্টা করি, তবে ঘড়ির বিভিন্ন অংশ দেখিবার সময়, একটি অংশ অন্য অংশের সহিত কিরূপ সম্বন্ধযুক্ত আছে তাহা লক্ষ্য করি। এখানে বিভিন্ন অংশের প্রতি মনোযোগ হইল বিশ্লেষ, আর তাহাদের সম্বন্ধ লক্ষ্য করা হইল সংশ্লেষ। অবশ্য একথা সত্য যে, সব অবধারণেই এই দুই প্রক্রিয়া সমভাবে প্রকট নয়। কোথায়ও বিশ্লেষ ক্রিয়া প্রবল ও সুস্পষ্ট, এবং সংশ্লেষ ক্রিয়া ক্ষীণ ও অস্পষ্ট। আবার কোথায়ও ইহার বৈপরীত্য দেখা যায়, অর্থাৎ সংশ্লেষ সুস্পষ্ট, বিশ্লেষ অস্পষ্ট। কিন্তু সর্বত্রই উভয় প্রক্রিয়া এক না এক ভাবে বর্তমান। কোন চিত্রের অংকন-প্রণালী বুঝিবার সময় বিশ্লেষ ক্রিয়া প্রাধান্য লাভ করে, সংশ্লেষ ক্রিয়া গৌণ হইয়া যায়। আবার সমগ্র চিত্রটির সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার সময় ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা হয়, অর্থাৎ সংশ্লেষ ক্রিয়া প্রাধান্য লাভ করে, বিশ্লেষ অপ্রধান হইয়া যায়।

(৪) অবধারণ—সমষ্টি-জ্ঞানের উৎপাদক

অবধারণ হইতে সমষ্টি জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

আমরা অবধারণকে জ্ঞানের প্রাথমিক রূপ বা প্রথম সোপান বলিয়াছি। ইহা হইতে আমাদের জ্ঞানের সূত্রপাত হয়, ইহাদ্বারা জ্ঞানের প্রসার হয় এবং সকল জ্ঞানের সমন্বয়ে এক সাধারণ সমষ্টি-জ্ঞান (general system of knowledge) রচিত হয়। কোন ব্যক্তি পল্লীগ্রাম হইতে প্রথম কোন শহরে আসিলেন। পূর্বে শহর সম্বন্ধে তাঁহার কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি শহরের বিভিন্ন অংশগুলি ক্রমশঃ দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার এক একটি দর্শন এক একটি অবধারণের আকারে তাঁহার মনে স্থান পাইল। কিন্তু পূর্বাপর অবধারণগুলি বিচ্ছিন্ন বা অসংলগ্নভাবে থাকে না।

তিনি শহরের বিভিন্ন অংশগুলি এক না একভাবে দেশ ও কালে সম্বন্ধযুক্ত করেন, অর্থাৎ একটি অন্যটির পূর্ব বা পশ্চিম দিকে অবস্থিত, একটি হইতে অপরটিতে যাইতে অল্প বা দীর্ঘ সময় লাগে ইত্যাদি ধারণা করেন। এইভাবে সেই ব্যক্তিটি শহরের বিভিন্ন অংশের দেশিক ও কালিক সম্বন্ধও অবগত হন। কিন্তু ইহা কিরূপে হয়? তাঁহার অবধারণগুলি ত একটি অপরটির পূর্ব বা পশ্চিম দিকে, নিকটে বা দূরে থাকে না, সবগুলিই তাঁহার মনের মধ্যে থাকে। কিন্তু এক ব্যক্তির মনে বিভিন্ন অবধারণ একভাবে মিলিত হয়। এক ব্যক্তির কোন নূতন অবধারণ তাহার পূর্বসঞ্চিত অবধারণগুলির সহিত গ্রথিত হয়, এবং পূর্বসঞ্চিত প্রত্যয়সমষ্টি (old apperceptive mass) নূতনটিকে প্রভাবিত করে এবং নূতনটিও পূর্বটির সন্নিবেশের কিছুটা পরিবর্তন ও প্রসার সাধন করে। এভাবে পূর্বোক্ত ব্যক্তির শহরের বিভিন্ন অংশের ও তাহাদের সম্বন্ধের জ্ঞান হইতে থাকে, এবং শহরের সকল অংশ দর্শনান্তে তাঁহার সমগ্র শহর সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। ইহাকে আমরা একটি নিম্নস্তরের সমষ্টি-জ্ঞান (minor system of knowledge) বলিতে পারি।

এইভাবে বিভিন্ন অবধারণের মূলে আমরা বিভিন্ন বিষয়কে সম্বন্ধযুক্ত করিয়া একটি সমষ্টি-জ্ঞানে উপনীত হই। এইপ্রকারে মানুষের অবধারণ-শক্তি বিভিন্ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমষ্টি-জ্ঞান রচনা করিয়াছে। কখন কখন এসব বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। আবার জড়বিজ্ঞানের সহিত নীতিশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের বিরোধ দেখা যায়। দর্শনশাস্ত্রে আমরা সকল প্রকার জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করিয়া এক সর্বব্যাপী সমষ্টি-জ্ঞান (universal system of knowledge) রচনা করিবার চেষ্টা করি। এরূপ সমষ্টি-জ্ঞানের আলোকে আমরা বিশ্বের সর্ববিষয়ের ব্যাখ্যা করিতে পারি। কিন্তু এরূপ সমষ্টি-জ্ঞানের রচনা এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে এবং ইহা অনির্দিষ্ট কাল চলিবে মনে হয়।

৪। অবধারণের প্রকারভেদ
(Types of Judgment)

অবধারণের চারটি প্রধান প্রকারভেদ।

অবধারণের প্রকৃতি এবং বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। এখন ইহার কয়েকটি প্রধান প্রকারভেদের কথা বলা আবশ্যক। অবধারণের চারিটি প্রধান প্রকারভেদ আছে, যথা—গুণবিষয়ক অবধারণ, পরিমাণ-বিষয়ক অবধারণ, কার্যকারণসম্বন্ধ-বিষয়ক অবধারণ এবং ব্যক্তিত্ব-বিষয়ক অবধারণ।

CENTRAL LIBRARY

(১) গুণবিষয়ক অবধারণ
(Judgments of Quality)

গুণবিষয়ক অবধারণ।

আমাদের চিন্তাশক্তি বা বুদ্ধিদ্বারা আমরা জাগতিক বস্তুনিচয় বুঝিবার চেষ্টা করি। এই প্রচেষ্টা প্রথমে বস্তুর গুণবিষয়ক অবধারণরূপে প্রকাশিত হয়। মন ও বুদ্ধির অপরিণত অবস্থায় বস্তুর অমিশ্র প্রাথমিক গুণগুলিই (simple qualities) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোন একটি শব্দ শুনিলে বা বর্ণ দেখিলে শিশুদের মন আকৃষ্ট হয় এবং তাহাদের শব্দ বা বর্ণমাত্রের একটা অস্পষ্ট অনুভূতি বা অবধারণ হয়। ইহাতে ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর অবয়বের বা সম্বন্ধের জ্ঞান থাকে না, মাত্র একটি অবিভক্ত গুণের উপলব্ধি হয়। প্রায় দেখা যায়, শিশুরা সকল পুরুষকে 'বাবা', স্ত্রীলোককে 'মা' সম্বোধন করে, এবং হাতী-ঘোড়াকেও গরু বলে। ইহার কারণ এই যে, তাহাদের শিশুসুলভ জ্ঞানে বস্তুর একটা সাধারণ রূপ বা গুণের প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু সেগুলির অংশ বা সম্বন্ধের জ্ঞান হয় না। শিশুরা বড় হইলে এসব বিষয় জানে।

এই প্রকার অবধারণ হইতে চিন্তার আরম্ভ হয়।

বয়স্ক লোকের পক্ষে এরূপ বালসুলভ ও গুণমাত্রবোধক অবধারণ সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তাহাদের অবধারণে বস্তুর গুণের সঙ্গে উহার অংশ ও সম্বন্ধ প্রভৃতির জ্ঞানও হয়। তথাপি কখন কখন তাহাদের অবধারণে বস্তুর গুণই প্রাধান্য লাভ করিতে পারে, যদিচ বস্তুর অংশ বা সম্বন্ধবিশেষের জ্ঞানও অপ্রধানভাবে থাকিতে পারে। যেমন কেহ বলিলেন, 'এ পাতাটি সবুজ'। এখানে সবুজ বর্ণই জ্ঞানের প্রধান বিষয়। যদিও পাতা ও সবুজ বর্ণের সম্বন্ধ-জ্ঞান এক্ষেত্রেও বর্তমান, তথাপি সম্বন্ধ-জ্ঞানটি অপ্রধান ও অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। এরূপ গুণবিষয়ক অবধারণ সর্বাপেক্ষা সহজ ও সরল। এজন্য ইহাতেই চিন্তার সূত্রপাত বা আরম্ভ হয় বলা যায়।

পরিমাণ-বিষয়ক অবধারণেরও সূত্রপাত হয়।

কিন্তু আমাদের চিন্তাশক্তি এরূপ সহজ ও সরল গুণবিষয়ক অবধারণে সীমাবদ্ধ থাকে না। আমরা এক বস্তুর বিশ্লেষ ও সংশ্লেষ করিয়া তাহার বিভিন্ন অংশ জানি এবং অন্য বস্তুর সহিত তাহার তুলনা করিয়া তাহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করি। যেমন 'পাতাটি নীল' শুধু এই কথা না বলিয়া আমরা বলি 'পাতাটি গাঢ় নীল বা ফিকে নীল', 'বস্ত্রটি লাল' না বলিয়া বলিতে পারি 'বস্ত্রটি গোলাপি রং-এর' ইত্যাদি। এখানে আমাদের যে অবধারণ হয় তাহাতে বস্তুর গুণমাত্রের জ্ঞান হয় না, পরন্তু তাহার পরিমাণেরও কতকটা নির্ধারণ হয়। এরূপ গুণবিষয়ক অবধারণ হইতেই পরিমাণ-বিষয়ক অবধারণের সূত্রপাত হয়।

CENTRAL LIBRARY

(২) পরিমাণ-বিষয়ক অবধারণ (Judgments of Quantity)

গুণবিষয়ক ও পরিমাণ-বিষয়ক অবধারণের মধ্যে কোন স্পষ্ট সীমারেখা চিহ্নিত করা দুঃসাধ্য। কারণ একটি হইতে অপরটির দিকে চিন্তার স্বাভাবিক গতি দেখা যায়। আকার বা পরিমাণ বিষয়েও এমন অবধারণ আছে যাহাকে গুণ-বিষয়কই বলিতে হইবে। যেমন কেহ বলিলেন 'একটি প্রকাণ্ড গাছ দেখিলাম', কেহ বলিলেন 'আজ আমার ঘরের জিনিস কম্ কম্ দেখিতেছি'। এসব স্থলে বস্তুর পরিমাণ সম্বন্ধে যে অবিশিষ্ট (indefinite) জ্ঞান হয়, তাহাকে সহজ ও প্রাথমিক গুণবিষয়ক অবধারণের তুল্যই বলিতে হইবে। কারণ এখানে প্রথম দৃষ্টান্তে বস্তুটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা শাখা-প্রশাখার কোন নিশ্চয় হয় না। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে কোন ব্যক্তির ঘরটি খালি খালি বোধ হয়, কিন্তু ঘর হইতে কত জিনিস অপসৃত হইয়াছে তাহার কোন নির্ণয় হয় না। অতএব এগুলিকে গুণবিষয়ক অবধারণের শ্রেণীভুক্ত বলিতে হইবে।

পরিমাণ-বিষয়ক অবধারণ।

পক্ষান্তরে, পরিমাণ-বিষয়ক অবধারণকে অন্য একপ্রকার উচ্চশ্রেণীভুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি বলিতে হয়। 'বস্তুটি প্রকাণ্ড', 'আকাশে বহু নক্ষত্র আছে', এরূপ অবধারণগুলি অস্পষ্ট ও অবিশিষ্ট। এজন্য আমরা তাহাতে তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত না হইয়া বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করি। বস্তুটি যেসব অংশ বা অবয়বের সমষ্টি, সেগুলি যদি একপ্রকার বা সমপ্রকৃতির হয়, তবে আমরা সেগুলি গণনা করিয়া বলিতে পারি, তাহার মধ্যে কতকগুলি অংশ বা কতকগুলি জিনিস আছে। যেমন এক ঝুড়ি আম গণনা করিয়া কেহ বলিলেন, 'ঝুড়িতে ২০টি আম আছে'। ইহাকে সংখ্যাবিষয়ক অবধারণ বলে।

সংখ্যাবিষয়ক অবধারণ।

কিন্তু কোন বস্তুর বিভিন্ন অংশ ও তাহাদের সংখ্যা জানিলেই তাহার পরিমাণ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান হয় না। এজন্য আমরা সেগুলিকে মাপ বা ওজন করিয়া দেখি। কোন বস্তুকে মাপ করার অর্থ হইতেছে কোন নির্দিষ্ট মানের সহিত তাহার অংশগুলির সম্বন্ধ নির্ণয় করা। যেমন কোন গজকাঠি দিয়া কোন বস্ত্র মাপ করিয়া আমরা বলি 'বস্ত্রটি ২০ গজ লম্বা', অথবা এক সের পড়িয়ান দিয়া জল ওজন করিয়া বলি 'এই পাত্রে দশ সের জল আছে'। এগুলিকে পরিমাপ-বিষয়ক অবধারণ বলে।

পরিমাপ-বিষয়ক অবধারণ

পরিমাণ-বিষয়ক অবধারণ হইতেই আমাদের জ্ঞান সুস্পষ্ট ও সঠিক হয়। ইহা হইতেই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। জ্ঞানের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, বস্তু সম্বন্ধে পরিমাণ-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে এবং তাহাকে গাণিতিক সূত্রে নিবদ্ধ করিতে পারিলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার ও প্রকর্ষ হয়।

বিজ্ঞানে ইহার উপযোগিতা।

(৩) কার্যকারণ-সম্বন্ধ-বিষয়ক অবধারণ
(Judgments of Causal Connection)

গুণ ও পরিমাণ-বিষয়ক অবধারণ অপেক্ষা কার্যকারণ-বিষয়ক অবধারণ উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত। ইহাদ্বারা আমাদের জ্ঞানের অধিকতর প্রসার ও সংহতি ঘটে। পূর্বোক্ত দুইপ্রকার অবধারণ বিশেষ বিশেষ বস্তুতে সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ কোন একটি বস্তু সম্বন্ধেই জ্ঞান প্রদান করে, এক বস্তুর পরিবর্তনের সহিত অন্য বস্তুর কিরূপ সম্বন্ধ তাহা প্রকাশ করে না। কার্যকারণ-বিষয়ক অবধারণে এক বস্তুর পরিবর্তন যে অন্য বস্তুর সহিত কার্যকারণভাবে সম্বদ্ধ তাহাই প্রকাশিত হয়। আমরা প্রথমে এক একটি বস্তুর গুণ ও পরিমাণ জানি, এক বস্তুর সহিত অন্য বস্তু সকলের সম্বন্ধ পরে জানিবার চেষ্টা করি। অবশ্য কোন বস্তুর পরিমাণ জানিতে হইলেও তাহার সহিত অন্য বস্তুর তুলনা করিতে হয় এবং সম্বন্ধও জানিতে হয়। কিন্তু এরূপ সম্বন্ধ বস্তুনিষ্ঠ (objective) বলিয়া মনে হয় না। যেমন আমি যদি বলি 'এ টেবিল্‌টি আমার হাতের দুই হাত লম্বা হইবে' তবে টেবিল্ ও আমার হাতের মধ্যে যে সম্বন্ধের কথা বলা হইল তাহা বস্তুবহির্ভূত ও কাদাচিৎক (accidental) সম্বন্ধমাত্র। কিন্তু যখন আমরা কোন বস্তুকে অন্য বস্তুর সহিত কার্যকারণ-সম্বন্ধযুক্ত বলি, তখন সে সম্বন্ধটিকে ঘনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করি।

কার্যকারণ-সম্বন্ধ-বিষয়ক অবধারণ।

দুইটি বস্তু বা ঘটনার মধ্যে নিয়ত পূর্বপরভাবী সম্বন্ধের নাম কার্য-কারণ-সম্বন্ধ। ইহাদের মধ্যে কারণটি নিয়ত পূর্বভাবী বা পূর্ববর্তী বস্তু বা ঘটনা এবং কার্যটি তাহার নিয়ত পরভাবী বা পরবর্তী বস্তু বা ঘটনা। কারণ থাকিলেই কার্য থাকিবে, কারণ না থাকিলে কার্য হইবে না। অতএব কারণ কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী এবং কার্যের জন্য অপরিহার্য (invariable and necessary antecedent) বস্তু বা ঘটনা। অপরপক্ষে, কার্যটি কারণের নিয়ত পরবর্তী ও অবশ্যম্ভাবী (invariable and necessary consequent) বস্তু বা ঘটনা।

কারণ ও কার্যের লক্ষণ।

CENTRAL LIBRARY

সমষ্টি-জ্ঞান উৎপাদনে কার্যকারণ-বিষয়ক অবধারণের বিশেষ উপযোগিতা দেখা যায়। আমাদের বিভিন্ন জ্ঞান কিভাবে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং কিভাবে তাহাদের মিলন হইতে পারে, তাহাই আমরা জানিবার চেষ্টা করি। এরূপভাবে বিভিন্ন জ্ঞানকে একত্র মিলিত ও সমাবেশিত করিতে পারিলে একটি সমষ্টি-জ্ঞান (system of knowledge) রচিত হয়। কার্যকারণ-সম্বন্ধদ্বারা আমরা বিভিন্ন এবং আপাত-বিচ্ছিন্ন বস্তুসকলকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বলিয়া বুঝি এবং তাহাদের একত্র মিলিত করিতে পারি। এভাবে তাহাদের মিলন ও সমন্বয় করিতে পারিলে তাহারা একটি সমষ্টি-জ্ঞানের অংগীভূত হয়।

সমষ্টি-জ্ঞানে কার্যকারণ-বিষয়ক অবধারণের উপযোগিতা।

(৪) ব্যক্তিত্ব-বিষয়ক অবধারণ
(Judgments of Individuality)

যে অবধারণে কোন বস্তুকে একটি অবয়বী দ্রব্য বা ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করা হয় তাহাকে ব্যক্তিত্ব-বিষয়ক অবধারণ বলে। এরূপ অবধারণকে কখন কখন প্রয়োজন-বিষয়ক বা উপযোগিতা-বিষয়ক অবধারণও (judgments of purpose or teleology) বলা হয়। একটি দৃষ্টান্তদ্বারা ইহার অর্থ বুঝান যায়। একটি ইটের স্তূপ ও একটি জীবশরীরের মধ্যে প্রভেদ কি? ইটের স্তূপটি কতকগুলি ইটের সমষ্টি বা রাশিমাত্র। সেগুলি পৃথগ্‌ভাবে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের একত্র সংযুক্ত বা জড় করা হইয়াছে মাত্র। যদি তাহাদের পৃথক্‌ করা যায়, তবে তাহাদের পূর্বসংযোগ বিনষ্ট হইবে বটে, কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব বিনষ্ট হইবে না। তাহাদের পরস্পর সংযোগ বা বিয়োগের ফলে তাহাদের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। পক্ষান্তরে, কোন জীবশরীর বিভিন্ন অবয়বের সংযোগ বা যোগফলমাত্র নহে এবং সেগুলিকে পৃথক্‌ করিলে তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায়। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এরূপ বস্তুকে আমরা কিভাবে বুঝিব? পরিমাণ-বিষয়ক বা কার্যকারণ-সম্বন্ধ-বিষয়ক অবধারণে ইহার স্বরূপ বা প্রকৃতি যথাযথভাবে বুঝা যায় না। কোন জীবশরীরের অস্থি-মজ্জা-মাংস ইত্যাদির পরিমাণ জানিলেই তাহার সম্যক্‌ জ্ঞান হয় না, কারণ অস্থি-মাংস ইত্যাদি যোগ করিলেই কোন জীবশরীর উৎপন্ন হয় না। জীবশরীরের বিভিন্ন অবয়বের মধ্যে কিরূপ কার্যকারণ-সম্বন্ধ বিদ্যমান তাহা জানিলেও ইহার সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক জ্ঞান লাভ করা যায় না, কারণ অবয়বগুলির সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে শরীরটিকে অবয়বী বলিয়া বুঝিতে হইবে। অবয়বগুলি শরীরের

ব্যক্তিত্ব-বিষয়ক অবধারণ।

সমষ্টি ও ব্যক্তির প্রভেদ।

CENTRAL LIBRARY

অংশমাত্র (parts), কিন্তু শরীরটি তদতিরিক্ত ও তাহাদের ঐক্যসম্পাদক অবয়বী বা অংশী (whole)। অবয়ব ও অবয়বীর সম্বন্ধ কতকগুলি ইট ও তাহাদের স্তূপের সম্বন্ধের মত নয়। অবয়ব ও অবয়বী পরস্পরসাপেক্ষ এবং পরস্পরের পরিপোষক। অবয়বগুলি পরস্পরের সহযোগিতা করে এবং তদ্দ্বারা অবয়বীর প্রয়োজন সাধন করে। পক্ষান্তরে, অবয়বী অবয়বগুলিকে সাহায্য করে এবং তাহাদের ঐক্য ও সহযোগিতা রক্ষা করে। একটি অন্যটির ইষ্ট সাধন করে। ইহাদের ক্রিয়া জড় দ্রব্যের ক্রিয়ার মত উদ্দেশ্যহীন বা নিষ্প্রয়োজন (mechanical and fortuitous) নয়। পরন্তু, তাহা প্রয়োজন-সাধক (purposive and teleological), অর্থাৎ জীবশরীরের কোন প্রয়োজন বা কল্যাণ (purpose or end) সাধন করে। এজন্য আমরা জৈব দ্রব্য, জীবশরীর, মনুষ্য প্রভৃতিকে অংশসকলের সংঘাত বা সমষ্টিমাত্র (aggregate) না বলিয়া অবয়বী বা ব্যক্তি (individual) বলি এবং তাহাদিগকে ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট বলিয়া অবধারণ করি।

৫। অবধারণ ও অনুমানের সম্বন্ধ
(Relation of Judgment and Inference)

অনুমানে অবধারণের হেতু ব্যক্ত করা হয়।

পূর্বে বলিয়াছি যে, অবধারণ চিন্তার প্রাথমিক ও সরলতম রূপ এবং কোন অবধারণকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত ও প্রতিপাদিত করিলে তাহা অনুমানে রূপান্তরিত হয়। অবধারণের হেতু কি তাহা অনুমানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। কোন সরল অবধারণস্থলে আমরা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ-মূলে একটি উক্তিমাত্র করিয়া থাকি, যেমন কেহ বলিলেন 'গত কল্য বৃষ্টি হইয়াছিল', 'আজ রৌদ্র হইবে না' ইত্যাদি। এখানে এক একটি উক্তি বা বাক্য যেন অন্যনিরপেক্ষ ও অন্যবিষয়ের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া থাকে। ইহাতে আমরা কথিত বিষয়ের সহিত অন্যান্য বিষয়ের সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া তাহাকে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করি না। কিন্তু অনুমানে আমরা ঠিক তাহাই করি, অর্থাৎ একটি বস্তু বা বিষয়ের সহিত অন্য বস্তু বা বিষয়ের যে নিয়ত সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রদর্শন করি। আমরা দেখাইয়া দিই যে, 'এক বস্তু থাকিলেই অন্য বস্তু নিশ্চয় থাকিবে, সেটি না থাকিলে অন্য বস্তুটি থাকিতে পারে না'। গত কল্য বৃষ্টি হইয়াছিল এবিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইলে আমরা বলিতে পারি যে, আজ মাঠঘাট যখন সিক্ত ও কর্দমাক্ত দেখা যাইতেছে তখন নিশ্চয় কাল বৃষ্টি হইয়াছিল, কারণ বৃষ্টি হইলেই মাঠঘাট এরূপ হয়, তাহা না হইলে হয় না। সেইরূপ কেহ যদি 'আজ রৌদ্র হইবে না', একথার প্রতিবাদ করে তবে আমরা বলিতে পারি যে, আকাশ এরূপ

মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে সূর্যকিরণ আসিবে না এবং রৌদ্রও হইবে না। এইভাবে কোন অবধারণের হেতুগুলি ব্যক্ত করিলে উহা অনুমানে পরিণত হয়।

সাধারণতঃ আমরা অনেক বিষয়ে অনেক কথা বলি, কিন্তু তাহার হেতু সম্বন্ধে ভাবি না। বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক ও অল্পজ্ঞ ব্যক্তিরা অনেক উক্তি করে, কিন্তু সেগুলির হেতু বা কারণ সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। কিন্তু পরে তাহারা দেখিতে পায় যে, তাহাদের কোন কোন উক্তি ও ধারণা সত্য, আবার কোন কোনটি মিথ্যা, কারণ কোন কোনটিতে কার্য সফল হয়, আবার কোন কোনটিতে কার্য বিফল হয়। এজন্য কোন বিষয়ে আমাদের অবধারণের মূলে কোন সদ্ধেতু আছে কি না তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি। সুতরাং অবধারণ একেবারে বিচ্ছিন্ন জ্ঞান নহে, এক অবধারণের সহিত অন্য অবধারণের সম্পর্ক আছে এবং সব অবধারণের মূলেই সাধক বা বাধক হেতু আছে। যখন আমরা কোন অবধারণের প্রামাণ্যাপ্রামাণ্যের বিচার করি তখন তাহার মূলগত ও অপ্রকাশিত হেতুগুলি প্রকাশিত হয়। এইভাবে যখন অবধারণটি তাহার সমর্থক হেতুর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং সমর্থক হেতুটি সদ্ধেতু বলিয়া জ্ঞাত হয়, তখন আমরা তাহাকে যথার্থ অবধারণ বলিয়া গণ্য করি। পক্ষান্তরে, কোন অবধারণের হেতুগুলি দুষ্ট বা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইলে আমরা তাহাকে অযথার্থ বা অপ্রামাণিক বিবেচনা করি। অতএব আমাদের জ্ঞানবিচারের স্বাভাবিক গতি অনুসারেই আমরা এক অবধারণকে তাহার মূলীভূত হেতুর সহিত যুক্ত করি, এবং তাহা করিলেই অবধারণ অনুমানের রূপ পরিগ্রহ করে।

অবধারণ হেতুযুক্ত হইলে অনুমানে পরিণত হয়।

৬। অনুমানের স্বরূপ
(The Nature of Inference)

অবধারণ ও অনুমানের সম্বন্ধ আলোচনাবসরে আমরা দেখিয়াছি যে, তাহাদের মধ্যে কোন অলঙ্ঘনীয় সীমারেখা অঙ্কিত করা যায় না। তথাপি অনুমানের স্বরূপ বা বিশেষ লক্ষণ বুঝিলে তাহাদের পার্থক্য বুঝা যাইবে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, যে বিষয়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষ কিংবা স্মৃতিজন্য নয়, কিন্তু কোন এক বা একাধিক বিষয়ান্তরের জ্ঞান হইতে অনিবার্যভাবে প্রসক্ত হয়, তাহার নাম অনুমান। দূরস্থ পর্বতে ধূম দেখিয়া অগ্নির যে জ্ঞান হয় তাহা অনুমান। এখানে পর্বতস্থ অগ্নি আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর নহে। কিন্তু আমরা পর্বত হইতে ধূম নির্গত হইতেছে দেখিতেছি এবং পূর্ব হইতেই জানি যে, অগ্নির সহিত ধূমের নিয়তসম্বন্ধ আছে। ইহা হইতেই আমরা অগ্নি না দেখিলেও জানিতে পারি যে, পর্বতে অগ্নি আছে।

অনুমান একপ্রকার পরোক্ষ জ্ঞান।

এর্‌পভাবে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের যে জ্ঞান হয় তাহাকে অন্‌মান বলে। অন্‌মান প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান নয়, কারণ দৃষ্টান্তস্থলে অগ্নির প্রত্যক্ষ হয় না। কোন বিষয় প্রত্যক্ষগোচর হইলে, সাধারণতঃ তাহা অন্‌মানের বিষয় হয় না। অন্‌মান স্মৃতিলব্ধ জ্ঞানও নহে। পূর্বে কোন বস্তু প্রত্যক্ষ না করিলে তাহার স্মরণ হয় না। পর্বতস্থ অগ্নি আমরা পূর্বে প্রত্যক্ষ করি নাই। অতএব এখানে অগ্নিজ্ঞানকে স্মৃতিও বলা যায় না।

অনুমানের বিশেষ লক্ষণ

অন্‌মানের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আছে। কোন বিষয়ের অন্‌মান করিতে হইলে, প্রথমে অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান আবশ্যক হয়। যেমন পর্বতে অগ্নির অন্‌মান করিবার পূর্বে আমাদের ধূম প্রত্যক্ষ করিতে হয়। তারপর, যে বিষয়টির অন্‌মান করা হয়, তাহার সহিত পূর্বজ্ঞাত বিষয়টির নিয়ত-সম্বন্ধ-জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ধূমদ্বারা অগ্নির অন্‌মানস্থলে অগ্নির সহিত ধূমের নিয়ত-সম্বন্ধ-জ্ঞান আবশ্যক, অর্থাৎ ধূম যে অগ্নিব্যাপ্য, ধূম থাকিলেই যে অগ্নি থাকে, তাহা পূর্বে জানা আবশ্যক। অতএব অন্‌মান ব্যাপ্তিজ্ঞানসাপেক্ষ। তারপর, আমরা সিদ্ধান্ত করি যে, পর্বতে অগ্নি আছে, যদিচ সেই অগ্নি আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নয়।

অনুমানের তিনটি অবয়ব।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অন্‌মানের তিনটি অঙ্গ বা অবয়ব আছে। (১) কোন পক্ষে লিঙ্গ বা হেতুর প্রত্যক্ষ হইল অন্‌মানের প্রথম অঙ্গ, যেমন পর্বতে অগ্নির অন্‌মানস্থলে প্রথমে পর্বতে ধূমের দর্শন হয়। (২) সাধ্য অর্থাৎ অন্‌মেয় বিষয়ের সহিত হেতুর নিয়ত-সম্বন্ধ-জ্ঞান হইল অন্‌মানের দ্বিতীয় অঙ্গ; যেমন দৃষ্টান্তস্থলে অগ্নির সহিত ধূমের নিয়ত-সম্বন্ধ-জ্ঞান। এই দুইপ্রকার জ্ঞান যে বাক্যদ্বয়দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাদিগকে সাধক-বাক্য (premises) বলে। (৩) পক্ষে (পর্বতে) সাধ্যের (অগ্নির) নির্দেশ হইল অন্‌মানের তৃতীয় ও শেষ অঙ্গ, যেমন 'পর্বতে অগ্নি আছে' এর্‌প নির্দেশ। ইহাকে সিদ্ধান্ত-বাক্য (conclusion) বলে।

অন্‌মানে আমরা প্রথমে সাধক-বাক্য বলিয়া সিদ্ধান্ত-বাক্যে উপনীত হইতে পারি, অথবা প্রথমে সিদ্ধান্ত-বাক্য বলিয়া তাহার সাধকর্‌পে সাধক-বাক্য দুইটির উল্লেখ করিতে পারি। প্রথমস্থলে সাধক-বাক্য দুইটি প্রয়োগ করিয়া, 'অতএব', 'এজন্য' (therefore) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়, যেমন কেহ বলিলেন—'যেখানে ধূম আছে সেখানেই বহ্নি আছে, পর্বতে ধূম আছে, অতএব পর্বতে বহ্নি আছে'। দ্বিতীয়স্থলে সিদ্ধান্ত-বাক্য বলিয়া, 'যেহেতু', 'কারণ' (because) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়, যেমন কেহ বলিলেন—'পর্বতে বহ্নি আছে, যেহেতু পর্বতে ধূম আছে', এবং 'যেখানে ধূম থাকে সেখানেই বহ্নি থাকে'।

অনুমানে জ্ঞাত বিষয় হইতে কি প্রকারে অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান হয়?

অনুমানে আমরা কোন অধিগত বিষয় হইতে কোন অনধিগত বিষয় জানি, অর্থাৎ কোন জ্ঞাত বস্তু বা বিষয়ের সাহায্যে কোন অজ্ঞাত বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করি। এই অজ্ঞাত বস্তুটি জ্ঞাত বস্তু হইতে ভিন্ন হইবে, নতুবা উহার জ্ঞানকে অনুমান বলা যাইবে না। যদি উহা জ্ঞাত বস্তুই হয় অথবা তাহার মতই হয়, তবে আর উহার অনুমানের প্রয়োজন কি? আবার যদি উহা একেবারে অজ্ঞাত হয়, তবে আমরা উহাকে জানিবার চেষ্টাও করিতে পারি না। অনুমান (তথা সকল জ্ঞান) সম্বন্ধে এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য বলা যায় যে, অনুমিত বস্তুটি সর্বতোভাবে জ্ঞাত নহে, আবার সর্বতোভাবে অজ্ঞাতও নহে। উহা সাধারণভাবে জ্ঞাত এবং বিশেষভাবে অজ্ঞাত থাকে। অনুমানদ্বারা আমরা উহাকে বিশেষভাবে জানি। একটি দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা বুঝান যায়। কেহ বলিলেন, 'যেখানে ধূম আছে সেখানেই অগ্নি আছে, পর্বতে ধূম আছে, অতএব পর্বতে অগ্নি আছে'। এখানে পর্বত ও অগ্নি ভিন্ন বস্তু হইলেও, তাহাদের মধ্যে ধূম বিষয়ে ঐক্য বা মিল আছে। পর্বতে ধূম আছে এবং ধূমে অগ্নি আছে, অর্থাৎ সাধারণভাবে ধূমের সঙ্গে অগ্নি থাকে। অতএব পর্বতে ধূম জ্ঞাত হইলে সাধারণভাবে জ্ঞাত অগ্নি বিশেষভাবে পর্বতস্থ বলিয়া অনুমিত হয়। এখানে পর্বত, ধূম ও অগ্নি ভিন্ন বস্তু হইলেও তাহাদের মধ্যে একটি মিলনসূত্র আছে, যাহাদ্বারা তাহারা সম্বদ্ধ হইয়াছে। পর্বত ও অগ্নির মধ্যে 'ধূম' এই মিলনসূত্র, ইহাকে মধ্যস্থ পদ (middle term) বলে। যে স্থলে এরূপ মিলনসূত্র নাই, সে স্থলে অনুমান হয় না। যেমন 'কাল বৃষ্টি হইয়াছিল' এবং 'গোলকোণ্ডায় হীরক পাওয়া যায়', এই দুইটি বাক্য হইতে কিছু অনুমান করা যায় না, কারণ ইহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ বা মিলনসূত্র পাওয়া যায় না।

৭। ব্যাপ্তিপ্রয়োগ ও ব্যাপ্তিগ্রহ অনুমান

(Deduction and Induction)

ব্যাপ্তিপ্রয়োগে কোন সাধারণ নিয়ম বিশেষ-স্থলে প্রয়োগ করা হয়।

অনুমানে আমরা বিভিন্ন ও আপাতবিচ্ছিন্ন বস্তু ও ঘটনাকে এক মিলন-সূত্রে গ্রথিত করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি এবং তাহা করিতে পারিলে তাহারা আর বিচ্ছিন্ন না থাকিয়া এক সমষ্টি-জ্ঞানের (system of knowledge) সুসংবদ্ধ অংশ বা অঙ্গে পরিণত হয়। বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনার মিলনসূত্র হইল তাহাদের নিয়ামক কোন ব্যাপ্তি-

CENTRAL LIBRARY

সম্বন্ধ বা সাধারণ নিয়ম (general principle or law), যাহা জানিতে পারিলে তাহাদের ব্যাখ্যা হয় এবং তাহাদিগকে বুঝা যায়। অনুমানের এই বিশেষ প্রয়োজন দুইভাবে বা দুই দিক্ হইতে সিদ্ধ হইতে পারে। যদি কোন ব্যাপ্তি বা সাধারণ নিয়ম আমাদের পূর্বজ্ঞাত হয় অথবা আমরা তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করি, তবে সেই নিয়ম অনুসারে কি কি ঘটনা ঘটিতে পারে বা কোন্ কোন্ বস্তুর উদ্ভব হইতে পারে তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। যেমন আমরা আকাশে বিদ্যুৎ দেখিলে মেঘগর্জন অনুমান করি, কারণ আমরা জানি যে, দুইটির মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ আছে। জ্যোতির্বিদ্‌গণ গ্রহসমূহের স্থিতি ও গতির নিয়মানুসারে সূর্য বা চন্দ্র-গ্রহণের নির্দিষ্ট দিন ও সময় অনুমান করেন। এই প্রকারের অনুমানকে ব্যাপ্তিপ্রয়োগানুমান (Deduction) বলে। ইহাতে কোন এক বস্তু বা ঘটনাকে কোন সাধারণ নিয়ম বা ব্যাপ্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন রাম ও শ্যাম একদিন মারা যাইবে বলিয়া আমরা অনুমান করি, কারণ তাহারা 'মানুষ মরণশীল' এই নিয়মের অধীন। কোন এক বিশেষ স্থলে কোন ব্যাপ্তি বা সাধারণ নিয়ম প্রয়োগ করিলে কি সিদ্ধান্ত হইবে তাহাই ব্যাপ্তিপ্রয়োগানুমানের বিবেচ্য।

পক্ষান্তরে, ব্যাপ্তিগ্রহানুমানের (Induction) আকার-প্রকার অন্যরূপ দেখা যায়। এখানে আমরা প্রথমে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনা দেখিয়া তাহাদের কোন সাধারণ নিয়ম (general law or principle) আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করি এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগকে সুসম্বদ্ধ করিতে পারি। আমরা প্রায় দেখি যে, দুইটি ঘটনা এক সঙ্গে ঘটে। যেমন আমরা দেখি যে, রান্নাঘর, কলকারখানা, জাহাজ ইত্যাদিতে ধূম ও অগ্নি সহচারিরূপে থাকে। ইহা দেখিয়া আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে—কেন এমন হয়? অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, আর্দ্র ইন্ধনে অগ্নিসংযোগ হইলে তাহার জলীয় অংশ ধূমাকারে উঠিতে থাকে। ইহা জানিলে আমরা বুঝি যে, ধূম ও অগ্নির সাহচর্য আকস্মিক নয়, পরন্তু কার্যকারণ-নিয়মের অধীন। এইভাবে বিশেষ বিশেষ ঘটনা দেখিয়া তাহাদের সাধারণ নিয়ম বা কার্যকারণ-সম্বন্ধ আবিষ্করণ ব্যাপ্তিগ্রহানুমানের লক্ষণ।

ব্যাপ্তিগ্রহে বিশেষ বিশেষ ঘটনা হইতে সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা হয়।

ব্যাপ্তিগ্রহ ও ব্যাপ্তিপ্রয়োগকে অনুমানের দুই রূপ বা আকার বলা যায়। কিন্তু উহাদের উৎপত্তি ও ধারা ভিন্ন রূপ। একটিতে কোন ব্যাপ্তি বা সাধারণ নিয়ম কোন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, আর অন্যটিতে বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ঘটনা হইতে কোন ব্যাপ্তিসম্বন্ধ বা সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা হয়। উহাদের মধ্যে এরূপ ভেদ দৃষ্টে কখন কখন

ইহারা একেবারে ভিন্ন দুই প্রকার অনুমান নহে।

উহাদিগকে একেবারে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র প্রকারের অনুমান বলিয়া বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। একটু ভাবিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, অনুমানের মূল ধারা বা বিশেষ লক্ষণ উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান। অনুমানের বিশেষ লক্ষণ বা সারকথা হইতেছে যে, ইহাতে বিচ্ছিন্ন বস্তু বা ঘটনাগুলির সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া তাহাদিগকে একটি সুসম্বদ্ধ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অনুমানের এই মুখ্য প্রয়োজন ব্যাপ্তিপ্রয়োগ ও ব্যাপ্তিগ্রহ উভয় অনুমানেই সিদ্ধ হয়। ব্যাপ্তিপ্রয়োগানুমানে আমাদের কোন ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ বা সাধারণ নিয়ম জানা থাকে এবং আমরা তাহার সহায়তায় বিশেষ স্থলে এবং বিশেষ বস্তু বিষয়ে কি ঘটনা বা অবস্থার উদ্ভব হয় তাহা জানিতে পারি। এরূপ ব্যাপ্তি-নিয়মের অধীন ও অন্তর্ভুক্ত ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয়েও আমরা জ্ঞানলাভ করিতে পারি এবং তাহাতে আমাদের জ্ঞানের শৃঙ্খলা ও সংহতি (order and system) বৃদ্ধি হয়। ব্যাপ্তিগ্রহানুমানেও এই এক উদ্দেশ্যই সাধিত হয়, যদিচ এখানে আমাদের চিন্তার গতি ভিন্নরূপ। এখানে প্রথমে কতকগুলি বস্তু বা ঘটনা প্রায় একত্র থাকে বা সহগমন করে, ইহা লক্ষ্য করিয়া আমরা তাহার কোন কারণ বা সাধারণ নিয়ম অনুসন্ধান করি এবং তাহা আবিষ্কার করিয়া তাহাদের সম্বন্ধ বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে পারি। অর্থাৎ এসব বস্তু বা ঘটনা যে এক নিয়মের অধীন এবং তদ্দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সংহত তাহা বুঝিতে পারি।

ইহারা অনুমানের পরস্পর পরিপূরক দুইটি অঙ্গ।

কোন ব্যাপ্তিনিয়মদ্বারা বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করাই অনুমানের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য ব্যাপ্তিপ্রয়োগ ও ব্যাপ্তিগ্রহ উভয় অনুমানেই সিদ্ধ হয় বটে। কিন্তু উহাদের মিলনেই অনুমান পূর্ণাঙ্গ প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাপ্তিপ্রয়োগ অনুমানে (deduction) আমরা ব্যাপ্তি-নিয়মটির সত্যতা স্বীকার করিয়া লইয়া তাহা স্থলবিশেষে প্রয়োগ করি। যেমন 'সব মানুষ মরণশীল' এই ব্যাপ্তি-নিয়ম স্বীকার করিয়া আমরা তাহার মূলে কোন জীবিত ব্যক্তি যে ভবিষ্যতে মরিবে তাহা অনুমান করি। কিন্তু এই ব্যাপ্তি-নিয়ম স্বীকার করিবার হেতু কি? কিরূপেই বা আমরা তাহা জানিতে পারি? অর্থাৎ কিপ্রকারে ব্যাপ্তিগ্রহ হয়? অতএব ব্যাপ্তিপ্রয়োগ অনুমানে ব্যাপ্তিগ্রহের বিচার অবশ্য কর্তব্য। ব্যাপ্তিগ্রহ অনুমানেই ব্যাপ্তিগ্রহের বিচার করা হয়। এজন্য ব্যাপ্তিপ্রয়োগ অনুমানের (deduction) পরিপূরক হিসাবে ব্যাপ্তিগ্রহ অনুমান (induction) অপেক্ষিত বলিতে হয়।

ব্যাপ্তিগ্রহ অনুমানে আমরা বহু স্থলে দুইটি বস্তুর সাহচর্য দর্শন করিয়া এবং কুত্রাপি তাহাদের সাহচর্যের ব্যতিক্রম না দেখিয়া অনুমান করি যে, তাহাদের মধ্যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে। যেমন বহু স্থলে ধূম ও বহ্নির

সাহচর্য দর্শন করিয়া আমরা অনুমান করি যে 'যেখানে ধূম আছে সেখানেই বহ্নি আছে', অর্থাৎ বহ্নির সহিত ধূমের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে। কিন্তু আমাদের অনুমিত ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ কি না তাহা প্রমাণ করিতে হইলে ঐ ব্যাপ্তি-নিয়মটি অন্যান্য স্থলে প্রয়োগ করিয়া দেখিতে হয়। এরূপ প্রয়োগের ফলে যদি দেখা যায় যে, যেসব নূতন ক্ষেত্রে ধূম প্রত্যক্ষ হয় সেখানে বহ্নিও বিদ্যমান, তবে আমরা নিশ্চিত হইতে পারি যে, উহাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্যাপ্তিপ্রয়োগ অনুমানদ্বারা ব্যাপ্তিগ্রহ অনুমান প্রমাণিত হয়। এই হিসাবে ব্যাপ্তিপ্রয়োগ অনুমানকে ব্যাপ্তিগ্রহ অনুমানের পরিপূরক বলিতে হয়। আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে এবং বৈজ্ঞানিক প্রমাণ-পদ্ধতিতে (scientific method) ব্যাপ্তিগ্রহ ও ব্যাপ্তিপ্রয়োগ উভয় অনুমানেরই একত্র প্রয়োগ দেখা যায়। অতএব ব্যাপ্তিগ্রহ ও ব্যাপ্তিপ্রয়োগকে দুইটি স্বতন্ত্র অনুমান বলা উচিত নয়। ভারতীয় তর্কশাস্ত্রে অনুমানের এরূপ প্রকারভেদ করা হয় নাই, ব্যাপ্তিপ্রয়োগ ও ব্যাপ্তিগ্রহ উভয়কেই এক অনুমানের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

চতুর্দশ অধ্যায়

মূল প্রত্যয় ও তত্ত্ব

(Categories of Knowledge and Reality)

পাশ্চাত্য দর্শনে যাহাকে 'category' বলে, বাংলাভাষায় তাহাকে মূল-প্রত্যয় বা মূল-তত্ত্ব বলা যায়। যাহা যে-কোন বস্তু সম্বন্ধে উক্ত বা বিহিত হয়, তাহার নাম 'category'। কোন বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইলেই আমাদিগকে সেবিষয়ে কিছু না কিছু ভাবিতে হয়। যেমন একটি আলোক সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইলে আমাদিগকে ভাবিতে হয় যে, ইহার অন্য দ্রব্যের উপর ক্রিয়া করিবার শক্তি আছে, অর্থাৎ ইহা দ্রব্যান্তরে কার্য উৎপন্ন করিবার কারণ। আমাদিগকে আরও ভাবিতে হয় যে, ইহা কোন দেশে ও কালে বিদ্যমান এবং অন্যান্য দ্রব্যের সহিত ইহার দৈশিক ও কালিক সম্বন্ধ আছে। অন্য দ্রব্যের উপর ইহার কার্য করিবার শক্তিগুলিকে আমরা ইহার গুণ বলিয়া থাকি। এজন্য ঐ বস্তুকে একটি দ্রব্য এবং শক্তিগুলিকে উহার গুণ বলিয়া ভাবিতে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমাদের চিন্তা বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত যে-কোন বস্তু সম্বন্ধে আমাদিগকে দ্রব্য ও গুণ, কার্য ও কারণ, দেশ ও কাল এই প্রত্যয়গুলি নিয়ত প্রয়োগ করিতে হয় এবং তাহা না করিলে আমরা কোন বস্তু জানিতে বা চিন্তা করিতে পারি না। এগুলি আমাদের বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের অপরিহার্য অঙ্গ। এরূপ সর্বজ্ঞানগত প্রত্যয়-গুলিকে 'categories of knowledge' বলে, তাহাদিগকেই আমরা এখানে মূল-প্রত্যয় বলিয়াছি। অপরপক্ষে আমাদের জ্ঞানগত যে-কোন বস্তুর অস্তিত্ব এসব প্রত্যয়গত ভাবের উপর নির্ভর করে, তদ্ব্যতীত কোন বস্তুই থাকিতে বা হইতে পারে না। আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত যে-কোন বস্তু একটি গুণযুক্ত দ্রব্য হইবেই এবং উহার সহিত অন্যান্য দ্রব্যের দৈশিক, কালিক ও কার্যকারণ-সম্বন্ধ থাকিবেই। নতুবা উহার উৎপত্তি ও স্থিতি হইতে পারে না। এইজন্য দ্রব্য-গুণ, দৈশিক, কালিক ও কার্যকারণ-সম্বন্ধকে 'categories of reality'ও বলা হয়। সুতরাং আমরা তাহাদিগকে মূল-তত্ত্বও বলিতে পারি।

মূল-প্রত্যয় ও মূল-তত্ত্ব শব্দের অর্থ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে: (১) এসব মূল-প্রত্যয়গুলি আমাদের মনে কিভাবে উপজাত হয়, অর্থাৎ কিভাবে ইহাদের উৎপত্তি হয় এবং ইহাদের প্রকৃত অর্থ

CENTRAL LIBRARY

কি? (২) এসব প্রত্যয়গুলির মনোগত সত্তার অতিরিক্ত কোন বাহ্য বা বাস্তবিক সত্তা আছে কি না? যদি থাকে, তবে তাহার স্বরূপ কি এবং তাহার সহিত আমাদের মানসিক প্রত্যয়ের সম্বন্ধই বা কি? এখন এই প্রশ্নগুলির সমাধান করিতে হইবে। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, প্রথম প্রশ্নটি মূল-প্রত্যয়গুলির জ্ঞানবিষয়ক (epistemological) প্রশ্ন এবং দ্বিতীয়টি উহাদের সত্তা বা স্বরূপবিষয়ক (metaphysical) প্রশ্ন।

১। দেশ
(Space)

দেশ কাহাকে বলে? যাহাতে সকল সসীম ও সাবয়ব দ্রব্য পরস্পরের বাহিরে ও পার্শ্বে সহাবস্থান করিতে পারে, তাহার নাম দেশ। ঘট-পটাদি ক্ষুদ্র দ্রব্য হইতে আরম্ভ করিয়া পর্বত-সাগরাদি মহৎ দ্রব্যসকল মধ্যমপরিমাণবিশিষ্ট ও সকায় (extended), উহারা অনেক প্রদেশের সংযোগে গঠিত। এরূপ সকায় দ্রব্যের অস্তিত্ব এবং সহাবস্থিতি এক মহাদেশের মধ্যেই সম্ভব হয়, দেশ না থাকিলে প্রদেশবৎ বা অস্তিকায় দ্রব্য থাকিতে পারে না। এইসব দ্রব্যের গতিবিধিও দেশসাপেক্ষ। ইহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে, মহান্ বায়ু সর্বত্র বিচরণ করে। এইসব দ্রব্যের অবস্থান এবং গমনাগমন যাহাতে সম্ভব হয়, তাহার নাম দেশ। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে ইহাকে দিক্ এবং জৈনদর্শনে আকাশ বলা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, আমরা কিরূপ দেশের প্রত্যয় বা ধারণায় উপনীত হই এবং দেশের স্বরূপ অর্থাৎ বাস্তবিক সত্তাই বা কি?

দ্রব্যসকলের সহাবস্থানের অপেক্ষিত পদার্থের নাম দেশ।

(১) দেশ-প্রত্যয়ের উৎপত্তি

(ক) দেশ-প্রত্যয়ের উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন মত দেখা যায়। এক মতে যদ্দ্বারা কর্ম অর্থাৎ গতিক্রিয়া (movement) সম্ভব হয়, তাহার নাম দেশ। হস্তপদ সঞ্চালন করিলে দেহের পেশীসকলের গতিক্রিয়াবশতঃ আমরা নানাপ্রকার সংবেদন অনুভব করি। আমরা এই সংবেদনগুলিকে অনুষঙ্গ-নিয়ম (law of association) অনুসারে এক প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করতঃ গতিক্রিয়ার সম্ভাবনারূপ একটি সামান্য বা সাধারণ প্রত্যয়ে (general idea) উপনীত হই। গতিক্রিয়ার সম্ভাবনাত্মক সামান্য-প্রত্যয়ই দেশের প্রত্যয়। এই

দেশ প্রত্যয়ের উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন মত।

(১) অনুষঙ্গবাদ।

মতকে অনুষঙ্গবাদ (association theory) বা গতিক্রিয়াবাদ (dynamical theory) বলা যায়। এই মতানুসারে যেস্থানে আমাদের গতিক্রিয়া ব্যাহত বা প্রতিরুদ্ধ হয় না, তাহাকে শূন্য দেশ (empty space) বলে এবং যে-স্থানে তাহা ব্যাহত ও রুদ্ধ হয়, তাহাকে পূরিত বা ভরিত দেশ (filled space) বলে। এইভাবে পেশী-সঞ্চালন-জন্য সংবেদনসমূহের স্মৃতিমূলে অনুষঙ্গ হইলে এবং বিশেষ-নিষ্কর্ষণ (abstraction) দ্বারা সমানধর্মের বোধ জন্মিলে দেশ-প্রত্যয় ক্রমে ক্রমে উপজাত হয়।

(২) প্রত্যক্ষবাদ।

(খ) প্রত্যক্ষবাদ (intuitional theory) অনুসারে দেশ একটি সৎ পদার্থ এবং ইহা আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষযোগ্য। ইহার প্রত্যয় পেশীসঞ্চালন-সংবেদন হইতে স্মৃতিসহায়ে ক্রমশঃ উপজাত হয় না। বাহ্য দ্রব্যসকলের বহুপ্রদেশবত্ত্ব (extension) রূপ-রস-গন্ধের ন্যায় একটি গুণমাত্র, এবং উহাদের মতই সাক্ষাৎ-প্রতীত বা প্রত্যক্ষ হয়। বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সেইরূপ তাহার দৈশিক অবস্থিতি ও অন্যান্য গুণও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এইভাবে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ-দ্বারা বাহ্য দ্রব্যের দৈশিক বিস্তারের (extension) যে অনুভূতি হয়, তাহা হইতে দেশ-প্রত্যয় উপজাত হয়। তারপর মনে মনে বাহ্য দ্রব্যগুলিকে অপসারিত করিয়া দিলে আমরা এক মহাশূন্য বা শূন্য দেশের প্রতীতিতে উপনীত হই। কেহ কেহ মনে করেন যে, কোন দ্রব্যের দৈশিক বিস্তার (extension in space) আমাদের সংবেদনের বিস্তৃতি বা আয়তন দ্বারা প্রকাশিত হয়। সংবেদনের যেমন তীব্রতা (intensity) গুণ আছে, সেইরূপ উহার বিশালতা বা ব্যাপকতা (extensity) গুণও আছে। এই ব্যাপকতা গুণেই দ্রব্যের দৈশিক বিস্তার অর্থাৎ বহুপ্রদেশবত্ত্ব প্রকাশিত হয়।

কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে, সংবেদনের ব্যাপকতা বা বিশালতা এবং দ্রব্যের প্রদেশবত্ত্ব এক বস্তু নয়। সংবেদনের ব্যাপকতার মূলে দ্রব্যের প্রদেশবত্ত্ব ও অন্যান্য দৈশিক সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে পেশীসঞ্চালন আবশ্যক। গতিক্রিয়া ব্যতীত দৈশিক সম্বন্ধের প্রতীতি হয় না, এবং দেশ-প্রত্যয়ও উপজাত হয় না। কারণ যদ্দ্বারা গতিক্রিয়া সম্ভব হয়, তাহাকেই দেশ বলে। আরও এক কথা, সংবেদন বাহ্য দ্রব্য নয়, কোন সংবেদনকে কোন প্রদেশবৎ বাহ্য দ্রব্যের সমান বলা যায় না, অর্থাৎ তাহাদের একীভূত করা যায় না।

(৩) প্রত্যক্ষ-পূর্বত্ববাদ।

(গ) প্রত্যক্ষ-পূর্ব জ্ঞানপদ্ধতি (*a priori* theory) অনুসারে দেশ কোনরূপ বাহ্য বা ভৌতিক পদার্থ নহে; ইহা আমাদের মন বা বুদ্ধিগত জ্ঞানাকারমাত্র (form of perception)। কোন বস্তু বা দ্রব্যকে কল্পনা করিতে হইলে, অথবা মানসচক্ষে অবলোকন করিতে হইলে, ইহাকে কোন দেশে অবস্থিত বলিয়াই আমাদিগকে ভাবিতে হয়, নতুবা আমরা তাহা ভাবিতে বা কল্পনা করিতে

পারি না। বাহ্য দ্রব্যগুলি আমাদের এবং পরস্পরের বাহিরে অবস্থিত এরূপ ভাবিতে গেলেই, তাহাদিগকে কোন দেশে অবস্থিত বলিয়াই ভাবিতে হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বাহির্দেশ হইতে উত্তেজিত হইলে যেসব সংবেদন উৎপন্ন হয়, সেগুলি বাহ্য দ্রব্য নয়, উহারা আমাদের মন বা চিত্তের বৃত্তিমাত্র। কিন্তু এসব সংবেদন আমাদের স্বকৃত বা ইচ্ছাধীন নয়। আমরা ইচ্ছা করিয়া এগুলি পাই না, অথবা অনিচ্ছা করিলে সেগুলি পরিহার করিতে পারি না। অতএব তাহাদের কারণরূপে আমাদিগকে কতকগুলি বাহ্য দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এ দ্রব্যগুলি আমাদের এবং পরস্পরের বাহিরে অবস্থিত বলিয়া আমরা ভাবি। কিন্তু এভাবে ভাবিতে গেলেই আমাদের মনে দেশ-প্রত্যয় উপজাত হয় এবং তাহার সাহায্যেই আমরা দ্রব্যগুলি আমাদের ও পরস্পরের বাহিরে অবস্থিত বলিয়া ভাবিতে পারি। অতএব বলিতে হয়, দেশ মনোজাত জ্ঞানাকার এবং বাহ্য দ্রব্য জানিবার বা বুঝিবার জন্য মন হইতে উত্থিত ও মন কর্তৃক প্রযুক্ত হয়। মন যে দেশ ও দৈশিক প্রত্যয় রচনা করিতে পারে, তাহা অঙ্কশাস্ত্রে, বিশেষতঃ জ্যামিতিতে প্রচলিত দেশ ও দেশবিষয়ক প্রত্যয়গুলি দৃষ্টে বুঝা যায়। এসব প্রত্যয় প্রত্যক্ষলব্ধ নয়, কারণ অঙ্কশাস্ত্রানুমোদিত দেশ ও জ্যামিতিক বিন্দু, সরলরেখা প্রভৃতির বাহ্য জগতে কোন অস্তিত্বই নাই, সুতরাং উহাদের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, ইহাদিগকে আমাদের মনোগত ও বুদ্ধিপ্রসূত প্রত্যয় বলিতে হয়।

(২) দেশের বাস্তবিক সত্তা

দেশের স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত।

এখন দেশের স্বরূপ অর্থাৎ বাস্তবিক সত্তা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। এবিষয়েও বিভিন্ন মত আছে। পূর্বে দেশ-প্রত্যয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, দেশের বাস্তবিক সত্তা সম্বন্ধে তিনটি মত বা সিদ্ধান্ত হইতে পারে।

(১) দেশ অনন্ত নিত্য দ্রব্য।

(ক) প্রথম মতানুসারে দেশ অনন্ত, সর্বব্যাপী নিত্য দ্রব্য, যাহার মধ্যে অন্য সব দ্রব্য বিদ্যমান আছে। ইহা আমাদের মনোগত বা চিন্তাপ্রসূত প্রত্যয়মাত্র নয়। পরন্তু ইহা আমাদের মন ও চিন্তার বহিস্থ ও স্বতন্ত্র দ্রব্য। আমাদের মনোগত দেশ-প্রত্যয়ের অনুরূপ এক বাহ্য ও মনোনিরপেক্ষ বাস্তবিক দেশ-দ্রব্য আছে এবং সকল দ্রব্য ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহার অন্তঃস্থ বা অন্তর্গত। কোন বাহ্য দ্রব্য না থাকিলেও দেশ থাকিবে। ইহা এক

সর্বগত ও সর্বনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র দ্রব্য। ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণের ন্যায় পাশ্চাত্ত্য বস্তুতন্ত্রবাদিগণ (realists) এই মত পোষণ করেন। তাঁহারা বস্তুর মুখ্য ও গৌণ গুণের (primary and secondary qualities) ভেদ প্রদর্শন করতঃ এই মত প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস করেন। বস্তুর প্রদেশবত্ত্ব, আকার, গতিক্রিয়া (motion) প্রভৃতি উহার মুখ্য গুণ এবং এগুলি বস্তুনিষ্ঠ অর্থাৎ বাহ্য বস্তুতেই থাকে। রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি উহার গৌণ গুণ এবং এগুলি বস্তুনিষ্ঠ নয়, পরন্তু আমাদের মনোনিষ্ঠ অর্থাৎ মনের বিকারমাত্র। অতএব ইহা স্বীকার্য যে, দেশের বাহ্য সত্তা আছে এবং ইহা সকল দ্রব্যের আধার অর্থাৎ ইহার মধ্যেই সকল দ্রব্য থাকে। গ্যালিলিও ও নিয়ুটন পাশ্চাত্ত্য দেশে এই মত প্রবর্তন করেন।

(২) দেশ জ্ঞানাকার মাত্র।

(খ) দ্বিতীয় মত অনুসারে দেশের কোন বস্তুগত বাহ্য সত্তা নাই, ইহা আমাদের মনোগত জ্ঞানাকারমাত্র। কোন বস্তু সম্বন্ধে ভাবিতে হইলেই আমাদিগকে বাধ্য হইয়া উহা কোন দেশে অবস্থিত এরূপ ভাবিতে হয়, কারণ দেশ না থাকিলে কোন দ্রব্য আমাদের এবং অন্য দ্রব্যের বাহিরে থাকিতে পারে না। অতএব দেশ, রূপ প্রভৃতির মত একটি মানসিক প্রত্যয়মাত্র (subjective), উহার কোন মনোনিরপেক্ষ বস্তুগত (objective) সত্তা নাই। কাণ্ট এই মতের প্রধান সমর্থক। বিজ্ঞানবাদে (idealism) এবং অবভাসবাদে (phenomenalism) দেশের স্বরূপসত্তা সম্বন্ধে এরূপ মত গৃহীত হইয়াছে। কোন কোন বিজ্ঞানবাদী ও অবভাসবাদী বলেন যে, দেশ একেবারে মনঃকল্পিত মিথ্যা প্রত্যয়, যদিও ইহা আমাদের জ্ঞানে অপরিহার্য।

কিন্তু এমত গ্রহণীয় নয়। দেশ মানসিক ও জ্ঞানগত প্রত্যয় হইলেও, বাহ্য বস্তু সকলের কোন গুণ-ধর্ম ও সম্বন্ধের সহিত ইহার একটা মিল বা সামঞ্জস্য আছে, যদিচ সে মিল কোনরূপ সাদৃশ্য নয়। যেমন কোন পুস্তকে লিখিত শব্দগুলির ক্রমসন্নিবেশের সহিত লেখকের প্রত্যয়সমূহের ক্রমবিকাশের একটা মিল আছে, যদিও উহা কোনরূপ সাদৃশ্য বা একরূপত্ব নয়।

(৩) দেশ সামান্য-প্রত্যয় মাত্র।

(গ) তৃতীয় মত অনুসারে দেশ কোন বাহ্য দ্রব্যও নয় আর জ্ঞানাকারও নয়। ইহা বিশেষ বিশেষ দৈশিক সম্বন্ধ-প্রত্যক্ষ হইতে লব্ধ একটি সামান্য-প্রত্যয়মাত্র। এই মতটি দেশ-প্রত্যয়ের উৎপত্তি-বিষয়ে প্রথম মতেরই পরিণতি। জন্ লক্ এই মতের বিশদ ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে দ্রব্যসকলের দূরত্ব অথবা তাহাদের বিস্তারমাত্র ভাবনাদ্বারা আমরা দেশের সামান্য-প্রত্যয়ে উপনীত হই। অতএব দেশকে একটি সামান্য-প্রত্যয়ই (general idea) বলিতে হইবে।

২। কাল
(Time)

(১) কাল-প্রত্যয়ের উৎপত্তি

যেমন দেশ-প্রত্যয় সম্বন্ধে সেইরূপ কালের প্রত্যয় সম্বন্ধেও তিনটি মত প্রচলিত আছে।

কালের প্রত্যয় সম্বন্ধে বিভিন্ন মত।

(ক) প্রথমতঃ কালের প্রত্যয় সম্বন্ধে কোন কোন প্রত্যক্ষবাদী (empiricists) বলেন যে, আমরা অহরহ আমাদের এবং বহির্জগতের মধ্যে যেসব পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করি, তাহাই কালের প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষদ্বারা আমরা কাল অবগত হই।

(খ) দ্বিতীয়তঃ কোন কোন প্রত্যক্ষবাদী বলেন যে, কালের প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু পূর্ব ও পর, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘটনাসমূহের এবং তাহাদের ক্রম বা পরম্পরার প্রত্যক্ষ হইতে তাহাদের হেতুরূপে আমরা কালের অনুমান করি। ঘটনাসমূহের ক্রম বা পূর্বাপর সম্বন্ধ কালের অস্তিত্ব সাপেক্ষ; কাল না থাকিলে এসব সম্বন্ধ হইতে পারে না।

কিন্তু প্রত্যক্ষবাদীদের মত সম্বন্ধে আপত্তি হইতেছে যে, তাঁহারা কাল-প্রত্যয়ের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাহা পূর্বেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কারণ ঘটনার ক্রমোৎপত্তি বা পরিবর্তন জানিতে হইলে কালের উপলব্ধি আবশ্যক; কালের জ্ঞান থাকিলে, তবে পূর্বাপর সম্বন্ধ বা এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরের উৎপত্তি অর্থাৎ পরিবর্তন বুঝা যায়।

(গ) এজন্য কাল সম্বন্ধে তৃতীয় মতের উৎপত্তি হইয়াছে। এ মত অনুসারে কাল প্রত্যক্ষ-পূর্ব (*a priori*) জ্ঞানাকারমাত্র (form of perception)। ইহা আমাদের মনোগত ও চিন্তাপ্রসূত প্রত্যয়। জ্ঞানের বিষয়গুলি জানিতে হইলে, উহাদিগকে একটির পর আর একটি করিয়া জানিতে হয়। এইভাবে জানিবার জন্য আমাদের মনে বা চিন্তাবৃত্তিতে কাল-প্রত্যয়ের উদয় হয় এবং তদ্দ্বারা আমরা বস্তু বা ঘটনাসমূহের ক্রম বা পরম্পরা-সম্বন্ধ বুঝিতে পারি। অতএব বলিতে হয়, দেশের ন্যায় কালও আমাদের জ্ঞানগত একটি প্রত্যয়মাত্র। ইহার কোন জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য সত্তা নাই। অবশ্য বাহ্য বস্তুসকলের কোন গুণধর্মের সহিত ইহার একরূপ মিল বা ঐক্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা কোনরূপ সাদৃশ্য বা একরূপত্ব নয়।

(২) কালের বাস্তবিক সত্তা

কালের স্বরূপ সম্বন্ধেও তিনটি মত আছে।

কালের স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত।

(ক) প্রথম মত অনুসারে কাল এক, সর্বগত ও অনন্ত বস্তু। কালের মধ্যেই সকল পরিবর্তন বা ঘটনা ঘটে। দেশ যেমন সকল বস্তুর সহাবস্থানের হেতু, কিন্তু সকল বস্তু-নিরপেক্ষ, সেইরূপ কাল সকল পরিবর্তনের ও ঘটনার ক্রম বা পরম্পরার (succession) হেতু, কিন্তু ইহা বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন বা ঘটনা-নিরপেক্ষ। কাল এক নিরবচ্ছিন্ন গতি বা প্রবাহমাত্র, বিশেষ বিশেষ ঘটনা না ঘটিলেও কালের গতি অব্যাহত থাকিবে। নিয়ুটনের মতে পরম ও যথার্থ কাল (absolute and true time) স্বভাবতঃ প্রবহমান এবং ইহার গতি বাহ্যবস্তু-নিরপেক্ষ। উপাধিভেদে আমরা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, দিবা ও রাত্রি প্রভৃতি কালের ব্যাবহারিক ভেদ বা সময়ের সৃষ্টি করি। দেশের আয়তন (dimension) তিনটি—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা। কিন্তু কাল একায়তন (one-dimensional), ইহার গতি একমুখী অর্থাৎ এক দিকে হয় এবং তাহার পুনরাবর্তন হয় না (irreversible)। দেশমধ্যস্থ একটি দ্রব্য হইতে অন্য দ্রব্যে যাওয়া যায় এবং অন্যটি হইতে প্রথমটিতে ফিরিয়া আসা যায়। কালে কেবল পূর্ব হইতে পরে যাওয়া যায়, কিন্তু পর-কাল হইতে পূর্ব-কালে ফিরিয়া আসা যায় না। এজন্য গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লাইটাস্ বলিয়াছেন, 'একই নদীতে দুইবার নামা যায় না, কারণ প্রতি মুহূর্তে ভিন্ন ভিন্ন জলস্রোত বহিয়া যায়।'

(খ) দ্বিতীয় মত অনুসারে কালের কোন বস্তুগত বাহ্য সত্তা নাই, ইহা আমাদের মনোগত জ্ঞানাকারমাত্র। কাণ্ট এই মতের সমর্থক।

(গ) তৃতীয় মতানুসারে কাল কোন বাস্তবিক সত্তাও নয়, আর জ্ঞানাকারমাত্রও নয়। ইহা বিশেষ বিশেষ কালিক সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হইতে উৎপন্ন একটি সামান্য-প্রত্যয়মাত্র (general idea or concept)। জন্ লক্ এই মতের ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিয়াছেন।

(৩) দেশ ও কালের আপেক্ষিকত্ববাদ
(Relativity of Space and Time)

দেশ-কাল সম্বন্ধে আধুনিক মত।

আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ অংকশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যাসম্বন্ধীয় গবেষণার ফলে দেশ ও কাল সম্বন্ধে এক নূতন প্রত্যয়ের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাতে প্রাচীন কালের প্রত্যয়গুলির আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে এবং ইহার ফল

CENTRAL LIBRARY

সুদূরপ্রসারী হইতে পারে। এখন সংক্ষেপে এই নূতন মতের আলোচনা করা যাইতেছে। এবিষয়ে দুইটি প্রধান তথ্য জ্ঞাতব্য।

দেশ ও কাল ভিন্ন বস্তু নয়।

(১) প্রথম তথ্য হইতেছে যে, দেশ ও কাল দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ বা ভিন্ন তত্ত্ব নয়। ইহারা একই মূল তত্ত্বের দুইটি ভিন্ন দিক্ বা রূপমাত্র। গতিক্রিয়া বা কর্ম (motion) সেই মূল তত্ত্ব। পূর্বকালে দেশ ও কালকে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তুরূপে গণ্য করা হইত। এখন আর তাহাদিগকে একেবারে ভিন্ন বস্তু বলা হয় না, পরন্তু এক বস্তুরই দুই দিক্ হিসাবে তাহাদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। তারপর তাহাদের নাম উল্লেখ করিবার সময়, 'দেশ এবং কাল' এরূপ শব্দ ব্যবহার না করিয়া 'দেশ-কাল' এরূপ যুক্তশব্দ ব্যবহার অধিকতর সঙ্গত বিবেচনা করা হয়। ইংরেজ দার্শনিক হোয়াইট্‌হেড্ বলেন, 'দেশ ব্যতীত কাল নাই এবং কাল ব্যতীত দেশ নাই। একটি ব্যতিরেকে অন্যটির বাস্তব সত্তা নাই, উহা একরূপ অবাস্তব কল্পনামাত্র (abstraction) হইয়া পড়ে। আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ-গোচর প্রাকৃত জগতে দেশ-কাল বিচ্ছিন্ন নয়, পরন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত।' ভাইকাউন্ট্ হ্যাল্‌ডেনের উক্তি হইতে এবিষয়টি ভাল বুঝা যায়। তিনি বলিয়াছেন, 'দেশ একটি সর্বনিরপেক্ষ আধার (absolute framework) এবং কাল ঐরূপ স্বতন্ত্র আধার—এই ধারণা আমরা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারি না। কারণ বাল্যকাল হইতে আমরা ইহা শিখিয়াছি এবং ইহাদ্বারা আমাদের ব্যাবহারিক জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। কিন্তু ইহাদের বাহ্য আকার পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধরূপ দেখিলে, ইহারা ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, একটি ব্যতীত অন্যটি হয় না। এক বস্তু অন্য বস্তুর পর বা অন্তর হইলে, তাহাদিগকে দেশে অবস্থিত বলা যায়। কিন্তু কালে কোন ক্রম বা পরিবর্তন না হইলে, বস্তুর পরত্ব বা পৃথক্-অবস্থান হয় না। অতএব দেশের অস্তিত্ব কালের ক্রিয়া-সাপেক্ষ। পক্ষান্তরে, দেশে পৃথক্ বা বিচ্ছিন্ন না হইলে কালে বস্তুর বা ঘটনার ক্রম হইতে পারে না। অতএব কালের অস্তিত্ব দেশসাপেক্ষ। এইভাবে বুঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে দেশ ও কাল একই তত্ত্বের পরস্পরসাপেক্ষ দুই দিক্ বা রূপ।' সামুয়েল আলেক্‌জাণ্ডার তাঁহার দর্শনে এই মত সমর্থন করিয়াছেন।১

দেশ ও কাল আপেক্ষিক বস্তু।

(২) দ্বিতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য হইতেছে যে, দেশ ও কাল সর্বনিরপেক্ষ দুইটি বস্তু (absolute entities) নয় এবং ইহারা সর্বত্র একভাবেই থাকে না। পরন্তু ইহারা আপেক্ষিক (relative) বস্তু এবং ইহাদের সম্বন্ধ ও পরিমাণ পর্যবেক্ষকের গতি ও মানদণ্ডের উপর নির্ভর

১ Samuel Alexander, *Space, Time and Deity*, V. I. দ্রষ্টব্য।

CENTRAL LIBRARY

করে। আমার ঘরের ঘড়িটিতে প্রথমে ১টা বাজিল, এবং এক ঘণ্টা পরে দুইটা বাজিল। আমার নিকট ঘড়িটি এক স্থানেই দুইবার বাজিল, কারণ পৃথিবীপৃষ্ঠে আমি ও ঘড়িটি একস্থানেই অবস্থিত আছি। কিন্তু কোন দূরস্থ গ্রহ হইতে কোন পর্যবেক্ষক দেখিবেন যে, ঘড়িটিতে ১টা বাজিলে ঘড়িটি বহুদূরে চলিয়া যাইবার পর ২টা বাজিল, কারণ পৃথিবী প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৭০,০০০ মাইল বেগে নিজ কক্ষে ভ্রমণ করে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্থানীয় সময় ভিন্ন ভিন্ন রকম। আমাদের দেশে দিবা ১২টার সময় ইংলণ্ডে সকাল প্রায় ৬টা হয়। ভারত হইতে আমেরিকা যাত্রা করিলে পথে মাসের দিন অর্থাৎ তারিখ বদলাইয়া যায়। এসব দৃষ্টান্তদ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, সর্বনিরপেক্ষ ও সর্বত্র একরূপ দেশ ও কাল বলিয়া কিছু নাই। দেশ ও কাল এবং তাহাদের সম্বন্ধ পর্যবেক্ষকের গতি ও মানদণ্ডদ্বারা নিরূপিত হয়, ইহারা আপেক্ষিক বস্তু। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, দেশ-কাল আপেক্ষিক বস্তু হইলেও আমাদের মনোগত জ্ঞানাকারমাত্র নয়, ইহাদের একপ্রকার বস্তুগত সত্তা আছে, অর্থাৎ ইহারা বহির্জগতের বাস্তবিক গুণ বা ধর্ম।

৩। দ্রব্য
(Substance)

যে বস্তুর কোনরূপ স্বতন্ত্র সত্তা আছে এবং যাহা অন্যান্য বস্তুর সহিত ঘাতপ্রতিঘাতদ্বারা নিজস্ব সত্তা রক্ষা করিতে পারে, তাহার নাম দ্রব্য। নিজস্ব সত্তা রক্ষা করিবার শক্তি বা সামর্থ্যই দ্রব্যের স্বরূপ। অন্যান্য বস্তুর উপর ক্রিয়া করিয়া ইহা যেসব কার্য উৎপন্ন করে তদ্দ্বারা ইহার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। অন্যান্য বস্তুর উপর ক্রিয়া করিবার শক্তিগুলিকে দ্রব্যের গুণ বলে এবং কার্যানুসারে তাহাদের নাম দেওয়া হয়। যেমন কোন দ্রব্য আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের উপর ক্রিয়া করিয়া রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি সংবেদন উৎপন্ন করিলে, আমরা উহাকে রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট বলি এবং গুণগুলি দ্রব্যে সমবেত বলি। আমরা আরও বলি যে, কোন দ্রব্যের ক্রিয়া, গুণ বা অবস্থার পরিবর্তন হইলেও দ্রব্যটির পরিবর্তন হয় না; দ্রব্য অপরিণামী, উহার গুণ-ধর্মেরই পরিণাম হয়। দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা বুঝান যায়।

দ্রব্যের লক্ষণ।

মৃত্তিকা একটি জড়দ্রব্য। অগ্নিসংযোগে ইহা কঠিন হয় এবং জল মিশ্রিত করিলে ইহা কোমল ও তরল হয়। ইহা ঘট, ইষ্টক প্রভৃতির আকারে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু আকার বা অবস্থার পরিবর্তন হইলেও মৃত্তিকার বিনাশ বা পরিবর্তন হয় না। সেইরূপ জল তরল, বাষ্প ও কঠিন

স্বতন্ত্র সত্তা ও স্থায়িত্ব দ্রব্যের বিশেষ ধর্ম।

যে-কোন আকারেই থাকুক না কেন, তাহার জলত্বের হানি হয় না। আমাদের মন এবং আত্মা সম্বন্ধেও এই একই কথা। আমাদের মনে নিরন্তর নানাপ্রকার চিন্তা ও ভাবনা উদিত ও অপগত হয়। কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্যে মন দ্রব্যরূপে স্থিতিশীল থাকে। আমার আত্মাতে সুখ-দুঃখ-ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন প্রভৃতি বৃত্তির উদয় ও অপগম হয়। কিন্তু আত্মা দ্রব্যরূপে একই থাকে এবং এরূপ পরিবর্তনের মধ্যে আমি যে একই ব্যক্তি থাকি সে-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ হয় না। এসব দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝা যায় যে, স্বতন্ত্র সত্তা এবং স্থায়িত্ব বা অপরিণামিত্ব দ্রব্যের বিশেষ লক্ষণ ও ধর্ম।

(১) দ্রব্য-প্রত্যয়ের উৎপত্তি

এখন প্রথম প্রশ্ন হইতেছে—আমরা দ্রব্যের প্রত্যয়টি কিভাবে পাই?

দ্রব্যের প্রত্যয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত।

(ক) দ্রব্য-প্রত্যয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, আমরা প্রথমে বাহ্য জড়দ্রব্য প্রত্যক্ষ করি এবং পরে মন ও আত্মাকে দ্রব্য বলিয়া অনুমান করি।

(খ) পক্ষান্তরে, কেহ কেহ বলেন যে, আমরা প্রথমে মন ও আত্মাকে সাক্ষাৎভাবে দ্রব্যরূপে উপলব্ধি করি এবং পরে বাহ্য জড়বস্তুকে দ্রব্য বলিয়া অনুমান করি। যদি দ্রব্য বলিতে কোন স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বস্তু বুঝায়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা কেবল নিজ মন ও আত্মাকেই সাক্ষাৎভাবে দ্রব্য বলিয়া জানিতে পারি। বাহ্য জড়দ্রব্যের স্বতন্ত্র ও স্থায়ী সত্তা সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ অনুভূতি নাই, ইহা অনুমেয় অর্থাৎ আত্মার সহিত সাদৃশ্যহেতু অনুমিত হয়। আমাদের আত্মা বিশেষ বিশেষ গুণবিশিষ্ট এবং বিশেষ বিশেষ কর্মের কর্তা। বাহ্য জড়বস্তুও বিশেষ বিশেষ গুণযুক্ত এবং বিশেষ বিশেষ কার্যের কারণ। অতএব আত্মার ন্যায় বাহ্য জড়বস্তুও দ্রব্য।

(২) দ্রব্যের বাস্তবিক সত্তা

দ্রব্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে—দ্রব্যের বাস্তবিক সত্তা কি? দ্রব্যের স্বরূপগত সত্তা সম্বন্ধেও দার্শনিকদের মতভেদ দেখা যায়।

দ্রব্যের বাস্তবিক সত্তা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত।

(ক) প্রত্যক্ষবাদী কোন কোন দার্শনিকের মতে দ্রব্য গুণসমূহের সমষ্টিমাত্র, ইহার গুণসকলের অতিরিক্ত কোন সত্তা নাই। আম্র একটি দ্রব্য। ইহাকে বিশ্লেষ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাতে রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি গুণের একত্র সমাবেশ হইয়াছে। এরূপ একত্র সমাবিষ্ট গুণসমূহের

নামই আম্রফল এবং ইহা একটি দ্রব্য। পক্ষান্তরে, জন্ লক্ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ-বাদীদের মতে দ্রব্য গুণসমূহের সমষ্টিমাত্র নহে, ইহা গুণসমূহের আধার বা অধিকরণ। গুণসমূহের অবস্থিতি কোন আশ্রয়সাপেক্ষ, অর্থাৎ কোন আশ্রয়ে অধিষ্ঠিত না হইলে উহারা থাকিতে পারে না। গুণসকলের আশ্রয় বা অধিকরণের (substratum) নাম দ্রব্য।

(খ) কাণ্টপ্রমুখ দার্শনিকদের মতে দ্রব্য গুণসমূহের সমষ্টি বা আধার নহে। উহা আমাদের মনোগত জ্ঞানাকারমাত্র (category of the understanding)। গুণের প্রত্যয় দ্রব্যের প্রত্যয়-সাপেক্ষ, অর্থাৎ গুণের কথা ভাবিতে হইলেই দ্রব্যের কথা ভাবিতে হয়, দ্রব্য ব্যতীত গুণের ধারণা হয় না। অতএব দ্রব্য জ্ঞানের একটি অপরিহার্য প্রত্যয়মাত্র, ইহার কোন বস্তুগত সত্তা নাই।

(গ) হেগেল প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদী দার্শনিকদের মতে দ্রব্য জ্ঞানাকার-মাত্রও নয়, আর গুণসমূহের সমষ্টি অথবা আধারমাত্রও নয়। ইহা গুণ-সমূহের অন্তর্নিহিত এক বাস্তবিক সত্তা এবং গুণসমূহে প্রকাশিত হয়। দ্রব্য ব্যতীত গুণ থাকে না এবং গুণ ব্যতীত দ্রব্যও থাকিতে পারে না। যে সত্তা গুণে প্রকাশিত হয় এবং গুণসমূহকে সমষ্টিবদ্ধ করে, তাহার নাম দ্রব্য।

পরম দ্রব্য এক, দুই, না বহু?

দ্রব্য সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ববিষয়ক (ontological) প্রশ্ন হইতেছে—পরম দ্রব্য এক, না দুই, না বহু? একতত্ত্ববাদ (monism), দুইতত্ত্ববাদ (dualism) ও বহুতত্ত্ববাদ (pluralism), ইহাদের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয়? যদি পরম দ্রব্য এক হয় এবং একতত্ত্ববাদ প্রমাণিত হয়, তবে আরও প্রশ্ন হইবে—এই এক দ্রব্যের বা তত্ত্বের প্রকৃতি বা স্বরূপ কি? ইহা জড় না চেতন, অর্থাৎ জড়বাদ (materialism), না চেতনবাদ (idealism) সত্য? যদি পরম দ্রব্য এক বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে আরও এক প্রশ্ন হইবে—এক কিরূপে বহু হইল? আর যদি বহু পরম দ্রব্য স্বীকার করা যায়, তবে প্রশ্ন হইবে—বহু দ্রব্য কিভাবে একীভূত হইয়া এক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিল? এইগুলিই তত্ত্ববিদ্যার মূল প্রশ্ন।

৪। কার্যকারণভাব
(Causality)

কারণ সম্বন্ধে দুইটি প্রধান প্রশ্ন।

পরিদৃশ্যমান জগতে সব বস্তুই কার্যকারণসম্বন্ধদ্বারা আবদ্ধ। আমরা নিয়তই প্রত্যক্ষ করি যে, এক বস্তু আর এক বস্তুর উপর ক্রিয়া করিয়া তাহার কিছু পরিবর্তন সাধন করে। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা প্রথম বস্তুটিকে কারণ এবং দ্বিতীয় বস্তুর পরিবর্তনকে উহার কার্য বলি। আমরা আরও

CENTRAL LIBRARY

বিশ্বাস করি যে, কারণ বিনা কোন কার্য হয় না। এখন প্রশ্ন হইতেছে—কারণ কাহাকে বলে? কেন এবং কিরূপে কারণ কার্য উৎপন্ন করে? কারণ সম্বন্ধে দুইটি প্রধান প্রশ্ন হইতে পারে। একটি প্রশ্ন কারণ-প্রত্যয়ের উৎপত্তিবিষয়ক, যথা—আমরা কিভাবে কারণের প্রত্যয়ে উপনীত হই? অপরটি কারণের স্বরূপবিষয়ক, যথা—আমাদের মনোগত প্রত্যয়-নিরপেক্ষ কারণের নিজস্ব সত্তা কি? প্রথম প্রশ্নটির আলোচনা করিতে হইলে দ্বিতীয় প্রশ্নটির আলোচনা আবশ্যক। এজন্য প্রথমে দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোচনা করা হইতেছে।

(১) কারণের বাস্তবিক সত্তা

কারণের বাস্তবিক সত্তা সম্বন্ধে লৌকিক মত।

(ক) সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, সকল দ্রব্যে একপ্রকার শক্তি নিহিত আছে। স্থলবিশেষে কোন দ্রব্যের অন্তর্নিহিত শক্তি ক্রিয়াশীল হইয়া অন্য দ্রব্যে প্রবেশ করে এবং তাহার অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে, অর্থাৎ একটি কার্য উৎপাদন করে। প্রাকৃতজনের মতে এরূপ কার্যজননশক্তিই প্রকৃত কারণ, ইহাই কারণের স্বরূপ। কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে, কারণশক্তি যথার্থ কি বস্তু এবং কেমন করিয়া ইহা দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে প্রবেশ করে তাহাই বিচার্য বিষয়। ইহা না বুঝিলে কারণ কি বস্তু তাহা বুঝা যায় না।

বৈজ্ঞানিক মত।

(গ) জড়বিজ্ঞানে কারণকে গতিক্রিয়ায় (motion) পর্যবসিত করা হইয়াছে। স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনরূপ গতিক্রিয়াই কারণের প্রকৃত সত্তা। যখন কোন দ্রব্য অন্য কোন দ্রব্যের উপর, ক্রিয়া করিয়া তাহার কোন পরিবর্তন ঘটায়, তখন বুঝিতে হইবে যে, প্রথম দ্রব্যস্থ গতিক্রিয়া (motion) তাহা হইতে বাহির হইয়া দ্বিতীয় দ্রব্যে প্রবেশ করে এবং তাহাতে গতিক্রিয়ার সঞ্চার করে। এখানে প্রথম দ্রব্যের গতিক্রিয়া দ্বিতীয় দ্রব্যে সঞ্চারিত হয় এবং তাহাতে উহার পরিমাণের কোন লাঘব বা অপচয় হয় না। প্রথম দ্রব্যস্থ গতিক্রিয়ার নাম কারণ এবং তাহাই দ্বিতীয় দ্রব্যে প্রবিষ্ট ও প্রকট হইলে কার্যপদবাচ্য হয়। প্রকৃতিতে যেসব পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ কার্যকারণ পরম্পরা দেখা যায়, তাহা কেবল গতিক্রিয়ার এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন বুঝিতে হইবে। যখন একটি ধাবমান গোলকের আঘাতে আর একটি গোলক ধাবিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, স্থূল গতিক্রিয়া (molar motion) এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে সঞ্চারিত হইয়াছে। যখন কোন জ্বলন্ত গৃহ হইতে গৃহান্তরে অগ্নিসংযোগ হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, সূক্ষ্ম আণবিক গতিক্রিয়া (molecular motion) এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে গমন করিয়াছে। অতএব জড়বিজ্ঞানের মতে সকল কারণই গতিক্রিয়ার স্থানান্তর ও রূপান্তরমাত্র।

CENTRAL LIBRARY

কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে, এরূপ মতে জড়দ্রব্যের কার্যকারণভাব বুঝা গেলেও, জড় ও চেতন দ্রব্যের কার্যকারণসম্বন্ধ বুঝা যায় না। আমাদের দেহ জড়বস্তু, মন অজড় চেতন দ্রব্য। দেহের ক্রিয়া গতিক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ হইলেও মানসিক ক্রিয়াকে গতিক্রিয়া বলা যায় না। অতএব দেহ ও মনের মধ্যে যে ক্রিয়া হয়, তাহাকে গতিক্রিয়ার স্থানান্তর বা রূপান্তর বলা যায় না।

প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকদের মত।

(গ) চরমপন্থী প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক হিয়ুম, মিল প্রভৃতির মতে কারণের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা কিছু নির্ধারণ করিতে বা সঠিক বলিতে পারি না। ইহা আমাদের প্রত্যক্ষের অগোচর। প্রত্যক্ষদ্বারা আমরা কেবল বস্তু বা ঘটনা-সমূহের ক্রম বা পর্যায় অবলোকন করিতে পারি। বস্তুসকলের ক্রম প্রত্যক্ষ হইতে কারণ ও কারণতা-প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয়। আমরা পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করি যে, যখনই কোন একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে, তখনই আর একটি বিশেষ ঘটনা তাহার অনুগমন করে। এরূপ ভূয়োদর্শনের ফলে এই দুইটি ঘটনা আমাদের মনে নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। পরে আমরা প্রথমটি প্রত্যক্ষ করিলে অথবা প্রথমটির কথা ভাবিলে, দ্বিতীয়টির কথা ভাবি এবং উহা প্রথমটির অনুগমন করিবে এরূপ আশা করি। এরূপ আশা প্রকাশ করিতে আমরা পূর্বগামী ঘটনাকে কারণ এবং তাহার নিয়ত পশ্চাদ্‌গামী ঘটনাকে কার্য বলি এবং তাহাদের সম্বন্ধকে কার্যকারণসম্বন্ধ বলি। অতএব কোন ঘটনার নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনার নাম কারণ এবং কোন ঘটনার নিয়ত পরবর্তী ঘটনার নাম কার্য, এরূপ নিয়ত পূর্বাপর সম্বন্ধের নাম কার্যকারণসম্বন্ধ।

কিন্তু এস্থলে বক্তব্য এই যে, চরমপন্থী প্রত্যক্ষবাদীরা দুইটি ঘটনার নিয়ত ক্রমমাত্র স্বীকার করেন, কিন্তু কেন এরূপ নিয়ত ক্রম হয়, তাহার কোন হেতু প্রদর্শন করেন না। অথচ এই প্রশ্নই কারণ সম্বন্ধে মূল প্রশ্ন, কিন্তু তাহার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না।

বিজ্ঞানবাদী দার্শনিকদের মত।

(ঘ) বিজ্ঞানবাদী দার্শনিকগণ পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে জাগতিক সকল পরিবর্তনই বুদ্ধিপূর্বক ক্রিয়ার (rational action) ন্যায় কোনরূপ প্রয়োজন বা ইষ্টের সাধক। কোন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই বস্তুসকলের পরিণাম হয়, নতুবা তাহাদের পরিবর্তন হইবে কেন? যদি কোন বস্তু এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, পূর্বাবস্থায় উহার কোনরূপ অভাব বা ত্রুটি ছিল এবং এই ত্রুটি বা অপূর্ণতা দূর করিয়া পূর্ণতা লাভ করিবার জন্যই ইহার পরিণাম হয়। কিন্তু বর্তমানের অপূর্ণতা ও ভবিষ্যতের পূর্ণতা অথবা কোন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞান বা বুদ্ধিদ্বারাই বুঝা যাইতে পারে। অতএব বলিতে হয় যে, বুদ্ধিগত উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই সকল

পরিবর্তন ঘটে। ইচ্ছাশক্তিদ্বারাই এরূপ প্রয়োজনসিদ্ধি হয়। অতএব ইচ্ছা বা মানসিক প্রযত্নই (will-force) কারণ-শক্তির মূলাধার ও যথার্থ রূপ।

কারণ-শক্তিকে যে শেষ পর্যন্ত মানসিক শক্তিতে (mental energy) পর্যবসিত করিতে হয়, তাহা আর এক ভাবেও বুঝান যায়। সাধারণতঃ আমরা ভাবি যে, জগতের এক বস্তু অন্য সব বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্রভাবে অন্য বস্তুর উপর ক্রিয়া করিয়া তাহার পরিবর্তন ঘটায়। দ্বিতীয় বস্তুটি স্বতন্ত্রভাবে অন্য বস্তুর পরিবর্তন সাধন করে এবং এইভাবেই জগৎ-ব্যাপার নির্বাহ হয়। কিন্তু এরূপ হইলে জাগতিক বস্তুসকলের পারস্পরিক ক্রিয়া এবং তাহাদের একত্র সমাবেশ ও সংস্থিতি কিরূপে হইতে পারে তাহা বুঝা যায় না। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বুঝা যায়, জগৎ বিভিন্ন স্বতন্ত্র বস্তুতে বিচ্ছিন্ন নয়। অপরপক্ষে, জগতের সব বস্তুই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, তাহারা এক বিরাট সমষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ বা অঙ্গ, এবং একটি বস্তুর কোন পরিবর্তন হইলে অন্য সব বস্তুর তদনুযায়ী পরিবর্তন হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সারা বিশ্ব এক-সূত্রে গ্রথিত এবং এক ঐশী শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। যেমন আমাদের দেহের কোথায় কোন পরিবর্তন হইলে, উহা সারা দেহের পরিবর্তন ঘটায় এবং সমগ্র দেহই উহার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য অন্যান্য অংশের বা অঙ্গের আবশ্যকীয় পরিবর্তন সাধন করে, সেইরূপ বিশ্বের এক বস্তুতে কোন পরিবর্তন হইলে সমগ্র বিশ্ব তাহার প্রতি-বিধানকল্পে এবং তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার্থে অন্যসব বস্তুতে পরিবর্তন ঘটায়। অতএব একটি মাত্র বস্তুর পরিবর্তন অন্য বস্তুর পরিবর্তনের ঠিক কারণ নহে। বরং ঐ পরিবর্তনকে উপলক্ষ করিয়া সমগ্র বিশ্ব অন্য বস্তুর পরিবর্তন ঘটায়। অতএব শেষ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্ত্রী শক্তিকেই সকল কার্যের কারণ বলিতে হয়। এ বিশ্বশক্তি মঙ্গলরূপা, পরমা ভাগবতী শক্তি। ইহা চিৎশক্তি বা ইচ্ছাশক্তি। এজন্য ইচ্ছাশক্তিকেই কারণের স্বরূপ বলিতে হয়।

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। জড়বিজ্ঞানের মতানুসারে গতিক্রিয়ারূপ জড় বা অচেতন শক্তি সকল কার্যের কারণ। অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কারণ হইতে কার্যের উৎপত্তি এবং কার্যকারণ-ব্যবস্থাপন হয়। কার্যকারণ-নিয়মের কখন ব্যতিক্রম হয় না। সকল জড় ও অজড় বস্তু এবং তাহাদের সকল ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে কার্য-কারণসম্বন্ধদ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাহাদের কোন স্বাতন্ত্র্য বা স্বয়ংক্রিয়তা নাই। কারণ সম্বন্ধে এরূপ মতকে জড়কারণবাদ (mechanical theory of causation) বলা যায়। পক্ষান্তরে, কারণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানবাদীদের মতকে ঐচ্ছিক বা চেতন কারণবাদ (teleological theory of causation) বলা যায়। এ মতে কারণশক্তি জ্ঞানসহকৃত ইচ্ছা বা প্রযত্নস্বরূপ এবং ইহা কোন না কোন

কারণতার দুই প্রকার ভেদ— জড়কারণতা ও চেতনকারণতা।

প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত। কারণশক্তি মূলে ইচ্ছাশক্তি। ইহা চেতন, জড় নহে। ইহা একেবারে পরতন্ত্র বা জড়ের অধীন নহে, ইহার কিছু স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ংক্রিয়তা আছে। স্থূলদৃষ্টিতে জড়জগতে জড়কারণতা এবং জীবজগতে বা প্রাণিজগতে চেতনকারণতা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এই দুইপ্রকার কারণতার ভিত্তিতে দুইপ্রকার দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

(২) কারণ-প্রত্যয়ের উৎপত্তি

কারণ-প্রত্যয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত।

(ক) বস্তুতন্ত্রবাদী দার্শনিকদের মতে আমরা প্রত্যক্ষদ্বারা বহির্জগতে কারণ উপলব্ধি করি এবং তাহা হইতেই কারণতার প্রত্যয় উপজাত হয়। সাধারণ লোকে মনে করে যে, আমরা দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়প্রকার গতিক্রিয়ার (motion) অনুপ্রবেশ প্রত্যক্ষ করি এবং তাহা হইতে কারণতার ধারণা বা প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয়।

(খ) চরমপন্থী প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকগণ বলেন যে, প্রত্যক্ষদ্বারা আমরা দুইটি বস্তু বা ঘটনার নিয়ত ক্রমমাত্র জানিতে পারি এবং ইহা হইতেই আমাদের কারণতার প্রত্যয় জন্মে।

(গ) বিজ্ঞানবাদী দার্শনিকগণ বলেন যে, পূর্বোক্ত দুইটি মতে কারণজন্য কার্যের কথাই বলা হইয়াছে, প্রকৃত কারণের প্রত্যয় সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই। আমরা প্রত্যক্ষদ্বারা বহির্জগতে নানাপ্রকার পরিবর্তন বা ঘটনাক্রম জানিতে পারি, কিন্তু ইহারা যে কার্যকারণসম্বন্ধে আবদ্ধ তাহা জানিতে পারি না। তাহা জানিতে হইলে পূর্ব হইতেই আমাদের কারণ সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকা আবশ্যক। ঘটনাসমূহের নিয়ত ক্রম দেখিলেই আমরা তাহাদিগকে কার্য-কারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া বুঝি না। দিন ও রাত্রির অথবা ঋতুসকলের নিয়ত ক্রম দেখিলেও আমরা দিনকে রাত্রির কারণ অথবা এক ঋতুকে পরভাবী ঋতুর কারণ বলি না। অতএব ঘটনাসমূহের নিয়ত ক্রম দৃষ্টে তাহাদিগকে কার্যকারণসম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইলে, আমাদের পূর্বেই কারণ সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকা আবশ্যক। আমাদের মানসিক ক্রিয়া হইতেই এ ধারণা উপজাত হয়। যখন আমরা ইচ্ছাশক্তি বা প্রযত্নদ্বারা (voluntary effort) কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করি অথবা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করিয়া কোন কার্য সমাধা করি, তখনই কারণশক্তি কাহাকে বলে তাহা জানিতে পারি। কারণ-শক্তির প্রত্যয় প্রথমে এইভাবে উপজাত হয়। তৎপরে বাহ্য জগতে বস্তু বা ঘটনাসমূহের নিয়ত ক্রম প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের কার্যকারণসম্বন্ধ উপমান-দ্বারা ঐরূপ কারণশক্তিজন্য বলিয়া বুঝি।

CENTRAL LIBRARY

পঞ্চদশ অধ্যায়

তত্ত্ববিষয়ক মতবাদ

(Theories of Reality)

সদ্বস্তুর নাম তত্ত্ব।

সদ্‌বস্তুর নাম তত্ত্ব (reality)। সত্তা (existence) ও তত্ত্ব পর্যায় শব্দ। যে-বস্তুর অল্প বা দীর্ঘকাল স্থায়ী সত্তা আছে এবং নিজ সত্তার রক্ষা ও উৎকর্ষ সাধন করিবার শক্তি ও সামর্থ্য আছে, তাহাকে একপ্রকার তত্ত্ব বলা যায়। আমরা কোন তত্ত্বকে গুণবিশিষ্ট দ্রব্য বলিয়া জানি। গুণ ও দ্রব্য যে-কোন তত্ত্বের পরস্পরসাপেক্ষ অঙ্গ বা আকার। তত্ত্বের স্থায়ী সত্তা থাকায় উহাকে দ্রব্য বলা হয়। কিন্তু ইহার সত্তা নানাপ্রকার ক্রিয়া বা কর্মদ্বারা প্রকাশিত হয়। এসব ক্রিয়া ও তাহাদের কার্যকে উহার গুণ বা ধর্ম বলে। যেমন জড়পদার্থ একটি তত্ত্ব। ইহা একটি দ্রব্য এবং রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ও শব্দ ইহার গুণ। মন আর একটি তত্ত্ব। ইহা একপ্রকার দ্রব্য এবং জ্ঞান বা চৈতন্য ইহার গুণ।

১। বস্তুতন্ত্রবাদ

(Realism)

বস্তুতন্ত্রবাদ কাহাকে বলে ?

যে দার্শনিক মত অনুসারে তত্ত্বের মনোনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বাহ্য সত্তা আছে, তাহাকে বস্তুতন্ত্রবাদ বা বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ (realism) বলে। তত্ত্বের সত্তা মন, বুদ্ধি বা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। তত্ত্ব মন বা জ্ঞানের বিষয় না হইলেও অর্থাৎ ইহাকে কেহ না জানিলেও স্বসত্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। অবশ্য ইহা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু ইহা জ্ঞানের বিষয় হউক বা না হউক, তাহাতে ইহার সত্তার কোন হানি বা ইতর-বিশেষ হয় না। ইহার মন ও জ্ঞানাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা সমভাবেই থাকে এবং থাকিবে। ঘট ও পট, পর্বত ও সাগর প্রভৃতি সদ্বস্তুর অস্তিত্ব মানব, দেবতা বা পরমেশ্বর কাহারও মন বা জ্ঞানের অপেক্ষা করে না। ইহারা কাহারও জ্ঞানের বিষয় না হইলেও বিদ্যমান থাকে এবং থাকিবে। গৃহমধ্যস্থ কোন ঘটকে কেহ না দেখিলেও বা না জানিলেও উহা স্বসত্তায় বিদ্যমান থাকে।

CENTRAL LIBRARY

(১) লৌকিক বস্তুতন্ত্রবাদ
(Common-sense Realism)

লৌকিক বস্তুতন্ত্রবাদের লক্ষণ।

সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, জাগতিক বস্তুসমূহ আমাদের মন ও জ্ঞান অতিক্রম করিয়া বহির্জগতে বিদ্যমান আছে, উহারা আমাদের জ্ঞাননিরপেক্ষ এবং উহাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তা আছে। সরলবুদ্ধি সাধারণ লোকে আরও মনে করে যে, বাহ্য বস্তুসমূহের কেবল অস্তিত্ব নয়, কিন্তু তাহাদের সকল গুণধর্মও আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। বাহ্য বস্তুর রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি গুণ এবং দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, পরিমাণ প্রভৃতি গুণ বাহ্য বস্তুতেই থাকে এবং আমরা সেগুলি যথার্থভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। আমাদের জ্ঞান প্রদীপের মত বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব ও সকল গুণধর্ম যথাবৎ প্রকাশ করে এবং আমরা যে-দ্রব্য যেভাবে প্রত্যক্ষ করি তাহা ঠিক সেইভাবেই বহির্জগতে বিদ্যমান আছে। এ মতে আমাদের জ্ঞানগত বস্তুর গুণবিষয়ক প্রত্যয়গুলিকে বস্তুগত গুণের যথার্থ প্রতিরূপ (true copy) বলা যায়। সাধারণ সরল-বুদ্ধি লোকের এরূপ ধারণা বা মত স্বাভাবিক বলিয়া ইহাকে পাশ্চাত্ত্য দর্শনে common-sense, naive, natural, realism বলা হয়। আমরা ইহাকে লৌকিক বস্তুতন্ত্রবাদ বলিয়াছি। এই মত অতি প্রাচীন বলিয়া ইহাকে প্রাচীন বস্তুতন্ত্রবাদও বলে।

(২) বৈজ্ঞানিক বস্তুতন্ত্রবাদ
(Scientific Realism)

বৈজ্ঞানিক বস্তুতন্ত্রবাদের লক্ষণ।

লৌকিক এবং বৈজ্ঞানিক উভয়প্রকার বস্তুতন্ত্রবাদেই সকল বস্তুর মন ও জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা স্বীকার করা হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বস্তুতন্ত্রবাদে বাহ্য বস্তুর গুণের প্রকারভেদ করা হইয়াছে। গুণ দুইপ্রকার—মুখ্য (primary) ও গৌণ (secondary)। কোন দ্রব্যের প্রদেশবত্ত্ব (extension in space), গতিক্রিয়া (movement), দৈশিক স্থিতি, আকার প্রভৃতিকে উহার মুখ্য গুণ বলে। মুখ্য গুণগুলি বাহ্য দ্রব্যেই থাকে এবং ইহারা যেভাবে থাকে আমরা ঠিক সেইভাবেই তাহাদের প্রত্যক্ষ করি। রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি দ্রব্যের গৌণ গুণ। ইহারা আমাদের মনোগত সংবেদনমাত্র, বস্তুনিষ্ঠ কোন ধর্ম নহে। অতএব গৌণ গুণের প্রত্যয়গুলিকে বস্তুনিষ্ঠ

কোন গুণের যথার্থ প্রতিরূপ বলা যায় না, কেবল মুখ্য গুণের প্রত্যয়গুলিকেই এরূপ প্রতিরূপ বলা যায়। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষদ্বারা আমরা যথার্থ বাহ্য বস্তুসমূহ জানি, কেবল তাহাদের বাহ্যরূপ বা অবভাসমাত্র অবগত হই না।

(৩) নব্য বস্তুতন্ত্রবাদ
(Neo-Realism or New Realism)

প্রাচীন বস্তুতন্ত্রবাদের বিপক্ষে যুক্তি।

নব্য বস্তুতন্ত্রবাদে প্রাচীন লৌকিক বস্তুতন্ত্রবাদেরই পুনরভ্যুত্থান দেখা যায়। অবশ্য ইহাতে প্রাচীন মতের দোষ-ত্রুটিগুলি দূর করিবার জন্য কিছু সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। প্রাচীন মত সম্বন্ধে একটি প্রধান আপত্তি এইরূপ। প্রাচীন মত অনুসারে ভ্রম-প্রত্যক্ষের কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। এই মতানুসারে আমাদের সকল প্রত্যক্ষেই সদ্বস্তু গৃহীত হয় এবং আমরা যে-বস্তু যেভাবে প্রত্যক্ষ করি তাহা ঠিক সেইভাবেই বহির্জগতের বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এরূপ হইলে কোন জ্ঞানকেই ভ্রমজ্ঞান বলা যাইবে না। ভ্রমপ্রত্যক্ষের বিষয়কেও সদ্বস্তু বলিতে হয় এবং তাহাও যেভাবে জ্ঞাত হয়, ঠিক সেইভাবেই বিদ্যমান আছে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভ্রম-প্রত্যক্ষের বিষয়ের বাস্তবিক সত্তা নাই। যখন কোন ব্যক্তির রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় অথবা শুক্তিতে রজতভ্রম হয়, তখন একথা বলা যায় না যে, তাহার প্রত্যক্ষীভূত সর্প বা রজতখণ্ড বাহ্য জগতে বা বহির্দেশ ও কালে বিদ্যমান আছে। আর যদি তাহাই বলা হয়, তবে প্রমা ও অপ্রমা জ্ঞানের অথবা যথার্থ ও ভ্রম-প্রত্যক্ষের ভেদই স্বীকার করা যাইবে না।

দ্বৈতমূলক বস্তুতন্ত্রবাদ।

প্রাচীন বস্তুতন্ত্রবাদের এই ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া রেণে ডেকার্ট, জন্ লক্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ বাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষযোগ্যত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আমাদের মন কেবল নিজ বৃত্তিগুলিকেই সাক্ষাৎভাবে জানিতে বা প্রত্যক্ষ করিতে পারে, মনের অতীত বা বহিঃস্থ বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। তবে বাহ্য বস্তু আমাদের দেহ ও মনের উপর ক্রিয়া করিয়া যেসব প্রত্যয় উৎপন্ন করে, আমরা তাহাদের মাধ্যমে বাহ্য বস্তু জানিতে পারি। আমাদের সংবেদনজন্য প্রত্যয়গুলি আমাদের স্বকৃত নয়, বাহ্য জগতে ইহাদের কারণ অবশ্য আছে। বাহ্য বস্তুসমূহের ক্রিয়াজন্য প্রত্যয়গুলি তাহাদেরই প্রতিরূপ। অতএব আমরা সাক্ষাৎভাবে বাহ্য বস্তুসমূহ না জানিলেও, তাহাদের প্রত্যয়রূপ প্রতিরূপ (mental representations) হইতে তাহাদের অস্তিত্ব ও গুণধর্ম অনুমানদ্বারা জানিতে পারি।

লক্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ লৌকিক বস্তুতন্ত্রবাদ পরিত্যাগ করিয়া বাহ্যানুমেয়-বাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে তাঁহাদের মতকে Representationism or Epistemological Dualism বলা হয়। ইহাও একপ্রকার বস্তুতন্ত্রবাদ। ইহাকে দ্বৈতমূলক বস্তুতন্ত্রবাদ (Dualistic Realism) বলা যায়।

ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি।

দ্বৈতমূলক বস্তুতন্ত্রবাদে বা বাহ্যানুমেয়বাদে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বুঝিবার কিছু সুবিধা হয়। আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানে বাহ্য বস্তু সাক্ষাৎভাবে প্রতিভাত হয় না। বাহ্য বস্তুর ক্রিয়াজন্য প্রত্যয়গুলিই আমরা সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারি। আমাদের মনোগত প্রত্যয় বাহ্যবস্তুর গুণধর্মের যথার্থ প্রতিরূপ না হইলেই ভ্রমপ্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এখানে আপত্তি হইবে যে, বাহ্যানুমেয়বাদ অনুসারে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় না। যদি কুত্রাপি আমাদের বাহ্য বস্তুর সাক্ষাৎ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ না হয়, তবে আমাদের মনোগত প্রত্যয় যে, কোন স্থলেও তাহার যথার্থ প্রতিরূপ তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না। আমরা যাহাকে বাহ্য বস্তু বলি, তাহাকেও একটি মনোগত প্রত্যয় বলিতে হইবে। এরূপ স্থলে বস্তুতন্ত্রবাদীকে হয় বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, নয় বাহ্য বস্তুর সাক্ষাৎ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষযোগ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। এখানে আর অন্য কোন পথ নাই। কিন্তু প্রথমোক্ত পথ অনুসরণ করিলে বস্তুতন্ত্রবাদের হানি এবং বিজ্ঞানবাদের প্রতিষ্ঠা হয়।

নব্য বস্তুতন্ত্রবাদের বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় বৈভাষিক-নামক বৌদ্ধ দার্শনিকদের ন্যায় পাশ্চাত্ত্য নব্য বস্তু-তন্ত্রবাদীরা শেষোক্ত পথ অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বাহ্য বস্তুর সাক্ষাৎ প্রতীতি বা প্রত্যক্ষ হয় এবং আমাদের প্রত্যক্ষীভূত সকল বস্তুরই জ্ঞাননিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা আছে। ভ্রমপ্রত্যক্ষের ও স্বপ্নের বিষয়ীভূত বস্তুরও একপ্রকার স্বতন্ত্র সত্তা আছে। এ সত্তা আমাদের মন বা জ্ঞানগত (subjective) নয়, উহা জ্ঞানাতিরিক্ত ও জ্ঞাননিরপেক্ষ (objective) সত্তা। অবশ্য আমাদের স্বাভাবিক ও যথার্থ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের বিষয়গুলির সত্তা এবং ভ্রমপ্রত্যক্ষের বিষয়ের সত্তা একপ্রকার নয়। প্রথমোক্ত বিষয়গুলির সত্তা দেশ-কালে প্রকাশমান ও ইন্দ্রিয়গোচর, শেষোক্ত বিষয়গুলির সত্তা দেশ-কালে অপ্রকাশমান ও অতীন্দ্রিয়। ইহাদের বিভিন্নপ্রকার সত্তা বুঝাইবার জন্য নব্য বস্তুতন্ত্রবাদীরা প্রথমটিকে প্রকাশমান সত্তা (existence) এবং দ্বিতীয়টিকে শুদ্ধ সত্তা (being or subsistence) আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর (things of sense) ন্যায় বুদ্ধিগম্য

বস্তুরও (things of thought) একপ্রকার সত্তা আছে, ভৌতিক পদার্থের ন্যায় যৌক্তিক পদার্থেরও (logical entities) যথার্থ সত্তা আছে। দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টি বুঝান যায়। পাপ ও পুণ্য কি তাহা আমরা বুঝি, ধূমত্ব ও গোত্ব কাহাকে বলে তাহাও আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু পাপ ও পুণ্য কর্ম-বিশেষের প্রত্যক্ষ হইলেও পাপ ও পুণ্যমাত্রের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হয় না। সেইরূপ ধূম ও গো-বিশেষের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হইলেও ধূমত্ব ও গোত্বের সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ হয় না। তথাপি আমরা পাপ ও পুণ্যের, ধূমত্ব ও গোত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করি। ইহাদের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও বুদ্ধিগ্রাহ্য। এরূপ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের অগোচর ও বুদ্ধিগম্য অস্তিত্বকে শুদ্ধ সত্তা বলে। ভৌতিক পদার্থের ন্যায় ইহারাও সদ্বস্তু, যদিচ ইহাদের দেশ-কালে প্রকাশমান সত্তা নাই। ভ্রমপ্রত্যক্ষের বিষয়গুলিও একপ্রকার সদ্বস্তু, তাহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক সত্তা না থাকিলেও বুদ্ধিগম্য শুদ্ধ সত্তা আছে, উহারা আমাদের কল্পনা বা মানসিক প্রত্যয়মাত্র (subjective states or entities) নয়। ভ্রমপ্রত্যক্ষের বিষয় অসদ্বস্তু বলিয়া লৌকিক বস্তুতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে যে আপত্তি হইতে পারে, নব্য বস্তুতন্ত্রবাদে এইভাবে তাহার খণ্ডন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এ মতে জ্ঞান বা সংবিদের লক্ষণ।

সদ্বস্তুই সব জ্ঞানের বিষয় ইহা প্রতিপাদন করিবার আগ্রহে কোন কোন নব্য বস্তুতন্ত্রবাদী জ্ঞান বা সংবিৎকে (consciousness) জ্ঞানের বিষয়বস্তুতে পর্যবসিত করিয়াছেন। জ্ঞান বিষয়প্রকাশক আলোকমাত্র (searchlight)। জ্ঞান বা সংবিদের বিষয়াতিরিক্ত পৃথক্ সত্তা নাই। জ্ঞাত বিষয়ের সমষ্টিকেই জ্ঞান বলে। আলোক যেমন তৎসন্নিকৃষ্ট বিষয়গুলিকে প্রকাশ করে এবং আলোকের সত্তা যেমন প্রকাশিত বস্তুসমূহের সত্তা হইতে ভিন্ন নয়, সেইরূপ জ্ঞান বলিতে জ্ঞাত বিষয়ের সমষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু বুঝায় না। অবশ্য সকল নব্য বস্তুতন্ত্রবাদী এ মত সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞান বা সংবিদের পৃথক্ সত্তা স্বীকার করেন। কিন্তু সকল জ্ঞানের বিষয়ের জ্ঞানাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা এবং তাহাদের সাক্ষাৎ-প্রতীতি বা প্রত্যক্ষযোগ্যতা বিষয়ে সকল নব্য বস্তুতন্ত্রবাদী একমত।

নব্য বস্তুতন্ত্রবাদের বিপক্ষে যুক্তি।

নব্য বস্তুতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে দুইটি প্রধান আপত্তি হইতে পারে। প্রথমতঃ ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল লৌকিক বস্তুতন্ত্রবাদের সংস্থাপন। কিন্তু এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। ভ্রমপ্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা করিবার জন্য ইহাতে শুদ্ধ সত্তাকে (subsistent entities) ভ্রমজ্ঞানের বিষয় বলা হইয়াছে। কিন্তু এ শুদ্ধসত্তা কি বস্তু তাহা বুঝা দুষ্কর। অন্ততঃ সাধারণ বুদ্ধিদ্বারা ইহা বুঝা যায় না এবং লৌকিক বস্তুতন্ত্রবাদে ইহার কোন স্থান নাই। ইহা যেন

অর্থহীন শব্দমাত্র। দ্বিতীয়তঃ কোন কোন নব্য বস্তুতন্ত্রবাদী যে, জ্ঞানকে জ্ঞেয় বস্তুতে পর্যবসিত করিয়াছেন তাহা সমীচীন মনে হয় না। জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞেয় বস্তুই বুঝা যায় না। তারপর, জ্ঞানকে জ্ঞেয় বস্তুর সমষ্টিমাত্র বলা যায় না। অচেতন জ্ঞেয় বস্তু সমষ্টিবদ্ধ হইলেই তাহাতে চৈতন্য বা বোধশক্তি জন্মে না। বাহ্য বস্তুর প্রকাশক হিসাবে জ্ঞানকে আলোকের সহিত তুলনা করা যায়। কিন্তু সে স্থলেও ইহা লক্ষ্য করা উচিত যে, আলোক আলোকিত বস্তুর সমষ্টিমাত্র নয়। আলোক আলোকিত বস্তুর সমষ্টি হইতে ভিন্ন পদার্থ। ইহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বস্তুকে আলোকিত করিতে পারে এবং কখন কখন আমাদের দৃষ্ট কোনও বস্তুকে আলোকিত নাও করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে তাহার অস্তিত্বের বিকৃতি বা হানি হয় না। রাত্রিতে সূর্যের আলোক আমরা দেখিতে পাই না বা উহা পৃথিবীর অংশবিশেষকে প্রকাশিত করে না বলিয়া আমরা তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি না। আলোক আলোকিত বস্তু হইতে ভিন্ন পদার্থ। সেইরূপ জ্ঞান জ্ঞেয় বস্তু হইতে ভিন্ন, ইহার একটা স্বতন্ত্র নিজস্ব সত্তা আছে। বাহ্যপ্রত্যক্ষানুভূতির মূলে বস্তুতন্ত্রবাদীরা জ্ঞেয় বিষয়ের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। আন্তর অনুভূতির মূলে জ্ঞান বা চৈতন্যেরও স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করা কর্তব্য। বাস্তবিক পক্ষে জ্ঞান বা চৈতন্য ঠিক আলোকস্থানীয় বস্তু নয়। জ্ঞান আলোকেরও প্রকাশক। কোন ব্যক্তি অজ্ঞান বা অচৈতন্য হইলে, আলোক তাহার কাছে কিছু প্রকাশ করিতে পারে না। জ্ঞান সর্ববস্তুর প্রকাশক। এজন্য বিজ্ঞানবাদে জ্ঞানকেই মুখ্য স্থান বা প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এখন আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

২। বিজ্ঞানবাদ
(Idealism)

বিজ্ঞানবাদ কাহাকে বলে ?

যে দার্শনিক মত অনুসারে মন বা আত্মা ও জ্ঞান পরম তত্ত্ব এবং অন্য সকল বস্তুর সত্তা বা অস্তিত্ব মন বা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, তাহাকে বিজ্ঞানবাদ (idealism) বলে। জাগতিক বস্তুসকলের মন বা জ্ঞাননিরপেক্ষ সত্তা নাই। যেমন চিন্তা, বেদনা, ইচ্ছা প্রভৃতির মন বা জ্ঞাননিরপেক্ষ সত্তা নাই এবং উহারা কোন মন বা আত্মায় থাকে, সেইরূপ জাগতিক বস্তুসমূহও মন বা জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া বিদ্যমান আছে। বহির্জগতের বস্তুগুলি আমাদের বা ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয়রূপেই বিদ্যমান থাকে। যে-বস্তু কাহারও প্রত্যক্ষীভূত বা কোনরূপে জ্ঞাত নয়, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলা যায় না এবং তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। বস্তুতন্ত্রবাদীদের মূল তত্ত্ব হইল যে, সর্ব-

বস্তুর মন বা জ্ঞাননিরপেক্ষ সত্তা আছে এবং উহারা কাহারও জ্ঞানের বিষয় না হইলেও বিদ্যমান থাকে। অপরপক্ষে বিজ্ঞানবাদীদের মূল তত্ত্ব হইল যে, কোন বস্তুর মন বা জ্ঞাননিরপেক্ষ সত্তা নাই এবং উহা কাহারও না কাহারও জ্ঞানের বিষয়রূপেই বিদ্যমান থাকে।

(১) কেবলবিজ্ঞানবাদ
(Subjective Idealism)

কেবল বিজ্ঞানবাদের লক্ষণ।

যে মত অনুসারে মন বা জ্ঞানই একমাত্র সদ্বস্তু এবং বাহ্য বস্তুর প্রকৃত সত্তাই নাই, তাহাকে কেবলবিজ্ঞানবাদ বা বিজ্ঞান-মাত্রবাদ বলা যায়। এ মতে বাহ্য বস্তুকে জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত পৃথক্ বিষয়ও বলা হয় না এবং বাহ্য জড় জগতের কোন অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। আমরা যেসব বাহ্য জড়দ্রব্য প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিয়া মনে করি, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি মনোগত প্রত্যয়মাত্র অথবা জ্ঞানের বিভিন্ন আকার বা রূপমাত্র। জ্ঞানের বিষয়কে জ্ঞান হইতে পৃথক্ করা যায় না, অতএব উহা জ্ঞান হইতে অভিন্ন। যেমন নীলবর্ণ নীলজ্ঞান হইতে অভিন্ন, যেহেতু উহাদের পৃথগ্‌ভাবে উপলব্ধি হয় না।

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক বার্কলি বলেন, কোন বস্তুর অস্তিত্ব বলিতে তাহার প্রত্যক্ষজ্ঞানই বুঝায় (*'esse is percipi'*)। আমাদের ভাবনা ও চিন্তা যেমন আমাদের মনোগত প্রত্যয়মাত্র, তেমনি বাহ্য বস্তুসকলও আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান বা সংবেদনমাত্র, তাহাদেরও মানসিক প্রত্যয়ের অতিরিক্ত সত্তা নাই। যখন কেহ বলেন, 'গৃহে একটি ঘট আছে'—সে কথার অর্থ হইতেছে যে, তিনি ঘটটি প্রত্যক্ষ করিতেছেন বা অন্য কেহ ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যে-বস্তু কেহ প্রত্যক্ষ করে না, তাহার অস্তিত্বের কোন অর্থ হয় না। অতএব মনোনিরপেক্ষ জড়বস্তুর (matter) সত্তা স্বীকার্য নহে। জগতে মন ও মনঃপ্রসূত প্রত্যয়সমূহ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর প্রকৃত সত্তা নাই। জাগতিক সকল বস্তুই, হয় আমাদের আর না হয় ঈশ্বরের মনোগত প্রত্যয়মাত্র। আমরা যখন কোন বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষ করি, তখন বুঝিতে হইবে যে, ঈশ্বরের মনোগত কোন প্রত্যয় আমাদের মনে সঞ্চারিত হয়। বার্কলির মতে যেসব বস্তু আমাদের মনের প্রত্যয় নয়, তাহারা ঈশ্বরের মনের প্রত্যয়: বাহ্য প্রত্যক্ষে আমরা ঈশ্বরের মনোগত প্রত্যয়গুলি প্রত্যক্ষ করি। যখন আমরা একটি বৃক্ষ প্রত্যক্ষ করি, তখন বুঝিতে হইবে যে বাহ্য ও বাস্তবিক বৃক্ষটি ঈশ্বরের মনোগত প্রত্যয়রূপে বিদ্যমান এবং তাহাই আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। অতএব সকল বস্তুই আমাদের অথবা ঈশ্বরের মনোগতপ্রত্যয়মাত্র। কোন কোন বিজ্ঞানবাদীর

মতে সকল বস্তুই আমাদের বা আমাদের মত জীবের মনোগত প্রত্যয়মাত্র, ইহাদিগকে ঈশ্বরের মনের প্রত্যয় বলিবার প্রয়োজন নাই। বহির্জগতের বহু-প্রকার শক্তি বা তেজোরাশিই নিরন্তর ক্রিয়া করে, বাস্তবিক পক্ষে সেখানে ঘট-পটাদি দ্রব্য নাই। কিন্তু ঐ শক্তিপুঞ্জ আমাদের মনের উপর ক্রিয়া করিলে ঘট-পটাদি প্রত্যয়সমূহের উৎপত্তি হয়। অতএব সকল বস্তুই আমাদের মনোগত প্রত্যয়মাত্র, বাহ্য বস্তুর কোন বাস্তবিক সত্তা নাই। এইরূপ মতকেও কখন কখন কেবলবিজ্ঞানবাদ বা বিজ্ঞানমাত্রবাদ বলা হয়। বৌদ্ধদর্শনের যোগাচার শাখায় এই প্রকার বিজ্ঞানবাদ দেখা যায়।

(২) সবিষয়-বিজ্ঞানবাদ

(Objective Idealism)

কেবল বিজ্ঞানবাদ ও সবিষয় বিজ্ঞানবাদের পার্থক্য।

কেবলবিজ্ঞানবাদ মতে মন এবং মানসিক প্রত্যয় একমাত্র সদ্বস্তু বা তত্ত্ব এবং বাহ্য বিষয়ের বাস্তবিক সত্তা নাই। সবিষয়-বিজ্ঞানবাদ মতে মন ও বাহ্য জগৎ, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয় একই পরম তত্ত্বের পরস্পর-সাপেক্ষ অংশ, একটি ব্যতীত অপরটি থাকিতে পারে না। মন বা জ্ঞান থাকিলেই, তাহার বিষয়রূপে বস্তুসমূহ অর্থাৎ জাগতিক দ্রব্যসকল থাকিবে। অতএব জ্ঞানের বিষয়রূপে বাহ্য বস্তুর সত্তা স্বীকার্য। অবশ্য বস্তুসমূহের মনো-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা নাই। কিন্তু উহারা মনোগত প্রত্যয়মাত্রও নয়। পরন্তু মন বা জ্ঞানের অপরিহার্য বিষয়রূপে তাহাদের পৃথক্ সত্তা আছে।

সবিষয় বিজ্ঞানবাদ অনুসারে পরম তত্ত্বের স্বরূপ।

পরম তত্ত্ব এক সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক সত্তা (spiritual or mental reality)। ইহার স্বভাবই হইল নিজ সত্তাকে জগদাকারে ব্যক্ত বা প্রকাশিত করা। জীবজগতের সৃষ্টিদ্বারা ইহার অন্তর্নিহিত ভাবরাশি (potentialities) বাস্তবে রূপায়িত হয় এবং ইহা স্বপ্রকাশ চৈতন্য বা আত্মারূপে (self-conscious spirit) প্রকাশিত হয়। জীবজগৎ পরম তত্ত্বের স্বপ্রকাশিত বাস্তব রূপ। অতএব জীবজগৎ মানসিক প্রত্যয় বা কল্পনামাত্র নয়। কেবল-বিজ্ঞানবাদীরা জগৎকে মনোগত প্রত্যয়সমূহে পর্যবসিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে স্থিতিশীল, বৈচিত্র্যময় জগতের রচনানৈপুণ্য বুঝা যায় না। প্রত্যয়-সমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং সংযোগ-বিয়োগদ্বারা বৈচিত্র্যময় জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি হয় না। এ জগৎ নানাপ্রকার শক্তির ক্রিয়ার পরিণতি। এসব শক্তি পরম তত্ত্ব বা পরমাত্মার আত্মভূত ও আত্মপ্রকাশিত শক্তি। এরূপ শক্তিযোগেই জীবজগতের সৃষ্টি হয় এবং জীবজগতের সৃষ্টিদ্বারাই পরম তত্ত্ব স্বপ্রকাশ

চৈতন্য বা পরমাত্মারূপে প্রতিষ্ঠিত হন। অতএব জাগতিক বস্তুসকলের বাস্তবিক সত্তা স্বীকার্য। অবশ্য উহাদের সত্তা আপেক্ষিক (relative), সর্বনিরপেক্ষ (absolute) নয়, যেহেতু ইহারা পরমাত্মারই প্রকাশবিশেষ এবং তাঁহাতেই অধিষ্ঠিত। পরমাত্মা সৃষ্টিশক্তিরূপে জগতের আদি এবং স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপে জগতের অন্ত অর্থাৎ ইহার পরম গতি বা পরিণতি। অতএব এরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে যে, 'বাস্তবিক সত্তামাত্রই বৌদ্ধিক বা চেতন সত্তার প্রকাশ (whatever is actual is rational) এবং বৌদ্ধিক বা চেতন সত্তামাত্রই বাস্তবিক সত্তায় প্রকাশিত হয় (whatever is rational is actual)', অর্থাৎ দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে বুদ্ধি বা চৈতন্যের ক্রিয়া নিহিত আছে এবং বুদ্ধি বা চৈতন্যশক্তি স্বভাবতঃই বাস্তবিক জগতে রূপায়িত হয়।

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, পরম তত্ত্বের জীবজগদ্‌রূপে অভিব্যক্তি এবং তদ্দ্বারা ইহার স্বপ্রকাশ আত্মারূপে প্রতিষ্ঠা কালে সংঘটিত হয় না, অর্থাৎ এইরূপ অভিব্যক্তি এককালে আরম্ভ হইয়া কালান্তরে পূর্ণ ও শেষ হয় না। ইহা এককালে অপূর্ণ ও অচেতন ছিল এবং কালে পরিণতির ফলে পূর্ণ ও সচেতন হইল এমন কথা বলা যায় না। ইহা সততই সচেতন বা স্বপ্রকাশ আত্মারূপে বিদ্যমান এবং অনন্ত শক্তিযোগে নিরন্তর পূর্ণতা লাভ করে। পরম তত্ত্বের পূর্ণজ্ঞানরূপও নিত্য এবং জগদাকারে লীলায়িতরূপও নিত্য। ইহা কোন কালেই জীবজগতের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া ছিল না এবং থাকিবেও না। আর যদি বলা যায় যে, পরম তত্ত্ব প্রথমে জড়া প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত হয়, ক্রমে ক্রমে প্রাণ, মন ও জীবাত্মারূপে প্রকাশিত হইয়া নিজ স্বপ্রকাশ চিৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে মনে রাখিতে হইবে যে, এরূপ পরিণতির ক্রম ঐতিহাসিক অর্থাৎ কালিক ব্যাপার (temporal process) নয়, উহা শুধু বিচারমূলক ক্রমপরিণতির (logical process) কথা। পরম তত্ত্ব ও তাহার অভিব্যক্তি দেশ-কালের অতীত; ইহা দেশ-কালের অন্তর্গত নয়, বরং দেশ-কাল ইহার অন্তর্গত।

হেগেলের সবিষয়-বিজ্ঞানবাদ।

জার্মান দার্শনিক হেগেল তাঁহার ন্যায়সম্বন্ধীয় গ্রন্থে (Logic) দ্বন্দ্বসমন্বয় পদ্ধতি অনুসারে এইরূপ মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার মতে পরম তত্ত্ব স্বরূপতঃ মানসিক বা আধ্যাত্মিক সত্তা বলিয়া তাঁহার মতকে বিজ্ঞানবাদ (idealism) ও চেতনবাদ বা অধ্যাত্মবাদ (spiritualism) বলে। ইহাতে জ্ঞানের অপরিহার্য বিষয়রূপে জাগতিক বস্তুর জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা স্বীকার করা হয় বলিয়া ইহাকে সবিষয়বিজ্ঞানবাদ (objective idealism) ও বাস্তববিজ্ঞানবাদ (realistic idealism) বা বিজ্ঞানমূলক বস্তুবাদও (ideal-realism) বলা যায়।

CENTRAL LIBRARY

ষোড়শ অধ্যায়

বহুত্ববাদ, দ্বৈতবাদ ও একত্ববাদ

(Pluralism, Dualism and Monism)

তত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। এখন পরম তত্ত্বের লক্ষণ ও সংখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পরম দ্রব্য এক, না দুই, না বহু?—এই প্রশ্নই তত্ত্ববিদ্যার মূল প্রশ্ন। পরম দ্রব্যকেই পরম তত্ত্ব বলা যায়। অতএব পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে মূল প্রশ্ন হইতেছে—পরম তত্ত্ব এক, না দুই, না বহু? এই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহা হইতেই বহুত্ববাদ, দ্বৈতবাদ ও একত্ববাদের উদ্ভব হইয়াছে। যে দ্রব্য বা তত্ত্ব উৎপত্তি ও স্থিতি বিষয়ে স্বতন্ত্র অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি ও স্থিতি অন্য দ্রব্য বা তত্ত্বের উপর নির্ভর করে না, তাহাকে পরম দ্রব্য বা তত্ত্ব বলে। এরূপ এক বা দুই বা বহু পরম দ্রব্য বা তত্ত্ব স্বীকার করিলে যথাক্রমে একত্ববাদ, দ্বৈতবাদ ও বহুত্ববাদের আবির্ভাব হইবে। এখন আমরা এগুলির আলোচনা করিব।

পরম তত্ত্বের লক্ষণ ও সংখ্যা।

১। বহুত্ববাদ

(Pluralism)

সাধারণ লোকে মনে করে যে, জগতে বিভিন্ন প্রকার বস্তু বা দ্রব্য আছে এবং ইহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র। আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষে জীবজগৎ অসংখ্য স্বতন্ত্র দ্রব্যের সমষ্টি বা সংঘাতমাত্র বলিয়া প্রতিভাত হয়। এজন্য প্রাকৃত বা সাধারণ পর্যায়ের জ্ঞানের স্তরে (common-sense knowledge) জগতে বহু স্বতন্ত্র দ্রব্য বা তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এসব দ্রব্য যে একই মূল দ্রব্য বা তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে যে কোন নিগূঢ় মিলনসূত্র আছে, তাহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না এবং স্বীকারও করে না। এইরূপ সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে কোন কোন বস্তুতন্ত্রবাদী দার্শনিকের বহুতত্ত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নব্য বস্তুতন্ত্রবাদীরা বলেন যে,

বহু পরমতত্ত্ববাদের নাম বহুত্ববাদ।

জগৎ নানাপ্রকার স্বতন্ত্র দ্রব্যের বা বিভিন্ন জাতীয় স্বতন্ত্র তত্ত্বের সমাবেশমাত্র। জগতের সব বস্তুকে এক পরম তত্ত্বের পরিণাম বা প্রকাশ বলা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে যাহাকে আমরা এক জগৎ বলি, তাহা এক নয়; বরং ইহা অনেক বা বহুধা বিভক্ত। জগতে বহু স্বতন্ত্র দ্রব্য বা তত্ত্ব বিদ্যমান, তাহাদের একত্র অবস্থান এবং পরস্পর সম্বন্ধ একটা আকস্মিক ব্যাপারমাত্র। এইরূপ দার্শনিক মতকে বহুতত্ত্ববাদ বা বহুত্ববাদ বলে। বহুত্ববাদ প্রধানতঃ দুইপ্রকারের হইতে পারে, যথা জড়পরমাণুবাদ এবং চেতনপরমাণুবাদ।

ইহা দুইপ্রকার।

(১) জড়-পরমাণুবাদ
(Materialistic Atomism)

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসে গ্রীক্ দার্শনিক ডিমক্রিটাস জড়-পরমাণুবাদ প্রবর্তন করেন। তাঁহার মতে সাবয়ব জড়-দ্রব্যকে উহার অবয়বে বিভক্ত করিতে করিতে যেসব ক্ষুদ্রতম ও অবিভাজ্য কণা পাওয়া যায়, তাহাদের সংযোগদ্বারা উহা গঠিত হয়। এই ক্ষুদ্রতম কণার নাম পরমাণু। পরমাণুর উৎপত্তি হয় না; ইহা স্বপ্রতিষ্ঠ, নিত্য পদার্থ। এরূপ অসংখ্য পরমাণু জাগতিক সকল পদার্থের মৌলিক উপাদান। প্রত্যেক পরমাণুর স্বতন্ত্র সত্তা আছে, ইহাদের কেহ কাহারও উপর নির্ভর করে না। পরমাণুসকলের আকারপ্রকারগত ভেদ আছে, গুণগত ভেদ নাই, গুণ হিসাবে সকল পরমাণুই একরূপ।

(১) জড়পরমাণুবাদ।

এইরূপ পরমাণুবাদের উপর জড়বাদের (materialism) প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। জড়বাদ অনুসারে সৃষ্টির আদিতে কেবল অসংখ্য পরমাণুই মহাশূন্যে অর্থাৎ মহাকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। এসব পরমাণু নিজ নিজ স্বভাববশে ঘূর্ণায়মান হয় এবং পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করে। অনন্ত দেশ ও কালে পরমাণুসমূহের ঘূর্ণনের ফলে তাহাদের আকস্মিক সংযোগ ও বিয়োগ ঘটে। এরূপ পরমাণু সংযোগ ও বিয়োগদ্বারা প্রথমে জড় বস্তুসকলের এবং তাহাদের সকল গুণ-ধর্মের উৎপত্তি হয়। তৎপরে জড়-দ্রব্যসমূহের উপাদানভূত পরমাণুসকলের সুচারু সন্নিবেশ হইতে প্রাণের ও জীবদেহের উৎপত্তি হয়। জীবদেহে স্নায়ুপুঞ্জ ও মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইতে মন ও চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। মন বা চৈতন্য জড়েরই বিকার, ইহা মস্তিষ্কের ক্রিয়ামাত্র। দেহাতিরিক্ত কোন চেতন আত্মা নাই। চৈতন্য মস্তিষ্কের গতিক্রিয়ার (motion) ছায়ামাত্র, ইহার কোন

ইহার উপর জড়বাদের প্রতিষ্ঠা।

পৃথক্ নিজস্ব সত্তা নাই। জগতের সৃষ্টি ও স্থিতির জন্য ঈশ্বরের কল্পনা অনাবশ্যক। জড়-পরমাণুসমূহের আকস্মিক সংযোগ-বিয়োগদ্বারাই জাগতিক সকল বস্তুর উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় বুঝা যায়। জড়বাদে আত্মা ও ঈশ্বরের কোন স্থান নাই।

জড়-পরমাণুবাদ বা জড়বাদের বিরুদ্ধে কতকগুলি আপত্তি হইতে পারে।

ইহার বিরুদ্ধে আপত্তিসমূহ।

প্রথমতঃ বহু স্বতন্ত্র দ্রব্য কিরূপে একযোগে ক্রিয়া করিতে পারে এবং কিরূপেই বা তাহাদের সহযোগিতাদ্বারা সুসম্বদ্ধ বিশ্বের রচনা হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। অসংখ্য পরমাণুর প্রত্যেকটি যদি স্বতন্ত্র ও স্বপ্রতিষ্ঠ হয়, তবে তাহাদিগকে কোনরূপেই একত্র মিলিত ও সংঘবদ্ধ করা যায় না। পরন্তু তাহারা চিরকালই বিচ্ছিন্ন থাকিবে এবং কেহ কাহাকেও স্পর্শ করিতে বা জানিতে পারিবে না। এরূপ হইলে তাহাদের মিলনে কোন সুশৃঙ্খল বিশ্বের রচনা সম্ভব হইবে না। দ্বিতীয়তঃ জড়বাদে দেশ-কাল, অসংখ্য পরমাণু, তাহাদের আকর্ষণ-বিকর্ষণ, সংযোগ-বিয়োগ প্রভৃতি সকল বিষয়ই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে, ইহাদের কোন সঙ্গত কারণ দেখান হয় না। অতএব জড়বাদ বিশ্বব্যাপার বুঝিতে বিশেষ সহায়তা করে না। তৎপরে জড়-পরমাণু হইতে কিরূপে প্রাণ ও মনের বা চৈতন্যের উৎপত্তি হইতে পারে তাহা বুঝা যায় না। জড় দ্রব্যের সব ক্রিয়াই এক না একপ্রকার গতিক্রিয়া এবং ইহার কার্যও গতিক্রিয়ার রূপান্তর (transformation of motion)। কিন্তু মন বা চৈতন্য গতিক্রিয়া নহে। অতএব মন বা চৈতন্যকে মস্তিষ্কের গতিক্রিয়ার রূপান্তর বলা যায় না। এজন্য বলিতে হয় যে, জড়বাদে প্রাণ, মন ও চৈতন্যের উৎপত্তির কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা করা হয় নাই। তারপর মন ও চৈতন্যকে যে মস্তিষ্কের ছায়ামাত্র (by-product) বলা হইয়াছে তাহাও ঠিক নয়। মন ও চৈতন্য সক্রিয় সদ্বস্তু, দেহ ও দেহের ক্রিয়ার উপর ইহাদের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। অতএব মন ও চৈতন্য দেহের ক্রিয়ার নিষ্ক্রিয় ছায়ামাত্র নয়। শেষকথা, জড়-দ্রব্য ও জড়-পরমাণু আমাদের সাক্ষাৎ প্রতীতি বা প্রত্যক্ষগোচর বস্তু নয়। আমরা মন বা চৈতন্যকেই সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারি। জড়-দ্রব্য বা পরমাণুকে মন বা চৈতন্যদ্বারাই জানিতে হয়। অতএব দেখা যায়, যে মন বা চৈতন্য জড়ের উৎপত্তির কারণ, জড়বাদে তাহাকেই জড়দ্রব্যের কার্য বলা হইয়াছে। যদি জড়দ্রব্যকে আমাদের সংবেদনের কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবে বলিতে হইবে যে, জড়দ্রব্য সংবেদনের কারণরূপে অনুমিত হয়। কিন্তু চৈতন্য ব্যতীত অনুমান হয় না। অতএব জড়ের অস্তিত্ব চৈতন্যের উপর নির্ভর করে। এইসব কারণে জড়বাদ গ্রহণীয় নয়।

(২) চেতন-পরমাণুবাদ
(Spiritualistic Atomism)

(২) চেতন-পরমাণুবাদ (theory of monads)।

বহুত্ববাদ আর এক প্রকারের হইতে পারে। ইহাকে চেতন-পরমাণুবাদ বলা যায়। ইহাতে জড়-পরমাণুর পরিবর্তে সজীব ও সচেতন ক্ষুদ্রতম দ্রব্যসমূহকে জগতের মৌলিক উপাদানরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। জড়-পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা আমাদের অনুমানগম্য। আত্মাই আমাদের প্রত্যক্ষীভূত, অবিভাজ্য ও ক্ষুদ্রতম দ্রব্য। অতএব জগতের মূল ও উপাদানভূত দ্রব্যগুলিকে আত্মার ন্যায় চেতন দ্রব্য বা পরমাণু বলিতে হয়। জার্মান দার্শনিক লাইব্‌নিজ ইহাদিগকে 'monads' বলিয়াছেন। এজন্য তাঁহার মতকে 'monadism' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। লাইব্‌নিজের 'monadism' চেতন-পরমাণুবাদের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাঁহার মতে অসংখ্য চেতন-পরমাণু জগতের মূল উপাদান। ইহারা পরমাণুর ন্যায় ক্ষুদ্রতম ও অবিভাজ্য দ্রব্য, কিন্তু আত্মার ন্যায় সজীব ও সচেতন। অবশ্য সকল চেতন-পরমাণু সমভাবে সচেতন নয়। কিন্তু ন্যূনাধিকভাবে সকল পরমাণুতেই চৈতন্য বিদ্যমান। চেতন-পরমাণুগুলি স্বতন্ত্র এবং কেহ কাহার উপর কোন ক্রিয়া করে না, বা প্রভাব বিস্তার করে না। প্রত্যেকটির নিজ স্বভাব অনুসারে নিজের মধ্যেই পরিণাম ঘটে। তথাপি একটি চেতন-পরমাণুতে অন্যান্য চেতন-পরমাণুর পরিণামের প্রতিবিম্ব পড়ে এবং তাহাতেই ইহার বহির্জগতের প্রত্যক্ষ হয়। প্রত্যেক চেতন-পরমাণুর অভ্যন্তরে যেসব পরিণাম ঘটে, তদ্দ্বারা উহার চৈতন্যের বিকাশ হয় এবং উহা স্বপ্রকাশ আত্মারূপে (self-conscious soul) প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্যই সকল চেতন-পরমাণুর পরিবর্তন ঘটে এবং পরিবর্তনগুলি প্রতিবিম্বিত হইলে ইহারা পরস্পরকে জানিতে পারে।

ইহার বিপক্ষে যুক্তি

কিন্তু চেতন-পরমাণুবাদ একপ্রকার বহুত্ববাদ এবং বহুত্ববাদমাত্রেরই যে দোষ-ত্রুটি, তাহা ইহাতেও দেখা যায়। বহু স্বতন্ত্র ও স্বরূপতঃ সম্বন্ধবর্জিত চেতন-পরমাণু কিরূপে সম্বন্ধ হইতে পারে এবং কিরূপেই বা তাহাদের মিলনে এ সুশৃঙ্খল জগতের রচনা হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া লাইব্‌নিজ্ পরিশেষে চেতন-পরমাণুসকলের স্রষ্টারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ঈশ্বর চেতন-পরমাণুসমূহ সৃষ্টি করিবার সময় তাহাদের ভবিষ্যৎ পরিণামের ক্রম এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন যে, একটির পরিবর্তনের সমকালে অন্যগুলির তদনুরূপ পরিবর্তন ঘটে এবং এরূপে

তাহাদের মধ্যে এক মিলনসূত্র স্থাপিত হয়। যেমন কতকগুলি ঘড়ি এক সময়ে চালাইয়া দিলে পরস্পরের সহিত মিল রাখিয়া চলিতে থাকে, সেইরূপে চেতন-পরমাণুসমূহ পরস্পরের সহিত মিলন রক্ষা করিয়া চলে। ইহা তাহাদের ঈশ্বর কর্তৃক পূর্বনিয়ন্ত্রিত মিলন (pre-established harmony) এবং ইহাদ্বারা তাহারা সুশৃঙ্খল জগৎ রচনা করে। কিন্তু এরূপ হইলে বলিতে হয় যে, বাস্তবিকপক্ষে এক ঈশ্বরই জগৎ-স্রষ্টা। ইহাতে বহুত্ববাদের উচ্ছেদ এবং একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা হয়। হারমান লট্‌সের দার্শনিক মতে বহুত্ব-বাদের এরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে। তিনি সব চেতনপরমাণুকে (monads) এক অদ্বিতীয় সত্তার অর্থাৎ পরমাত্মার অঙ্গীভূত করিয়াছেন।

২। দ্বৈতবাদ
(Dualism)

দুই পরম তত্ত্ববাদের নাম দ্বৈতবাদ।

বাহ্য প্রত্যক্ষে যেমন জড়দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ আন্তর বা মানসিক প্রত্যক্ষে মন বা আত্মাকে স্বতন্ত্র দ্রব্যরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। কোন কোন দার্শনিক উভয়প্রকার প্রত্যক্ষ যথার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। এজন্য তাঁহারা জড়দ্রব্য ও আত্মা, দেহ ও মন উভয়কেই স্বতন্ত্র, স্বপ্রতিষ্ঠ ও পরম দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করেন। অতএব তাহাদের মতে পরম তত্ত্ব দুইটি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র দ্রব্য। এজন্য তাঁহাদের মতকে দ্বৈতবাদ বলে।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসে প্লেটো ও আরিষ্টটলের দর্শনে দ্বৈতবাদের সূচনা ও প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহারা জড়দ্রব্য এবং ঈশ্বরকে দুইটি স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণরূপে ভিন্নপ্রকার তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পরবর্তী কালে রেণে ডেকার্টের দর্শনে আত্মা (soul) ও জড়দ্রব্যকে (matter) দুইটি স্বতন্ত্র দ্রব্যরূপে স্বীকার করায় দ্বৈতবাদের পুনরভ্যুত্থান ঘটে। ডেকার্টের মতে আত্মার বিশেষ গুণ হইল চৈতন্য (consciousness)। পক্ষান্তরে, জড়দ্রব্যের বিশেষ গুণ হইল প্রদেশবত্ত্ব বা দৈশিক বিস্তার (extension)। ইহারা একেবারে বিপরীতধর্ম-বিশিষ্ট এবং পরস্পর-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র দ্রব্য।

দ্বৈতমতে জড় ও আত্মার, দেহ ও মনের সম্বন্ধ

কিন্তু দ্বৈতবাদ স্বীকার করিলে জড় ও আত্মার, তথা দেহ ও মনের সম্বন্ধ বুঝা সুকঠিন হয়। যদি ইহারা বিপরীত-ধর্মী স্বতন্ত্র দ্রব্য হয়, তবে কিরূপে ইহাদের সম্বন্ধ হইতে পারে, কিরূপেই বা একটির পরিবর্তনের সহিত অপরটির পরিবর্তনের মিল থাকিতে পারে? ডেকার্টের মতে দেহ জড় ও প্রদেশবৎ দ্রব্য, ইহার সকল কার্যই গতিক্রিয়ার এক না একপ্রকার রূপ (form of motion)। কিন্তু মন শুদ্ধ চেতন-দ্রব্য, তাহাতে

গতিক্রিয়া নাই। অতএব কিরূপে দেহের ক্রিয়া মনের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে এবং মনের চিন্তা বা চিত্তবৃত্তি দেহের অবস্থান্তর করিতে পারে? ইহাই হইল দ্বৈতবাদের প্রধান সমস্যা। ডেকার্ট অবশ্য ইহাদের পারস্পরিক কার্যকারণ সম্বন্ধ (interaction) স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে দেহ মনের উপর ক্রিয়া করিতে পারে এবং মনও দেহের উপর ক্রিয়া করিতে পারে। কিন্তু তাঁহার অনুগামী দার্শনিকগণ তাঁহার মত সঙ্গত মনে করেন না। তাঁহারা এবিষয়ে অন্যরূপ মত পোষণ করেন।

(১) কার্যকারণতা সম্বন্ধ।

ডেকার্টের অনুগামী দার্শনিক মালেব্রাঙ্ক (Malebranche) দেহ ও মনের সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য উপলক্ষণ কারণের (theory of occasional cause) অবতারণা করিয়াছেন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ এবং সর্বত্র বিরাজমান। যখনই কোন বাহ্য দ্রব্য আমাদের দেহের উপর কোন ক্রিয়া করে, তখনই ঈশ্বর আমাদের মনে তাহার সংবেদন জাগ্রত করেন। আবার যখন আমরা কোন কাজ করিবার জন্য ইচ্ছা ও প্রযত্ন করি, তখন ঈশ্বর আমাদের দেহে গতিক্রিয়ার সঞ্চার করেন। অতএব ঈশ্বরই আমাদের মানসিক সংবেদন এবং দৈহিক ক্রিয়ার প্রকৃত কারণ, দেহের ক্রিয়া বা মনের প্রযত্ন কারণ নয়, উহারা ঈশ্বরের শক্তি প্রয়োগের ও কার্য করিবার উপলক্ষণ বা সংকেতমাত্র। অতএব দেহ ও মনের মধ্যে কোন কার্যকারণসম্বন্ধ নাই।

(২) উপলক্ষণ-কারণতা সম্বন্ধ।

লাইব্‌নিজ এবিষয়ে যে মত পোষণ করেন, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার মতে দেহ মনের উপর কোন ক্রিয়া করে না, মনও দেহের উপর কোন ক্রিয়া করে না। ঈশ্বর দেহ ও মন সৃষ্টি করিবার সময় তাহাদের নিজ নিজ ক্রিয়া এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন যে, প্রত্যেক দৈহিক ক্রিয়া মানসিক ক্রিয়ার সহিত এবং প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়া দৈহিক ক্রিয়ার সহিত মিল রক্ষা করিয়া চলে, মনের সংবেদন ও প্রযত্নের সহিত দেহের গতিক্রিয়ার মিলন রক্ষিত হয়। দেহ ও মনের কার্যকারণসম্বন্ধ নাই, তাহাদের কার্যের মধ্যে যে মিল বা সংগতি দেখা যায়, তাহা ঈশ্বর কর্তৃক পূর্বনিয়ন্ত্রিত (theory of pre-established harmony)।

(৩) পূর্বনিয়ন্ত্রিত মিলন সম্বন্ধ।

ডেকার্টের পরবর্তিকালীন প্রসিদ্ধ দার্শনিক স্পিনোজা দেহ ও মনের কার্যকারণসম্বন্ধ স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে দেহ ও মন দ্রব্যই নয়। ঈশ্বরই একমাত্র দ্রব্য (substance)। জড় ও চেতন সত্তা পৃথক্ দ্রব্য নয়, ইহারা একমাত্র দ্রব্য, ঈশ্বরের গুণমাত্র (attributes)। আমাদের দেহ ও মন এই দুইটি গুণের প্রকারভেদ বা রূপভেদ (modes)। যেহেতু জড় ও

(৪) সমান্তরাল রেখার মত সাহচর্য সম্বন্ধ।

চেতন সত্তা দুইটি পৃথক্ দ্রব্য নয়, পরন্তু একই দ্রব্যের দুইটি গুণ, ইহারা কেহ কাহারও উপর কোন ক্রিয়া করিতে পারে না। কারণ কোন দ্রব্য নিজের উপরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (interact) করে না। তথাপি জড় ও চেতনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, কারণ ইহারা একই দ্রব্যের দুইটি গুণ। যাহা একদিকে জড়ের প্রকারভেদ বা রূপভেদ (mode of extension) বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাই অন্যদিকে চৈতন্যের প্রকারভেদ বা রূপভেদ (mode of thought) বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। অতএব দেহ ও মন, জড় ও চেতন সত্তার প্রকার-ভেদরূপে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে। দেহের প্রত্যেক ক্রিয়া বা পরিবর্তনের অনুরূপ মানসিক ক্রিয়া বা পরিবর্তন হয় এবং মনের প্রত্যেক ক্রিয়া বা পরিবর্তনের অনুরূপ দৈহিক ক্রিয়া বা পরিবর্তন হয়। ইহারা দুইটি সমান্তরাল রেখার (parallel lines) মত সর্বত্র সামঞ্জস্য ও সাহচর্য রক্ষা করিয়া চলে, যদিচ তাহাদের কোন কার্যকারণসম্বন্ধ নাই। দেহ ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ে স্পিনোজার এই মতকে theory of parallelism or psycho-physical parallelism বলা হয়।

এ বিষয়ে মন্তব্য।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসে দ্বৈতবাদের মূলেই দেহ ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ে কঠিন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে এবং তাহা সমাধানের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে মনে হয়। এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, দেহ ও মন সম্বন্ধে দ্বৈতমূলক ধারণাই ভ্রান্ত। দেহ ও মন দুইটি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র দ্রব্য বা বস্তু নহে এবং জীবদেহ উহাদের সংযোগে গঠিত নয়। জীবদেহে বিশেষতঃ নরদেহে স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইটি শরীর আছে। সাধারণতঃ স্থূল শরীরকে দেহ এবং সূক্ষ্ম শরীরকে মন বলা হয়। কিন্তু দেহ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সংঘাত বা সমষ্টি, ইহা একটি দ্রব্য এবং দেহের সকল কার্যেই উভয় শরীর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা দেহ-মন অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বারাই চিন্তা ও প্রযত্ন করি এবং বাহ্য দৈহিক ক্রিয়া করি। অতএব দেহ-মনের সম্বন্ধের সমস্যা উঠে না, কারণ ইহারা দুইটি ভিন্ন দ্রব্যই নয়।১

১ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর সম্বন্ধে দশম অধ্যায়, ১৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩। একত্ববাদ
(Monism)

যে দার্শনিক মত অনুসারে পরম তত্ত্ব (absolute reality) এক, অদ্বিতীয় ও স্বতন্ত্র, এবং অন্য সব বস্তুর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব তাহার উপর নির্ভরশীল, তাহাকে একত্ববাদ বলে। স্বপ্রতিষ্ঠ পরম তত্ত্বের সহিত জীবজগতের সম্বন্ধ তিনপ্রকার হইতে পারে। প্রথমতঃ বলা যাইতে পারে যে, পরম তত্ত্বই একমাত্র তত্ত্ব বা সত্য, এবং জীবজগৎ মিথ্যা, অসত্য ও মায়াময়। দ্বিতীয়তঃ বলা যায় যে, জীবজগতের পৃথক্ ও স্বতন্ত্র সত্তা আছে বটে, কিন্তু ইহার স্বতন্ত্র সত্তা পরম তত্ত্ব হইতে প্রাপ্ত। পরম তত্ত্ব হইতে জীবজগতের সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু এরূপ সৃষ্টি না হইলেও পরম তত্ত্বের কোন হানি বা ক্ষতি হয় না। অতএব জীবজগতের অস্তিত্ব আপেক্ষিক ও সাময়িকমাত্র, ইহার নিত্য ও নিরপেক্ষ সত্তা নাই। পরিশেষে বলা যায়, পরম তত্ত্বের স্বভাবই এরূপ যে, ইহা জীবজগতে প্রকাশিত হয় এবং তদ্দ্বারা নিজ পূর্ণ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব পরম তত্ত্ব ও জীবজগৎ পরস্পর-সাপেক্ষ এবং উভয়ের মিলনে পূর্ণ, প্রাণবন্ত ও বাস্তব তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। এই তিনপ্রকার সম্বন্ধ অনুসারে একত্ববাদের তিনপ্রকার ভেদ হইতে পারে।

এক পরম তত্ত্ববাদের নাম একত্ববাদ।

(১) কেবলৈকত্ববাদ
(Abstract Monism)

যে মত অনুসারে কেবল একত্বই সত্য, অনেকত্ব অসৎ ও মিথ্যা, তাহাকে কেবলৈকত্ববাদ বলা যায়। এমতে পরম তত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয়, ইহা নির্গুণ ও নির্বিশেষ, ইহাতে বিষয়গত বা গুণগত কোন ভেদ নাই। অতএব এই বৈচিত্র্যময় জগতের পরম তত্ত্বে কোন স্থান নাই। ইহা আমাদের মনের কল্পনা বা অবভাসমাত্র, ইহার মনোনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা নাই। এরূপ একত্ববাদে কেবল এককেই স্বীকার এবং বহুকে অস্বীকার করা হইয়াছে। যদি ঈশ্বর এই একস্থানীয় তত্ত্ব হন, তবে ঈশ্বরই সর্বময় তত্ত্ব হইবেন এবং ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর প্রকৃত সত্তা বা অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইবে না। এজন্য এরূপ মতকে pantheism অর্থাৎ সর্বেশ্বরবাদ বা বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদ বলা হয়। ইহাতে জীবজগতের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হওয়ায়, ইহাকে acosmism অর্থাৎ সর্ব-শূন্যবাদ বা জগৎ-নিরাকরণবাদও বলা হয়।

কেবলৈকত্ববাদের লক্ষণ।

CENTRAL LIBRARY

(২) আপেক্ষিক দ্বৈতবাদ
(Conditional Dualism)

আপেক্ষিক দ্বৈতবাদকেও একপ্রকার একত্ববাদ বলা যায়। এ মত অনুসারে একটিমাত্র স্বপ্রতিষ্ঠ (self-existent) ও স্বতন্ত্র পরম তত্ত্ব আছে। কিন্তু ইহা হইতে অন্য আর একটি তত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। সৃষ্টির পরে এই তত্ত্ব স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান আছে। অতএব ইহা স্বপ্রতিষ্ঠ না হইলেও এবং প্রথমে পরম তত্ত্ব কর্তৃক সৃষ্ট হইলেও বর্তমানে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে বিরাজমান আছে। সৃষ্টির পূর্বে জীবজগৎ কিছুই ছিল না, এক মহাশূন্য-মাত্র ছিল। তখন পরম তত্ত্ব একাকী নিঃসংগভাবে স্বসত্তায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালে ইহা মহাশূন্য হইতে জড় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক নিয়মাবলী রচনা করিল এবং অসংখ্য জীবাত্মা সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রদান করিল। এইভাবে পরম তত্ত্ব সৃষ্ট-জীবজগৎকে পৃথক্ স্বতন্ত্র সত্তা দান করিল। অতঃপর জীবজগৎ স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে বিদ্যমান আছে এবং নিজ শক্তি ও নিয়মানুসারে চলিতেছে। যেমন কোন শিল্পী বহির্জগৎ হইতে উপাদান সংগ্রহপূর্বক কোন যন্ত্র নির্মাণ করিয়া উহাকে চালাইয়া দিলে উহা নিজে চলিতে থাকে, সেইরূপ জীবজগৎ মহাশূন্য হইতে পরম তত্ত্ব কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে ও স্বাধীনভাবে চলিতেছে। অতএব পরম তত্ত্ব এক হইলেও ইহা আর এক স্বতন্ত্র তত্ত্ব সৃষ্টি করিয়াছে। এরূপ মত অনুসারে ঈশ্বরকে জীবজগতের নির্মাতা হিসাবে স্রষ্টা বলা হয়, কিন্তু তাঁহার সহিত জীবজগতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় না। ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ মতকে deism অর্থাৎ বিশ্বাতীত-ঈশ্বরবাদ বলা হয়, কারণ ইহাতে ঈশ্বরকে জীবজগতের অতীত এবং উহার সহিত সম্পর্কশূন্য বলা হইয়াছে।

আপেক্ষিক দ্বৈতবাদ একপ্রকার একত্ববাদ।

(৩) বিশিষ্টৈকত্ববাদ
(Concrete Monism)

যে মত অনুসারে এক ও বহু উভয়ই সদ্বস্তু এবং উভয়ের মিলনেই পরম তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাকে বিশিষ্টৈকত্ববাদ বলা যায়। কেবলৈকত্ববাদে পরম তত্ত্বকে ভেদবর্জিত ও বিশেষণরহিত বলা হয় এবং জীবজগৎকে অসত্য বলিয়া উহার সহিত পরম তত্ত্বের কোন সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় না। কিন্তু বিশিষ্টৈকত্ববাদ অনুসারে জীবজগৎ মিথ্যা নয়, উহা পরম তত্ত্বের আত্মভূত ও

এক সবিশেষ পরম তত্ত্ববাদের নাম বিশিষ্টৈকত্ববাদ।

অন্তর্গত। পরম তত্ত্ব জীবজগৎ-বিশিষ্ট, উহা এক হইলেও বহুত্ববর্জিত নয়, বরং বহুত্ববিশিষ্ট এবং বহুতে অনুপ্রবিষ্ট। আপেক্ষিক দ্বৈতবাদ-মতে জীবজগৎ পরম তত্ত্বের বহির্ভূত ও স্বতন্ত্র তত্ত্ব। বিশিষ্টৈকত্ববাদে পরম তত্ত্ব ও জীবজগৎ অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধযুক্ত এবং একটি ব্যতীত অপরটি অসত্য ও অবাস্তব হইয়া পড়ে। পরম তত্ত্ব স্বভাবতঃই জীবজগদ্-রূপে প্রকাশিত হয় এবং তদ্দ্বারা ইহা পূর্ণতা লাভ করিয়া বাস্তব রূপ ধারণ করে ও স্বপ্রকাশ আত্মারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতএব পরম তত্ত্ব ও জীবজগৎ পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব নয়, উহারা পরস্পরের পরিপূরক, উভয়ের মিলনে এক বাস্তব তত্ত্বের (concrete reality) বিকাশ হইয়াছে। অগ্রে অর্থাৎ প্রথমে পরম তত্ত্ব সদ্-রূপে বিদ্যমান ছিল। এক সৎ হইতে বহুর উৎপত্তি হইল এবং তাহার মধ্যেই ইহারা সন্নিবিষ্ট ও সম্বন্ধযুক্ত হইল। এইভাবে বহু জড় দ্রব্য ও চেতন আত্মা এক বিশ্বব্যাপী সত্তার অঙ্গরূপে পরস্পর সহযোগিতা করিয়া তাহার পূর্ণতা ও পরাকাষ্ঠা সম্পাদন করিল। এক বহুর বিরোধী নয়, একটি অপরের বহির্ভূত নয়। এক ও বহুর মিলনই হইল বাস্তব ও পূর্ণ পরম তত্ত্ব। এক ও সন্মাত্ররূপে পরম তত্ত্ব অবাস্তব (abstract) ও অপূর্ণ থাকে, বহু ও জীবজগদ্-বিশিষ্ট হইয়া ইহা বাস্তব (concrete) ও পূর্ণ হয়। অবশ্য বৈচিত্র্যময় জীবজগৎ পরম তত্ত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক্ হইয়া থাকিতে পারে না, কারণ ইহা পরম তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং তাহাতেই অবস্থিত আছে। পক্ষান্তরে, পরম তত্ত্বও জীবজগদ্-বর্জিত হইয়া থাকিতে পারে না, কারণ জীবজগতের মাধ্যমেই ইহার বাস্তব সত্তার বিকাশ হয় এবং ইহা বাস্তব ও জীবন্ত হইয়া উঠে। জীবজগৎই ইহার প্রাণকেন্দ্র ও প্রাণের স্পন্দন, তাহার অভাবে ইহা নির্জীব, নিষ্ক্রিয় ও অবাস্তব সত্তামাত্রে পরিণত হয়। পরম তত্ত্ব অনাদি ও অনন্ত কাল জীবজগৎ সৃষ্টি করিতেছে, ইহার অফুরন্ত সৃষ্টিশক্তি অনন্ত কালে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রবাহিত হইতেছে। অতএব বলিতে হয়, পরম তত্ত্ব জীবজগদ্-রূপে প্রকাশিত হইয়াই নিজ স্বরূপে অবস্থান করে। এ মতে পরম তত্ত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে জীবজগতের আপেক্ষিক সত্তা (relative reality) অবশ্য স্বীকার্য।

এক ও বহুর, পরমতত্ত্ব ও জীবজগতের সম্বন্ধ।

এইভাবে এক ও বহুর অর্থাৎ পরম তত্ত্ব ও জীবজগতের সম্বন্ধ বুঝিলে, আমাদের ঈশ্বরবিষয়ক প্রত্যয় কিরূপ হইবে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যায়। এমতে ঈশ্বরকেই (God) পরম তত্ত্ব স্থানীয় (absolute) বলিতে হয়। কিন্তু পরম তত্ত্ব অনন্ত ও নির্বিশেষ সৎ-মাত্র, ইহা নির্বিষয় ভাবরূপ সত্তামাত্র (abstract potentiality)। পক্ষান্তরে, ঈশ্বর স্বপ্রকাশ

বিশিষ্টৈকত্ববাদে ঈশ্বরের প্রত্যয়।

CENTRAL LIBRARY

চৈতন্য অর্থাৎ পরম পুরুষ। এখন প্রশ্ন হইতেছে, কিরূপে ঈশ্বরকে পরম তত্ত্বও (absolute) বলা যায় এবং স্বপ্রকাশ পরম পুরুষও (self-conscious person) বলা যায়? পৌরুষেয় চৈতন্য স্বভাবতঃ বিষয়কে প্রকাশ করে। নির্বিষয় চৈতন্য পুরুষে সম্ভব নয়। অতএব বিষয় না থাকিলে পৌরুষেয় চৈতন্য প্রকাশিত হয় না। এখন পরম পুরুষ ঈশ্বরের চৈতন্যের বিষয় কি হইবে? পরম তত্ত্বরূপে তিনি ত এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি ব্যতীত কোন দ্বিতীয় বস্তু বা বিষয়ই নাই। অতএব তাঁহার পক্ষে স্বপ্রকাশ চৈতন্য বা পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর নয়। এই সমস্যার সমাধান এইরূপ-ভাবে করা যায়। পরম তত্ত্ব নিজ পরমা শক্তিযোগে লীলায়িত হইয়া জীবজগৎ সৃষ্টি করে এবং নিজেকে তাহার কর্তা, জ্ঞাতা ও বিধাতারূপে অবগত হয়। সৃষ্ট জীবজগৎ ও তাহার বৈচিত্র্য পরম তত্ত্বের চৈতন্যের বিষয়ীভূত হইয়া তাহাতেই অবস্থান করে। অতএব পরম তত্ত্বের স্বগত বিষয়ভেদই ইহাকে স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপে প্রকাশিত করে; ইহা যেন সুপ্ত আত্মার জাগরণ এবং আত্মনিষ্ঠ প্রত্যয়রাজির দর্শন। অতএব পরম তত্ত্বই ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হয়। পরম তত্ত্ব ও ঈশ্বর দুই তত্ত্ব নয়। ইহারা একই তত্ত্বের প্রকাশভেদমাত্র। জগদ্রূপে অপ্রকাশিত যে তত্ত্বকে পরম তত্ত্ব (absolute) বলে, জীবজগদ্‌-রূপে প্রকাশিত সেই তত্ত্বকেই পরমেশ্বর (God) বলে এবং ইহার স্বভাবই এরূপ যে, ইহা জীবজগদ্‌-রূপে প্রকাশিত হয়।

এ মতে ঈশ্বর বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত

বিশিষ্টৈকত্ববাদ অনুসারে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে মত বিবৃত হইল, তাহাকে বিশ্বাতীত-ঈশ্বরবাদ (deism) অথবা বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদ (pantheism) বলা যায় না। এমতে ঈশ্বরকে বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত দুইই বলিতে হয়। কারণ জগতের স্রষ্টা ও জ্ঞাতারূপে তিনি বিশ্বাতীত, কিন্তু জীবজগৎ তাঁহারই প্রকাশ এবং তিনি তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া তিনি বিশ্বগত। অতএব এ মতকে বিশ্বাতীত-ও-বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদ (panentheism) বলিতে হয়। এ মতে সবই ঈশ্বর (God is all) নয়, তবে সবই ঈশ্বরের অন্তঃস্থ বা অন্তর্ভূত (all are in God)। এবিষয়ের বিশদ আলোচনা পরে করা যাইবে।

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রাকৃতিক জগদ্‌-বিষয়ক মতবাদ

(Theories of Nature)

প্রাকৃতিক জগৎ জড় ও প্রাণের সমষ্টি।

আমাদের প্রত্যক্ষগোচর প্রাকৃতিক জগৎ দেশ ও কালে অবস্থিত অসংখ্য জড় ও জীবন্ত দ্রব্যের বিরাট সমাবেশ। ইহারা নিরন্তর পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করিতেছে এবং পরস্পরের পরিবর্তন সাধন করিতেছে। ইহাদের মধ্যে একটা যোগসূত্র বা ঐক্য আছে এবং তাহার মূলেই ইহারা এক বৈচিত্র্যময় জগতের অংশরূপে বিদ্যমান আছে। জড়-জগৎ ও জীবজগৎ প্রাকৃতিক জগতের দুইটি প্রধান ভাগ বা অংশ। প্রাকৃতিক জগৎ সম্বন্ধে প্রধান প্রশ্নগুলি এইরূপ: জড় ও প্রাণের লক্ষণ কি? কিরূপে তাহাদের উৎপত্তি হইল? কিরূপেই বা প্রাকৃতিক জগতের উৎপত্তি হইল? এখানে এই প্রশ্নগুলির আলোচনা করা যাইবে।

১। জড়ের লক্ষণ ও গুণ

(Matter and its Attributes)

জড়ের লক্ষণ।

যে দ্রব্য কোন দেশ পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করে এবং তাহার মধ্য দিয়া অন্য দ্রব্যের গতি রোধ করে, তাহার নাম জড়। দেশ ব্যাপিয়া থাকা (filling space) এবং তাহার মধ্য দিয়া গতি রোধ করা (impenetrability) জড়ের স্বরূপগত লক্ষণ।

জড়ের মুখ্য গুণ।

অবশ্য জড়ের এই দুইটি ধর্ম একেবারে ভিন্ন নয়, কারণ কোন দেশের মধ্য দিয়া কোন দ্রব্যের গতি রুদ্ধ হইলে বুঝিতে হইবে যে, সেই দেশ পরিব্যাপ্ত বা ভরিত (filled) আছে। জড়ের আর একটি প্রধান গুণ হইল যে, ইহা চল (mobile), অর্থাৎ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে পারে। জড়মাত্রে চলত্ব (mobility), অর্থাৎ গতিক্রিয়াসামর্থ্য (capacity of motion) ধর্ম আছে। ইহার জন্যই জড়দ্রব্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে অথবা ইহাকে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয়। দেশব্যাপিত্ব (extension), অভেদ্যত্ব অর্থাৎ

তদ্ব্যাপ্ত দেশের মধ্য দিয়া গতিরোধের সামর্থ্য (impenetrability), জাড্য (inertia) অর্থাৎ যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকিবার প্রবৃত্তি এবং চলত্ব (mobility) প্রভৃতিকে জড়ের মুখ্য গুণ (primary qualities) বলে।

মুখ্য গুণ ব্যতীত জড়ের আরও কতকগুলি গুণ আছে—যথা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। এ গুণগুলিকে উহার গৌণ গুণ (secondary qualities) বলে। ইহারা মুখ্য গুণের পরিণতি, অর্থাৎ মুখ্য গুণগুলি ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করিলে ইহারা উৎপন্ন হয়। কোন জড়দ্রব্য অণু ও পরমাণুদ্বারা (molecules and atoms) গঠিত হইলে, তাহার উপাদানভূত অণু-পরমাণুর সংস্থান, সমাবেশ ও গতিক্রিয়া হইতে রূপ-রস প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন হয়। যেমন দ্রব্যের অভ্যন্তরস্থ অণু-পরমাণুর গতিক্রিয়া হইতে স্পার্শন গুণ তাপ উৎপন্ন হয়, তাহাদের রেণুর আকারে বিচ্ছুরণ এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া হইতে গন্ধ উৎপন্ন হয়। এইরূপে অন্যান্য গৌণ গুণের উৎপত্তি হয়। অতএব জড়ের সকল গুণই তাহার দেশব্যাপিত্ব এবং তদ্গত অণু-পরমাণুর গতিক্রিয়াজন্য বলা যায়। জড়বিজ্ঞানে জড়ের সকল গুণকেই এই দুইটি গুণে পর্যবসিত করা হইয়াছে। অতএব দেশব্যাপিত্ব (extension) এবং গতিক্রিয়াকে (motion) জড়ের মৌলিক গুণ বলা যায়।

জড়ের গৌণ গুণ।

২। জড় সম্বন্ধে প্রাচীন মত
(Ancient Theory of Matter)

প্রাচীন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের মতে জড়দ্রব্যসকল পরমাণুসমূহের সংযোগদ্বারা গঠিত হয় এবং তাহাদের বিয়োগ হইলে বিনষ্ট হয়। পরমাণুসকল সূক্ষ্মতম, অবিভাজ্য ও অবিনশ্বর পদার্থ। আমরা স্থূল জড়দ্রব্যসকল দেখিতে পাই এবং স্পর্শ করিতে পারি। কিন্তু পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব আমরা কিরূপে বলিতে পারি যে, স্থূল জড়দ্রব্য পরমাণু-সংযোগে গঠিত হয়। কিরূপেই বা আমরা পরমাণুর অস্তিত্ব জানিতে পারি? পরমাণুর অস্তিত্ব অনুমানদ্বারা জানা যায়। অনুমান-প্রণালী এইরূপ: কোন দেশকে পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকাই জড়ের মৌলিক গুণ বা ধর্ম। অতএব যে দ্রব্য কোন দেশকে এমনভাবে পরিব্যাপ্ত করে যে, তাহাতে কোন অবকাশ বা রন্ধ্র থাকে না, তাহাকেই প্রকৃষ্ট জড় বলিতে হইবে এবং তাহা জড়দ্রব্যসকলের মূল উপাদান হইবে। এখন যদি কোন জড়দ্রব্যকে তাহার ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাগ করিয়া যাওয়া

জড় সম্বন্ধে প্রাচীন পরমাণুবাদ।

যায়, তবে পরিশেষে আমরা এমন ক্ষুদ্রতম অংশসমূহ পাইব যে, তাহাদের আর ভাগ করা যাইবে না। এইরূপ ক্ষুদ্রতম ও অবিভাজ্য কণাগুলিকেই প্রকৃত ও মৌলিক জড় সত্তা বলিতে হইবে। ইহাদের নাম পরমাণু এবং ইহারা অভেদ্য অবিভাজ্য ও অবিনশ্বর বা নিত্য। কোন অংশভেদ না থাকায় ইহাদের বিভাগ করা যায় না, এবং যাহার অংশবিভাগ হয় না তাহার বিনাশও হয় না। জড়দ্রব্য বলিতে পরমাণুসমূহের সমষ্টি বুঝায়। যেমন পরমাণুসকল নিত্য, সেইরূপ তাহাদের গতিক্রিয়াও (motion) নিত্য। জড়বাদীদের মতে মহাকাশে নিত্য পরমাণুসকলের নিত্য গতিক্রিয়াদ্বারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়।

জড়দ্রব্য পরমাণুসমূহের সমষ্টি, এই মত গ্রীক্ দার্শনিক ডিমক্রিটাস প্রবর্তন করেন। তাঁহার মতে জড় বলিতে অসংখ্য পরমাণু বুঝায়। এসব পরমাণুর কোন গুণগত ভেদ নাই, তবে ইহাদের আকার-প্রকার (size and shape) এবং গতিক্রিয়ার বেগ (velocity of motion) বিষয়ে পার্থক্য আছে। ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে বৈজ্ঞানিক ডাল্‌টন এই মতের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালীন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ জড় সম্বন্ধে পরমাণুবাদই (atomic theory) স্বীকার করিতেন।

৩। জড় সম্বন্ধে আধুনিক মত
(Modern Theory of Matter)

জড় সম্বন্ধে আধুনিক বৈদ্যুতিক-শক্তিবাদ।

আধুনিক কালে জড়সম্বন্ধীয় ধারণার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বকালের বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে, পরমাণু অবিভাজ্য, অভেদ্য ও অযৌগিক (simple) পদার্থ। কিন্তু এখন এ ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আধুনিক জড়বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, পরমাণুকে বিভাগ করা যায় এবং ইহা যৌগিক (complex) পদার্থ। এক একটি পরমাণু এক একটি ব্রহ্মাণ্ড এবং অনন্ত বৈদ্যুতিক শক্তির (electrical energy) আধার। একটি পরমাণুর কেন্দ্রে (nucleus) যোগ-সংজ্ঞক বৈদ্যুতিক-শক্তিবিশিষ্ট (positively electrified) প্রোটন-নামক তড়িৎ-কণা থাকে। কেন্দ্রের চারিদিকে ইলেক্‌ট্রন-নামক বিয়োগ-সংজ্ঞক বৈদ্যুতিক-শক্তি-বিশিষ্ট (negatively electrified) এক বা একাধিক তড়িৎ-কণা প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণন করে। বিভিন্নপ্রকার পরমাণুতে ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটনগুলির সংখ্যা ও সমাবেশ ভিন্নরূপ দেখা যায়। হাইড্রোজেন পরমাণু সর্বাপেক্ষা লঘু, ইহার

CENTRAL LIBRARY

কেন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া একটিমাত্র ইলেকট্রন ঘুরিতেছে। পক্ষান্তরে, ইউরেনিয়াম পরমাণু সর্বাপেক্ষা গুরু, ইহার কেন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া ৯২টি ইলেকট্রন ঘুরিতেছে। অন্যান্য পরমাণুতে ইহাদের অন্তর্বর্তী সংখ্যক ইলেকট্রন ও প্রোটন দেখা যায়। পরমাণুর বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায় যে, পরমাণু যৌগিক পদার্থ, ইহা সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় নহে। ইহার অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক শক্তিসকল প্রচণ্ডবেগে ঘুরিতেছে। ইহাকে বৈদ্যুতিক শক্তিপুঞ্জ বলা যায়। অতএব জড়কে বৈদ্যুতিক শক্তি বলিতে হয়। জড় সম্বন্ধে এই মতকে বৈদ্যুতিক-শক্তিবাদ (electronic theory) বলা যায়।

৪। যন্ত্র ও শরীরের প্রভেদ
(Machine and Organism)

যন্ত্রের লক্ষণ।

যে দ্রব্য বহিস্থ শক্তিদ্বারা অনেক পরমাণু বা অনেক জড় অবয়ব-সংযোগে গঠিত হয়, বহিস্থ শক্তিদ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া কার্য করে এবং যাহার কার্যের ফল কোন চেতন পুরুষ ভোগ করে, তাহার নাম যন্ত্র। কোন বাহিরের শক্তি কোন যন্ত্রের উপর ক্রিয়া করিলে উহার গতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। উহার অবয়বগুলি এমনভাবে সন্নিবিষ্ট এবং পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত যে, এক অবয়বে শক্তি প্রয়োগ করিলে ইহা অন্যান্য অবয়বে সঞ্চারিত হয় এবং সকল অবয়ব যুক্তভাবে কার্য করিয়া একটি ফল প্রসব করে। যন্ত্রের অবয়বগুলি পরস্পরের বাহিরে অবস্থান করে এবং তাহাদের স্বভাবগত কোন ঐক্য বা তাদাত্ম্য নাই। কেবল এক বিষয়ে তাহাদের ঐক্য দেখা যায়। তাহারা সকলেই জড়ের কার্য এবং সকলেই বহির্দেশ হইতে প্রাপ্ত নিজ গতিক্রিয়া অপরে সঞ্চারিত করিতে পারে। যন্ত্রের এক অবয়বের ক্ষতি বা বিনাশ হইলে অন্য অবয়বের ক্ষতি বা বিনাশ হয় না, যদিচ উহার কার্যের ব্যাঘাত হয়। তৎপরে বলা যায় যে, যন্ত্রের কোন অংশের ক্ষতি হইলে, উহা নিজে তাহা পূরণ করিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কোন যন্ত্র বিভিন্ন অংশ বা অবয়বের সংঘাতমাত্র। উহাকে বাস্তবিক পক্ষে অংশী বা অবয়বী (real whole) বলা যায় না, উহা কৃত্রিম অবয়বী (artificial whole)। উহার নিজেকে গঠন, বর্ধন বা রক্ষণ করিবার সামর্থ্য নাই।

ইহার দৃষ্টান্ত।

দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টি বুঝান যায়। জলচালিত কল একটি যন্ত্র। ইহা মনুষ্য কর্তৃক নির্মিত হয়। জলচালিত কলের চক্রের ফলকে জল পড়িলে জলের বেগ চক্রে সঞ্চারিত হয়। ঐ বেগ চক্রসংলগ্ন অন্যান্য অংশে সঞ্চারিত হইয়া কলটি

চালায় এবং তাহাতেই বাঞ্ছিত ফললাভ হয়। সেইরূপ ঘড়ি একটি যন্ত্র। ইহা কোন মনুষ্য কর্তৃক নির্মিত। ঘড়িতে দম দিলে উহা চলিতে থাকে, অর্থাৎ বাহির হইতে কোন শক্তি প্রয়োগ করিলে ঘড়ির মধ্যস্থ সূক্ষ্ম চক্র ক্রিয়ারত হয়। সূক্ষ্ম চক্রের ক্রিয়া অন্যান্য চক্রে সঞ্চারিত হইয়া ঘড়ির কাঁটাগুলিকে সঞ্চালিত করে এবং তদ্দ্বারা সময়-নির্দেশ হয়। দৃষ্টান্ত-স্থলে দেখা যায় যে, কোন বহিস্থ শক্তিদ্বারা বিভিন্ন জড় অংশের সংযোগ ও সন্নিবেশ হইলে যন্ত্র নির্মিত হয়। ইহা বহিস্থ শক্তিদ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহা এক অংশ হইতে অন্য অংশে গতিক্রিয়ার সঞ্চারদ্বারা কার্য করিয়া কোন ফল উৎপাদন করে। যন্ত্র নিজে নিজে চলে না এবং কোনক্রমে এক অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, যন্ত্র তাহা নিজে মেরামত করিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে অন্য অংশগুলির ক্ষতি হয় না, ক্ষতিগ্রস্ত অংশটিকে কেহ বদল করিয়া দিলেই যন্ত্র আবার কাজ করিতে পারে। যন্ত্র ও যান্ত্রিক সংস্থার (mechanical system) এইসব লক্ষণ দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—কিরূপে যান্ত্রিক সংস্থার উৎপত্তি হয়? এই প্রশ্নের উত্তর তিনপ্রকার হইতে পারে। প্রথমতঃ বলা যায় যে, কোন বুদ্ধিমান্ কর্তা কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহপূর্বক তাহাদের যথাযোগ্য সন্নিবেশদ্বারা যন্ত্র নির্মাণ করেন। এরূপ যন্ত্রদ্বারা যন্ত্রের কোন প্রয়োজন বা ইষ্ট সিদ্ধ হয় না। তদ্দ্বারা বহিস্থ অন্য পুরুষের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অতএব বলিতে হয়, যন্ত্র পরপ্রয়োজনে বুদ্ধিমান্ কর্তার দ্বারা নির্মিত হয়। এইভাবে সমগ্র জগৎ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট বলা যায়। যন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মতকে পর-ইষ্টকারণতা বা বাহ্য-ইষ্টকারণতা (external teleology) বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ বলা যায় যে, প্রাকৃতিক দ্রব্যসকল নিজ নিজ স্বভাববশে এবং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে যান্ত্রিক সংস্থার সৃষ্টি করে, তজ্জন্য কোন বুদ্ধিমান্ কর্তার প্রয়োজন হয় না। মেঘ হইতে জল পড়ে, জল নিজ স্বভাববশে মাটিতে খাল কাটিয়া প্রবাহিত হয় এবং নদী-নালা, গিরি-প্রস্রবণ প্রভৃতি সৃষ্টি করে। এইরূপে পৃথিবীতে মানুষের বাসযোগ্য দ্রব্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে। এইভাবে সৌরজগতের সৃষ্টি হইয়াছে বলা যায়। জড়বাদী দার্শনিকগণ বলেন, জড়-পরমাণুসকলের যদৃচ্ছা-গতিক্রিয়াজন্য সংযোগ-বিয়োগ হইতে ব্রহ্মাণ্ডের ও প্রাণিজগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তজ্জন্য কোন বুদ্ধিমান্ কর্তার বা চেতনা-শক্তির প্রেরণা ও নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক হয় না। জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মতকে যদৃচ্ছাবাদ বা যন্ত্রবাদ (mechanical theory) বলা যায়। ইহাকে যান্ত্রিক-মতও বলিতে পারা যায়। তৃতীয়তঃ বলা যায় যে, যান্ত্রিক সংস্থা যে প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য

যন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত।

(purpose or end) সাধন করে, তাহাদ্বারাই ইহা উৎপন্ন হয়। জগতের মূলে কোন ঐক্য-সূত্র না থাকিলে, জগতে এরূপ প্রয়োজন-সাধক এবং আপাতদৃষ্টিতে যান্ত্রিক সংস্থার সৃষ্টি হইতে পারে না। এই ঐক্য-সূত্র হইল জগতের অন্তর্নিহিত এক চেতনা-শক্তি, যাহাদ্বারা জাগতিক সকল শক্তি নিয়ন্ত্রিত হইয়া একযোগে কার্য করে এবং এক সুশৃঙ্খল জগৎ সৃষ্টি করে। বিশ্বগত চেতনা-শক্তি বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ যান্ত্রিক সংস্থা রচনা করে। প্রয়োজনগুলি তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে কার্য করে এবং সেই শক্তিই যান্ত্রিক সংস্থায় রূপায়িত হয়। অতএব যান্ত্রিক সংস্থার উৎপত্তি তদন্তর্গত প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তই হইয়া থাকে। উহা পরপ্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত হয় না। এই মতে যান্ত্রিক সংস্থাকে বাস্তবিক পক্ষে চেতন-শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং এক মহান্ বিশ্বব্যাপী শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিতে হয়। যেমন শরীর উহার অন্তর্নিহিত প্রাণ-শক্তির পরিণতি, সেইরূপ জগৎ উহার অন্তর্নিহিত চেতন-শক্তির পরিণতি। প্রাণ যেমন নিজ ইষ্ট সাধনের জন্য শরীর গঠন করে, সেইরূপ বিশ্বগত চেতন-শক্তি নিজ প্রয়োজন সাধনের জন্য জগৎ রচনা করে। এই মতকে নিজ-ইষ্টকারণতা বা আন্তর-ইষ্টকারণতা (immanent teleology) বলা যায়।

শরীরের লক্ষণ এবং যন্ত্র ও শরীরের প্রভেদ।

এখন শরীর কাহাকে বলে এবং শরীরের বিশেষ গুণ-ধর্ম কি, তাহার আলোচনা করা যাইবে। সাধারণভাবে বলা যায়, যে দ্রব্য জীবনজনি ক্রিয়ার (vital process) আধার, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান এবং সুখ-দুঃখভোগের আয়তন, তাহার নাম শরীর। যন্ত্রের ন্যায় শরীরেরও কতকগুলি অংশ বা অবয়ব আছে এবং উভয়েরই অবয়বগুলি একযোগে কার্য করিয়া একটি ফল প্রসব করে। কিন্তু যন্ত্রের অবয়বগুলি কোন বহিস্থ শক্তিদ্বারা একত্র হয় এবং তাহাদের যুক্ত কার্যের ফল কোন বহিস্থ ভোক্তা পুরুষ ভোগ করে। অপরপক্ষে, শরীরের অবয়বগুলি শরীরস্থ কোন শক্তিদ্বারা উৎপন্ন ও পরস্পরের সহিত যুক্ত হয় এবং তাহাদের কার্য সমগ্র শরীরের প্রয়োজন সাধন করে। যন্ত্র কোন কর্তার দ্বারা গঠিত বা নির্মিত হয়, কিন্তু শরীর কোন অন্তর্নিহিত শক্তি হইতে জন্মে ও বর্ধিত হয়। শরীরের মূল উৎপাদক জীবনী শক্তি বহিস্থ অণু-পরমাণু উপাদানরূপে সংগ্রহ করিয়া একটি শরীর-কোষ (cell) উৎপন্ন করে। কালে আরও অধিক পরিমাণে উপাদান সংগ্রহ করিয়া একটি শরীর-কোষ হইতে অগণিত কোষ উৎপন্ন করে এবং তাহাদের সমবায়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়সমূহ উৎপন্ন হয়। অতএব শরীরের সকল অবয়ব এমন ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ হয় যে, তাহাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, অথবা কোনটিকে বিচ্ছিন্ন করিলে উহা নষ্ট হইয়া যায়, অন্যান্য অবয়বের এবং সমগ্র

শরীরের ক্ষতি হয়। অবশ্য শরীর সে ক্ষতি পূরণ করিবার চেষ্টা করে এবং আংশিকভাবে কৃতকার্য হয়। কিন্তু যন্ত্রের কোন অংশ তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে নষ্ট হয় না, আর যন্ত্রও নিজে তাহার শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে পারে না। এক শরীর হইতে অন্য শরীর জন্মিতে পারে, কিন্তু কোন যন্ত্র হইতে অন্য কোন যন্ত্রের জন্ম হয় না। যন্ত্র ও শরীরের সংক্ষেপতঃ এইরূপ প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

৫। প্রাণের লক্ষণ ও বিশেষ ধর্ম
(Life and Its Characteristics)

প্রাণের লক্ষণ ও ধর্ম।

দেহ-মধ্যস্থ যে শক্তি নিজের অভ্যন্তর হইতে শরীর উৎপন্ন করে, দেহের অবয়বগুলির যোগাযোগ রক্ষা করে এবং সেগুলিকে স্বীয় করণরূপে নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া সমগ্র শরীরের কল্যাণ বা ইষ্ট সাধন করে, তাহার নাম প্রাণ (life)। প্রাণকে শরীরের আদি ও অন্ত বলা যায়। ইহা শরীরের আদি, কারণ ইহাদ্বারাই প্রথম দেহকোষ হইতে পূর্ণ শরীর গঠিত হয়। ইহা শরীরের অন্ত, যেহেতু শরীর ইহার উৎকর্ষ ও পূর্ণতা সাধনের উপায় এবং ইহা শরীরের উপেয় বা সাধনীয় উদ্দেশ্য (entelechy)।

প্রাণের বিশেষ ধর্ম বা বৃত্তিগুলি প্রধানতঃ এইরূপ। (১) ইহা দেহের অণুগুলিকে অম্লজানঘটিত পদার্থে (oxide) পরিণত করিয়া তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে। (২) এইরূপে উৎপন্ন শক্তির এক অংশ প্রয়োগ করিয়া ইহা নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের আকার-প্রকারের আবশ্যকীয় পরিবর্তন সাধন করে। (৩) ঐ শক্তির আর এক অংশ প্রয়োগ করিয়া ইহা বাহির হইতে উপাদান সংগ্রহ ও জীর্ণ (digest) করিয়া নিজের ক্ষয় পূরণ ও আয়তন বৃদ্ধি করে। (৪) শরীর-কোষগুলির (cells) পরিবর্তন ও সংগঠন সাধন করিয়া ইহা রক্ত-সঞ্চালন, শ্বাস-প্রশ্বাস, পরিপাক প্রভৃতি ক্রিয়ার উপযোগী করণসমূহ উৎপন্ন করে এবং তাহাদের ক্রিয়া এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যে, উহারা পরস্পরের সহযোগিতা করিয়া সমগ্র শরীরের কল্যাণ সাধন করে। (৫) যখন ইহার পূর্ণতাপ্রাপ্তি (maturity) হয়, তখন ইহা পুষ্প-ফল-বীজরূপে অন্যান্য শরীর প্রসব করে এবং এইভাবে অনির্দিষ্ট কাল আপন সন্ততি বা বংশ রক্ষা করে।

প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত।

যন্ত্র ও শরীরের প্রভেদ এবং প্রাণের বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনার পর প্রাণের উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে। এখানে প্রথমেই বলা উচিত যে, প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে-কোন সিদ্ধান্তই করা যাক না কেন, তাহাতে উহার বিশেষ ধর্মগুলির অপলাপ না করিয়া সংগত ব্যাখ্যা করা কর্তব্য। প্রাণের উৎপত্তি বিষয়ে প্রধানতঃ তিনপ্রকার মত আছে। এখানে সেই মতগুলি ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা যাইবে।

৬। প্রাণ সম্বন্ধে যান্ত্রিক-মত
(Mechanistic Theory of Life)

প্রাণ জড়-শক্তির ক্রিয়ামাত্র।

এই মত অনুসারে জীবশরীর একটি যন্ত্রমাত্র এবং প্রাণ জড়-শক্তিসমূহের ক্রিয়ামাত্র। অবশ্য সাধারণ যন্ত্র ও শরীর-যন্ত্রের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। কিন্তু তাহা ইহাদের প্রকৃতি বা স্বভাবগত নয়, ইহা কেবল গুণগত বা অণু-পরমাণুর সংস্থান ও সমাবেশগত ভেদ। যেমন সাধারণ যন্ত্র জড়-পরমাণুসকলের যদৃচ্ছা-সংযোগে গঠিত হয়, সেইরূপ জীবশরীরও পরমাণুসমূহের যদৃচ্ছা-মিলনে উৎপন্ন হয়। কেবল জীবশরীরে পরমাণুসকলের এমন সূক্ষ্ম ও সুচারু সমাবেশ ঘটে যে, তাহাতে প্রাণের আবির্ভাব ও প্রাণক্রিয়ার সঞ্চার হয়। যখন পরমাণুসকল নিজ শক্তিতে পরস্পরকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করিতে করিতে একত্র সম্বদ্ধ হয় এবং পারস্পরিক ক্রিয়াদ্বারা প্রোটোপ্লাজ্‌ম-নামক কোষ (protoplasmic cell) উৎপন্ন করে, তখনই প্রাণের আবির্ভাব হয়। কালে একটি কোষ বর্ধিত হইয়া অগণিত কোষে বিভক্ত হয় এবং কোষগুলির বিভিন্ন সমাবেশ হইতে শরীরের বিভিন্ন অংশ ও অবয়ব গঠিত হয়। এইসব অবয়বের সুষ্ঠু মিলন ও পারস্পরিক ক্রিয়াদ্বারা সমগ্র জীবশরীর উৎপন্ন হয় এবং সকল প্রাণ-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। অতএব শরীরকে বিশেষগুণসম্পন্ন যন্ত্রই বলিতে হয় এবং প্রাণকে শারীরিক ক্রিয়াজন্য ও প্রাণহীন জড় হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এরূপ যান্ত্রিক-মতে প্রাণ বা জীবন অজীবজনি এই মত (doctrine of abiogenesis) গৃহীত হইয়াছে।

৭। প্রাণের অতিরিক্ত-পদার্থত্ববাদ
(Vitalistic Theory of Life)

প্রাণ জড়ের অতিরিক্ত পদার্থ।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রাণ সম্বন্ধে যান্ত্রিক-মত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, জড় অণু-পরমাণুর যদৃচ্ছা-সংযোগ-বিয়োগদ্বারা প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে না। প্রাণের যেসব বিশেষ ধর্ম পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে,

সেগুলিকে শরীরস্থ অণু-পরমাণুর ভৌতিক ও রাসায়নিক ক্রিয়ামাত্র (physical and chemical process) বলা যায় না। জড় অণু-পরমাণু-সকলের যে সূক্ষ্ম ও সুচারু সমাবেশে প্রোটোপ্লাজ্‌ম ও তৎসহ প্রাণের উৎপত্তি হয় বলিয়া যন্ত্রবাদীরা মনে করেন, পূর্বে প্রাণ না থাকিলে তাহাই সম্ভবপর হয় না। এসব অণু-পরমাণুসমাবেশ প্রাণ-শক্তিরই কার্য। শরীরের বিভিন্ন অংশ ও অবয়বের সুসংবদ্ধ ও সুসমঞ্জস ক্রিয়াও শরীরের কেন্দ্রীভূত প্রাণ-শক্তি ব্যতীত হইতে পারে না। ফলকথা, শরীর কোনরূপ জড় যান্ত্রিক-সংস্থা নয় এবং ইহার ক্রিয়াও যান্ত্রিক-সংস্থার ক্রিয়ার মত নয়। ইহাদের প্রকৃতিগত ভেদ আছে। অতএব শরীরের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, স্থিতি প্রভৃতি জড় অণু-পরমাণুসকলের সংযোগ-বিয়োগজন্য বলা যায় না। শরীরের বিশেষ গুণ-ধর্ম বুঝিতে হইলে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, শরীরের অভ্যন্তরে প্রাণ-শক্তি নামে এক বিশেষ শক্তি (special life-force or vital power) আছে এবং ইহা সকল জড়ের অতিরিক্ত পদার্থ। এই শক্তি হইতেই শরীরের উৎপত্তি হয়। ইহাদ্বারাই শরীরের সব অবয়ব বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রিত হইয়া একযোগে কার্য করে এবং প্রাণের উৎকর্ষ ও পূর্ণতা সম্পাদন করে। জড়-শক্তিসমূহ নিজেদের নিয়ন্ত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে না। প্রাণ-শক্তি-দ্বারাই ইহারা নিয়ন্ত্রিত, সংহত ও মিলিত হয়। নতুবা জড়-শক্তিসকল বিচ্ছিন্ন ও বিকীর্ণ হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অতএব জড় দেহের অতিরিক্ত কোন প্রাণ-শক্তি স্বীকার করিতে হয় এবং ইহাদ্বারাই শরীরের সংগঠন ও পরিবর্ধন হয়। এইরূপ মতকে প্রাণের অতিরিক্ত-পদার্থত্ববাদ (vitalism) বলে। জার্মান জীববিৎ Hans Driesch প্রাণ সম্বন্ধে এই মত সমর্থন করেন। তিনি প্রাণকে জড়ের অতিরিক্ত ও চেতনস্বভাব শক্তিবিশেষ বলিয়াছেন এবং ইহাকে 'entelechy' ও 'psychoid' বলিয়াছেন।

ইহার বিপক্ষে প্রথম যুক্তি ও তাহার খণ্ডন।

প্রাণ জড়ের অতিরিক্ত পদার্থ এই মতের বিপক্ষে যান্ত্রিক মতবাদীর প্রথম আপত্তি এই যে, ইহাতে জড়-শক্তিসংরক্ষণ-নিয়ম (law of conservation of energy) ভঙ্গ হয়। বৈজ্ঞানিক মত অনুসারে জাগতিক জড়-শক্তির নানারূপ পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু ইহার পরিমাণের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। এখন যদি প্রাণ-শক্তি দেহের উপর ক্রিয়া করে, অথবা দৈহিক শক্তি প্রাণ-শক্তির উপর ক্রিয়া করে, তবে প্রাণ-শক্তি জড় দৈহিক শক্তিতে পরিণত হইবে, অথবা, দৈহিক শক্তি প্রাণ-শক্তিতে পরিণত হইবে। ফলে জড়-শক্তির মোট পরিমাণ একপক্ষে বাড়িবে এবং অপরপক্ষে কমিবে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। এই আপত্তির খণ্ডন করিতে দুইটি কথা বলা যায়। প্রথমতঃ বলা যায় যে, দেহের মোট শক্তির নির্দিষ্ট পরিমাণ আমরা জানি না, অতএব ইহা বাড়িতেছে

কি কমিতেছে তাহা বলিতে পারি না। তারপর বলা যায় যে, প্রাণ-শক্তি দেহশক্তিতে রূপান্তরিত হয় না, ইহা কেবল দৈহিক শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

দ্বিতীয় যুক্তি ও তাহার খণ্ডন।

যান্ত্রিক মতবাদীর দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, শরীরমধ্যস্থ পিত্ত, শর্করা প্রভৃতি দ্রব্যকে এক সময়ে কেবল জীবশরীরেই উৎপাদনযোগ্য মনে করা হইত। কিন্তু এখন এগুলিকে পরীক্ষাগারে (laboratory) জড় ও রাসায়নিক শক্তি হইতে উৎপন্ন করা যায়। কালে অন্যান্য জৈব দ্রব্যও, এমনকি প্রোটোপ্লাজ্‌মও এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব কোন অতিরিক্ত প্রাণ-শক্তি স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। এই যুক্তির খণ্ডনে বলা যায় যে, বাস্তবিক পক্ষে জৈব ধাতু বা প্রোটোপ্লাজ্‌ম অজৈব জড় হইতে উৎপন্ন হয় না। যেখানে এরূপ হয় বলিয়া মনে হয়, সেখানেই দেখা যায় যে, জড়ের মধ্যে জীবাণু লুক্কায়িত থাকে অথবা বায়ু হইতে উহাতে সঞ্চারিত হয়। কোন পচনশীল দ্রব্য হইতে কীট জন্মে ইহা সত্য। কিন্তু যদি অগ্নিসংযোগে ঐ দ্রব্যস্থ জীবাণু নিঃশেষ করা যায় এবং উহাতে বায়ুসংস্পর্শ না হয়, তবে আর কোন জীবাণুর আবির্ভাব হইবে না। অতএব ইহা স্বীকার্য যে, জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি হয় না, প্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হয় (*omne vivum ex vivo est*), এবং প্রাণ জড়ের অতিরিক্ত পদার্থ। প্রাণের অতিরিক্ত-পদার্থত্ববাদে প্রাণ বা জীবন জীবজনি এই মত (doctrine of biogenesis) পরিগৃহীত হইয়াছে।

৮। প্রাণ সম্বন্ধে ইষ্টকারণতা বা চেতনকারণতাবাদ
(Teleological or Idealistic Theory of Life)

চেতন-শক্তি প্রাণের উৎপত্তির কারণ।

প্রাণের বিশেষ গুণ-ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কোন কোন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রাণ সম্বন্ধে যান্ত্রিক-মত পরিহার করিয়াছেন এবং প্রাণকে জড়ের অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য হইতেছে—প্রাণ জড়ের অতিরিক্ত দ্রব্য হইলেও কিরূপে নিজের প্রয়োজনোপযোগী এবং নিজের ইষ্টসাধক ক্রিয়া করিয়া জীবশরীর গঠন করে এবং তদ্দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে? এই প্রশ্নের উত্তরে কোন কোন দার্শনিক বলেন, যে প্রয়োজন বা ইষ্ট (end or good) সাধনের নিমিত্ত শরীর ও প্রাণের ক্রিয়া হয়, তাহাই উহাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতির কারণ। যে চেতন বিশ্বশক্তি জীবজগতের মূল কারণ, তাহারই আত্মভূত বিশেষ বিশেষ

CENTRAL LIBRARY

প্রয়োজন (purpose) বা ইষ্ট সিদ্ধির জন্য জগতের এবং তদন্তর্গত সকল পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। এজন্যই জড়জগতের সৃষ্টি, শরীর-সংস্থার গঠন এবং প্রাণ ও মনের আবির্ভাব। অতএব প্রাণ জড়াতিরিক্ত পদার্থ হইলেও, ইহার মূল কারণ হইতেছে কোনরূপ প্রয়োজন বা ইষ্টসাধনতা (realisation of some end or good) এবং ইহা জীবশরীর গঠনপূর্বক তাহারই মাধ্যমে নিজ ইষ্ট সাধন করে। প্রাণ সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে প্রাণসম্বন্ধীয় যান্ত্রিক-মতের এবং প্রাণের অতিরিক্ত-পদার্থত্ববাদের সমন্বয় করা যায়। কারণ এই মত অনুসারে শরীর-যন্ত্রকে প্রাণের বিকাশের উপায়রূপে বা প্রাণের পূর্ণতার সহায়করূপে গ্রহণ করা যায়। আপাতদৃষ্টিতে শরীর জড়-যন্ত্রমাত্র বোধ হইলেও, বাস্তবিক পক্ষে উহা প্রাণের উপযোগী যন্ত্র, প্রাণের প্রয়োজনসাধক তন্ত্র (system), এবং প্রাণ শরীরের সাধনীয় উপেয় (entelechy)।

৯। জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে সৃষ্টিবাদ
(Theory of Special Creation)

জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে আদিম যুগের মানবসমাজে যেসব অবাস্তব ও কাল্পনিক ধারণা প্রচলিত ছিল, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সভ্যতার যুগে এবিষয়ে যেসব মত প্রচলিত হইয়াছে, তাহারই আলোচনা করা যাইবে। জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইপ্রকার মত আছে—সৃষ্টিবাদ ও পরিণামবাদ। এখানে সৃষ্টিবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে সৃষ্টিবাদ।

সৃষ্টির পূর্বে জীবজগৎ কিছুই ছিল না, এক পরম তত্ত্ব অর্থাৎ পরমেশ্বরমাত্র ছিলেন। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ ও পূর্ণকাম পুরুষ। তাঁহার কাম্য বা প্রাপ্তব্য কোন বস্তুই নাই। জীবজগৎ সৃষ্টি করিবার কোন প্রয়োজনও তাঁহার ছিল না। তথাপি তিনি জীবকুলকে নিজের অপার আনন্দ দান করিবার জন্য সৃষ্টি করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি সর্বশক্তিমান্। অতএব জীবজগৎ সৃষ্টি করিবার জন্য তাঁহার কোনরূপ উপাদান-সামগ্রী প্রয়োজন হয় না অথবা সময়ও আবশ্যক হয় না। তাঁহার পরমা ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তিনি একক্ষণেই সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—নীহারিকা, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, নানাজাতীয় বৃক্ষ, লতা, জীবজন্তু—সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাদের নিজ নিজ স্বভাব ও শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তদবধি সকল বস্তুই যেমনভাবে সৃষ্ট হইয়াছিল, মুখ্যতঃ তেমনভাবেই আছে। তাহাদের ক্রমপরিণতি বা ক্রমোন্নতি হয় নাই, অবশ্য কোন কোনটির কিছু অবনতি

হইয়াছে। অতএব, কিভাবে জগতের সৃষ্টি হইল এবং কিভাবে পৃথিবীতে জীবের বসতি হইল?—এরূপ প্রশ্ন করা চলে না। ঈশ্বরের বাঙ্‌নির্দেশমাত্রই সুসজ্জিত জগতের আবির্ভাব হইয়াছে এবং ইহা একভাবেই চলিতেছে।

কিন্তু ভূতত্ত্ব, জীববিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞানে যেসব তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সৃষ্টিবাদ আর স্বীকার করা যায় না। এসব তথ্যের আলোকে বেশ বুঝা যায় যে, জীবজগৎ বহু কোটি বৎসরব্যাপী ক্রমপরিণতির ফলে বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। অতএব জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে এখন পরিণামবাদই গ্রহণীয়।

১০। জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে পরিণামবাদ (Theory of Evolution)

পরিণামবাদ ও ইহার দুই-প্রকার ভেদ

পরিণাম (Evolution) কাহাকে বলে? সৃষ্টির বিপরীত ভাবের নাম পরিণাম। জগতের সৃষ্টি বলিতে আমরা বুঝি যে, বর্তমানে জগৎ যে আকারে দৃষ্ট হইতেছে, ঠিক সেই আকারেই পূর্বকালে একক্ষণে উৎপন্ন হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, জগতের পরিণাম বলিতে বুঝায় যে, জগৎ কোন সমভাবাপন্ন উপাদানের বহুকালব্যাপী ক্রমপরিবর্তনের ফলে বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। যেমন একটি উদ্ভিদ্‌ বা প্রাণী কোন বীজ বা জীবাণু হইতে ক্রমশঃ বর্ধিত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীবজগৎ কোন অবিভক্ত দ্রব্যের বিভাগ ও বিভক্ত অংশের সংহতি ও সংগঠনদ্বারা বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। পরিণামের গতি সাধারণতঃ সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের দিকে, অবিশেষ হইতে বিশেষের দিকে, নিম্ন হইতে উচ্চ দিকে। অতএব বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী প্রশ্ন হইতেছে—কোন্‌ শক্তিবলে জীবজগতের এই ক্রমপরিবর্তন অর্থাৎ পরিণাম ঘটিয়াছে? এই প্রশ্নের দুইপ্রকার উত্তর হইতে পারে এবং তদনুসারে পরিণামবাদ দুইপ্রকার হইবে, যথা—যান্ত্রিক পরিণামবাদ এবং ইষ্টহেতুক বা উপযোগিতাত্মক পরিণামবাদ (mechanical and teleological evolution)।

(১) যান্ত্রিক পরিণামবাদ (Theory of Mechanical Evolution)

যান্ত্রিক পরিণামবাদ।

এই মত অনুসারে জড়জগৎ ও জীবজগৎ—প্রাণ, বুদ্ধি ও মন—জড়-পরমাণুসকলের আকস্মিক সংযোগ-বিয়োগের ক্রম-পরিণতি। জড়জগৎ ও জীবজগতের ক্রমোৎপত্তির জন্য কোন বুদ্ধিমান্‌ কর্তার প্রয়োজন নাই, অথবা মনের বা ইচ্ছাশক্তির কোন

কারণত্বও স্বীকার করিতে হয় না। অসংখ্য জড়-পরমাণু অনন্ত আকাশে নিজ নিজ গতিক্রিয়াদ্বারা অনন্তকাল সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইতেছে। এইরূপ আকস্মিক (chance) সংযোগ-বিয়োগ হইতে হইতে জীবজগতের বর্তমান সংস্থিতি ও সমাবেশ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব জগতের উৎপত্তিক্রম মানুষের কার্য-ক্রমের মত নয়, উহা অন্ধ জড়-শক্তির আকস্মিক কার্যক্রমমাত্র। বিষয়ভেদে যান্ত্রিক পরিণামবাদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—জড়জগদ্-বিষয়ক যান্ত্রিক পরিণামবাদ এবং জীবজগৎ বা প্রাণিজগদ্-বিষয়ক যান্ত্রিক পরিণামবাদ।

(ক) জড়জগৎ সম্বন্ধে যান্ত্রিক পরিণামবাদ
(Mechanical Theory of Cosmological Evolution)

জড়জগৎ সম্বন্ধে যান্ত্রিক পরিণামবাদ।

জড়জগৎ-সম্বন্ধীয় যান্ত্রিক পরিণামবাদ গণিতশাস্ত্রজ্ঞ লাপ্লেসের 'নীহারিকা-কল্পনার' (nebular hypothesis) উপর প্রতিষ্ঠিত। যান্ত্রিক পরিণামবাদ অনুসারে জীবজগতের উৎপত্তিক্রম এইরূপ: সুদূর অতীত কালে জগতের উপাদানভূত জড় পদার্থ এক বিরাট নীহারিকার অর্থাৎ নীহারপুঞ্জসদৃশ গ্যাস বা ধূলিমেঘের আকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা এখনও জগতের প্রান্তভাগে তৎসদৃশ নীহারিকাসমূহ দৃষ্ট হয়। সেই নীহারিকাস্থ পরমাণুসকল অত্যন্ত কম্পমান থাকায় তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ চলিতে থাকে এবং তাহা হইতে উত্তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয়। কালে তাহাদের বিক্ষেপকারী গতিক্রিয়াশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইলে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিযোগে নীহারিকার মধ্যস্থল জমাট বাঁধিতে থাকে এবং উহারা তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতে থাকে। ক্রমে নীহারিকার মধ্যস্থল যত সঙ্কুচিত হইতে লাগিল, তাহারা তত প্রচণ্ডবেগে ঘুরিতে লাগিল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমাটবাঁধা মেঘপুঞ্জ মধ্যস্থল হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড মধ্যবর্তী পিণ্ডকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতে লাগিল এবং নিজেদের কেন্দ্রের চারিদিকেও ঘুরিতে লাগিল। এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ডই হইল গ্রহসমূহ এবং সেগুলি হইতে যেসব ক্ষুদ্রতর পিণ্ড নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহারা হইল উপগ্রহ বা চন্দ্রসমূহ। নীহারিকার কেন্দ্রস্থলস্থ প্রধান পিণ্ডটি হইল সূর্য। সূর্যের নিকটবর্তী গ্রহগুলি সর্বশেষে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় আকারে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়াছে এবং বহুকাল পূর্বেই নিরেট গোলকে পরিণত হইয়া জীবের বাসোপযোগী হইয়াছে। এগুলি হইল পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ ও শুক্রগ্রহ। দূরবর্তী পিণ্ডগুলি, যথা—বৃহস্পতি ও শনিগ্রহ, আকারে খুব বড় হওয়ায় অতি দীর্ঘকালে জমাট বাঁধিয়াছে এবং বোধ হয় এখনও জ্বলন্ত পিণ্ডই রহিয়াছে। এগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূর্যের মত নিজ নিজ উপগ্রহসহ যেন

এক একটি সৌরজগৎ রচনা করিয়াছে। পৃথিবী সম্ভবতঃ ত্রিশ কোটি বৎসর পূর্বে নিরেট গোলকে পরিণত হইয়াছে এবং যে-সময় হইতে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে শীতল হইয়াছে সেই সময় হইতেই জল, বায়ু, মেঘ, বৃষ্টি প্রভৃতির ক্রিয়াদ্বারা ইহাতে প্রস্তর, মাটি প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে এবং উদ্ভিদ্ ও প্রাণিসমূহের আবির্ভাব হইয়াছে। জড়জগতের উৎপত্তি সম্পূর্ণভাবে জড়-দ্রব্য ও জড়-শক্তিদ্বারাই হইয়াছে, ইহা কোন বুদ্ধিমান্ কর্তার পরিকল্পনা অনুসারে রচিত হয় নাই।

(খ) প্রাণিজগৎ সম্বন্ধে যান্ত্রিক পরিণামবাদ
(Mechanical Theory of Biological Evolution)

প্রাণিজগৎ সম্বন্ধে যান্ত্রিক পরিণামবাদ।

প্রাণ ও বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর উৎপত্তি-বিষয়ে যান্ত্রিক-মত উপপাদন করিবার জন্য যান্ত্রিক পরিণামবাদে দুইটি নিয়ম স্বীকার করা হইয়াছে। নিয়ম দুইটিকে পরস্পরের পরিপূরক বলা যায়।

ইহার প্রথম নিয়ম—ডারুইনের মত।

(১) প্রথম নিয়মটি এইরূপ: জীবশরীরের আকস্মিক আভ্যন্তর পরিবর্তনজন্য বিভেদ হয় এবং প্রকৃতি যোগ্যতম জীবকে সংরক্ষণ করিবার জন্য নির্বাচন করে (differentiation of organisms by fortuitous variation from within, with natural selection of the fittest)। যান্ত্রিক পরিণাম-বাদে প্রাণহীন জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি (abiogenesis) স্বীকার করা হয়। এই মত অনুসারে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন অণুগুলি আকস্মিকভাবে মিলিত হইলে প্রোটোপ্লাজ্ম-নামক জীব-কোষের উৎপত্তি হয়। একটি কোষ হইতে যে-সব নূতন কোষের উৎপত্তি হয়, তাহাদের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন হয় এবং তাহারা পরস্পর হইতে ভিন্ন হয়। এরূপ পরিবর্তনের কোন কারণ দেখা যায় না। অতএব ইহাকে আকস্মিক (fortuitous) বলিতে হয়। কিন্তু এসব আকস্মিক পরিবর্তন, একটি কোষ হইতে উৎপন্ন অন্য নূতন কোষে উত্তরাধিকারসূত্রে সঞ্চারিত হয়। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ্ ও জীবশরীর বহুসংখ্যক অণুকোষদ্বারা গঠিত। অতএব এক একটি কোষের অল্প অল্প পরিবর্তন উত্তরাধিকারসূত্রে সঞ্চিত হইয়া সমগ্র শরীরের আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করে। এইভাবে বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ্ ও জীবের উৎপত্তি হয়। কিন্তু প্রত্যেক শরীরকেই পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক শক্তি ও জীবসমূহের সহিত নিরন্তর যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়। এখন যদি তাহার কোষের আকস্মিক পরিবর্তনসমূহ আত্মরক্ষার অনুকূল ও উপযোগী হয়, তবে উহা বাঁচিয়া থাকিবে এবং উহার বংশবৃদ্ধি হইবে।

পক্ষান্তরে, যদি উহার কোষের পরিবর্তনসমূহ আত্মরক্ষার অনুপযোগী ও প্রতিকূল হয়, অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং উহা তাহার সহিত মিল রাখিয়া চলিতে না পারে, তবে কালে প্রতিকূল পরিবর্তনসমূহ সঞ্চিত ও প্রবল হইয়া উহার বংশের বিলোপ সাধন করে। এইভাবে বিলুপ্ত জাতির স্থলে অনুকূল—অবস্থান্তরপ্রাপ্ত অন্য জাতির আবির্ভাব হয় এবং তাহার বংশবৃদ্ধি হয়। এইরূপে জীবকোষের আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে অসংখ্য জাতির জন্ম হয় এবং প্রকৃতি যেন তাহাদের মধ্যে যোগ্যতম জাতি-গুলিকে নির্বাচন করিয়া সংরক্ষণ করে। অতএব মৌলিক জীবাণুগুলির আকস্মিক পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনহেতু বর্তমানে পৃথিবীর জলে, স্থলে ও বাতাসে অনেক জাতীয় উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর আবির্ভাব হইয়াছে। এই মতে প্রাকৃতিক নির্বাচনহেতু (natural selection) বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। Darwin তাঁহার 'Origin of Species' নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম এই মতের বিশদ ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছে।

ইহার দ্বিতীয় নিয়ম—লামার্কের মত।

(২) দ্বিতীয় নিয়মটি এইরূপ: বহির্জগতের ক্রিয়াদ্বারা জীবশরীরের পরিবর্তন হয় এবং তাহাও বংশানুক্রমে সংক্রমিত হয় (modifications imposed on organisms by the forces of their environment are inherited)। লামার্ক এই নিয়মটি প্রথমে আবিষ্কার করেন, পরে স্পেনসার ও ডারুইন ইহার উপযোগিতা স্বীকার করেন। ডারুইনের মতে জীবকোষের আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে জীবশরীরের বিভিন্ন-প্রকার গঠন হয়। কিন্তু আকস্মিক পরিবর্তনদ্বারা কিরূপে নির্দিষ্ট ও বিশেষ বিশেষ আকার গঠিত হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। অতএব ইহা অন্যভাবে বুঝিতে হয়। বহির্জগতের শক্তিসকল নিরন্তর জীবশরীরের উপর ক্রিয়া করে এবং জীবশরীর নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিক্রিয়া করিতে বাধ্য হয়। এরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রচেষ্টা হইতে তাহার আকারের পরিবর্তন হয় এবং বিভিন্ন দেহযন্ত্রের উৎপত্তি হয়। যেমন জীবশরীরকে বাধ্য হইয়া বাহিরের দ্রব্য খাদ্যরূপে গ্রহণ করিতে হয় এবং তাহা পরিপাক করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। সেই প্রচেষ্টা দেহের এক অংশে কেন্দ্রীভূত হইয়া পরিপাক-যন্ত্র গঠন করে। সেইরূপ নিজের জীবন রক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহের জন্য উহাকে বাধ্য হইয়া ইতস্ততঃ গমন ও খাদ্য গ্রহণের চেষ্টা করিতে হয়, এরূপ প্রচেষ্টা হইতে হস্তপদাদির উৎপত্তি হয়। আলোক ইহার উপর ক্রিয়া করিলে ইহাতে যে গতিক্রিয়া হয়, তাহা এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া দর্শনেন্দ্রিয় উৎপন্ন করে। এইভাবে জীবশরীরের আকারের যে পরিবর্তন ঘটে, তাহা বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হইয়া বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠন করে।

CENTRAL LIBRARY

নিম্ন শ্রেণীর জীবশরীরে এবং মাতৃগর্ভস্থ দ্রূণে এরূপ ক্রমপরিণতির আভাস পাওয়া যায়। ইহাতে এক জীবশরীরের অর্জিত আকার-প্রকারগত পরিবর্তন উত্তরাধিকারসূত্রে অন্য শরীরে সংক্রমিত (inheritance of acquired modifications) হয়।

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ডারূইনের মতে প্রথমে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়, তৎপরে ইহার কার্য বা ক্রিয়া হয়, যেমন প্রথমে হস্তপদাদির উৎপত্তি হয়, পরে গমন ও ধারণাদি ক্রিয়া হয়। কিন্তু লামার্কের মতে প্রথমে দীর্ঘকাল-স্থায়ী ক্রিয়া হইলে পরে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়, যেমন জীবশরীর দীর্ঘকাল গমনের ও গ্রহণের চেষ্টা করিলে, তবে পরে পদ ও হস্ত গঠিত হয়। প্রথম মতে ইন্দ্রিয়গুলি যেন প্রকৃতির দান, শেষ মতে উহারা জীবশরীরের প্রকৃতিগত নিজ চেষ্টার ফল।

কিন্তু পরবর্তী কালে Weismann প্রমুখ অনেক জীববিৎ পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তির নিজ চেষ্টার ফলে শরীরের আকারের যেসব পরিবর্তন হয় তাহা জীবকোষের কোন পরিবর্তন সাধন করে না। সুতরাং এসব পরিবর্তন বংশানুক্রমে সংক্রমিত হয় না এবং কোন নূতন আকার বা ইন্দ্রিয় গঠন করিতে পারে না। তাঁহাদের মতে কেবল জীবকোষের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনগুলি এক কোষ হইতে উৎপন্ন অন্য কোষে সংক্রমিত হইতে পারে এবং বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকারসূত্র সঞ্চারিত হয়। অতএব শেষপর্যন্ত ডারূইনের মতই অর্থাৎ জীবকোষের আকস্মিক পরিবর্তন এবং প্রকৃতিকর্তৃক যোগ্যতমের সংরক্ষণ—এই মতই গ্রহণ করিতে হয়।

যান্ত্রিক পরিণামবাদ অনুসারে প্রাণের এবং বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর উৎপত্তিক্রমের বিবরণ দেওয়া হইল। ইহাকে যদৃচ্ছাবাদ ও স্বভাববাদ বলা যায়। কারণ এই মত অনুসারে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের যদৃচ্ছাক্রিয়াদ্বারা প্রাণি-জগতের উৎপত্তি হয়, ইহাতে কোন বুদ্ধিমান্ কর্তা যে কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য জীবজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা স্বীকার করা হয় না।

(২) ইষ্টহেতুক বা উপযোগিতাত্মক পরিণামবাদ (Theory of Teleological Evolution)

যান্ত্রিক পরিণামবাদের দোষত্রুটি।

যান্ত্রিক পরিণামবাদ সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, ইহাতে অনেক ব্যাপার আকস্মিকভাবে (by chance) ঘটে বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। প্রথমতঃ দেশে ও কালে জড় পরমাণুসকলের প্রাথমিক সন্নিবেশ ও পরস্পর-সম্বন্ধ আকস্মিকভাবেই সংঘটিত হইয়াছে বলিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ পরমাণুসকলের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এবং তাহার গতি ও বেগ কোন নির্দিষ্ট

CENTRAL LIBRARY

কারণে না হওয়ায়, তাহাকে আকস্মিক ব্যাপারই বলিতে হয়। তৃতীয়তঃ পরমাণুসকলের সংযোগ ও বিয়োগের কোন কারণ না থাকায়, তাহাকেও আকস্মিক বলিতে হয়। ফলতঃ যান্ত্রিক পরিণামবাদী ডারুইন জীবকোষের পরিবর্তনকে আকস্মিক বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু যদি সব ব্যাপারই আকস্মিক হয়, তবে প্রকৃতিতে যে সামঞ্জস্য এবং উপায় ও উপেয় বা ফল ও ফলসাধনের যোগাযোগ (adaptation of means to results) দেখা যায় তাহা অতি দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ জীব-শরীরের যে রচনানৈপুণ্য দেখা যায় এবং তাহার ইন্দ্রিয়গুলির যে বিস্ময়কর গঠনপ্রণালী বিজ্ঞান কর্তৃক উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহা জড় শক্তিদ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে বলিয়া ধারণা করা যায় না। এগুলি ঠিকভাবে বুঝিতে হইলে বলিতে হয় যে, ইহারা যেসব প্রাকৃতিক শক্তির পরিণামের ফল তাহা কোন চেতন শক্তি হইতে উদ্ভূত এবং তৎকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

ইষ্টহেতুক পরিণামবাদ।

ইহাই ইষ্টহেতুক বা উপযোগিতাত্মক পরিণামবাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই মত অনুসারে প্রাকৃতিক জগৎ এবং জড়শক্তি মূল বা পরম তত্ত্ব নহে। ইহাদের অন্তর্নিহিত এক চেতন শক্তি আছে এবং উহাই সব শক্তির মূল ও উৎস। কোন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য এই শক্তির ক্রমপরিণামের ফলে জীবজগতের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব জীবজগতের কোন বস্তুই নিরর্থক নয়। সকল বস্তুরই কোন প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা আছে। ইহারা কোন না কোন উদ্দেশ্য বা ইষ্ট সাধনের নিমিত্ত উৎপন্ন বা আবির্ভূত হইয়াছে। তাহাদের সাধনীয় প্রয়োজনই তাহাদের উৎপত্তির কারণ এবং যতদিন এ প্রয়োজন সিদ্ধ না হয়, ততদিন তাহারা বিদ্যমান থাকিবে। এ প্রয়োজন কোন ইষ্ট বা মঙ্গলময় বস্তু হইবে। ইহা যতদিন সিদ্ধ না হয়, ততদিন ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত থাকে এবং একটি ভাবনাত্মক সত্তারূপে বর্তমান ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করে, যেমন কোন ব্যক্তি ভবিষ্যতে কোন ফল লাভ করিবার জন্য সেই ভাবনা অনুসারে বর্তমানে তদুপযোগী কার্য করে। জড়বাদীদের মতে সব বস্তুই তাহাদের পূর্ববর্তী ঘটনাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু ভবিষ্যৎ ফল বা মঙ্গল বর্তমান বস্তুকে আকৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। এজন্য ইষ্টহেতুক পরিণামবাদে কোন সাধনীয় ও ভবিষ্য ইষ্টকে বর্তমান ঘটনার কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়। কোন বস্তুর নিয়ত পূর্ববর্তী ও কার্যকরী বস্তুকে তাহার নিমিত্ত কারণ (efficient cause) বলা হয়। সেই বস্তুর ভবিষ্য ইষ্টকে উহার প্রয়োজন কারণ (final cause) বলা যায়। যান্ত্রিক পরিণামবাদে কেবল জড়কে জীবজগতের উপাদান কারণ (material cause) এবং জড়শক্তিকে নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়। ইষ্টহেতুক পরিণামবাদে প্রয়োজন কারণকে জীবজগতের

CENTRAL LIBRARY

এবং জড় ও জড়শক্তিরও মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। জড় ও জড়শক্তির অন্তরালে এক সর্বব্যাপী চেতন শক্তি বিদ্যমান এবং তাহারই প্রয়োজন বা তদ্গত ইষ্ট সাধনের নিমিত্ত জড় ও জড়শক্তি যন্ত্ররূপে কার্য করিতেছে।

ইষ্টহেতুক পরিণামবাদের সপক্ষে দুইটি যুক্তি দেওয়া যায়। প্রথমতঃ কারণ কাহাকে বলে তাহা বিচার করিয়া দেখা যাক্। নিজ ক্রিয়া বা পরিবর্তনদ্বারা যে-বস্তু কোন কার্য উৎপন্ন করে, তাহাকে কারণ বলে।

ইহার সপক্ষে প্রথম যুক্তি।

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে—কোন ক্রিয়া বা পরিবর্তন আদৌ হয় কেন? যান্ত্রিক মতে ইহা আপনা-আপনি হয়। কিন্তু ইহা সদুত্তর নহে। কোন ক্রিয়া বা পরিবর্তনের কোন হেতু অর্থাৎ প্রয়োজন থাকিবে। অনর্থক অর্থাৎ প্রয়োজন বিনা কোন কার্য হয় না। কোন প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তই কোন কার্য হইয়া থাকে ইহাই আমরা সর্বত্র দেখি। অতএব ইহা স্বীকার্য যে, কোন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সিদ্ধিই ক্রিয়ার এবং পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ। এই প্রয়োজন কোনরূপ ইষ্টার্থ বা শ্রেয়স্কর বস্তু হইবে। ইষ্টার্থ (end or good) লাভের জন্য ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। ক্রিয়া আপনা-আপনিও হয় না অথবা অনর্থকও হয় না। অতএব জগতে যেসব ক্রিয়া ও পরিবর্তন দেখা যায়, তদ্দ্বারা কোনও না কোন প্রয়োজন বা ইষ্টার্থ সাধিত হয়। এইরূপ ক্রিয়া-দ্বারাই জীবজগতের সৃষ্টি হইতে পারে। উদ্দেশ্যহীন আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে কোন বস্তু বা কার্য সিদ্ধ হয় না।

তৎপরে প্রাকৃতিক জগতের সর্বত্র যে রচনানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্দৃষ্টে ইহাকে জড়শক্তির যদৃচ্ছা পরিণামের ফল না বলিয়া ইষ্টহেতুক ও উপযোগিতাত্মক পরিণামের ফল বলিতে হয়। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির নিজ নিজ কক্ষে নিয়মিত গতি; পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশের জীবনোপযোগী সংগঠন, জীবশরীরের বিস্ময়কর ও সুনিপুণ সংস্থান, বিভিন্ন স্তরের প্রাণিকুলের উপায়-উপেয় সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয় অনুধাবন করিলে জীব-জগৎকে বুদ্ধিমৎ কারণের কার্য এবং উপযোগিতামূলক ও ইষ্টহেতুক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অন্ধ জড়শক্তির উদ্দেশ্যহীন ক্রিয়াদ্বারা জীবজগতের এরূপ সুনির্দিষ্ট ও সুনিপুণ রচনা সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয় যুক্তি।

জগতের ইষ্টহেতুক পরিণাম দুইপ্রকারের হইতে পারে। প্রথমতঃ বলা যায়, ইহা ঈশ্বরের মনোগত ইষ্টকল্পনা অনুসারে হইয়াছে, অর্থাৎ ঈশ্বর কোন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জীবজগৎ রচনা করিয়াছেন—যেমন কোন শিল্পী কোন উদ্দেশ্য লইয়া উপাদান সংগ্রহপূর্বক কোন যন্ত্র নির্মাণ

ইষ্টহেতুক পরিণাম দুই প্রকার—বাহ্য ও আন্তর।

করেন। এস্থলে জগতের পরিণামদ্বারা যে ইষ্ট বা প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে তাহা জগদ্গত না হইয়া ঈশ্বরগত হইবে অর্থাৎ পরগত হইবে। এরূপ পরিণামকে বাহ্য- বা পরগত-ইষ্টহেতুক (external or transcendent teleology) বলা যায়। পক্ষান্তরে, জগৎকে ঈশ্বরের ইচ্ছা-শক্তির প্রকাশ এবং ঈশ্বরকে জগৎ বা বিশ্বগত বলিলে, জগতের পরিণামদ্বারা যে ইষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহা জগদ্গত বলা যায়, অর্থাৎ জগতের পরিণামদ্বারা জগতের নিজ ইষ্ট সিদ্ধ হয় বলা যায়। এইরূপ পরিণামকে আন্তর- বা স্বগত-ইষ্টহেতুক (internal or immanent teleology) বলা যায়।

ইষ্টহেতুক পরিণামবাদের বিপক্ষে যুক্তি ও তাহার খণ্ডন।

জগতের ইষ্টহেতুক পরিণামবাদের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি এইরূপ: যদি ইষ্ট-সাধনের নিমিত্ত জগতের পরিণাম হয়, তবে সংসারে মানুষের এত দুঃখকষ্ট কেন, কেনই বা পৃথিবীতে এত অকল্যাণকর বস্তু দেখা যায়? মঙ্গলময়ের সৃষ্টিতে কোন অমঙ্গল থাকিতে পারে না। এরূপ আপত্তির খণ্ডনে বলা যায় যে, ইহা মানুষের সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার ফল। মানুষ মনে করে যে, জগৎ কেবল তাহার স্বার্থসিদ্ধি ও উপভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং কুত্রাপি মানুষের স্বার্থ হানি বা দুঃখভোগ হইলেই মানুষ মনে করে যে, জগতের ইষ্টকারণতার হানি হয়। কিন্তু এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। মানুষের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না। অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষ অতি ক্ষুদ্র বালুকণা এবং অনন্ত কালসমুদ্রে ক্ষণস্থায়ী তরঙ্গমাত্র। অন্যান্য জীব ও বস্তুর ন্যায় মানুষও ঈশ্বরের পরম উদ্দেশ্য সাধনের সহকারী উপায়মাত্র। মানুষ সংসারে তাহার কর্তব্য পালন করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিতে পারিলেই তাহার জীবন সফল হইবে। কেবল সুখভোগ করিলেই মনুষ্য জীবন সার্থক হয় না। দুঃখকষ্টের মধ্যেও মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। কেবল সুখ-ভোগে মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অতএব সংসারে দুঃখকষ্ট দেখিলেই জগৎ ইষ্টহেতুক নয় অথবা মঙ্গলময় ঈশ্বরের সৃষ্টি নয় একথা বলা সংগত নহে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মন ও আত্মা
(Mind and Self)

১। মন এবং আত্মার লক্ষণ ও একত্ব

ভারতীয় দর্শনে সাধারণতঃ মন ও আত্মার মূলগত বা স্বরূপতঃ ভেদ স্বীকার করা হয়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দর্শনে সাধারণতঃ মন (mind) ও আত্মা (self) শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রায় সকল পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের মতে মন দেহাতিরিক্ত অর্থাৎ দেহ হইতে ভিন্ন চেতন পদার্থ। মন সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে বা জানিতে পারে। মন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করে, সুখ-দুঃখ-বেদনা প্রভৃতি অনুভব করে এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন প্রভৃতি নিষ্পন্ন করে। অতএব জ্ঞান, বেদনা ও প্রযত্ন মনের ধর্ম বা স্বাভাবিক ক্রিয়া। মনে যেসব বৃত্তি অর্থাৎ জ্ঞান, বেদনা ও প্রযত্নরূপ ক্রিয়া হয়, মন সে-বিষয়ে সচেতন থাকে অথবা সচেতন হইতে পারে। কোন জড় বস্তুতে যেসব ক্রিয়া হয়, উহা সে-বিষয়ে সচেতন নয়। কিন্তু মনে কোন ক্রিয়া হইলেই, মন তাহা জানে বা জানিতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি একটি ঘট বা পট প্রত্যক্ষ করিলে, তাঁহার যে ঘট- বা পট-বিষয়ক প্রত্যক্ষ হইতেছে বা হইয়াছে তাহা তিনি জানেন বা জানিতে পারেন। যে ব্যক্তি সুখ-দুঃখ অনুভব করেন, তাঁহার যে সুখ-দুঃখের অনুভূতি হইতেছে তাহাও তিনি জানেন। সেইরূপ যে ব্যক্তি কোন কর্ম করেন বা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যে এরূপ কর্ম করিতে ইচ্ছুক বা এরূপ কর্মে নিযুক্ত তাহা জানেন বা জানিতে পারেন। অতএব মনে যাহা ঘটে, মন সে-বিষয়ে সচেতন থাকে বা সচেতন হইতে পারে। অবশ্য ঘটনাটি মনে ঘটিবার সময়ই, মন সে-বিষয়ে সচেতন না হইতেও পারে। অন্য বিষয়ে মন নিবিষ্ট থাকিলে এরূপ হইতে পারে। কিন্তু যখন সে-বিষয় হইতে মন প্রত্যাহৃত হইয়া অন্তঃস্থ হয়, তখন তদ্গত ঘটনাগুলি জানিতে পারে। যদি তখন কোন ঘটনা বর্তমান না থাকে, তবে তাহার স্মৃতি থাকিয়া যায় এবং মন স্মৃতিসহায়ে তাহা জানিতে পারে। স্মৃতি মনের একটি বিশেষ বৃত্তি ও লক্ষণ। সেইরূপ সংশয়, বিচার, অবধারণ বা নিশ্চয়জ্ঞান মনের

পাশ্চাত্ত্য দর্শনে মন ও আত্মা শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বৃত্তি ও ধর্ম। সংক্ষেপে বলা যায় যে, মন যাবতীয় জ্ঞান, বেদনা ও প্রযত্ন-বৃত্তির আশ্রয় ও কারণ এবং চৈতন্য (consciousness) ইহার বিশেষ ধর্ম।

মনের সহিত মানসিক বৃত্তি ও চৈতন্যের সম্বন্ধ।

মন জ্ঞান-বেদনা-প্রযত্ন-বৃত্তির আশ্রয় ও সচেতন পদার্থ হইলেও, তাহাদের সমান বা সমতুল্য বস্তু নয়। জ্ঞান প্রভৃতি মনের বৃত্তি এবং চৈতন্য মনের ধর্ম বা বিশেষ গুণ। অতএব মন তাহাদের অতিরিক্ত বস্তু। মনের বৃত্তিগুলি কখন থাকে, কখন থাকে না। কিন্তু মন সব সময়েই বিদ্যমান থাকে। সেইরূপ মনের সচেতনতা গুণ কখন কখন না থাকিতেও পারে। যেমন সুষুপ্তিকালে মনের চৈতন্য লুপ্ত হয়, কিন্তু তাহাতে মনের বিলোপ হয় না, তখনও মন বিদ্যমান থাকে। অনেক পূর্বানুভূত বস্তু আমাদের মনের মধ্যে নিহিত থাকে, যদিচ আমরা সেসব বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকি না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মন মনের বৃত্তিসকলের এবং চৈতন্য গুণের অতিরিক্ত কোন স্থিতিশীল পদার্থ। আরও এক কথা, মানসিক বৃত্তিগুলি নানাপ্রকারের হইলেও একই মনে কেন্দ্রীভূত হইয়া একই ব্যক্তি বা পুরুষের জীবন ও চরিত্র গঠন করে। অতএব মনকে মানসিক বৃত্তিগুলির ঐক্য-সম্পাদক কোন স্থিতিশীল চেতন পুরুষ বলা যায়। এরূপ মনকেই আত্মা বলা হয়। এজন্য পাশ্চাত্ত্য দর্শনে মন ও আত্মা পর্যায় শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু মন বা আত্মা সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য দর্শনে নানাপ্রকার মত দেখা যায়। এখানে তাহার মধ্যে প্রধান চারিটি মতের আলোচনা করা যাইবে।

মন বা আত্মা সম্বন্ধে চারিপ্রকার মত।

২। মন বা আত্মা দেহাতিরিক্ত দ্রব্য
(Substance Theory of Mind or Soul)

মন দেহাতিরিক্ত অজড় দ্রব্য।

প্রাচীন কালে গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটো ও আরিষ্টটল দেহ ও মনের প্রভেদ স্পষ্টভাবে স্বীকার ও প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে চিন্তা, ইচ্ছা ও বেদনা (thinking, willing and feeling) মনের বিশেষ ধর্ম বা ক্রিয়া। এসব ক্রিয়া জড় দেহদ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে না। অতএব জড় দেহের অতিরিক্ত কোন অজড় সত্তা বা পদার্থের (entity or principle) অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এই অজড় সত্তাই মন বা আত্মা।

পরবর্তী কালে মন বা আত্মাকে অজড় দ্রব্য (immaterial or spiritual substance) বলা হইয়াছে। এই দ্রব্য চিন্তা, ইচ্ছা, বেদনা প্রভৃতি অনুভূতির

আশ্রয়, অর্থাৎ ইহারা এই দ্রব্যে থাকে। ইহাদের পরিবর্তন হইলেও মন বা আত্মার পরিবর্তন হয় না। মন বা আত্মা অপরিণামী ও অজড় দ্রব্য। ইহা চিন্তা প্রভৃতির আশ্রয়মাত্র, অতএব ইহা নিষ্ক্রিয় (passive)। নানাপ্রকার চিন্তা, ইচ্ছা ও বেদনা এক মনে বা আত্মায় আশ্রিত থাকে বলিয়া পরস্পর সম্বদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ হয়। এক দ্রব্যে আশ্রিত না থাকিলে তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে না। ডেকার্ট, লক্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ প্লেটো ও আরিষ্টটলের মতানুসারে মন বা আত্মাকে জ্ঞান-ইচ্ছা-বেদনা প্রভৃতির আশ্রয়-দ্রব্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতকেই 'spiritual-substance' theory of mind or soul বলা হয়। ভারতীয় ন্যায়বৈশেষিক, জৈন, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনে আত্মা সম্বন্ধে এরূপ মত দেখা যায়।

৩। মন বা আত্মা চেতন পুরুষ বা জ্ঞাতা
(Personalistic Theory of Mind or Self)

মন চেতন পুরুষ বা জ্ঞাতা।

কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকদের মতে মন বা আত্মা নিষ্ক্রিয় দ্রব্যমাত্র নহে, ইহা সক্রিয় ও সচেতন পুরুষ (person) বা জ্ঞাতা (subject of consciousness)। মন বা আত্মাকে দ্রব্য বলিলে দুইটি দোষ হয়। প্রথমতঃ দ্রব্য গুণের নিষ্ক্রিয় আধারমাত্র। কিন্তু মন বা আত্মাকে জ্ঞান-ইচ্ছা প্রভৃতির নিষ্ক্রিয় আধারমাত্র বলা যায় না। যেমন কোন পেটিকায় নানাবিধ দ্রব্য সঞ্চিত থাকে, সেইরূপে জ্ঞান-ইচ্ছা প্রভৃতি মন বা আত্মাতে কেবল আশ্রিত থাকে না। মন বা আত্মা জ্ঞান-ইচ্ছা প্রভৃতি বৃত্তির সক্রিয় কর্তা ও নির্বাহক। জ্ঞান-ইচ্ছা প্রভৃতি মন বা আত্মার ক্রিয়াশক্তির ফল। মন বা আত্মার ক্রিয়া ব্যতীত উহারা নিষ্পন্নই হয় না। অতএব মন বা আত্মাকে পূর্বনিষ্পন্ন জ্ঞান-ইচ্ছা প্রভৃতির আশ্রয়-স্থলমাত্র বলা যায় না। আরও এক কথা, জ্ঞান-ইচ্ছা প্রভৃতি বৃত্তির ঐক্য সম্পাদনের জন্যও মন বা আত্মার ক্রিয়া আবশ্যক। এক মনের সকল অনুভূতি যে বিচ্ছিন্ন না থাকিয়া সম্বদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহাও মন বা আত্মার ক্রিয়ার জন্য। মন বা আত্মার ক্রিয়াই বিভিন্ন মনোবৃত্তির ঐক্যসূত্র স্থাপন করে। অতএব মন বা আত্মাকে নিষ্ক্রিয় দ্রব্য না বলিয়া, মানসিক অনুভূতিগুলির উৎপত্তিহেতু ও ঐক্যসাধক, সক্রিয় ও সচেতন পুরুষ বলা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ মন বা আত্মাকে দ্রব্য বলিলে ইহা জ্ঞানের বিষয় (object of consciousness) হইয়া পড়ে। কিন্তু মন বা আত্মা কখনও বিষয়রূপে প্রত্যক্ষ হয় না। আত্মাই সব বিষয়কে জানে, কিন্তু আত্মাকে বিষয়রূপে জানা যায় না। উহা সব সময়ই জ্ঞাতারূপে (as subject) প্রতিভাত হয়, কখনও জ্ঞেয়রূপে (as object) জ্ঞাত হয় না। আমরা অবশ্য কখন কখন বলি যে, 'মনকে

জানিতেছি', 'আত্মাকে জানিতেছি'। কিন্তু এভাবে আমরা যে মন বা আত্মাকে জানি তাহা মন বা আত্মার স্বরূপ নয়, উহা মন বা আত্মা কর্তৃক প্রকাশিত মনোবৃত্তিসকলের সমষ্টিমাত্র, উহাকে ইংরেজিতে 'I' বলা যায় না, 'me' বলিতে হয়। মন বা আত্মা স্বরূপতঃ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় নহে; ইহা চেতন কর্তা (agent) বা পুরুষ (person)। এই চেতন পুরুষ জ্ঞান ও ইচ্ছা শক্তিদ্বারা সকল বিষয় জানে, সকল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে এবং তজ্জন্য সুখ-দুঃখরূপ ফল ভোগ করে।

৪। মন বা আত্মা মানসিক অনুভূতিসমূহের সমষ্টিমাত্র (Empirical Theory of Mind or Self)

মন মানসিক বৃত্তিগুলির সমষ্টিমাত্র—হিয়ুমের মত

প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকদের মতে মন বা আত্মা মানসিক প্রত্যক্ষ বা বৃত্তি-সকলের অতিরিক্ত কোন অজড় দ্রব্যও নহে, আর চেতন পুরুষ বা অপরিণামী জ্ঞাতাও নহে। পরন্তু ইহা আমাদের প্রত্যক্ষীভূত মানসিক প্রত্যয়, বেদনা ও প্রযত্নসমূহের সমষ্টিমাত্র। প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক ডেভিড্ হিয়ুম্ মন বা আত্মা সম্বন্ধে এই মত প্রবর্তন করেন। তাঁহার মতে কোন মানুষের জীবনে যতকিছু প্রত্যক্ষ বা অনুভূতি হয়, তাহার সমষ্টি হইল তাহার মন বা আত্মা, ইহা ব্যতীত মন বা আত্মা বলিয়া কিছু নাই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেসব রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, তাহাদের যেসব প্রত্যয় মনে উৎপন্ন হয়, যেসব সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয়, যেসব ইচ্ছা বা মানসিক ক্রিয়া হয়, তদ্দ্বারাই আমাদের মন সম্পূর্ণভাবে গঠিত হয়, মনে আর অন্য কোন বস্তু বা উপাদান নাই। অবশ্য এক মনের সকলপ্রকার প্রত্যয় ও অনুভূতি একত্র সম্বদ্ধ হইয়া থাকে এবং অন্য মনের প্রত্যয়রাজির সমষ্টি হইতে পৃথক্ থাকে। একটির কোন অংশ অন্যটিতে মিশিতে পারে না, যেমন আমার মনের অনুভূতি অন্য লোকের মনের অংশীভূত হয় না। কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষের মন তাঁহার অনুভূতিসকলের সংঘাত বা সমষ্টিমাত্র, ইহাদের একটা পুলিন্দা বা বাণ্ডিল। এই সমষ্টিগত অনুভূতিসকল নিয়ত পরিবর্তন-শীল এবং অতি দ্রুতবেগে পর-পর আগমনশীল। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হইতেছে যে, কিপ্রকারে এইসব দ্রুতপরিবর্তনশীল প্রত্যয় ও অনুভূতি এক মনে সংযুক্ত বা সম্বদ্ধ হয়, কোন্ যোগসূত্রদ্বারা ইহারা একটি স্তবক বা বাণ্ডিলে পরিণত হয়? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হিয়ুম্ বলেন যে, প্রত্যয়ের অনুষঙ্গ-নিয়মদ্বারা (laws of association) ইহারা সম্বদ্ধ বা বাণ্ডিলে পরিণত হয় এবং এরূপ অনুভূতির পুলিন্দা বা বাণ্ডিলকেই মন বলে। যেসব অনুভূতির দেশে বা কালে নিয়ত আসত্তি বা সন্নিধি

(contiguity in space or time) আছে, অথবা কোনরূপ নিয়ত সাদৃশ্য (resemblance) আছে, তাহারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত বা সম্বন্ধ (associated) হয়। আমরা ধূম ও বহ্নির, বিদ্যুৎস্ফুরণ ও মেঘগর্জনের নিয়ত সান্নিধি প্রত্যক্ষ করি। ফলে ইহাদের প্রত্যয়গুলি আমাদের মনে সম্বন্ধ হয় এবং একটির কথা ভাবিলে অপরটির কথা ভাবিতে হয়। সেইরূপ যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তির মুখের সহিত আমার কোন বন্ধুর মুখের সাদৃশ্য থাকে, তবে তাহাকে দেখিলে আমার অনুপস্থিত বন্ধুর কথা মনে পড়িবে। এইভাবে আমাদের সকল অনুভূতি ও প্রত্যয় সম্বন্ধ হয় এবং এই সম্বন্ধ অনুভূতি ও প্রত্যয়রাজিকেই মন বলে। অতএব অনুষঙ্গ-নিয়মদ্বারা সম্বন্ধ অনুভূতি ও প্রত্যয়রাশির নামই মন। এরূপ মনকেই কেহ কেহ আত্মা বলেন।

হিয়ুমের মতে মন বা আত্মা বলিতে মানসিক অনুভূতি ও প্রত্যয়সমূহের সমষ্টিই বুঝায়, তদতিরিক্ত কোন অজড় দ্রব্য, আধ্যাত্মিক সত্তা বা চেতন অপরিণামী জ্ঞাতাকে বুঝায় না। এরূপ আধ্যাত্মিক দ্রব্য বা আত্মার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। ইহা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নয়। প্রত্যক্ষদ্বারা আমরা বিভিন্ন প্রকার অনুভূতি বা প্রত্যয় অবগত হই, তদতিরিক্ত কোন চেতন দ্রব্য বা আত্মাকে জানিতে পারি না। আর আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এমন কোন অনুভূতি নাই, যাহার দ্বারা আমরা ইহার অনুমান করিতে পারি। হিয়ুম্ বলিয়াছেন: 'আমি যখন গভীরভাবে আত্মস্থ হইয়া তথাকথিত আত্মার সন্ধান করি, তখন কোন না কোন অনুভূতিবিশেষের সম্মুখীন হই, আমাকে অর্থাৎ আত্মাকে পাই না। আর যখন সুষুপ্তিকালে কোন অনুভূতি থাকে না, তখন আমার আমিত্ববোধও থাকে না, ফলতঃ আমার অস্তিত্বই লুপ্ত হয়। মৃত্যুকালে আমার দেহ বিনষ্ট হইলে, যদি সকল অনুভূতি লুপ্ত হয়, আমিও শূন্যে লীন হইব।'১ অতএব অপরিণামী চেতন আত্মাকে মানুষের কল্পনা-বিলাসমাত্র বলিতে হইবে। আধুনিক কালে প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকগণ এবং অনেক মনোবিৎ হিয়ুমের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মন বা আত্মাকে মানসিক বৃত্তিসমূহের সমষ্টিতে পর্যবসিত করিয়াছেন।

এই মতের সমালোচনা।

মন বা আত্মা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকদের মত বিচারসহ মনে হয় না। তাঁহাদের মতে মন মানসিক বৃত্তি বা অনুভূতিসমূহের সমষ্টিমাত্র। কিন্তু ইহাদের কোন সমান ও অনুবর্তমান ঐক্যসূত্র না থাকিলে, ইহারা সমষ্টিবদ্ধ বা সম্বন্ধ হইতে পারে না। অবশ্য হিয়ুমের মতে অনুষঙ্গ-নিয়মদ্বারা ইহারা সম্বন্ধ হয়। কিন্তু এখানেও হিয়ুম্ স্বীকার করিয়াছেন যে, এরূপ অনুষঙ্গ দুই বা ততোধিক অনুভূতির নিয়ত দৈশিক বা কালিক সান্নিধির প্রত্যক্ষের ফল, অথবা এক পূর্বানুভূত বস্তুর সহিত পরানুভূত বস্তুর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষের

১। Hume, *Treatise of Human Nature* দ্রষ্টব্য।

ফল। এখন প্রশ্ন হইতেছে—দুই বা ততোধিক অনুভূতি যে, দেশে বা কালে নিয়ত সন্নিহিত থাকে তাহা কিরূপে বুঝা যায়? যদি একই জ্ঞাতা বারংবার উহাদের সন্নিধি প্রত্যক্ষ করে, তবেই উহাদের নিয়ত সন্নিধি জানা যায়। তারপর একটি অনুভূতির সঙ্গে বা পরে যে আর একটি অনুভূতি হয়, তাহা জানিতে হইলেও অনুভূতিগুলি একই জ্ঞাতার হওয়া আবশ্যক। যদি এক ব্যক্তি ধূম প্রত্যক্ষ করে এবং আর এক ব্যক্তি বহ্নি প্রত্যক্ষ করে, তবে তাহাদের কেহই জানিতে পারিবে না যে, ধূম ও বহ্নি দেশে বা কালে সন্নিহিত থাকে। সেইরূপ বর্তমান কালে দৃষ্ট কোন বস্তু যে পূর্বকালে দৃষ্ট কোন বস্তুর সদৃশ, তাহা জানিতে হইলে একই ব্যক্তি বা জ্ঞাতাকে দুইটি বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। ফল কথা, দুই বস্তুর নিয়ত দৈশিক বা কালিক সন্নিধির জ্ঞান অথবা পূর্বভাবী ও পরভাবী বস্তুর সাদৃশ্য-জ্ঞান স্মৃতিসাপেক্ষ। আর একই জ্ঞাতা পূর্ব এবং পর কালে স্থায়িভাবে থাকিলে, স্মৃতি সম্ভবপর হয়। নতুবা এক ব্যক্তি কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করিলেন এবং আর এক ব্যক্তি তাহা স্মরণ করিলেন এরূপ হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় না। অতএব মানসিক বৃত্তিগুলির অনুষঙ্গ ও সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে কোন স্থায়ী জ্ঞাতা বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তৎপরে বক্তব্য এই যে, যদি নিদ্রাকালে কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব লুপ্ত হয়, তবে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি ভিন্ন হইবেন এবং তাঁহার পূর্ববর্তী ব্যক্তির জীবনের কোন স্মৃতি থাকিবে না। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এরূপ হয় না। নিদ্রা হইতে উত্থিত ব্যক্তির নিশ্চিত জ্ঞান হয় যে, তিনিই পূর্ব রাত্রিতে নিদ্রা গিয়াছিলেন এবং তাঁহার পূর্ব পূর্ব দিনের ঘটনারও স্মরণ হয়। শেষ কথা, হিয়ুম্ যে বলিয়াছেন, আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা ঠিক। কিন্তু ইহার কারণ এই নয় যে, আত্মা নাই। আত্মা সব সময়ই জ্ঞাতারূপে স্বপ্রতিষ্ঠ, তাহাকে জ্ঞেয়রূপে জানা যায় না। হিয়ুম্ জ্ঞাতাকে জ্ঞেয়রূপে জানিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। ইহাতে আত্মার অস্তিত্বের হানি হয় না, তাঁহার অনুসন্ধান প্রণালীর দোষই প্রমাণিত হয়। যিনি আত্মার অনুসন্ধান করেন, যিনি তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করেন, যিনি ইহাকে অস্বীকার করেন, তিনিই ত আত্মা। কিন্তু তাঁহাকে জড় দ্রব্যের ন্যায় ধরাছোঁয়া যায় না, জ্ঞাতাকে জ্ঞাতারূপেই জানিতে হয়, বোদ্ধাকে শুদ্ধবোধে বোধ করিতে হয়।

৫। মন দেহের ক্রিয়া বা আচরণমাত্র
(Behaviouristic Theory of Mind)

মন দেহের ক্রিয়া বা আচরণ মাত্র—ওয়াট্‌সনের মত।

আধুনিক কালে মন সম্বন্ধে Behaviourism নামে এক নূতন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। জে বি ওয়াট্‌সন এই মত প্রবর্তন করেন এবং তিনিই ইহার প্রধান ব্যাখ্যাকার ও সমর্থক। এই মত অনুসারে দেহের অতিরিক্ত কোন মানসিক অনুভূতি

অথবা মানসিক অনুভূতিসমূহের ঐক্যসূত্র নাই। যাহাকে মানসিক অনুভূতি (experiences) বলা হয়, তাহা দেহেরই ক্রিয়া বা আচরণমাত্র। পারিপার্শ্বিক বাহ্য দ্রব্যসকল দেহের উপর ক্রিয়া করিলে, দেহে তাহার প্রতিক্রিয়া হয়, অর্থাৎ দেহ এক এক ভাবে ক্রিয়া করে। দেহের এরূপ প্রতিক্রিয়া বা আচরণের সমষ্টিকে মন বলে। মানসিক অনুভূতিগুলি যেমন দেহের ক্রিয়া বা আচরণ, সেইরূপ অনুভূতিসমূহের ঐক্যসূত্র হইল দেহমধ্যস্থ স্নায়ু-ও-পেশীতন্ত্র (neuro-muscular system)। দেহে যেসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা স্নায়ু-ও-পেশীতন্ত্রে কেন্দ্রীভূত থাকে এবং তৎকর্তৃক ঐক্যবদ্ধ হয়। ইহা ব্যতীত অনুভূতিসমূহের অন্য কোন ঐক্যসূত্র নাই। অনুভূতিসমূহের ঐক্য-সম্পাদনের জন্য কোন অজড় দ্রব্য বা চেতন জ্ঞাতা কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। যাহাকে চৈতন্য বা সংবিৎ (consciousness) বলা হয়, তাহাও অর্থহীন শব্দমাত্র। এরূপ সংবিৎ কোন সৎপদার্থ নয়, ইহা স্বীকার না করিয়াও সকল মানসিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা যায়। যেসব ব্যাপারকে লোকে বিশেষভাবে মানসিক ক্রিয়াসাধ্য বলিয়া মনে করে, সেগুলিকেও দেহের ক্রিয়া বা আচরণ বলিয়া বুঝা যাইতে পারে। এখানে সেগুলির আলোচনা করা যাইতেছে।

এই মতানুসারে মুখ্য মানসিক বৃত্তিগুলির ব্যাখ্যা।

কোন কর্ম পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠিত হইলে অভ্যাসে পরিণত হয়, যেমন সন্তরণ, ভ্রমণ ইত্যাদি। অভ্যাসে যে অতীত মানসিক অনুভূতিগুলি বর্তমানে ক্রিয়া করে অর্থাৎ বর্তমান কর্মকে প্রভাবিত করে তাহা নহে। ইহাতে কেবল বিভিন্ন স্নায়ুগ্রন্থিগুলি (neurones) ঐ কর্মের পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠানদ্বারা এমনভাবে সংযুক্ত হইয়া যায় যে, একটিতে ক্রিয়া হইলে অপরগুলি পূর্বে যেরূপ ক্রিয়া করিয়াছিল ঠিক সেইরূপ ক্রিয়া করে। অতএব অভ্যাসে মানসিক ক্রিয়ার কোন স্থান নাই।

প্রত্যক্ষও একপ্রকার দৈহিক অভ্যাস। কোন অর্থ বা দ্রব্যের সহিত কোন ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে উহার প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়, যেমন দূরস্থ একটি ফল আমার চক্ষুসন্নিকৃষ্ট হইলে ফলটির প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু চক্ষুদ্বারা আমি কেবল ফলটির রূপ দেখিতে পাই, অথচ তাহার স্পর্শ, গন্ধ ইত্যাদি গুণের সমষ্টিরূপে সমগ্র ফলটি প্রত্যক্ষ করি। ইহা কিরূপে হয়? কেহ কেহ বলিবেন যে, পূর্বে ফলটির স্পর্শ প্রভৃতি গুণের যে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হইয়াছিল তাহাদের প্রত্যয় বা সংস্কার মনে সঞ্চিত থাকে এবং সেগুলি এখন উদ্বুদ্ধ হইয়া দূরস্থ ফলটির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে। কিন্তু Behaviourism মতানুসারে এরূপ প্রত্যক্ষে স্নায়ুগ্রন্থিসকলের সংযুক্তিকেই যথার্থ ও যথেষ্ট কারণ বলা যাইতে পারে। পূর্বে ফলটির রস, গন্ধ প্রভৃতি বারংবার একত্র প্রত্যক্ষ করিবার ফলে তত্তৎ-প্রত্যক্ষ-সংশ্লিষ্ট স্নায়ুগ্রন্থিগুলি সংযুক্ত

হইয়া যায় এবং একটিতে ক্রিয়া হইলে অপরগুলিতে পূর্বের মত ক্রিয়া হয়, তজ্জনাই সমগ্র ফলটির প্রত্যক্ষ হয়। অতএব প্রত্যক্ষও একপ্রকার দৈহিক অভ্যাস, মানসিক ক্রিয়া নহে।

ভয়, ক্রোধ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বেদনা প্রবল হইলে তাহাদিগকে ভাবাবেগ (emotion) বলে। যেমন কোন লোক হঠাৎ একটি সর্প কিংবা ব্যাঘ্র দেখিলে ভয় পাইয়া ছুটিয়া পলায়ন করে। এখানে সাধারণতঃ বলা হয় যে, সর্প কিংবা ব্যাঘ্র দেখিয়া লোকটির মনে যে আসন্ন বিপদ্ বা মৃত্যুর আশঙ্কা হয়, তাহাই তাহার ভাবাবেগের কারণ। কিন্তু Behaviourism মতানুসারে ভাবাবেগ একপ্রকার জটিল স্নায়বিক ক্রিয়া। মানুষ যখন কোন বিপদের সম্মুখীন হয় তখন তাহার দেহের স্নায়ুকেন্দ্রগুলির প্রবল পরিবর্তন ঘটে এবং তাহা হইতেই ভাবাবেগের উৎপত্তি হয়, ইহা মানসিক ক্রিয়াজন্য নয়।

পূর্বানুভূত বিষয়ের মানসিক সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে তাহার প্রতিচ্ছবি (image) মনে উদিত হয় এবং তদ্দ্বারা তাহার স্মরণ (recollection) হয়। Behaviourism মতে ইহাও একপ্রকার দৈহিক ক্রিয়া অর্থাৎ অভ্যাস, মানসিক ক্রিয়া নহে। এই মতাবলম্বীরা মানসিক প্রতিচ্ছবির (mental image) অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে তথাকথিত মানসিক প্রতিচ্ছবিগুলি নাম বা শব্দমাত্র। কোন পূর্বানুভূত দ্রব্য স্মরণ করার অর্থ হইতেছে তাহার নাম বা নামস্থানীয় শব্দ উচ্চারণ করা। যেমন কেহ যদি গতকল্যকার ভুক্ত দ্রব্যগুলি স্মরণ করেন, তবে বলিতে হইবে যে, তিনি অস্ফুট-স্বরে দ্রব্যগুলির নাম উচ্চারণ করিলেন। অতএব স্মরণ একপ্রকার দৈহিক অভ্যাস, মানসিক ক্রিয়া নহে।

চিন্তা (thinking) যে এক বিশেষপ্রকার মানসিক ক্রিয়া ইহা অবশ্য-স্বীকার্য মনে হয়। যে মানসিক ক্রিয়াদ্বারা আমরা কোন বিষয়ের অর্থ বা তাৎপর্য বুঝি এবং এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ের অনুমান করি, তাহার নাম চিন্তা। চিন্তার আর একটি নাম মনন। ইহা মানসিক বৃত্তি বা ক্রিয়া বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু Behaviourism-মতে চিন্তাও একপ্রকার দৈহিক ক্রিয়া। অবশ্য ইহা দেহের কোনরূপ বাহ্য ও প্রত্যক্ষযোগ্য ক্রিয়া নহে। ইহা দেহের আভ্যন্তরিক ও অপ্রত্যক্ষ ক্রিয়া। যখন কেহ চিন্তা করেন, তখন তাঁহার বাগ্‌যন্ত্রে (larynx) কতকগুলি অব্যক্ত ক্রিয়া হয় এবং তিনি অস্ফুটস্বরে কথা বলিতে থাকেন। এরূপ অস্ফুটস্বরে কথা বলার (subvocal speech) নামই চিন্তা। চিন্তা একপ্রকার কথা বলার অভ্যাসমাত্র (language habit), ইহা দেহেরই অব্যক্ত ক্রিয়া (implicit process), মানসিক ক্রিয়া নহে।

CENTRAL LIBRARY

মন সম্বন্ধে Behaviourists বা আচরণবাদীদের মত বিচারসহ নহে। এই মত অনুসারে মন, জ্ঞান, চৈতন্য বা সংবিৎ বলিয়া কিছু নাই, দেহই একমাত্র সদ্বস্তু। তথাকথিত সকল মানসিক ক্রিয়া দেহেরই ক্রিয়া, দেহমধ্যস্থ স্নায়ু-ও-পেশী-মণ্ডল তাহাদের ঐক্যসাধক তন্ত্র। এরূপ মত জড়বাদেরই আধুনিক রূপান্তরমাত্র। মন বা আত্মা সম্বন্ধে জড়বাদীদের মতে যেসব দোষত্রুটি দেখা যায়, ইহাতেও সেসব দোষত্রুটি আছে। তবে উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ জড়বাদীরা মন বা সংবিৎকে দেহের ক্রিয়াজন্য বলিলেও, ইহার একপ্রকার পৃথক্ সত্তা স্বীকার করেন। কিন্তু আচরণবাদীরা (Behaviourists) তাহাও স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে মন ও সংবিৎ বা চৈতন্য বলিয়া কোন বস্তুই নাই। কিন্তু দেহের মধ্যে যে মন বা চৈতন্য নামে একটি পৃথক্ সত্তা আছে তাহা আমাদের সাক্ষাৎ প্রতীতি বা আভ্যন্তর প্রত্যক্ষগম্য। ইহা অস্বীকার করিলে আমাদের সাক্ষাৎ প্রতীতির অপলাপ করা হয় এবং সেস্থলে কোন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আমাদের সাক্ষাৎ প্রতীতি যদি নিয়ত ও অবাধিত হয়, তবে তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা সকল বিষয়েই সন্দেহ হইবে এবং কোন বিষয়েরই প্রতিষ্ঠা হইবে না। অতএব সাক্ষাৎ প্রতীতিমূলে মন ও সংবিৎ বা চৈতন্যের পৃথক্ সত্তা স্বীকার্য। যদি মন ও সংবিৎ বা চৈতন্য বলিয়া কোন বস্তু না থাকে, তবে আমাদের যে দেহ আছে, দেহের মধ্যে স্নায়ু-ও-পেশীতন্ত্র আছে, এবং তাহাদের বাহ্য ও আভ্যন্তর ক্রিয়া হয়—এসব কথা আমরা জানিতে পারি না, কারণ মন বা চৈতন্যদ্বারাই এসব বিষয় জানিতে হয়। আর এক কথা, বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন বয়সে কোন লোক নিজেকে একই ব্যক্তি বলিয়া জানেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বের একত্ববোধ (consciousness of personal identity) জড়বাদ ও আচরণবাদ অনুসারে বুঝা যায় না। কারণ দেহ, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অণু-পরমাণু নিয়ত পরিবর্তনশীল, দেহমধ্যস্থ স্নায়ু-ও-পেশীমণ্ডলেরও পরিণাম ও পরিবর্তন হয়। অতএব তাহাদের মূলে ব্যক্তির একত্ববোধ জন্মিতে পারে না। ইহা বুঝিতে হইলে কোন অপরিণামী চেতন সত্তার অর্থাৎ দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এইসব কারণে মন বা আত্মা সম্বন্ধে আচরণবাদীদের মত গ্রহণীয় নয়। অবশ্য মন বা আত্মা কর্তৃক অধিষ্ঠিত দেহে অভ্যাস, প্রত্যক্ষ, ভাবাবেগ, স্মরণ, চিন্তা প্রভৃতি স্থলে কিরূপ ক্রিয়া হয় সে-সম্বন্ধে আচরণবাদীদের মত গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু এখানেও মনে রাখিতে হইবে যে, এসব বিষয়ে তাঁহাদের বর্ণনা বিষয়গুলির একদেশে অর্থাৎ দেহের দিকে বা ক্রিয়াতে নিবদ্ধ। ইহাদের আর একটি দিক্ অর্থাৎ মানসিক দিক্ও আছে, তাহা স্বীকার করা তাঁহাদের কর্তব্য।

এই মতের সমালোচনা।

ঊনবিংশ অধ্যায়

ইষ্টার্থ ও তত্ত্ব
(Value and Reality)

১। ইষ্টার্থ ও ইষ্টার্থবিষয়ক অবধারণ
(Value and Judgments of Value)

মানুষের কাম্য বা বাঞ্ছিত বস্তুর নাম ইষ্টার্থ। সকল মানুষই শারীরিক স্বাস্থ্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ধন-সম্পদ্ কামনা করে। এইসব বস্তু তাহার প্রিয় বা ইষ্ট। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে ইংরেজী 'Value' শব্দ ভাবার্থে (as abstract) ইষ্টতা এবং বাস্তবার্থে (as concrete) ইষ্ট বস্তু বুঝায়। অতএব বাস্তবার্থে Value শব্দের বাংলা প্রতিশব্দরূপে 'পুরুষার্থ', 'প্রিয়বস্তু', 'কাম্যবস্তু', 'ইষ্টবস্তু', 'অর্ঘ', 'মূল্য' প্রভৃতি পদ ব্যবহার করা যায়। আমরা এখানে 'Value' শব্দের প্রতিশব্দরূপে সাধারণতঃ 'ইষ্টার্থ' শব্দ ব্যবহার করিব এবং স্থলবিশেষে অন্যান্য শব্দও ব্যবহার করিতে পারি।

'Value' শব্দের অর্থ ইষ্টতা ও ইষ্টার্থ।

আমাদের সকলপ্রকার অবধারণকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—যথা; বাস্তবার্থবিষয়ক অবধারণ (judgments of fact) এবং ইষ্টার্থবিষয়ক অবধারণ (judgments of value)। আমরা যেমন বাস্তব অর্থসমূহ অবধারণ করি, সেইরূপ ইষ্ট অর্থসমূহ অবধারণ করিতে পারি। এই দুই-প্রকার অবধারণের একটি মূলগত পার্থক্য আছে। বাস্তবার্থবিষয়ক অবধারণ কোন বাস্তব পদার্থের বর্ণনামাত্র (description) —যেমন 'ফুলটি লাল', 'ফলটি মিষ্ট', 'সূর্য পূর্বদিকে উঠিতেছে' ইত্যাদি। ইষ্টার্থবিষয়ক অবধারণে কোন বস্তুর গুণের সমাদর করা হয় অর্থাৎ সাদ্‌গুণ্যের প্রশংসা করা হয় (appreciation of worth)—যেমন 'ফুলটি সুন্দর', 'সূর্যোদয় মনোহর', 'কাজটি সৎ' ইত্যাদি। প্রথমোক্ত বাক্যগুলিতে কোন্ দ্রব্য বস্তুগত্যা কিপ্রকার বা কিরূপ অবস্থায় আছে, তাহাই বলা হইয়াছে। শেষোক্ত বাক্যগুলিতে বস্তুগুলির কোনরূপ ইষ্টতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাই হইল বাস্তবার্থ-বিষয়ক ও ইষ্টার্থবিষয়ক অবধারণের মূল প্রভেদ। প্রথমটিতে বস্তুর স্বরূপের বর্ণনা করা হয়, দ্বিতীয়টিতে কোন বস্তুর সাদ্‌গুণ্যের অর্থাৎ ইষ্টতার সমাদর করা হয়।

বাস্তবার্থবিষয়ক ও ইষ্টার্থ-বিষয়ক অবধারণ।

২। ইষ্টার্থের প্রকারভেদ

মানুষের সকল কাম্য বস্তুর বা ইষ্টার্থের পরিগণনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু কতকগুলি বিভিন্ন-জাতীয় ইষ্টার্থ আছে। এখানে তাহাদের প্রধানগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এগুলি নিম্নরূপ।

(১) শারীরিক ইষ্টার্থ
(Bodily Values)

শারীরিক ইষ্টার্থ।

শরীর রক্ষার জন্য এবং শারীরিক স্বাস্থ্য ও সুখ বিধানের জন্য যেসব বস্তু প্রয়োজন, তাহা মানুষের কাম্য ও ইষ্টার্থ। শরীরদ্বারাই মানুষকে অর্থোপার্জন, বিদ্যার্জন, ধর্মকর্ম সবকিছু করিতে হয়। অতএব শরীরের যাহাতে পুষ্টি ও উন্নতি হয়, যেরূপ আহার, ব্যায়াম ও বিহারদ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, শরীরের সহজাত বৃত্তিগুলির তৃপ্তি হয়, সে-সমস্ত বস্তুই শারীরিক বা দৈহিক ইষ্টার্থ বলিয়া পরিগণিত। কেহ কেহ শরীরকে আত্মার শত্রু ও কারাগার বলিয়া গণ্য করেন। তাঁহাদের মতে শরীরকে ক্লিষ্ট করিয়া কৃচ্ছ্রসাধন ও তপশ্চারণ জ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের মতে সুস্থ শরীর ব্যতীত ধর্মসাধনও হয় না। অবশ্য শারীরিক সুখই মানুষের পরমার্থ নয় এবং শারীরিক ইষ্টার্থই একমাত্র ইষ্টার্থ নয়। তথাপি সংযত আহার, বিহার, নিদ্রা, কর্মপ্রচেষ্টা প্রভৃতি মানুষের কাম্য বস্তু বা ইষ্টার্থ। এজন্য ভারতীয় দর্শনে কামকে অর্থাৎ দেহ ও মনের সুখভোগকে প্রথম পুরুষার্থরূপে গণ্য করা হইয়াছে।

(২) অর্থনৈতিক ইষ্টার্থ
(Economic Values)

অর্থনৈতিক ইষ্টার্থ।

দৈহিক ইষ্টার্থের ন্যায় অর্থনৈতিক ইষ্টার্থও অবশ্য স্বীকার্য। কোন মানুষ এককভাবে জীবনধারণের উপযোগী অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান প্রভৃতি বস্তু সংগ্রহ করিতে পারে না। এজন্য মানুষকে সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় এবং সমাজের বিভিন্নস্তরের ব্যক্তিবর্গকর্তৃক উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিনিময়-ব্যবস্থা করিতে হয়। এরূপ ব্যবস্থা হইতে অর্থনৈতিক ইষ্টার্থগুলির উৎপত্তি হয়। অর্থনৈতিক ইষ্টার্থের মধ্যে ধন বা অর্থ (wealth) সর্বপ্রধান। কারণ অর্থদ্বারা জীবন-ধারণের উপযোগী অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ করা যায়। অতএব অর্থ অর্থাৎ ধনসম্পদ,

মানুষের কাম্য বস্তু বা ইষ্টার্থ। অর্থসম্পদ্ ব্যতীত জীবনধারণই সম্ভব হয় না। অবশ্য অর্থসম্পদ্ মানুষের জীবনের পরমার্থ নয়, উহা জীবনধারণের এবং পরমার্থ লাভের উপায়মাত্র। অতএব অর্থের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য, কেবল অর্থ সংগ্রহ করিলে জীবন সার্থক হয় না। ভারতীয় দর্শনে অর্থকে দ্বিতীয় পুরুষার্থ বলা হইয়াছে।

(৩) সৌন্দর্যবিষয়ক ইষ্টার্থ
(Aesthetic Values)

সৌন্দর্যবিষয়ক ইষ্টার্থ।

মানুষ সৌন্দর্যের উপাসক। পশুপক্ষীর মধ্যেও অল্পবিস্তরভাবে সৌন্দর্যবোধ বিদ্যমান। এইজন্যই বোধ হয় মেঘ দেখিয়া ময়ূর নৃত্য করে, গান শুনিয়া সর্প শান্ত হয়। সে যাহা হউক, মানুষ যে সৌন্দর্যের উপাসক এবিষয়ে সন্দেহ নাই। মানুষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে এবং বিভিন্ন চারুকলার মাধ্যমে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। ইহা তাহার একটি কাম্য বস্তু বা ইষ্টার্থ। অবশ্য সৌন্দর্য উপভোগ ও সৃষ্টিদ্বারা সাক্ষাৎভাবে মানুষের জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্য বা গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করা যায় না। তথাপি ইহাতে মানুষ যে আনন্দ পায়, তাহাই মানুষকে সৌন্দর্যের সেবায় নিযুক্ত করে। বোধ করি আনন্দই মানুষের পরমার্থ এবং সৌন্দর্যের সব রূপই তাহাকে আনন্দ দেয় বলিয়া সেগুলি তাহার কাম্য বা ইষ্টার্থ। ভারতীয় দর্শনে সৌন্দর্যবিষয়ক ইষ্টার্থ-গুলিকে কামের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

(৪) নৈতিক ইষ্টার্থ
(Moral Values)

নৈতিক ইষ্টার্থ।

নৈতিক বিচারে মানুষের কতকগুলি কর্ম সৎ এবং কতকগুলি অসৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অবশ্য সব কর্মের বা বস্তুর নৈতিক বিচার চলে না। প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনার সদসৎ অর্থাৎ ভালমন্দ বিচার হয় না। সেইরূপ পশুপক্ষীর কর্মের নৈতিক বিচার করা হয় না। মানুষের কর্মের মধ্যে যেগুলি তাহার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তাহারই নৈতিক বিচার হয় এবং এরূপ বিচারে কোন কর্ম সৎ বা সাধু এবং কোন কর্ম অসৎ বা অসাধু বলিয়া বিবেচিত হয়। সেইরূপ আমাদের কোন কোন পারিবারিক এবং সামাজিক রীতি-নীতি ও সমাজব্যবস্থা কল্যাণকর বা অকল্যাণকর, মঙ্গলজনক বা অমঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এসব কর্ম, রীতি-নীতি প্রভৃতির মধ্যে যেগুলি সৎ বা শুভ এবং কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক সেগুলি আমাদের নৈতিক জীবনের পক্ষে

উপাদেয়। অতএব এগুলি আমাদের কাম্য বস্তু বা ইষ্টার্থ। নৈতিক ইষ্টার্থ-গুলির মূলে এক পূর্ণ মঙ্গল বা কল্যাণের ভাব (goodness) নিহিত আছে এবং ইহার আলোকে অন্যান্য নৈতিক ইষ্টার্থের উপযোগিতার বিচার করা হয়। যে ইষ্টার্থ মঙ্গল (goodness) লাভের যতটা সহায়তা করে, তাহা আমাদের নৈতিক জীবনের পক্ষে তত উপযোগী। অতএব মঙ্গলই (goodness) মূল নৈতিক ইষ্টার্থ, নৈতিক জীবনের উপযোগী অন্যান্য বস্তুগুলি মঙ্গল লাভের সহায়করূপে আমাদের কাম্য বা ইষ্টার্থ। ভারতীয় দর্শনে নৈতিক ইষ্টার্থগুলিকে তৃতীয় পুরুষার্থ 'ধর্মের' অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

৩। স্বতঃ ও পরতঃ ইষ্টার্থ
(Intrinsic and Extrinsic Values)

স্বতঃ ইষ্টার্থের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত।

পূর্বে যে-সকল ইষ্টার্থের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কতক-গুলিকে স্বতঃ বা স্বতন্ত্র (intrinsic) বলা যায় এবং আর কতকগুলিকে পরতঃ বা পরতন্ত্র (extrinsic) বলা যায়। যে ইষ্টার্থ নিজ গুণেই আমাদের কাম্য অর্থাৎ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কাম্য নহে, তাহাকে স্বতঃ ইষ্ট বলে। যেমন হিমালয়ের সৌন্দর্য নিজে নিজেই আমাদের নিকট আদরণীয়। আমরা অন্য কোন বস্তু লাভ করিবার জন্য অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, ইহার সৌন্দর্য উপলব্ধি করি না। অতএব সৌন্দর্য সর্বনিরপেক্ষভাবেই আমাদের কাম্য বা ইষ্টার্থ। এরূপ সর্বনিরপেক্ষ ইষ্টার্থকে স্বতঃ বা স্বতন্ত্র ইষ্টার্থ (intrinsic value) বলে। যেমন সৌন্দর্য সেইরূপ সত্য (truth), মঙ্গল (goodness), জীবে বা ঈশ্বরে প্রেম (love) স্বতঃ ইষ্টার্থ। সত্য সত্য বলিয়াই আমাদের আদরণীয়, মঙ্গল মঙ্গল বলিয়াই আমাদের কাম্য। অন্য কোন বস্তু লাভের আশায় অথবা অন্য কোন কামনা সিদ্ধির জন্য আমরা সত্য ও মঙ্গলের সমাদর করি না। জীবে বা ঈশ্বরে প্রেম স্বতঃই মানুষের কাম্য ও আদরণীয়। কোন কামনা-বাসনা সিদ্ধির জন্য ইহার সমাদর করা হয় না। প্রেম কোন লাভালাভের অপেক্ষা করে না এবং লাভা-লাভের হিসাব করিয়াও ইহার মূল্য নির্ধারিত হয় না। প্রেম নিঃস্বার্থ ভালবাসা এবং এরূপ নিঃস্বার্থ ভালবাসা স্বতঃই ইষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়।

পরতঃ ইষ্টার্থের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত।

পক্ষান্তরে, যে ইষ্টার্থ কোন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমাদের কাম্য, তাহাকে পরতঃ ইষ্টার্থ (extrinsic value) বলে। ইহা নিজ গুণেই আদরণীয় নহে, কিন্তু অন্য ইষ্টার্থ লাভের উপায়রূপে আমাদের কাম্য। প্রায় সকল শারীরিক ও অর্থনৈতিক ইষ্টার্থকে পরতঃ ইষ্ট বলা যায়। ধন-

সম্পদ্ অর্থাৎ ভূমি, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি স্বতঃই কাম্য নহে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমাদের গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ হয় বলিয়া আমরা সেগুলিকে ইষ্টার্থ বলিয়া বিবেচনা করি। সেইরূপ গ্রাসাচ্ছাদনও স্বতঃ ইষ্ট নয়, সেগুলি শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় বলিয়া আমাদের কাম্য বস্তু বা ইষ্টার্থ। অতএব যেসব ইষ্টার্থ অন্য ইষ্টার্থ লাভের উপায়মাত্র, তাহাদিগকে পরতঃ বা পরতন্ত্র ইষ্টার্থ বলে।

কোন্ ইষ্টার্থ স্বতঃ, আর কোন্ ইষ্টার্থ পরতঃ, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। সাধারণতঃ শারীরিক ও অর্থনৈতিক ইষ্টার্থগুলিকে পরতঃ ইষ্ট বলা হয় এবং মুখ্য অর্থাৎ মৌলিক সৌন্দর্যবিষয়ক ও নৈতিক ইষ্টার্থগুলিকে স্বতঃ ইষ্ট বলা হয়। যদিও স্থূলদৃষ্টিতে ইষ্টার্থের এরূপ বিভেদ করা হয়, তথাপি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ইহা সংগত ও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয় আনন্দই মানুষের পরম কাম্য বা ইষ্টার্থ এবং ইহাই একমাত্র স্বতঃ বা সর্বনিরপেক্ষ ইষ্ট। শারীরিক ও অর্থনৈতিক ইষ্টার্থগুলি আনন্দ লাভের উপায়রূপে আমাদের কাম্য। সৌন্দর্যবিষয়ক এবং নৈতিক ইষ্টার্থগুলিও আনন্দানুভূতির উপায় বলিয়া আমাদের কাম্য বস্তু ও ইষ্টার্থ। তবে এগুলি সাক্ষাৎভাবে আমাদের আনন্দ প্রদান করে, আর শারীরিক ও অর্থনৈতিক ইষ্টার্থগুলি পরম্পরায় আমাদের আনন্দ উৎপাদন করে। কিন্তু সাক্ষাৎভাবেই হউক আর পরম্পরায়ই হউক, যেসব ইষ্টার্থ আনন্দ লাভের উপায়, তাহাদিগকে পরতঃ ইষ্টার্থ বলিতে হয়। অতএব শারীরিক, অর্থনৈতিক, সৌন্দর্যবিষয়ক ও নৈতিক সকল ইষ্টার্থই পরতঃ বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। কেবল আনন্দই স্বতঃ ইষ্টার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এবিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইবে।

কোন্ ইষ্টার্থ স্বতঃ এবং কোনটি পরতঃ ইহার বিচার।

৪। ইষ্টার্থ পুরুষতন্ত্র, না বস্তুতন্ত্র ?
(Are Values Subjective or Objective?)

মানুষ যে-বস্তুকে কাম্য অর্থাৎ ইষ্টার্থ বলিয়া বিবেচনা করে, সে-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, ঐ বস্তুর ইষ্টতা কি আমাদের মনের অনুভূতি বা বেদনামাত্র (subjective), না উহা বস্তুনিষ্ঠ (objective) কোন গুণ বা ধর্ম ? এবিষয়ে দার্শনিকদের মতভেদ আছে।

কোন কোন দার্শনিকের মতে কোন বস্তুই নিজে ভাল বা মন্দ নয়, সুন্দর বা অসুন্দর নয়। উহা যে-ব্যক্তির মনে যেরূপ প্রতীতি ও বেদনা উৎপন্ন করে, তাহার নিকট সেইরূপে প্রতিভাত হয়। আমরা কথায় বলি 'মানুষের রুচি ভিন্ন', 'রুচি

ইষ্টার্থ পুরুষতন্ত্র।

লইয়া মতভেদ বা মতদ্বন্দ্ব চলে না'। আমার নিকট যাহা সুন্দর, ভিন্নরুচি-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট তাহা কদর্য হইতে পারে। আমাদের দেশে যেসব রীতি-নীতি সুনীতি বলিয়া সমাদৃত, কোন সুদূর দেশে তাহা কুনীতি বলিয়া নিন্দিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইষ্টার্থগুলি মানুষের মনের এবং অভিরুচির উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ ইহারা পুরুষতন্ত্র (subjective)। আর এক কথা, আমরা যাহাকে ইষ্টার্থ বলি, তাহা কোন পুরুষের তৃপ্তি বিধান করে এবং তৎকর্তৃক সমাদৃত হয়। যাহা কোন পুরুষের মনের তুষ্টি সাধন করে না অথবা কোন পুরুষ কর্তৃক ইষ্টরূপে আদৃত হয় না, তাহাকে ইষ্টার্থ বলার কোন অর্থ হয় না। অতএব সকল ইষ্টার্থই পুরুষের মনের সহিত সম্বন্ধসাপেক্ষ অর্থাৎ পুরুষতন্ত্র।

ইষ্টার্থ বস্তুতন্ত্র।

ইষ্টার্থ পুরুষতন্ত্র—এই মত একভাবে সত্য হইলেও সম্পূর্ণভাবে সত্য নয় এবং গ্রহণীয় নয়। একথা সত্য যে, পুরুষের তৃপ্তি-বিধান করে বলিয়াই কোন বস্তু আমাদের কাম্য বা ইষ্ট হয়। কিন্তু কোন বস্তুর পুরুষের তৃপ্তি সাধন করিবার যোগ্যতা থাকিলেই তবে উহা তাহার তৃপ্তি সাধন করিতে পারে। এই যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বস্তুর ইষ্টতাকে বস্তুগত বা বস্তুতন্ত্র বলা যায়। তারপর একথাও স্বীকার্য যে, অন্ততঃ মূল ইষ্টার্থগুলির ইষ্টতা কোন ব্যক্তির ইচ্ছা ও কল্পনার উপর নির্ভর করে না। আমরা ইচ্ছামত ইহাদের ইষ্টতা স্বীকার বা অস্বীকার করিতে পারি না। পক্ষান্তরে, ইহাদের এমন কোন গুণধর্ম আছে, যেজন্য আমরা ইহাদের ইষ্টতা স্বীকার করিতে বাধ্য হই। সত্য, মঙ্গল ও সুন্দর মূল ইষ্টার্থ। সকল সভ্য সমাজেই ইহাদের ইষ্টতা স্বীকার করা হয় এবং সব শিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিই ইহাদের সমাদর করেন। অতএব এই ইষ্টার্থগুলিকে পুরুষতন্ত্র অর্থাৎ পুরুষের ইচ্ছাধীন না বলিয়া, বস্তুতন্ত্র বা বস্তুনিষ্ঠ (objective) বলা উচিত। অবশ্য ইহাদের ইষ্টতা স্বীকার করিতে হইলে পুরুষের সুশিক্ষা ও সুরুচি আবশ্যক। কিন্তু তজ্জন্য ইহাদের পুরুষতন্ত্র বলা উচিত নয়। দর্পণের মল মার্জন না করিলে তাহাতে পুরুষের মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে না। কিন্তু সেজন্য কেহ পুরুষের মুখকে দর্পণের মার্জনসাপেক্ষ বলে না। সত্য, শিব বা মঙ্গল ও সুন্দরের উপলব্ধি পুরুষের মনের উৎকর্ষসাপেক্ষ হইলেও, তাহাদের অস্তিত্ব পুরুষের মনের উপর নির্ভরশীল নয়। পুরুষের মন তাহাদের উপলব্ধি করে, উৎপত্তি বা সৃষ্টি করে না। মূল ইষ্টার্থের ন্যায় অন্যান্য ইষ্টার্থকেও বস্তুতন্ত্র বলা যায়। অবশ্য যদি তাহারা বস্তুর গুণধর্মদ্বারা উৎপন্ন হয় এবং তাহাদের স্বীকার করিতে আমাদের কোনরূপ বাধ্যবাধকতা থাকে, তবেই তাহাদিগকে বস্তুতন্ত্র বলা যায়। এহিসাবে শারীরিক স্বাস্থ্য ও সুখকে এবং ধন-সম্পদের ইষ্টতাকে বস্তুনিষ্ঠ বলিতে হইবে। ইহাদের ইষ্টতা বস্তুগত এবং

CENTRAL LIBRARY

সকলের স্বীকার্য। অতএব অনেক দার্শনিকের মতে ইষ্টার্থ বস্তুতন্ত্র, পুরুষতন্ত্র নহে।

নব্যবস্তুতন্ত্রবাদী ইংরেজ দার্শনিক আলেক্‌জাণ্ডারের মতে ইষ্টার্থগুলি বস্তু ও পুরুষ উভয়তন্ত্র। ইষ্টার্থকে তিনি বস্তুর তৃতীয় শ্রেণীর গুণ (tertiary quality) বলিয়াছেন। যেমন কোন জড় বস্তুর দৈর্ঘ্য-প্রস্থাদি মুখ্য-গুণ এবং রূপ-রসাদি গৌণ-গুণ বস্তুগত, তেমনি উহার সৌন্দর্যাদি তৃতীয় শ্রেণীর গুণও বস্তুগত। তবে তিনি ইহাদিগকে মানসিক অনুভূতিসাপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ গুণ বলিয়াছেন। ইষ্টার্থ সম্বন্ধে আলেক্‌জাণ্ডারের মতই গ্রহণীয় মনে হয়।

ইষ্টার্থ উভয়তন্ত্র।

৫। তত্ত্বের সহিত ইষ্টার্থের সম্বন্ধ
(Relation of Value to Reality)

পরম তত্ত্বের সহিত ইষ্টার্থের কিরূপ সম্বন্ধ? পরম তত্ত্বে ইষ্টার্থের কোন স্থান আছে কি না? যদি থাকে, তাহা কিরূপ? ইষ্টার্থ তত্ত্বগত, না তত্ত্ববহির্ভূত, অর্থাৎ ইষ্টার্থ তাত্ত্বিক বস্তু, না অতাত্ত্বিক প্রত্যয়মাত্র? এইসব প্রশ্ন এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

পরম তত্ত্বের সহিত ইষ্টার্থের সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে, পরম তত্ত্বের স্বরূপ ও লক্ষণ নির্ণয় করা প্রয়োজন। কারণ পরম তত্ত্বের সহিত ইষ্টার্থের সম্বন্ধ পরম তত্ত্বের স্বরূপের উপর নির্ভর করে এবং পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মত হইতেই উহার সহিত ইষ্টার্থের সম্বন্ধ বিষয়ে বিভিন্ন মতের উদ্ভব হয়। সাধারণভাবে বলা যায়, যে সদ্বস্তু হইতে জগতের উৎপত্তি হয়, যাহাতে জগতের স্থিতি ও লয় হয়, তাহার নামই তত্ত্ব বা পরম তত্ত্ব। কিন্তু যাহা হইতে জগতের জন্মাদি হয় তাহাই তত্ত্ব এবিষয়ে সকল দার্শনিক একমত হইলেও, তত্ত্বের বিশেষ লক্ষণ ও স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতভেদ আছে। এইজন্যই তত্ত্বের সহিত ইষ্টার্থের সম্বন্ধ বিষয়ে তাঁহারা বিভিন্ন মত পোষণ করেন। এখানে কয়েকটি প্রধান মতের আলোচনা করা যাইবে।

তত্ত্বের সহিত ইষ্টার্থের সম্বন্ধ বিষয়ে বিভিন্ন মত।

(১) জড়বাদ, স্বভাববাদ ও যদৃচ্ছাবাদ অনুসারে জড় পরমাণুসকলই জগতের মূলতত্ত্ব। পরমাণু হইতেই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সমগ্র জগৎ ও জাগতিক বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে এবং কালে তাহাতেই লয় হইবে। জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কোন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য নাই। ইহা কোন বুদ্ধিমান্ কর্তার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্ম নহে। ইহা যদৃচ্ছভাবে হইয়াছে এবং যদৃচ্ছভাবেই বিনষ্ট হইবে। জড় পরমাণু ও অন্ধ প্রাকৃতিক শক্তি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ও ইষ্টানিষ্টের কোন কথা জানে না ও

জড়বাদী প্রভৃতি দার্শনিকদের মত।

ভাবিতে পারে না। বরং ইহারা নির্মমভাবে মানুষের অনেক প্রিয় ও কাম্য বস্তুকে অর্থাৎ ইষ্টার্থকে পদদলিত করিয়া বিনাশ করে। জড়া প্রকৃতি তাহার নিয়ম অনুসারে কাজ করিয়া যায়। তাহাতে মানুষের ভাল কি মন্দ হইল, ইষ্ট কি অনিষ্ট হইল তাহা সে ভাবে না। প্রকৃতি মানুষের ইষ্টার্থ বলিয়া কিছু জানে না এবং তাহার সিদ্ধির জন্য কোন ব্যবস্থাও করে না। অতএব জড়বাদ প্রভৃতি অনুসারে তত্ত্বের সহিত ইষ্টার্থের কোন সম্বন্ধ নাই, তত্ত্বে ইষ্টার্থের কোন স্থান নাই।

ইহার সমালোচনা।

দার্শনিক মত হিসাবে জড়বাদ প্রভৃতি গ্রহণীয় নয় একথা পূর্বেই বলিয়াছি।১ অতএব তত্ত্বের সহিত ইষ্টার্থের সম্বন্ধ বিষয়ে যে মত ইহাদের মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে তাহাও গ্রহণীয় নয়। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে জড় পরমাণু ও শক্তির যেসব পরিণাম হয়, তাহা নিরর্থক বলা যায় না। জড় পরমাণু হইতে যে অণুকোষ (cell) উৎপন্ন হয়, তাহাতে প্রাণের এবং প্রাণ হইতে মন ও চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। জড় পরমাণুই প্রাণের আবির্ভাবের উপযোগী শরীরসংস্থা উৎপন্ন করে এবং প্রাণ মনের আবির্ভাবের উপযোগী স্নায়ুতন্ত্র রচনা করে। যাহাকে জড়বাদীরা যদৃচ্ছা পরিণাম বলেন, বস্তুগত্যা তাহাদ্বারাই জড়জগতের ক্রমোন্নতি হয় এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রয়োজন অর্থাৎ ইষ্টার্থ সিদ্ধ হয়। অতএব জড়বাদ অনুসারেও তত্ত্বকে ইষ্টার্থ-বিমুখ অথবা ইষ্টার্থের সহিত সম্পর্কশূন্য বলা যায় না।

কেবলাদ্বৈতবাদীদের মত।

কোন কোন অদ্বৈতবাদী (absolutist) দার্শনিকের মতে পরম তত্ত্ব এক, অদ্বিতীয়, নির্গুণ ও নির্বিশেষ সত্তামাত্র। পরম তত্ত্বে কোন ভেদ নাই, ইহার কোন গুণধর্মও নাই। পরম তত্ত্বে বৈচিত্র্যময় জগতের প্রকৃত সত্তা নাই, উহা পরম তত্ত্বের মায়িক অবভাসমাত্র (false appearance)। পরম তত্ত্ব সদসৎ, শুভাশুভ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের অতীত (beyond good and evil)। পরম তত্ত্বের কোন কাম্য বা ইষ্ট বস্তু নাই, কোন দ্বেষ্য বা অনিষ্ট বস্তুও নাই, কোন প্রিয় কিংবা অপ্রিয় বস্তুও নাই। ইহা সর্বনিরপেক্ষ, উদাসীন ও নির্বিকার সত্তামাত্র। অতএব মানুষ যাহাকে ইষ্ট বা ইষ্টার্থ বলে, তাহা তাহার সাংসারিক জীবনের উপাদেয় বস্তুমাত্র, ইহার পারমার্থিক সত্তা নাই অর্থাৎ পরম তত্ত্বে ইহার কোন স্থান নাই। পরম তত্ত্ব সকল ইষ্টার্থের অতীত এবং ইষ্টানিষ্টনিরপেক্ষ।

ইহার সমালোচনা।

পরম তত্ত্ব এবং তাহার সহিত ইষ্টার্থের সম্বন্ধ বিষয়ে উল্লিখিত মত গ্রহণীয় মনে হয় না। পরম তত্ত্ব যাহাই হউক না কেন, ইহা জীবজগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ হইবে। অদ্বৈতমতে ইহা ব্যতীত জীবজগতের জন্মাদির অন্য কারণ

১। ষোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নাই। বস্তুতপক্ষে, ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় তত্ত্বই নাই। যদি তাহাই হয়, তবে পরম তত্ত্বকে জীবজগতের উৎপত্তি প্রভৃতির কারণ বলিতে হইবে। আর পরম তত্ত্ব যদি এক ও অদ্বিতীয় হয়, তবে বলিতে হইবে যে, জীবজগৎ তাহারই প্রকাশিত রূপ, ইহা নিরাকার হইলেও জগদাকারপ্রাপ্ত অর্থাৎ সাকার, ইহা নির্গুণ হইলেও জীবজগদ্‌রূপে গুণান্বিত অর্থাৎ সগুণ। তারপর ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, জীবজগতের সকল বস্তুতে, সকল ব্যাপারে পরম তত্ত্ব প্রকাশমান। জীবজগতের পরিণামের ফলে যেসব ইষ্টার্থ আবির্ভূত হইয়াছে এবং যেগুলির সিদ্ধির জন্য মনুষ্যজাতির যুগযুগান্তরের প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহারও প্রেরণা ও প্রতিষ্ঠা পরম তত্ত্বের মধ্যেই আছে। অতএব পরম তত্ত্বে ইষ্টার্থের কোন স্থান নাই, অথবা পরম তত্ত্ব ইষ্টার্থের অতীত ও ইষ্টার্থবিষয়ে উদাসীন একথা বলা যায় না।

রিকার্ট প্রভৃতি দার্শনিকদের মত।

পক্ষান্তরে রিকার্ট প্রভৃতি কোন কোন দার্শনিক তত্ত্বকে ইষ্টার্থের অতীত না বলিয়া ইষ্ট বা ইষ্টার্থকে তত্ত্বের অতীত পদার্থ বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে যাহা বিধেয় অর্থাৎ করণীয় (ought) তাহাই ইষ্ট। ইষ্ট কোন সদ্বস্তু বা সিদ্ধ পদার্থ (is or existent) নয়। অতএব উহা পরিদৃশ্যমান জগতের কোন বিদ্যমান বা অস্তিত্ববান্ দ্রব্য নয়। উহা দেশ-কালের ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অতীত পদার্থ। উহা আমাদের ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। উহা সকল সিদ্ধ পদার্থের এবং বিদ্যমান তত্ত্বের অতীত ও উৎকৃষ্টতর পদার্থ। ইষ্টার্থসমূহ জগতের বস্তু নয়, তবে এজগতে উহাদের আবির্ভাব হয় এবং তখন আমরা উহাদের বিষয় জানিতে পারি। এ মতে ইষ্টার্থগুলি একপ্রকার অদৃশ্য ও অচিন্ত্য বিধিমাত্র, ইহাদের প্রকাশমান সত্তা নাই, তবে একপ্রকার অনির্বচনীয় সত্তা আছে।

ইহার সমালোচনা।

ইষ্টার্থ সম্বন্ধে রিকার্ট প্রভৃতির মত অতি দুর্বোধ্য। যাহাকে আমরা ইষ্টার্থ বলিয়া গণ্য করি তাহা কোনরূপে আমাদের ইষ্টসাধক হইবে এবং আমাদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত জড়িত থাকিবে। কিন্তু যে ইষ্টার্থ আমাদের জ্ঞান বা বুদ্ধিগম্য নয় এবং যাহা সকল তত্ত্বের অতীত, তাহাকে আমাদের ইষ্টার্থ বলা নিরর্থক। এরূপ বস্তু যে আমাদের ইষ্টার্থ বা অনিষ্টার্থ, তাহা নির্ণয় করা যায় না এবং দর্শনশাস্ত্রে তাহার বিচারও চলে না।

হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকদের মত।

হেগেল, রইস (Royce) প্রভৃতি দার্শনিকদের মতে ইষ্ট ও তত্ত্ব অভিন্ন বস্তু। মানুষ যেসব ইষ্টার্থ লাভের চেষ্টা করে, সেগুলি পরম তত্ত্বে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। এ মতে পরমেশ্বর হইলেন পরম তত্ত্ব। সত্য, মঙ্গল ও সুন্দর প্রভৃতি মূল ইষ্টার্থগুলি তাঁহার স্বাভাবিক গুণ। মানুষ তাহার

CENTRAL LIBRARY

জীবনে এসব ইষ্টার্থ সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলেও, পরমেশ্বরের দিব্য জীবনে এগুলি পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। তিনি মানুষের সকল ইষ্টার্থের সংরক্ষণ করেন, কারণ এগুলি তাঁহার স্বভাবগত। আর যখন পরমেশ্বরই পরম তত্ত্ব, তখন ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইষ্ট বা ইষ্টার্থ তত্ত্বগত এবং তত্ত্ব ও ইষ্টার্থ অভিন্ন বস্তু।

ইহার অপেক্ষাকৃত সারবত্তা।

ইষ্টার্থ ও তত্ত্বের সম্বন্ধ বিষয়ে হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকদের মত পূর্বোল্লিখিত অন্যান্য মত অপেক্ষা আদরণীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মতে সত্য, মঙ্গল প্রভৃতি কেন আমাদের কাম্য বস্তুরূপে পরিগণিত হয় তাহা ঠিক বুঝা যায় না।

বেদান্তমতে তত্ত্ব ও ইষ্টের অভেদ সম্বন্ধ।

এই প্রশ্নের সদুত্তর বেদান্তমতে পাওয়া যায়। উপনিষদে এবং অদ্বৈত বেদান্তে আত্মাকে সর্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। তাহার কারণ, আত্মা সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। আত্মা আনন্দের মূল উৎস ও আধার। প্রত্যেক মানুষের নিকট তাহার আত্মাই সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু, তদপেক্ষা কোন প্রিয় বস্তু নাই। পৃথিবীতে আমাদের যেসব প্রিয় বস্তু আছে, তাহা আত্মার জনাই আমাদের নিকট প্রিয় হয়। দেহ, প্রাণ, মন, স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ্ সবই আত্মার তৃপ্তি ও আনন্দ-বিধান করে বলিয়া আমাদের নিকট প্রিয় হয়। এগুলিতে আমরা যে আনন্দ লাভ করি, তাহা আত্মানন্দেরই কলা বা অংশ। যে-বস্তুতে যে-পরিমাণ আত্মানন্দ লাভ করা যায়, সে-বস্তু আমাদের তত প্রিয় বা কাম্য হয়। দেহের সুখ আত্মানন্দেরই এক অংশ বা কলা। সেজন্য দেহ ও দৈহিক সুখ-শান্তি আমাদের কাম্য বস্তু বা ইষ্টার্থ। ঐহিক ধন-সম্পদে আমরা যে আনন্দ পাই, তাহা আত্মানন্দের আর এক অংশ বা কলা। অতএব ধন-সম্পদ্ আমাদের কাম্য বস্তু। ইহারই নাম অর্থনৈতিক ইষ্টার্থ। সেইরূপ সৌন্দর্যবিষয়ক ইষ্টার্থগুলি আত্মানন্দের বিভিন্ন কলা এবং সেজন্য আমাদের কাম্য বস্তু। নৈতিক ইষ্টার্থগুলিও আত্মানন্দের কলা বা অংশ এবং সেজন্য মানুষের কাম্য বস্তু। এইভাবে দেখা যায় যে, মানুষের সকল ইষ্টার্থ আত্মানন্দের বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া ইষ্টার্থরূপে পরিগণিত হয়। তারপর আত্মা স্বরূপতঃ সৎ বা সত্য, শিব বা মঙ্গল এবং রস বা সুন্দর। এরূপ আত্মাই পরম তত্ত্ব বা পরমেশ্বরস্থানীয় বলিয়া, সত্য-মঙ্গল-সুন্দর প্রভৃতি ইষ্টার্থকে পরম তত্ত্বে অর্থাৎ পরমেশ্বরে অধিষ্ঠিত বলা যায়। আত্মাই পরম তত্ত্ব ও পরম ইষ্ট। পরম ইষ্ট ও পরম তত্ত্ব এক আত্মা বা পরমেশ্বরের দুই দিক্ বা দুই রূপ। পরম তত্ত্বই পরম ইষ্ট এবং পরম ইষ্টই পরম তত্ত্ব।

CENTRAL LIBRARY

বিংশ অধ্যায়

ঈশ্বর ও জীবজগৎ
(God and the World)

১। ঈশ্বরের লক্ষণ ও ঈশ্বরবিষয়ক প্রত্যয়
(Nature and Conception of God)

ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন একটি সর্বজনগ্রাহ্য লক্ষণ নির্দেশ করা যায় না। কারণ ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ধারণা দেখা যায়। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেও ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা বিদ্যমান। প্রাচীন কালের মানুষ বহু ঈশ্বর বা দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত। তাহারা মনে করিত যে, প্রাকৃতিক জগতের এক একটি বিভাগ বা ক্ষেত্র এক একটি দেবতা বা ঈশ্বরের অধীন রাজ্য এবং তৎকর্তৃক রক্ষিত ও পরিচালিত। দেবতারা নিজ নিজ রাজ্যে পৃথগ্‌ভাবে বাস করিতেন এবং কখন কখন পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্বকলহেও লিপ্ত হইতেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ মতকে বহু-ঈশ্বরবাদ (polytheism) বলে। এই মত অনুসারে ঈশ্বর বা দেবতাসমূহ মানুষের ন্যায় ক্ষুদ্র, সসীম ও সান্ত জীব এবং তাঁহাদেরও মানুষের মত সুখ-দুঃখ-বেদনাবোধ হয়।

বহুঈশ্বরবাদ।

ঈশ্বর সম্বন্ধে আর একপ্রকার ধারণা কোন কোন স্থলে প্রচলিত দেখা যায়। ইহাকে দ্বৈতমূলক ঈশ্বর-প্রত্যয় (dualistic conception of God) বলা যায়। এই ধারণা অনুসারেও ঈশ্বর সসীম ও সান্ত পুরুষ, তিনি অনন্ত ও অসীম নহেন। এরূপ ধারণা দুইপ্রকার হইতে পারে। প্রথমতঃ বলা যায় যে, ঈশ্বরের বিরোধী অন্য এক আসুরিক শক্তি আছে। ইহা ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছা ও কল্যাণ প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিয়া জগতে অকল্যাণের সৃষ্টি করে। অতএব ঈশ্বরের সত্তা ও শক্তি ইহাদ্বারা সীমাবদ্ধ। প্রাচীন কালে পারসিকদের মধ্যে আহুরা মাজদা ও আরিমান (Ahura Mazda and Ahriman) নামে এরূপ দুইটি সমকক্ষ ও যথাক্রমে শুভ ও অশুভ ঐশ্বরিক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ বলা যায় যে, ঈশ্বর এক হইলেও জগতে আর একটি স্বতন্ত্র জড়সত্তা (matter) বিদ্যমান আছে। এই জড়শক্তিদ্বারা ঈশ্বরের সত্তা ও শক্তি বাধা-

দ্বৈতমূলক ঈশ্বরবাদ।

প্রাপ্ত হওয়ায় জগতে অশুভ ও অকল্যাণের সৃষ্টি হয়। ঈশ্বর মঙ্গলময় হইলেও জড়শক্তির বাধা অতিক্রম করিতে পারেন না। অতএব ঈশ্বর সসীম ও সান্ত পুরুষমাত্র।

আধুনিক একেশ্বরবাদে ঈশ্বরের লক্ষণ।

আধুনিক কালে বহু-ঈশ্বরবাদে ও দ্বৈতমূলক ঈশ্বরবাদে পরিগৃহীত ঈশ্বরবিষয়ক প্রত্যয় গ্রাহ্য নয়। আধুনিক বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত তথ্যসমূহের আলোকে বুঝা যায় যে, জাগতিক সকল বস্তু এক-সূত্রে গ্রথিত এবং এক বিশ্বশক্তি কর্তৃক প্রকাশিত। অতএব জীবজগতের মূলকারণরূপে এক পরম তত্ত্ব বা পরমা শক্তি স্বীকার করিতে হয়। এই পরম তত্ত্বের নাম ঈশ্বর। বর্তমান কালে ঈশ্বর বলিতে সাধারণতঃ এক, অদ্বিতীয় পরম তত্ত্বই বুঝায়। ঈশ্বর পরম পুরুষ বা পরমাত্মা। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ অর্থাৎ সকল শক্তির আধার ও উৎস। জগতের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকল বিষয়ই তাঁহার জ্ঞানগোচর। সদসৎ যে-সকল বস্তু জগতে আছে এবং তাহাদের যে-কোন শক্তি আছে, তাহা ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং তাঁহাতেই অবস্থিত। ঈশ্বরের অন্তরে বা বাহিরে অন্য কোন স্বতন্ত্র বস্তু বা তত্ত্ব নাই। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, স্বয়ম্ভু ও স্বপ্রতিষ্ঠ, অনাদি ও অনন্ত, স্বপ্রকাশ ও সর্ব-নিরপেক্ষ পরম পুরুষ। তাঁহার জ্ঞান, ইচ্ছা ও শক্তির কোন সীমা নাই। তিনি দেশে ও কালে অবচ্ছিন্ন বা বিভক্ত নন। তিনি দেশ-কালের অতীত, দেশ ও কাল তাঁহার অন্তর্গত। ঈশ্বর তাঁহার ইচ্ছা ও সংকল্প অনুসারে জগৎ ও জাগতিক সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন এবং তাহাদের কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছেন। জাগতিক বস্তু-নিচয়ের যথাযোগ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তিনি তাহাদের সুনিপুণ সমাবেশ সাধন করিয়াছেন। এইভাবে সৃষ্ট বস্তুসমূহের পরস্পর সহযোগিতায় জীব-জগৎ তাহার গতিপথে চলিতেছে।

৫। ঈশ্বর ও জীবজগতের সম্বন্ধ
(Relation between God and the World)

জাগতিক বস্তুসমূহ সসীম ও আপেক্ষিক দ্রব্য।

জগতে আমরা যেসব বস্তু দেখিতে পাই তাহারা পরস্পরের বহির্দেশে থাকিয়া পরস্পরকে সীমাবদ্ধ করে এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়। অতএব জগতের সকল বস্তু সসীম, আপেক্ষিক এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ একটি বস্তুর উৎপত্তি ও স্থিতি বহিস্থ অন্যান্য বস্তুর উপর নির্ভর করে। ভৌতিক দ্রব্যের ন্যায় মানুষের দেহ ও মন এরূপ সসীম ও আপেক্ষিক বস্তু। মানুষের জন্ম ও স্থিতি অপরাপর

দ্রব্যের উপর নির্ভর করে এবং তাহার ক্রিয়া বা কর্মপ্রচেষ্টা অন্যান্য দ্রব্য কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। অতএব মানুষকেও সসীম, আপেক্ষিক ও পরনির্ভরশীল বলিতে হইবে।

অতএব ইহারা ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত।

জীবজগৎ এইরূপ অসংখ্য সসীম ও আপেক্ষিক দ্রব্যে বিভক্ত। কিন্তু তাহা হইলেও এসকল দ্রব্য পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারত, তাহাদের সমবায়ে একটি সুসম্বদ্ধ জগৎ রচিত হইয়াছে। এরূপ বহু বিভিন্ন দ্রব্যের একত্র সংস্থিতি ও মিলন কিরূপে সম্ভব হয়? যদি তাহারা এক সত্তা হইতে উদ্ভূত হয় এবং এক শক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবেই ইহা সম্ভবপর হইতে পারে। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, জাগতিক সকল সসীম ও আপেক্ষিক দ্রব্য এক অসীম ও সর্বনিরপেক্ষ তত্ত্বে অধিষ্ঠিত। জগৎ যেন বহু হইয়াও এক তত্ত্বে অবস্থিত এবং এক হইয়াও বহুধা বিভক্ত। ইহা এক তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত এবং তদ্দ্বারা সম্বদ্ধ হইলেই বহু হইয়াও একস্থ অর্থাৎ একত্রাবস্থিত হইতে পারে। ঈশ্বরই সেই এক তত্ত্ব। অতএব বলিতে হয়, জগতের আপেক্ষিক দ্রব্যসমূহ এক সর্বনিরপেক্ষ তত্ত্ব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ জগৎ ঈশ্বর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

জাগতিক বস্তুসকল দুইপ্রকার ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক।

জাগতিক বস্তুসমূহ দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত—ভৌতিক ও মানসিক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক। ভৌতিক জগৎ জড়দ্রব্যসমূহের সমষ্টি। মন বা জীবাত্মা মানসিক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জগতের অন্তর্ভুক্ত। ঈশ্বর বিভিন্নপ্রকারে জগতের বিভিন্ন বিভাগ বা ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রিত করেন বলা যায়। প্রথমতঃ বলা যায়, ভৌতিক জগৎ সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। জড়দ্রব্য স্বয়ংক্রিয় বা স্বাধীন-ইচ্ছাসম্পন্ন নয়। অতএব তাহাদের পারস্পরিক ক্রিয়া ও সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বলিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ বলা যায়, জীবসমূহের মন বা আত্মা ঈশ্বর কর্তৃক আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত। জীবের মন বা আত্মা স্বাধীন-ইচ্ছাসম্পন্ন এবং স্বতন্ত্র। অতএব ইহা ঈশ্বর বা অন্য কোন কর্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বর জীবের মন বা আত্মার উৎপত্তির কারণ এবং তাহার সহজাত শক্তিসমূহ ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত। এই হিসাবে জীবের মনকে ঈশ্বর কর্তৃক আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত বলিতে হয়। তৃতীয়তঃ বলা যায়, মন ও দেহের বা জড়জগতের সম্বন্ধ ঈশ্বর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। আমরা মনদ্বারা জড়দ্রব্যসমূহ জানিতে পারি এবং তাহাদের উপর ক্রিয়া করিতে পারি। জড়জগৎ এমনভাবে গঠিত হইয়াছে যে, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং বুদ্ধিগম্য হয়। আমাদের মনও এমনভাবে গঠিত হইয়াছে যে, তাহা জড়জগৎ জানিতে পারে এবং জড় প্রাকৃতিক শক্তির উপর ক্রিয়া করিতে পারে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, মন ও জড়জগৎ

বিশ্বাতীত ঐশ্বরিক শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট এবং এই শক্তি তাহাদের এমনভাবে গঠিত করিয়াছে যে, তাহারা পরস্পরের সহিত যুক্ত বা মিলিত হইতে পারে।

এইভাবে আমরা বুঝিতে পারি যে, জীবজগৎ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত। জীবের মন বা আত্মা এবং জড়জগৎ উভয়ের উৎপত্তি, স্থিতি ও সম্বন্ধ ঈশ্বর কর্তৃক নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত। উভয়ে ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া সুসম্বদ্ধ ও সুশৃঙ্খলিত জগদ্-রূপে বিদ্যমান। জীবজগৎ পরতন্ত্র অর্থাৎ ঈশ্বরনিয়ন্ত্রিত, কেবল ঈশ্বরই স্বতন্ত্র ও সর্বনিরপেক্ষ পরম তত্ত্ব।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—স্বতন্ত্র ঈশ্বর ও পরতন্ত্র জগতের কিরূপ সম্বন্ধ? জীবজগতের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ কিভাবে বুঝা যায়? কিভাবে ঈশ্বর জীবজগৎ সৃষ্টি করেন, কিভাবেই বা ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করেন? এসব প্রশ্ন দর্শনশাস্ত্রের চরম প্রশ্ন। যিনি অসীম ও অনন্ত তিনি কিভাবে সসীম ও সান্ত হইলেন, যিনি সর্বনিরপেক্ষ পরম তত্ত্ব তিনি কিরূপে আপেক্ষিক জগদ্রূপে প্রকাশিত হইলেন, এক কিরূপে বহু হইল এবং তাহাদের সম্বন্ধই বা কিরূপ?—এসব শেষ-প্রশ্নই এখানে জিজ্ঞাস্য। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এসব প্রশ্নের মীমাংসা আমাদের জ্ঞান বা বুদ্ধির অধিগম্য নয়। আমাদের ন্যায়শাস্ত্র বা দর্শনশাস্ত্র অনুসারে ঈশ্বর ও জগতের, স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্বন্ধ বুঝিবার সময় আমরা এক মারাত্মক ভ্রমে পতিত হই। আমরা মনে করি যে, দুইটি সসীম ও সান্ত দ্রব্যের সম্বন্ধ যেভাবে বুঝা যায়, সেইভাবেই অনন্ত ঈশ্বর ও সান্ত জগতের সম্বন্ধ বুঝা যাইবে এবং এক ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মই উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। আমরা আরও মনে করি যে, যিনি অনন্ত তিনি ত সান্ত হইতে পারেন না, এক ত বহু হইতে পারে না, কারণ এসব স্ববিরুদ্ধ কথা, ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত বা ন্যায়সঙ্গত কথা নয়। অতএব ইহা স্বীকার্য যে, আমাদের বিচারবুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বর ও জগতের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় না। সান্ত ও সসীম জগৎ যে কোন অনন্ত ও অসীম সত্তায় অধিষ্ঠিত এবং তাহারই বাস্তব রূপ বা বাহ্য প্রকাশ, তাহা আমাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ইহা কেমন করিয়া হইল, তাহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের বুদ্ধিগম্য নয়। তথাপি দার্শনিকগণ ইহা বুঝিবার জন্য যুগযুগান্তর ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা নিম্নবর্ণিত দুইটি পদ প্রয়োগ করিয়া ঈশ্বর ও জগতের সম্বন্ধ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ঈশ্বর ও জগতের সম্বন্ধ কিরূপ?

পাশ্চাত্য দর্শনে পদ দুইটিকে ইংরেজিতে Transcendence ও Immanence বলে। Transcendence পদের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতেছে 'উপরে গমন বা অবস্থিতি', Immanence পদের অর্থ হইতেছে

'অন্তরে অবস্থিতি'। বাংলা ভাষায় এক কথায় ইহাদিগকে যথাক্রমে 'অতিবর্তিতা' এবং 'অন্তর্বর্তিতা' বলা যায়। কিন্তু এই পদগুলির আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিলে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা জন্মিতে পারে। 'উপরে বা অন্তরে অবস্থিতি' বলিলে আমাদের মনে হয় যে, দেশিক সম্বন্ধে একটি দ্রব্য অন্য দ্রব্যের উপরে বা মধ্যে অবস্থিত, যেমন একটি শুষ্ক পত্র জলের উপরে থাকে এবং একখণ্ড প্রস্তর জলের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। কিন্তু এরূপ অর্থে ঈশ্বর জগৎকে অতিক্রম (transcend) করিয়া আছেন অথবা তিনি জগতের অন্তরে (immanent) আছেন তাহা বলা যায় না। অতএব অতিবর্তিতা এবং অন্তর্বর্তিতা পদগুলি সাংকেতিক অর্থে (symbolical meaning) বুঝিতে হইবে। এরূপ সাংকেতিক অর্থে পদগুলি ঈশ্বর ও জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং ফলে এবিষয়ে তিনপ্রকার মতের সৃষ্টি হইয়াছে। সেগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল।

এ বিষয়ে তিনপ্রকার মত ।

(১) ঈশ্বর জগৎকে সম্পূর্ণভাবে অতিবর্তন বা অতিক্রম করিয়া (wholly transcendent) আছেন অর্থাৎ ঈশ্বর জগতের বাহিরে এবং জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করেন, যেমন একটি জড়দ্রব্য অপর একটি জড়দ্রব্যের বাহিরে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

(২) ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে জগতের অন্তর্বর্তী (wholly immanent) হইয়া আছেন অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণরূপে জগদ্ব্যাপ্ত এবং তাঁহার সত্তা ও জগতের সত্তা অভিন্ন। অতএব জাগতিক কোন বস্তুর ঈশ্বর হইতে পৃথক্ বা স্বাধীন সত্তা নাই।

(৩) ঈশ্বর জগৎকে অতিক্রম করিয়াও আছেন এবং তাহার অন্তর্বর্তী (both transcendent and immanent) হইয়াও আছেন। ঈশ্বরের শক্তি হইতে জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে এবং তাঁহার শক্তিদ্বারাই জগৎ নিয়ন্ত্রিত হয়। অতএব ঈশ্বর জগতের অন্তর্বর্তী বা অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত। পক্ষান্তরে ঈশ্বর অনন্ত ও অপরিমেয় শক্তির আধাররূপে জগৎকে অতিক্রম করিয়া আছেন, কারণ অনন্ত শক্তি সান্ত জগতে সীমাবদ্ধ ও নিঃশেষিত হইতে পারে না। তারপর ঈশ্বর জগতের সাক্ষী পুরুষরূপেও জগৎকে অতিক্রম করেন, কারণ দ্রষ্টা পুরুষ নিজেকে দৃশ্য জগৎ হইতে ভিন্ন ও পৃথক্ বলিয়াই জানিবেন।

এখন ঈশ্বর ও জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে এই তিনপ্রকার মতের বিশদ আলোচনা করা যাইবে।

CENTRAL LIBRARY

৩। বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদ
(Deism)

প্রথম মত—
ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাতীত।

যে মত অনুসারে ঈশ্বর জগৎকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত, তাহার নাম বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদ। এ মতে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে জগতের অতীত বা অতিবর্তী। ঈশ্বর সর্বনিরপেক্ষ পরম পুরুষ (absolute person)। জীবজগতের সৃষ্টির পূর্বে তিনি অনাদি ও অনন্ত কাল স্বীয় পূর্ণ সত্তায় ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। জগৎ সৃষ্টি করিবার তাঁহার কোন প্রয়োজনও ছিল না, কারণ জগৎ ব্যতিরেকেই তাঁহার পূর্ণ সত্তা ও জ্ঞান বিদ্যমান ছিল। তথাপি তিনি অন্যান্য জীবকে জীবনের আনন্দ প্রদান করিবার জন্য স্বেচ্ছায় জীবজগৎ সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার সৃষ্টিকৌশলে জীবজগৎ তাঁহার বাহিরে পৃথক্ ও স্বাধীন সত্তা লাভ করিল। এইভাবে সৃষ্ট জগৎ স্রষ্টার বাহিরে ও স্বাধীনভাবে নিজ গতিপথে চলিতে লাগিল। যেমন কোন শিল্পী কোন যন্ত্র নির্মাণ করিয়া চালাইয়া দিলে, উহা নিজে নিজে চলিতে থাকে এবং শিল্পীকে আর তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে হয় না, সেইরূপ বিশ্বশিল্পী ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট জগৎ নিজেই চলিতেছে, ঈশ্বর তাহাতে সাধারণ অবস্থায় হস্তক্ষেপ করেন না। তবে মনুষ্যনির্মিত যন্ত্র দীর্ঘ কাল চলে না, কিন্তু ঈশ্বর-সৃষ্ট জগৎ যতকাল ঈশ্বরের ইচ্ছা ততকাল চলিবে।

ঈশ্বর জগতের আদি কারণ, জড়দ্রব্য ও জীবসমূহ পরবর্তী কারণ।

এইভাবে ঈশ্বর জড়দ্রব্যসমূহ সৃষ্টি করিলেন এবং ইহাদের মধ্যে নানা-প্রকার শক্তি নানাভাবে সঞ্চারিত করিয়া ইহা-দিগকে দেশে ও কালে সমাবিষ্ট করিলেন। তদবধি উহারা স্বাধীন সত্তা লাভ করিয়া ঈশ্বরের বাহিরে নিজে নিজে কাজ করিতেছে। ঈশ্বর হইলেন জগতের প্রথম অর্থাৎ আদি কারণ (first cause), এবং জড়দ্রব্য ও শক্তিসমূহ হইল জগতের দ্বিতীয় অর্থাৎ পরবর্তী কারণ (second causes)। প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ সাক্ষাৎ-ভাবে ঈশ্বরের কার্য নহে, উহারা দ্বিতীয় কারণ জড়দ্রব্য ও শক্তিসমূহের কার্য। অতএব জলপ্লাবন, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যে লোকক্ষয় হয়, তাহা ঈশ্বরকৃত নয়, উহা দ্বিতীয় কারণ জড়শক্তির কার্য। সৃষ্টিকালে জগৎ ঈশ্বর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইলেও, পরবর্তী কালে ইহা আর ঈশ্বরনিয়ন্ত্রিত নয়।

কিন্তু জড়দ্রব্য ও শক্তিকে দ্বিতীয় কারণ বলা সংগত মনে হয় না। সৃষ্টিকালে ইহারা যেভাবে ঈশ্বর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, সেইভাবেই এখন কার্য করে, স্বাধীনভাবে কিছু করিতে পারে না। এইভাবে প্রাকৃতিক

CENTRAL LIBRARY

বিপর্যয়সমূহকেও ঈশ্বর কর্তৃক পূর্বপরিকল্পিত বলিতে হয়। অতএব ঈশ্বরই তাহাদের কারণ, বাস্তবিকপক্ষে দ্বিতীয় কারণগুলি কারণই নয়। কোন যন্ত্র উহার নির্মাতার পরিকল্পনা অনুসারেই প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কার্য করে, নিজে স্বাধীনভাবে কিছু করে না, উহাকে কোন সময়েই দ্বিতীয় কারণ বলা যায় না।

ঈশ্বর যেমন জড়দ্রব্যসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ বহু জীবাত্মা সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিও (free will) দিয়াছেন। তাহারা নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে কর্ম করিতে পারে, ভাল ও মন্দ কর্মও করিতে পারে এবং কখন কখন ঈশ্বরের ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার বিরুদ্ধেও কাজ করিতে পারে। এজন্য তাহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় কারণ (second causes) বলা যায়। সৃষ্টির পরে প্রত্যেক জীবাত্মা যেন সাময়িকভাবে স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে পরিণত হয়।

ঈশ্বর ও অলৌকিক ঘটনা।

জীবাত্মারা তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বলে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিকল্পনাকে ব্যাহত করিতে পারে। আবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মানুষের মহাদুঃখকষ্ট হইতে পারে, তাহা হইতে পরিত্রাণের জন্য মানুষ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়। উভয় ক্ষেত্রেই পৃথিবীতে মহাসংকটের অবস্থা আসিতে পারে। যখন এরূপ অবস্থা হয় তখন ঈশ্বর জগদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং কোন প্রাকৃতিক শক্তি ও নিয়মকে সাময়িকভাবে নিরুদ্ধ অথবা পরিবর্তিত করিয়া জগতের শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা সাধন করেন। এইরূপ বিশেষ ক্ষেত্রে ঐশ্বরিক শক্তির প্রয়োগের ফলে যেসব আশ্চর্য ঘটনা ঘটে, তাহাদিগকে অপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক ঘটনা (miracles) বলে। অতএব অলৌকিক ঘটনাদ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় না, বরং প্রকৃতি ও মানুষের সৃষ্ট সংকট হইতে উহা রক্ষিত হয় ও সংস্থাপিত হয়।

এই মত সম্বন্ধে প্রথম আপত্তি।

বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে কয়েকটি আপত্তি হইতে পারে। প্রথম আপত্তি হইল এই যে, এই মত অনুসারে ঈশ্বরকে অনন্ত না বলিয়া সান্ত বলিতে হয়। জীবজগৎ ঈশ্বরের বাহিরে অবস্থিত হইলে এবং ইহার স্বতন্ত্র সত্তা থাকিলে, ঈশ্বর সেখানে থাকিতে পারেন না। অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং তাঁহাকে জীবের ন্যায় সান্ত ও সীমাবদ্ধ বলিতে হয়। এই আপত্তি খণ্ডন করিবার জন্য দুইটি কথা বলা যায়। প্রথমে বলা যায় যে, জীবজগৎ ঈশ্বরের বাহিরে থাকে, সুতরাং ঈশ্বরের অন্তর্ভূত সত্তার কোন ক্ষতি হয় না অথবা তাঁহার অনন্তত্বের কোন হানি হয় না। তারপর বলা যায় যে, জীবজগতের অবস্থানের জন্য ঈশ্বর স্বেচ্ছায় নিজসত্তার সংকোচ সাধন করিয়াছেন এবং নিজেকে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু

তাহাতে তাঁহার মধ্যস্থ অনন্ত শক্তির কোন হ্রাস বা হানি হয় না, তিনি স্বরূপে অনন্তই আছেন। এইসব যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। জীবজগৎ ঈশ্বরের বাহিরে থাকিলে তাঁহার অন্তঃস্থ অনন্তত্বের হানি হয় না, একথা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ ঈশ্বরের অন্তরেই হউক আর বাহিরেই হউক, অন্য কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব স্বীকার করিলেই তাঁহার অনন্তত্বের হানি হয়। তারপর ঈশ্বর স্বেচ্ছায় নিজেকে সীমাবদ্ধ করিলেও তাঁহার অনন্তত্বের অপগম হয়। স্বেচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, সীমাবদ্ধ হইলেই তাঁহাকে আর অনন্ত বলা যাইবে না, সান্তই বলিতে হইবে।

দ্বিতীয় আপত্তি।

দ্বিতীয় আপত্তি এইরূপ: জীবজগৎ যদি ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয়, তবে ইহাতে এত দুঃখকষ্ট কেন? এ প্রশ্নের সদুত্তর বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদে মিলে না, অবশ্য ইহা অন্য-প্রকার ঈশ্বরবাদেও মিলে না। ঈশ্বর জীবজগতের বাহিরে থাকিলেও তৎকর্তৃক সৃষ্ট জগতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়হেতু জীবের অশেষ দুঃখভোগ হয়। অবশ্য জীবের কর্মের দোষে কিছু দুঃখভোগ হইতে পারে। কিন্তু এত বিপুল পরিমাণ দুঃখ জীবের কর্মজন্য বলা যায় না। আর ঈশ্বর যে অলৌকিক ঘটনাদ্বারা জীবকুলকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হইতে রক্ষা করেন, তাহাও দেখা যায় না। অবশ্য এই আপত্তির খণ্ডনার্থে বলা যায় যে, দুঃখ-কষ্টে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ হয় এবং চরিত্রের গঠন হয়। দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়াই মানুষ ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং দুঃখনিবৃত্তিরূপ নির্বাণ-মুক্তি ও পরমানন্দ লাভ করিতে পারে। কিন্তু এরূপ হইলে ঈশ্বরকে বিশ্বাতীত না বলিয়া বিশ্বগত অথবা বিশ্বের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ বলাই উচিত। ঈশ্বরই সাধারণভাবে বিশ্বের এবং বিশেষভাবে জীবের ক্রমোন্নতির প্রেরণার মূল—একথা স্বীকার করিতে হয়। তিনি বিশ্বকে সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করিয়া বিশ্বের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া আছেন—একথা বলা যায় না।

তৃতীয় আপত্তি।

বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে তৃতীয় আপত্তি হইতেছে যে, ইহাতে ব্যাঘাতদোষ (contradiction) দেখা যায়। একদিকে ইহাতে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর অনন্ত কাল জগৎ সৃষ্টি না করিয়া একাকী ছিলেন, আবার অন্যদিকে বলা হইয়াছে যে, তিনি পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ। কিন্তু জ্ঞেয় বিষয় না থাকিলে জ্ঞান হইতে পারে না, জ্ঞান কোন বিষয়েরই জ্ঞান হইবে; যেখানে কোন বিষয় নাই, সেখানে কোন জ্ঞানও হয় না। অতএব ঈশ্বর যদি স্বভাবতঃ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ হন, তবে বলিতে হইবে যে, জীবজগতের সহিত ঈশ্বরের স্বাভাবিক নিত্য সম্বন্ধ আছে। কারণ ঈশ্বরের পরিকল্পিত ও সৃষ্ট জীবজগৎই তাঁহার জ্ঞানের বিষয় হয়। অতএব ঈশ্বরকে জগৎ হইতে পৃথক্ এবং জগতের

সহিত সম্পর্কশূন্য না বলিয়া, ঈশ্বর ও জগৎকে পরস্পরের সহিত নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত বলিতে হইবে। ফলে ঈশ্বরকে জগতের অন্তর্বর্তী এবং জগৎকে ঈশ্বরের অন্তর্বর্তী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পরে এবিষয়ের আরও আলোচনা করা যাইবে।

৪। বিশ্বগত ঈশ্বরবাদ (Pantheism)

দ্বিতীয় মত— ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বগত।

যে মত অনুসারে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বগত অর্থাৎ জগতের অন্তর্বর্তী এবং বিশ্ব হইতে অভিন্ন, তাহার নাম বিশ্বগত ঈশ্বরবাদ (pantheism, from *pan*=all, *theos*=God)। এ মতে ঈশ্বরই সব (God is all) এবং সবই ঈশ্বর (All is God)। ঈশ্বর ও জগৎ অভিন্ন, কারণ যে ঐশ্বরিক শক্তি হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতেই জগৎ অবস্থিত; জগৎ ঈশ্বরের সত্তায় সত্তাবান্, ঈশ্বরের সত্তা ব্যতীত ইহার কোন পৃথক্ সত্তা নাই। ঈশ্বর ও জীবজগৎ দুইটি ভিন্ন বস্তু নয়। স্থূল দৃষ্টিতে আমরা যাহাকে জীবজগৎ বলিয়া দেখি বা জানি, তত্ত্বদৃষ্টিতে বা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাহা ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছু নয়। ঈশ্বর নিজ সত্তায় ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। জীবজগতের পারমার্থিক সত্তা নাই। ঈশ্বরই একমাত্র সদ্বস্তু, পারমার্থিক সত্তা ও সত্য। জীবজগৎ মিথ্যা অবভাসমাত্র (unreal appearances)। পারমার্থিক দৃষ্টিতে একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, তিনিই সব, আর যাহা কিছু আমরা দেখি বা জানি তাহা আমাদের কল্পিত অবভাসমাত্র। অতএব আমরা যে জড়জগৎ ও দেহবিশিষ্ট ক্ষুদ্র জীবসমূহ প্রত্যক্ষ করি, তাহা আমাদের ভ্রমদর্শনমাত্র।

ঈশ্বর সত্য, জগৎ মিথ্যা।

জগদ্রূপ ভ্রমদর্শন হয় কেন?

অবশ্য এখানে প্রশ্ন হইবে—আমাদের এরূপ ভ্রমদর্শন হয় কেন? যদি ঈশ্বরই সব হন, তবে আমরাও অর্থাৎ জীবসমূহও ঈশ্বর হইবে। তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ঈশ্বরই বহু জীব হইয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার মায়াশক্তিযোগে যেন বহু জীবে বিভক্ত হইয়াছেন এবং জীবের দৃষ্টিতে নিজেকে উপলব্ধি করেন। ঈশ্বর যখন জীবের দৃষ্টিতে নিজেকে উপলব্ধি করেন, তখনই তিনি দেশ-কালে অবস্থিত জড়জগৎ বলিয়া প্রতীয়মান হন। যখন জীব তাহার ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা ঐশ্বরিক সত্তা প্রত্যক্ষ করে এবং বুদ্ধিদ্বারা তাহা বুঝিবার চেষ্টা করে, তখন ঈশ্বর জড়জগৎ-রূপে প্রতিভাত হন। কারণ

জীবের বা আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ যাহা প্রত্যক্ষ করে, তাহাকেই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দময় বলিয়া প্রত্যক্ষ করে। আমরা বুদ্ধিদ্বারা বিভিন্নপ্রকার ইন্দ্রিয়-সংবেদন বুঝিবার জন্য এগুলিকে নানা দ্রব্যের গুণ বলিয়া বুঝি এবং দ্রব্য-গুলিকে দেশ-কালে অবস্থিত ও কার্যকারণ-সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বুঝি। ফলে আমাদের নিকট ভগবৎ সত্তা অর্থাৎ ঈশ্বর জড়জগৎ-রূপে প্রতিভাত হন। কিন্তু দেশ, কাল ও কার্যকারণ-সম্বন্ধ আমাদের মন বা বুদ্ধির প্রত্যয়মাত্র, ইহাদের মনোনিরপেক্ষ বাস্তবিক সত্তা নাই। আমাদের সংবেদনগুলিও আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের গুণ-ধর্ম ও প্রকৃতিসাপেক্ষ। ইহাদেরও ইন্দ্রিয়াতীত পারমার্থিক সত্তা নাই। অতএব জড়জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই, উহা কেবল জীবের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিপ্রসূত পারমার্থিক সত্তার অবভাসসমূহের সমষ্টিমাত্র (system of appearances)। জীব যখন তাহার ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিদ্বারা পরম তত্ত্বকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে, তখন তাহার ঈশ্বরে জগৎভ্রম হয়, ঈশ্বর জড়জগৎ-রূপে প্রতিভাত হন। কিন্তু পরমার্থতঃ একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, জীবজগতের ঐশ্বরিক সত্তার অতিরিক্ত কোন সত্তা নাই। উহা মিথ্যা অবভাসমাত্র। অতএব ঈশ্বরই সব এবং সবই ঈশ্বর। এইরূপে মতে কেবল ঈশ্বরই স্বীকৃত হইয়াছেন এবং জগৎ অস্বীকৃত হইয়াছে। ইহাকে নিরীশ্বরবাদ (atheism) না বলিয়া জগৎ নিরাকরণবাদ (acosmism) বলিতে হয়। ইহাকে কেবলৈকত্ববাদও (abstract monism) বলা যায়।

এই মতের সমালোচনা।

দর্শনের ইতিহাসে কেবলৈকত্ববাদ বা বিশ্বগত ঈশ্বরবাদ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। ইহা বহুত্ববাদের প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবাদরূপে কখন কখন আবির্ভূত হইয়াছে। গ্রীস্ দেশের ইলিয়াটিক্ দর্শনে (Eleatic philosophy) এবং ভারতের অদ্বৈত বেদান্তে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে স্পিনোজার দর্শনও ইহার দৃষ্টান্তস্থল। সে যাহা হউক, বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদের ন্যায় বিশ্বগত ঈশ্বরবাদও একদেশদোষদুষ্ট মনে হয়। ঈশ্বর জগতের অন্তর্বর্তী না অতিবর্তী অর্থাৎ অন্তঃস্থ না বহিঃস্থ তাহা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। তবে একথা ঠিক যে, একটি সীমাবদ্ধ জড়দ্রব্য যেভাবে অপর একটি সীমাবদ্ধ জড়দ্রব্যের মধ্যে বা বাহিরে থাকিতে পারে, ঈশ্বরকে সেভাবে জগতের অন্তর্ভূত বা বহির্ভূত বলা যায় না। যদি কোনভাবে ঈশ্বরকে জগতের অন্তর্ভূত বা বহির্ভূত বলা যায়, তবে বলিতে হয় যে, তিনি জগতের অন্তঃস্থও (immanent) বটেন এবং বহিঃস্থও (transcendent) বটেন। তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জগতের অন্তঃস্থ অথবা বহিঃস্থ বলিলে, তাঁহার অনন্তত্বের হানি হইবে এবং তিনি সান্ত হইবেন। ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে জগতের বহির্ভূত হইলে, জগৎও তাঁহার বহির্ভূত হইবে এবং বহির্ভূত জগৎদ্বারা তিনি সীমাবদ্ধ হইবেন। আবার ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে জগতের অন্তর্ভূত বলিলে, তিনি

জগতের ন্যায় সসীম ও সীমাবদ্ধ হইবেন। একদিকে ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, প্রভব ও প্রলয়স্থান এবং অন্তর্যামী ধাতা। এদিক্ দিয়া তাঁহাকে জগতের অন্তর্বর্তী বলিতে হয়। আবার আর এক দিক্ দিয়া তিনি জগতের গতি, ভর্তা, প্রভু ও সাক্ষী। তাঁহার অনন্ত শক্তি অনন্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াও নিঃশেষিত হয় না। তিনি জগৎ সৃষ্টির পূর্বেও পূর্ণ ছিলেন এবং জগৎ সৃষ্টির পরেও পূর্ণ আছেন। এদিক্ দিয়া তাঁহাকে জগতের অতিক্রান্ত বা অতিবর্তী বলিতে হয়। অতএব ঈশ্বরকে বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত দুইই বলিতে হয়। এখন আমরা এই মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

৫। বিশ্বাতীত-ও-বিশ্বগত ঈশ্বরবাদ
(Concrete Monism or Theism)

তৃতীয় মত—ঈশ্বর বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত।

যে মত অনুসারে ঈশ্বর জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াও আছেন এবং অতিক্রম করিয়াও আছেন, তাহাকে বিশ্বাতীত-ও-বিশ্বগত ঈশ্বরবাদ বলে। এই মত বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদ হইতে ভিন্ন, কারণ বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদে ঈশ্বরকে জগৎ হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলা হইয়াছে এবং জগতের সহিত ঈশ্বরের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় নাই। ইহা বিশ্বগত ঈশ্বরবাদ হইতেও ভিন্ন, কারণ বিশ্বগত ঈশ্বরবাদে জগৎ ঈশ্বর কর্তৃক ব্যাপ্ত বলা হইলেও, জগতের প্রকৃত অস্তিত্বই অস্বীকৃত হইয়াছে, জগৎকে মিথ্যা অবভাসমাত্রে পর্যবসিত করা হইয়াছে, এবং ফলে ঈশ্বরই নির্বিশেষ ও নিষ্ক্রিয় সত্তামাত্রে পরিণত হইয়াছেন।

এই মতের ব্যাখ্যা।

বিশ্বাতীত-ও-বিশ্বগত ঈশ্বরবাদে ঈশ্বর ও জগতের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় এবং একটি ব্যতীত অপরটির প্রকৃত সত্তাই স্বীকার করা হয় না। ঈশ্বর ও জগতের সত্তা পরস্পরসাপেক্ষ। ঈশ্বর ব্যতিরেকে জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি হয় না, আবার জগৎ সৃষ্টি না করিলে ঈশ্বরও সক্রিয়, প্রাণবন্ত জ্ঞাতা পুরুষ হইতে পারেন না। অতএব জগতের যেমন ঈশ্বরকে প্রয়োজন আছে, ঈশ্বরেরও তেমন জগৎকে প্রয়োজন আছে। ঐশ্বরিক সৃজনী শক্তি ব্যতীত জগতের উৎপত্তি হয় না, আবার জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি সম্পাদন করিয়াই ঈশ্বর প্রাণময়, প্রেমময় ও চৈতন্যময় পুরুষরূপে স্বপ্রতিষ্ঠ হন। এইভাবে ঈশ্বরকে জগতের আদি ও অন্ত বলা যায়। ঈশ্বরের শক্তিই জগৎ সৃষ্টির আদ্যা শক্তি, আবার ঈশ্বরই জগতের পরমা গতি অর্থাৎ ঈশ্বরের পুরুষোত্তমরূপে প্রতিষ্ঠাই জগতের পরম প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য।

CENTRAL LIBRARY

এই মত অনুসারে ঈশ্বর ও জগতের সম্বন্ধ।

এখন এই মত অনুসারে ঈশ্বরের সহিত জড়দ্রব্যের এবং জীবাত্মার সম্বন্ধ কিরূপ হইবে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। জড়দ্রব্য ও জীবাত্মাসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য আমরা দেশ, কাল, কারণতা, ভেদ, অভেদ, একত্ব, বহুত্ব প্রভৃতি প্রত্যয় প্রয়োগ করি। আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে, বিজ্ঞানে ও দর্শনে এইসব প্রত্যয়দ্বারাই তাহাদের সম্বন্ধ নির্ণীত হয়। তাহাদের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিবার সময় আমরা সাধারণ ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মানুসারে স্বীকার করি যে, দুইটি বস্তু ভিন্ন হইলে অভিন্ন হইতে পারে না, একটি অপরের অন্তঃস্থ হইলে বহিঃস্থ হইতে পারে না, যাহা এক তাহা বহু হইতে পারে না, ইত্যাদি। কিন্তু ঈশ্বর ও জীবজগতের সম্বন্ধ-স্থলে সাধারণ ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মাবলী প্রয়োজ্য বলিয়া মনে হয় না। এখানে আমরা বলিতে পারি না যে, ঈশ্বর ও জীবজগৎ ভিন্ন হইলে অভিন্ন হইতে পারে না, অথবা একটি অপরের অন্তর্ভূত হইলে বহির্ভূত হইতে পারে না। ঈশ্বর ও জীবজগতের সম্বন্ধ বিষয়ে ভেদ ও অভেদ দুইই স্বীকার করিতে হয়।

ঈশ্বর ও জড়ের সম্বন্ধ।

ঈশ্বরের সহিত জড় ও ভৌতিক দ্রব্যসকলের সম্বন্ধ একপ্রকার এবং জীবাত্মাসমূহের সম্বন্ধ অন্যপ্রকার হইবে। জড়-দ্রব্যসকল জীবসমূহের ভোগ সাধনের উপায়মাত্র। তাহারা নিজেদের কোন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সাধন না করিয়া সচেতন ভোক্তা জীবের প্রয়োজন সাধন করে। অতএব জড় প্রকৃতিকে জীবসমূহের উৎপত্তি ও স্থিতির উপায়মাত্র বলা যায়। অবশ্য জীবের প্রয়োজন সাধন করাই প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য নহে। জীবের ন্যায় প্রকৃতিও ঈশ্বরের পরম উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। ঈশ্বর তাঁহার অনন্ত শক্তি জীবজগৎ-রূপে প্রকাশিত করিয়া জ্ঞাতা পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। অতএব জড় প্রকৃতি সাক্ষাৎভাবে জীবের প্রয়োজন সাধনের উপায় হইলেও, জীবের ন্যায় ঈশ্বরের পরম উদ্দেশ্য অর্থাৎ পুরুষোত্তমরূপে প্রতিষ্ঠা লাভের উপায়। ইহার নিজের কোন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য নাই।

ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ।

কিন্তু মানুষ সচেতন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিবিশেষ। সে নিজেকে জানে, নিজের কর্ম নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে এবং তাহার নিজের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সাধন করে। জড়বস্তুসমূহ পরপ্রয়োজন সাধনমাত্র (means to end), কিন্তু মানুষ নিজপ্রয়োজনসাধক (end to himself) জীব। জড়বস্তু নিজে কোন কর্ম করিতে পারে না, অন্য কর্তা ইহাকে যন্ত্ররূপে নিয়োজিত করে। মানুষ নিজেই স্বাধীনভাবে কর্ম করিয়া নিজের উন্নতি সাধন করিতে পারে। মানুষ জাগতিক বস্তুসমূহ এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল জানিতে পারে। এবিষয়ে ঈশ্বর ও

মানুষের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে। এজন্য মানুষের মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তির ও বিভূতির আংশিক প্রকাশ স্বীকার করিতে হয় এবং মানুষকে ঈশ্বরের অংশ বলিতে হয়। পরমেশ্বরই জীবলোকে জীবরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের অংশ হইলেও, সসীম ও সীমাবদ্ধ জীব; তাহার নিজ প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সাধন করিতে তাহাকে অন্য জীব ও দ্রব্যের সাহায্য লইতে হয়। কোন মানুষকে তাহার নিজ কল্যাণ সাধন করিতে হইলে অন্য জীবের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয় এবং তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিতে হয়। মানুষ নিজ কল্যাণকে বিশ্বের পরম কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিশ্বহিতে নিজেকে নিয়োজিত করিতে পারিলেই তাহার প্রকৃত কল্যাণ হয় এবং জীবন সফল হয়।

জীবের ব্যক্তিত্বের হেতু।

এখানে জিজ্ঞাস্য হইতেছে—কিরূপে মানুষ ঈশ্বর হইতে পৃথক্ জীবরূপে আবির্ভূত হয় অর্থাৎ পৃথক্ ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হয়? ঈশ্বর হইতে জীবাত্মাকে পৃথক্করণের হেতু (*principium individuationis*) কি? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, যে প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাই তাহার পৃথক্ ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হইবার হেতু। ঈশ্বর হইতে যেসব জীবের আবির্ভাব হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনই (purpose or end) তাহাদের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ এবং তাহাদের যথার্থ স্বরূপ। অতএব বিভিন্ন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য বিভিন্ন দ্রব্যের ও জীবের উৎপত্তির ও পৃথক্করণের হেতু। আবার সকল দ্রব্য ও জীবের সকল প্রয়োজন ঈশ্বরের পরম প্রয়োজনের (absolute purpose) অঙ্গীভূত হইয়া তাহাতে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। এই পরম প্রয়োজন কি তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করা আমাদের অসাধ্য। তবে আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, জীবজগৎ সৃষ্টিদ্বারা নির্গুণ ও নির্বিশেষ ঐশ্বরিক শক্তি সগুণ, সবিশেষ ও সচেতন পুরুষোত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। অপৌরুষেয় ঐশী শক্তির পরম পুরুষরূপে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়াই জীবজগৎ সৃষ্টির পরম প্রয়োজন।

উপসংহার

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, পূর্বোল্লিখিত যুক্তি অনুসারে ঈশ্বর ও জীবজগৎ পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত এবং পরস্পরসাপেক্ষ অর্থাৎ একটি ব্যতীত অপরটি থাকিতে পারে না। ইহারা একই তত্ত্বের দুই দিক্ বা রূপ। ঈশ্বর জীবজগৎ সৃষ্টি করিয়া জ্ঞাতা পুরুষরূপে স্বপ্রতিষ্ঠ হন এবং সৃষ্ট জীবজগৎ ঈশ্বরের অংশ বা অঙ্গরূপে আত্মলাভ করে। এই মতকে বিশিষ্টৈকত্ববাদ (concrete monism) বা একেশ্বরবাদ (concrete monotheism) বলা যায়। সসীম জগতে জীবাত্মা ইহার উপমাস্থল। কোন জীবাত্মার অন্তর

হইতেই নানাপ্রকার প্রত্যয়ের (ideas) উৎপত্তি হয় এবং জীবাত্মা এগুলির মধ্যে থাকিয়া তাহাদের ঐক্য সম্পাদন করে। জীবাত্মা তাহাদের মাধ্যমে নিজেকে জ্ঞাতা ও কর্তা পুরুষরূপে অবগত হয় এবং নিজ প্রয়োজন (end) বা ইষ্ট (good) সাধন করে। প্রত্যয়গুলিতে জীবাত্মা আশ্রয়রূপে বিদ্যমান থাকায় ইহারাও সাময়িকভাবে একপ্রকার স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করে, জীবাত্মা যেন বিভিন্ন প্রত্যয়ে রূপায়িত হয়। কিন্তু জীবাত্মা স্বরূপতঃ এসব প্রত্যয়ে নিবদ্ধ নয়। ইহা তাহাদের মধ্যে থাকিয়াও তাহাদিগকে অতিক্রম করে এবং তাহাদিগকে নিজ চেতন সত্তার পূর্ণতা লাভের উপায়রূপে নিয়োজিত করে। সেইরূপ ঈশ্বরের পরমা প্রকৃতি বা শক্তি জীবজগৎ সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক জাগতিক দ্রব্য ও জীবকে একপ্রকার স্বতন্ত্র সত্তা প্রদান করিয়াছে। ঈশ্বর জীবজগতের মাধ্যমে নিজ চেতন সত্তার প্রকাশ ও পূর্ণতা সম্পাদন করেন। তিনি সকল দ্রব্য ও জীবকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তাহাদের মাধ্যমে জগৎকে এক পরম কল্যাণের পথে পরিচালিত করেন। জীবের কল্যাণ এই পরম কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত এবং এই পরম কল্যাণই (absolute end or good) ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির পূর্ণ বিকাশ। এইভাবে ঈশ্বর ও জগতের সম্বন্ধ বুঝিলে, ঈশ্বরকে বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত দুইই বলা যায়। জীবজগৎ ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ এবং তাঁহাতেই অবস্থিত। ইহা ঈশ্বরের আত্মভূত ও আত্মপ্রকাশিত রূপ এবং ইহার মাধ্যমেই ঈশ্বর বিশ্বাত্মা পুরুষোত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। এইরূপে তিনি বিশ্বগত (immanent) অর্থাৎ জীবজগতের অন্তঃস্থ। আবার জীবজগতের স্রষ্টা পুরুষরূপে এবং জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা সাক্ষিরূপে ঈশ্বর বিশ্বাতীত অর্থাৎ জীবজগতের বহিঃস্থ। তিনি চরাচর সর্বভূতের অন্তরেও আছেন, বাহিরেও আছেন। জীবজগৎ তাঁহার আত্মভূত বা অন্তঃস্থ, কিন্তু তিনি জীবজগতের অতীত। ঈশ্বর এবং জীবজগতের সম্বন্ধ বিষয়ে এরূপ মতকে কেবল 'theism' বা 'monotheism' না বলিয়া, 'panentheism' (all things in God) বলিলে ইহার তাৎপর্য ঠিকভাবে বুঝা যায়। এবিষয়ে এরূপ মতই সর্বাপেক্ষা আদরণীয় মনে হয়। বেদান্ত দর্শনেও এই মতের আভাস ও সমর্থন পাওয়া যায়।

নির্ঘণ্ট

(১) বাংলা

CENTRAL LIBRARY

(২) ইংরেজী

CENTRAL LIBRARY

24-7-63